বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে সূফীদের অবদান
(১৭৫৭ - ১৮৫৭)

মুহাম্মদ রুহুল আমীন
সহকারী অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

GIFT

Dhaka University Library
382363

382362

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ
১৯৯৬

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

বিষয়			পৃষ্ঠাঃ
ভূমিকা			
অধ্যায়-১	ঃ	বাংলাদেশ পরিচিতি	১-৩৭
অধ্যায়-২	ঃ	বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব	৩৮-৬৪
অধ্যায়-৩	ঃ	বাংলায় ইসলাম বিস্তার ও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের পটভূমি	৬৫-১১২
অধ্যায়-৪	ঃ	সূফী দর্শন	১১৩-২০৫
অধ্যায়-৫	ঃ	সূফী সাধকগণের অবদান (১৭৫৭-১৮৫৭)	২০৬-৩৬১
শব্দ সংক্ষেপ নির্দেশনা			৩৬২
প্রতিবর্ণায়ন			৩৬৩
অনুলিখনের বেলায় অনুসৃত রীতি			
বাংলা ও হিজরী অব্দকে খৃষ্টাব্দে রূপান্তরের নিয়ম			৩৬৪
গ্রন্থপঞ্জীর তালিকা			৩৬৫-৩৭৫

382362

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

বাংলাদেশ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার একটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশ। মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে জনসংখ্যার দিক থেকে এটা পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তর মুসলিম দেশ। ইন্দোনেশিয়ার পরই এর স্থান। একই ভাষা-ভাষী এত অধিক সংখ্যক মুসলিম পৃথিবীর অন্য কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। ইসলামের উৎপত্তিস্থল পবিত্র মক্কানগরী থেকে প্রায় চার হাজার মাইল দূরে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে এদেশ একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে পরিণত হল এবং কখন ও কাদের প্রচেষ্টায় ফলে এর সংখ্যাগরিষ্ঠতার গতি অব্যাহত রয়েছে-এ বিষয়ে এ পর্যন্ত যে কটি পুস্তক রচিত হয়েছে তন্মধ্যে ডঃ এনামুল হক-এর 'বঙ্গে সূফী প্রভাব,' রশীদ আহমদ-এর 'বাংলাদেশের সূফী-সাধক,' আব্দুল মান্নান তালিব-এর 'বাংলাদেশে ইসলাম,' গোলাম সাকলায়েন-এর 'বাংলাদেশের সূফী-সাধক,' মাওলানা এম. ওবাইদুল হক-এর 'বাংলাদেশের পীর-আউলিয়াগণ,' মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতি-এর 'বাংলাদেশের পীর-আউলিয়া ও মাশায়েখ,' মাওলানা নূরুর রহমান-এর 'তাযকেরাতুল আউলিয়া,' সাদেক শিবলী জামান-এর 'বাংলাদেশের সূফী-সাধক ও অলি-আউলিয়া' উল্লেখযোগ্য। কিন্তু কাল নির্ধারণ করে সূফী-সাধকগণের জীবন ইতিহাস, কর্ম ও অবদান সম্পর্কিত তেমন কোন গবেষনামূলক কর্ম বা গ্রন্থ রচনা অদ্যাবধি হয়নি। তদুপরি ১৭৫৭ সাল থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত-এ একশত বছর বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তান উপ-মহাদেশের মুসলমানদের জন্য এক দুর্যোগপূর্ণ ও অন্ধকারময় কাল ছিল। উক্ত সময়ে বিদেশী ও দেশীয় অমুসলিম কর্তৃক মুসলমানগণ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় দিক থেকে নানারূপ নির্যাতনের শিকার হয়। ইংরেজরা মুসলমানদের প্রায় ছয়শত বছরের লালিত ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুন, সাহিত্য-সংস্কৃতি, চিন্তা-চেতনা ধ্বংস করে অনৈসলামিক ধ্যান-ধারণা, কাজ-কর্ম প্রচলনের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। বিজাতীয় ও বিধর্মীদের বিভিন্ন জীবনাচরণ, কুপ্রথা ও কুসংস্কার মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ করে। এসব ইসলাম বিরুদ্ধ কার্যকলাপ থেকে বিরত রাখার জন্য সূফী-সাধকগণ নিরলস প্রচেষ্টা চালান। তাঁদের মধুর ব্যবহার, সুন্দর আচরণ, সরল জীবন-যাপন ও মানব হিতৈষী কল্যাণধর্মী কর্মে আকৃষ্ট হয়ে মানুষ মহাশান্তির ধর্ম ইসলামের পতাকা তলে সমবেত হয়। তাঁদের প্রচেষ্টার ফলেই এদেশের মুসলমানগণ মনুষ্যত্ব বিরোধী নানা প্রকার অনৈসলামিক কার্যকলাপ থেকে বিরত থেকে মুসলিম হিসেবে বেঁচে থাকার সুযোগ পায়। এছাড়া সূফী-সাধকগণ কি পরিস্থিতিতে, কোন প্রেক্ষাপটে ও কিভাবে বিজাতীয়দের অকথ্য নির্যাতনের বিরুদ্ধে নিজেদের জীবনকে বাজী রেখে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন : মানুষ নির্যাতিত-নিস্পেষিত হয়েও কেন দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে-এ বিষয়ে ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন আছে বিধায় বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে সূফীদের অবদান (১৭৫৭-১৮৫৭) বিষয়ে অভিসন্দর্ভ রচনার কাজ শুরু করা হয়।

382362

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা অভিসন্দর্ভটির ভাব সৌন্দর্য ও অবয়ব সুন্দর ও সুচারুরূপে বিন্যাস করার নিমিত্তে এর বিষয়বস্তুকে নিম্নরূপ পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছেঃ- প্রথম অধ্যায়ঃ বাংলাদেশ পরিচিতি; দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ বাংলাদেশে ইসলামের আগমন; তৃতীয় অধ্যায়ঃ বাংলাদেশে ইসলামের বিস্তৃতি ও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের কারণ , চতুর্থ অধ্যায়ঃ সূফী দর্শন ও পঞ্চম অধ্যায়ঃ সূফীগণের অবদান (১৭৫৭-১৮৫৭) সন্নিবেশিত হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে বঙ্গের নামকরণ, বঙ্গ নামের উৎপত্তি, বিভিন্ন সময়ে বঙ্গের সীমানা, বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের নাম ও এর প্রাচীন অধিবাসী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া ইসলামের আগমনপূর্বকালীন বঙ্গের রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দেয়ার চেষ্টা হয়েছে যদ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়েছে যে, তখন মানবতার মুক্তির জন্য অত্র অঞ্চলে ইসলামের আগমন অবশম্ভাবী হয়ে পড়েছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে কোন সাহাবী বা তাবেয়ী কখন ও কোথায় ইসলামের বাণী নিয়ে সর্বপ্রথম এদেশে আগমন করেন এ বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে। যদিও এ বিষয়ে হাদীস, ইতিহাস ও আসমাউর রিজাল শাস্ত্রে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত নেয়ার মত তেমন উল্লেখযোগ্য কোন তথ্য পাওয়া যায়নি তথাপি আকার-ইঙ্গিত, তথ্যসূত্র, যুক্তি ও গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর জীবদ্দশায় তাঁর মামা ও সাহাবী হযরত আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) নবুয়াতের ষষ্ঠদশ বর্ষের মধ্যেই কোন এক সময়ে প্রথম ইসলামের বাণী নিয়ে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে আগমন করেছিলেন। পরবর্তীতে সপ্তম ও অষ্টম শতকে এদেশে আরও অনেক সূফী-সাধকের আগমন ঘটে।

তৃতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশে ইসলামের বিস্তৃতি ও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের কারণ, সপ্তম থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত চারশ বছর এদেশে ইসলাম প্রচার, অতঃপর একাদশ থেকে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত-এ সাতশ বছরে ইসলামের ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ এবং এ সময় আরব, ইয়ামেন, ইরাক, খুরাসান, মধ্য এশিয়া ও উত্তর ভারত থেকে অসংখ্য সূফী-সাধক ও ওলামায়ে কিরাম এসে ইসলাম প্রচারে ব্যাপক অবদান রাখেন-তাঁদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আগত সাধকগণ ইসলাম প্রচার ও প্রসারের কাজে কখনও রাষ্ট্রীয় সহায়তা পেয়েছেন আবার কখনও সহায়তা তো পানই নি বরং বিভিন্ন রকমের বাধার সম্মুখীন হয়েও তাঁরা ইসলাম প্রচার কাজে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। এ সব সূফী-সাধকগণের নিরলস প্রচেষ্টার ফলেই এদেশে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং এ ধারা পরবর্তীতে অব্যাহত থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়ে সূফী দর্শন, সূফী শব্দের উৎপত্তি, সূফী-তত্ত্ব বা তাসাউফের সংজ্ঞা, সূফী দর্শনের উৎপত্তি বিষয়ক মতামত, সূফী দর্শনের উৎপত্তির কারণ, সূফীতত্ত্বের ক্রমবিকাশের ধারা, সূফীতত্ত্বের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি, সূফী পথ-পরিক্রমা, সূফীতত্ত্বের মূলনীতি, সূফী অভিজ্ঞতার বৈশিষ্ট্য, সূফী-সাধক ও রক্ষণশীল মুসলমান, সূফী তরীকাহ্ সমূহ ও সূফী দর্শনের গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে ১৭৫৭-১৮৫৭ সময় কালীন সূফী-সাধকগণের জীবনেতিহাস ও ইসলাম প্রচারে তাঁদের অবদান আলোচিত হয়েছে। সূফী-সাধকগণের মধ্যে উক্ত সময়ে যারা এদেশে জন্মগ্রহণ করেছেন ও এদেশে ইসলাম প্রচার করেছেন, এদেশে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং এদেশ ছাড়া অন্যদেশেও ইসলাম প্রচার করেছেন, অন্যদেশ থেকে এদেশে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করে ইসলাম প্রচার করেছেন, অন্যদেশ থেকে এ দেশে এসে ইসলাম প্রচার করে আবার স্বদেশে চলে গেছেন ও সেখানে সমাহিত হয়েছেন তাঁদের জীবনী, কর্ম, ত্যাগ ও অবদান সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া উক্ত সময়ের সূফী-সাধকগণের মধ্যে যাঁদের জন্ম-মৃত্যু সম্পর্কে সুস্পষ্ট তথ্য পাওয়া গেছে, যাঁরা উল্লেখিত সময়ের পূর্বে জন্মগ্রহণ করে এ সময়ে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের কাজ করেছেন, যাঁরা উল্লেখিত সময়ে জন্মগ্রহণ করেছেন কিন্তু কর্মজীবন উল্লেখিত সময়ের পরও অব্যাহত ছিল তাঁদের জীবন ও কর্মও আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে যে, সূফী-সাধকগণের আধ্যাত্মিক ও অলৌকিক শক্তিতে আকৃষ্ট হয়েই এদেশের অধিকাংশ মানুষ ইসলামের পতাকা তলে সমবেত হয় এবং মহাশান্তির পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানের দীক্ষা গ্রহণ করে সামাজিক ও আত্মিক শান্তি লাভ ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় নিজেদেরকে উৎসর্গ করে। তাই, তাঁদের জীবনাচরণ, শিক্ষা-দীক্ষা বর্ণনার সাথে সাথে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁদের অলৌকিক ঘটনাবলীও উল্লেখ করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভটি রচনার কাজে যে সব প্রতিষ্ঠান ও সুধীজন বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা রইল।

মুহম্মদ ফেরদৌস আলী(?)

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

বাংলাদেশ পরিচিতি

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ পরিচিতি

বাংলাদেশের উৎপত্তি :

পঞ্চান্ন হাজার পাঁচশত আটানব্বই বর্গমাইল এলাকা জুড়ে বাংলাদেশ নামে বর্তমানে যে স্বাধীন সার্বভৌম ভূ-খন্ড তা এই উপ-মহাদেশের সর্বাপেক্ষা নবীনতম স্বাধীন ভূ-খন্ড। এ ভূ- খন্ডের অভ্যুদয় কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। সু-প্রাচীন ইতিহাসের বিবর্তনের ধারায়ই এ নবীন রাষ্ট্রের সৃষ্টি।

বাংলাদেশের উত্তর সীমানায় অনতিদূরে অবস্থিত হিমালয় পর্বতমালা। প্রায় চারকোটি বছর আগে অলিগোসিন যুগে (Oligocine epoch) হিমালয় পর্বতমালার উৎপত্তির সাথে বাংলাদেশের সৃষ্টি সম্পৃক্ত।[১] আর হিমালয় পর্বতমালার সৃষ্টি সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে তোফায়েল আহমদ তাঁর 'যুগে যুগে বাংলাদেশ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, "একদা ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, মাদাগাস্কার, দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং এন্টার্কটিকার সমন্বয়ে গঠিত দক্ষিণ গোলার্ধে গন্ডোয়ানা ল্যান্ড নামে একটি বিশাল ভূ-খন্ড ছিল। উত্তর গোলার্ধেও অনুরূপ একটি ভূ-খন্ড ছিল। আর এ দুটোর মাঝে বিরাজ করত টেথিস সাগর (Tethys Sea)। মধ্যজীবীয় মহাযুগের (Mesozoic era) শেষের দিকে এ গন্ডোয়া ল্যান্ডে ফাটল ধরে এবং উল্লেখিত অংশ সমূহ একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভিন্ন দিকে ভাসতে ভাসতে আজকের অবস্থানে এসে দাঁড়ায়। প্রমাণিত হয়েছে যে, ভারত উপমহাদেশ এমনিভাবে গত দশকোটি বছরে তিন হাজার মাইলেরও বেশী পথ অতিক্রম করে এশিয়া ভূ-খন্ডের সাথে ধাক্কা (Collide) খেয়েছে। এই ধাক্কার ফলে উক্ত ভূ-খন্ডের মাঝে জমাকৃত পলল (Sediment) এবং পাললিক শিলা (Sedimentary rock) সংকুচিত (Squeezed) হয়ে হিমালয় পর্বতমালা সৃষ্টি হয়েছে"।[২] "হিমালয় পর্বতমালা, গারো ও লুসাই পাহাড় এবং রাজমহলের অনতিদূরস্থ পর্বত ও অনুচ্চ মালভূমি প্রভৃতি উচ্চতর অঞ্চল থেকে গঙ্গা, পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র নদের স্রোত ধারা বঙ্গোপসাগর অভিমুখে ধাবিত হওয়ার সময়ে যে রকমারী মাটি, পলল, প্রস্তর কণা, বালি ও আবর্জনা বহু শতাব্দী ধরে বহন করে এনেছিল, সেই পলি মাটি বহুযুগ যাবৎ জমে জমে শক্ত হয়ে বাংলাদেশের ভিত্তিতল গঠন করেছিল"।[৩] তোফায়েল আহমদ আরও বলেন,

---

১। তোফায়েল আহমদ, যুগে যুগে বাংলাদেশ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ৫, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ১৯৯২ ইং, পৃঃ- ৯।

২। তোফায়েল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ-৯।

৩। আব্দুল কাদির, ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক স্মারক বক্তৃতামালা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪ ইং, পৃঃ- ১৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

"পদ্মা, যমুনা নদীসমূহ হিমালয় থেকে বছরে প্রায় ১০২০ কোটি টন পলল বয়ে এনে এতদঅঞ্চলে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ব-দ্বীপ গড়ে তুলেছে যার উপজলীয় বিস্তৃতি (Submerine extension) বেঙ্গল ডীপ-সি ফ্যান (Bengal deep sea fan) নামে সারা বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে শ্রীলংকার আরও অনেক দক্ষিণে ৭° দক্ষিণ অক্ষাংশ পর্যন্ত। লম্বায় এটা প্রায় ২০০০ মাইল"। [১]

"সাগর তলের উপরে বাংলাদেশের প্রাথমিক ভিত্তি নির্মিত হয়ে তা সাগর তটের সম-পৃষ্ঠ হয়েছিল বলে আদি যুগে এদেশের অনেক অঞ্চল ছিল প্রধানতঃ জলাভূমি" [২]। কেননা, বাংলার প্রায় সমগ্র এলাকাটিই সমতল ভূমি। এই এলাকায় বৃহত্তর অংশই গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের পলিমাটি দ্বারা গঠিত। হিমালয় পর্বতের অভ্যুদয়ের বহুকাল আগে থেকেই ব্রহ্মপুত্র সিন্ধু নদ বিদ্যমান ছিল। ব্রহ্মপুত্রের মত মধ্য মায়োসিন কালে (২ কোটি ৫০ লক্ষ বছর আগে) হিমালীয় গিরিজনির (Himalayan Giroginy) ফলে আরো একটি হিমালীয় নদীর জন্ম হয়। এটাই গংগা। অনুমান করা হয় যে বর্তমানে যেখানে ভারতের শিবালিক পাহাড় শ্রেণী রয়েছে সেখান দিয়ে তা প্রবাহিত হত। পরে নদীর দশ্যুতা বা পানি ছিনতাই এর প্রক্রিয়ায় সিন্ধু এবং ব্রহ্মপুত্রের সাথে মিশে একটি মাত্র নদীতে পরিণত হয় তার নাম শিবালিক বা ইন্দ্র ব্রাহ্ম। পরে প্লায়োসিন যুগে শিবালিক ও পটোয়ার গিরি শ্রেণীর উৎপত্তির ফলে আবার একটি নদী ভেঙ্গে তিন নদী সিন্ধু, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র জন্ম নেয় যা বর্তমানে ভৌগোলিক বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খায়। অতীতকাল থেকে অদ্যাবধি এই নদ-নদীগুলোর গতিপথ বহুবার পরিবর্তিত হয়েছে। ফলে অতীতের বহু সমৃদ্ধ নগর ও জনপথ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ফলেও অনেক লোকালয় ও জনপথ ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছে। এতদভিন্ন গঙ্গা, পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার স্রোত উচ্চতর এলাকা থেকে মাটি বহন করে এনে পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গের 'ব'-দ্বীপ যে বিস্তৃত নতুন ভূমির সৃষ্টি করেছে, তা এ অঞ্চলের অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। "এসব পরিবর্তনের বৃহত্তম শিকার হয়েছে প্রাচীন বঙ্গের বৃহত্তম নগরী ও ঐতিহ্যময় রাজধানী গঙ্গো শহর"।[৪] আজ থেকে দু'হাজার বছর পূর্বে এটি হিমালয়ান উপমহাদেশের অন্যতম প্রসিদ্ধ রাজধানী নগরী ও সমৃদ্ধ বন্দর ছিল। এখান থেকে বাংলার সুক্ষ্ম মসলিন কাপড় সুদুর পশ্চিম দেশে রপ্তানি হত।

১। তোফায়েল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ-১০।

২। আব্দুল কাদির, প্রাগুক্ত, পৃঃ- ১৩৪।

৩। মাযহারুল হক,সৈয়দ বাংলাদেশের নদী, পৃঃ- ৩১-৩৮।

৪। আব্দুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশে ইসলাম, আধুনিক প্রকাশনী,ঢাকা, ১৯৮০ ইং,পৃঃ-১২।

Dhaka University Institutional Repository

"যুগযুগান্তরে নানা রূপান্তরের পর এ অঞ্চলের ভূমি যেভাবে স্থিতি নিয়েছে তার উত্তর সীমান্তে আছে গারো পাহাড়, পশ্চিমে রাজমহল পাহাড়, পূর্বপ্রান্তে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের টারসিয়ারী যুগের গিরি শ্রেণী এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। এর মধ্যবর্তী স্থানে সৃষ্টি হয়েছে বঙ্গ অববাহিকা। এর অধিকাংশ স্থান পড়েছে বাংলাদেশে। পূর্বে আছে পাহাড়ী অঞ্চল, মাঝখানে দিনাজপুর, রংপুর, রাজশাহী বরেন্দ্র ভূমি, ময়মনসিংহের গড় অঞ্চল, কুমিল্লা-ময়নামতি-লালমাইর টিলাটঙ্গর। এসব এলাকা ছাড়া বাংলাদেশের প্রায় সবটুকু জায়গাই ব-দ্বীপ"। ১

অতএব দেখা যায়, "উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে গারো, খাসিয়া, লুসাই, জয়ন্তিকা, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম শৈল শ্রেণী এবং পশ্চিমে বিহারের রাজমহল পাহাড় ও কলিঙ্গ। এই চতুঃসীমার মধ্যবর্তী অঞ্চলই বাংলা নামে পরিচিত"। ২ প্রাচীনকালে বাংলাদেশ বলে কোন স্থান ছিল না। বাংলাদেশ বলতে এখন যে অঞ্চলকে বুঝায়, তখন সে অঞ্চলকে নিয়ে কোন অখন্ড রাজ্যও ছিল না। এদেশে তখন অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং এ রাজ্যগুলো বিভিন্ন জনপদ বা রাষ্ট্র নামে অভিহিত হত। "এমন একসময় ছিল যখন বাংলাদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, পশ্চিম বাংলার সবটুকু নিয়ে বাংলাদেশ বুঝাত। আবার কখনো বাংলাদেশ বলতে সমতট, রাঢ়, পুন্ড্রবর্ধন, গৌড় ও তাম্রলিপ্ত রাজ্য বুঝাত। মহাভারতের যুগে বাংলাদেশ মোদাগিরি, পুন্ড্র, কৌশিকিকচ্ছ, সুম্ম, প্রসুম্ম বঙ্গ ও তাম্রলিপ্ত-এসব বিভিন্ন স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল"। ৩

এসব জনপদ বা রাষ্ট্রের সমষ্টিই বঙ্গ বা বাংলা। তবে এসব জনপদের মধ্যে বঙ্গ, পুন্ড্র, গৌড়, রাঢ়, বরেন্দ্র, সমতট ও হরিকেল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব রাজ্যের সীমা ও বিস্তৃতি সঠিকভাবে নির্ণয় করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। কারণ, যুগে যুগে বঙ্গের আয়তন বদলেছে, রাজ শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে এর সীমানা বারবার পরিবর্তিত হয়েছে।

<u>সমতট</u> ঃ সর্বপ্রাচীন এ সমতট জনপদের অবস্থান নির্ণয় করতে গিয়ে ইতিহাসবেত্তারা মতানৈক্য করেছেন। বরাহ মিহিরের লেখায়, "খৃস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে মহারাজ সমুদ্র গুপ্তের এলাহাবাদ প্রস্তর স্তম্ভ লিপিতে সমতটের নাম সম্ভবতঃ প্রথম উল্লেখিত হয়েছে"।৪ সমুদ্র স্পর্শী অঞ্চল বুঝাতে 'সমতট' শব্দ

১। তোফায়েল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ-১২।

২। আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃঃ- ১২।

৩। ফজলুল হাসান ইউসুফ, বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২ ইং, পৃঃ- ১।

৪। মাহবুবুর রহমান, মুসলিম বাংলার অভ্যুদয়, তৌহিদ ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮৮ ইং,পৃঃ-৩।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবহৃত হয়েছে। পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব বাংলার এই প্রাচীন জনপদ সমতট সম্ভবতঃ মেঘনার পূর্ব দিকে বর্তমান কুমিল্লা-নোয়াখালী (যা সমুদ্র নিকটবর্তী ছিল) অঞ্চলকে বুঝাত। নলিনীকান্ত ভট্টাচার্য 'কুমিল্লা ও নোয়াখালী'তে, ওয়ার্টস ফরিদপুরের দক্ষিণে, কার্ণিংহাম গাংগেয় ব-দ্বীপে, রাখালদাস কুমিল্লায় সমতটের অবস্থান অনুমান করেন এবং ফার্গসন সমতটের রাজধানী সোনারগাঁয় চিহ্নিত করেন। খৃস্টীয় চতুর্থ শতক থেকে স্বতন্ত্র রাজ্যরূপে সমতটের উল্লেখ পাওয়া যায়। খৃস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে চৈনিক পরিব্রাজক য়ুয়াং চুয়াং (হিউয়েন সাং) সমতট ভ্রমণ করেন। তার বিবরণ থেকে জানা যায়, সমতটে এক ব্রাহ্মণ বংশ রাজত্ব করত। পরে এরাজ্য খড়্গ বংশের শাসনাধীন হয়। এসময় এর রাজধানী ছিল কুমিল্লা জেলার কর্মান্ত (বর্তমানে- বড় কামতা)। "একসময় এর রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রসারের ফলে সমতট ও বঙ্গ একই এলাকা বুঝাত"।[১]

<u>হরিকেল</u> ঃ প্রাচ্য দেশের পূর্ব সীমায় অবস্থিত জনপদের প্রান্তসীমা বুঝাতে 'হরিকেল' শব্দ প্রচলিত হয়। এজনপদটি চন্দ্রদ্বীপ বা বাখরগঞ্জ অঞ্চলের সংলগ্ন ছিল। চট্টগ্রাম এলাকাও এর অন্তর্ভূক্ত ছিল। "সপ্তম-অস্টম শতাব্দী থেকে দশম একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত হরিকেল বঙ্গ-সমতটের সংলগ্ন স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। কিন্তু ত্রৈলোক্যচন্দ্রের চন্দ্রদ্বীপ অধিকারের পর থেকেই হরিকেলকে বঙ্গের অন্তর্ভূক্ত বলে ধরা হয় অর্থাৎ বঙ্গের সাথে এ জনপদ অভিন্ন। হরিকেল শ্রীহট্ট পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল"।[২]

<u>পুন্ড্র/পুন্ড্রবর্ধন</u> ঃ উত্তরবঙ্গে পুন্ড্র জাতির আবাসস্থল পুন্ড্র বা পুন্ড্রবর্ধন নামে খ্যাত ছিল। পুন্ড্র বঙ্গের প্রাচীনতম জনপদগুলোর অন্যতম ছিল। উত্তর বঙ্গের রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া পুন্ড্র জনপদের আওতাভুক্ত ছিল। 'পুন্ড্র' শব্দটির অর্থ কৃষিজীবী। পুন্ড্রগণ শাক-সবৃজী ও আখের চাষ করত। পুন্ড্রের রাজধানী ছিল বর্তমান বগুড়ার মহাস্থানগড়। কালক্রমে পুন্ড্রের ব্যাপ্তি ঘটে এবং এক সময় প্রায় সমগ্র বাংলাদেশই পুন্ড্রবর্ধন নামে অভিহিত হয়"।[৩]

১। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ ১ম খন্ডের প্রাচীন বাংলাদেশ প্রবন্ধ, পৃঃ- ২১।

২। অধ্যাপক, কে, আলী, বাংলাদেশের ইতিহাস, আলী পাবলিকেশন্স, ৭৭, পাটুয়াটুলী, ঢাকা,১৯৮৬ ইং, পৃঃ-২।

৩। বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ, প্রাগুক্ত, পৃঃ- ২১।

Dhaka University Institutional Repository

বরেন্দ্র/বরেন্দ্রী ঃ পুন্ড্রের সাথে সংযুক্ত বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রী আরেক প্রাচীন ভৌগোলিক সত্তা। গঙ্গা ও করতোয়া নদীর মধ্যভাগের উচ্চভূমি বরেন্দ্র/বরেন্দ্রী নামে পরিচিত ভূমি পাল রাজাদের 'জনকভূ' নামে পরিচিত ছিল। রাজশাহী জেলার একাংশ এখনও বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রী নামে পরিচিত।

রাঢ় ঃ রাঢ়ের অপরনাম সুহ্ম ছিল। ইহা ভাগীরথী নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। ''অজয় নদ এ জনপদকে 'উত্তর রাঢ়' ও 'দক্ষিণ রাঢ়' এ দু'ভাগে বিভক্ত করেছিল। রাঢ়ের দক্ষিণে পশ্চিম বঙ্গের মেদিনীপুর জেলার 'তাম্রলিপ্ত' (বর্তমানে 'তমলুক') ও 'দন্ড ভুক্তি' নামে দু'টি ছোট দেশ ছিল। অনেক সময় এগুলোকে বঙ্গ বা রাঢ়ের অন্তর্ভূক্ত বলে গণ্য করা হত''।[১]

গৌড় ঃ গৌড় জনপদটির অবস্থান বাংলাদেশের কোন অংশে ছিল তা নির্ণয় করা কঠিন। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে বর্তমান পশ্চিম বঙ্গের মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও পার্শ্ববর্তী এলাকা এবং উত্তর বঙ্গের কিছু অংশ নিয়ে গৌড় জনপদ গড়ে উঠেছিল বলে অনেকে মনে করেন। সপ্তম শতাব্দীতে রাজা শশাঙ্কের আমলে বিহার ও উড়িষ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মুর্শিদাবাদের নিকটবর্তী 'কর্ণ সুবর্ণ' ছিল গৌড়ের রাজধানী।

মুর্শিদাবাদের কানসোনা গ্রামকে অনেকে প্রাচীন 'কর্ণ সুবর্ণ' বলে ধারণা করেন। "পরবর্তীকালে বঙ্গের পাল রাজারা 'গৌড়েশ্বর' বা গৌড়রাজ বলে অভিহিত হতেন। গৌড়ে আধিপত্য না থাকলেও সেন বংশীয় রাজাগণ গৌড়েশ্বর উপাধি ধারণ করতেন''।[২] বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার অব্যাবহিত পূর্বে পশ্চিম বাংলার মালদহ জেলার লক্ষণাবর্তী 'গৌড়' নামে পরিচিত ছিল। রাজা শশাঙ্কের মৃত্যুর পর গৌড় রাজ্যের গৌরব স্তিমিত হয়ে যায়।

বঙ্গ ঃ বঙ্গ এদেশের ইতিহাসে প্রাচীনতম জনপদ। 'ঐতরেয় আরণ্যক' গ্রন্থে সর্ব প্রথম বঙ্গ এবং মগধ উপজাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। 'বৌধায়ন ধর্ম সূত্রে' আর্য সভ্যতা বহির্ভূত এবং কলিঙ্গের প্রতিবেশী হিসাবে 'বঙ্গ' জাতির উল্লেখ রয়েছে। 'পুরাণে' পূর্বাঞ্চলীয় দেশ সমূহের তালিকায় অঙ্গ, বিদেহ, পুন্ড্র, মগধ, মুদগরক, তাম্রলিপি, প্রাগজ্যোতিষ প্রভৃতির সঙ্গে 'বঙ্গে'র উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাভারতেও

১। অধ্যাপক, কে, আলী, প্রাগুক্ত, পৃঃ- ২

২। বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ, প্রাগুক্ত, পৃঃ- ২২।

৩। অধ্যাপক, কে, আলী, প্রাগুক্ত, পৃঃ- ২।

Dhaka University Institutional Repository

বঙ্গের উল্লেখ আছে। "ভীমের দিগ্বিজয় অংশে বলা হয়েছে যে ভীম পুন্ড্র এবং কুশি নদীর তীরের রাজাকে পরাস্ত করে কর্বট ও সুক্ষ্ম এবং অন্য ম্লেচ্ছদের পরাজিত করেন। এই অঞ্চলসমূহ জয় করে ভীম লোহিত্য (ব্রহ্মপুত্র) এর দিকে যাত্রা করেন। সমুদ্র উপকূলে বসবাসকারী ম্লেচ্ছদের নিকট হতে তিনি কর আদায় করেন"।[১] রামায়ণে অযোধ্যার সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনকারী দেশের তালিকায় বঙ্গের নাম পাওয়া যায়।

এসব সূত্রে বঙ্গের উল্লেখ পাওয়া গেলেও তার ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ধারণা করা যায় না। "মহাভারতে বেশ কয়েকটি রাজ্যের বা ভূ-ভাগের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এ বর্ণনায় (Contiguity) বা ভৌগোলিক সান্নিধ্য রক্ষার প্রতি নজর দেয়া হয়নি। তবে এতে বুঝা যায় যে 'বঙ্গ' একটি পূর্বাঞ্চলীয় দেশ বা জনপদ এবং এর অবস্থিতি ছিল অঙ্গ, সুক্ষ্ম, তাম্রলিপ্ত, মুদগরক, মগধ এবং পুন্ড্র এর কাছাকছি। মহাভারতে ভীমের দিগ্বিজয়ের সীমা দেয়া হয়েছে লোহিত্য বা ব্রহ্মপুত্র। সুতরাং ধরে নেয়া যায় যে এই জনপদগুলি ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিমেই অবস্থিত ছিল"।[২]

কালিদাসের 'রঘুবংশ' নাটকেও বঙ্গের অবস্থান সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। রঘু 'সুক্ষ্ম'দের পরাস্ত করে বঙ্গদের পরাস্ত করেন এবং 'রঘু' গঙ্গা স্রোত হন্তরেষু অর্থাৎ গঙ্গাস্রোত মধ্যবর্তী ভূ-ভাগে বিজয় স্তম্ভ স্থাপন করেন। গঙ্গার প্রধান স্রোত দু'টি ভাগীরথী ও পদ্মা। টলেমী গঙ্গার পাঁচটি শাখার উল্লেখ করেন-সর্বপশ্চিম শাখা কামবাইসন এবং সর্ব পূর্ব শাখা এন্টিবোল। ভাগীরথী থেকে কশাই নদী পর্যন্ত এলাকা সুক্ষের অন্তর্গত ছিল। রঘু কর্তৃক সুক্ষ্ম জয় ও সুক্ষ্ম থেকে বঙ্গ জয় এবং কলিঙ্গের দিকে গমনের কথা আছে। "গঙ্গার দুই স্রোতের মধ্যবর্তী ভূ-ভাগই বঙ্গ। এ স্রোত ভাগীরথী এবং পদ্মা হইতে পারে, আবার টলেমী বর্ণিত পাঁচটি স্রোতের যে কোন দুইটিও হইতে পারে"।[৩]

শক্তি সঙ্গমতন্ত্রের 'ষট পঞ্চাশদ্দেশ' বিভাগে রত্নাকম বা সাগর হতে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত ভূ-ভাগকে 'বঙ্গ' রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে "রত্নাকম বা সাগর বলতে বঙ্গোপসাগর বুঝায়। সুতরাং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর হতে উত্তরে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত 'বঙ্গ' এর সীমা"।[৪] 'বৃহৎ সংহিতা' গ্রন্থে ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের একাংশে

১। R. C. Majumdar, 'History of Bengal'- Vol-1 ed- Dhaka, 1943- p-8-9.

২। আব্দুল করিম,বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল,বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৭ ইং,পৃঃ-৫

৩। আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃঃ- ৬।

৪। আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃঃ- ৯।

Dhaka University Institutional Repository

'উপ-বঙ্গ' জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়। "যশোর ও তৎসংলগ্ন ভূমিকে বঙ্গের একাংশ বা উপবঙ্গ বলা হয়েছে"।[১]

বঙ্গ এর পরিচয় আরো স্পষ্ট হয়ে উঠে মুসলিম শাসনামলে। মিনহাজ-ই-সিরাজ কয়েক স্থানে 'বঙ্গ' এর উল্লেখ করেছেন। যেমন,

১. লক্ষণ সেনেয় পরাজয় এবং পলায়নের কথা বলে মিনহাজ বলেন, " রায় লখমনিয়া সকোনাত ও বঙ্গ রাজ্যের দিকে পৌছে গেলেন। ---------------------- তার বংশধরগণ এসময় পর্যন্ত বঙ্গরাজ্যে রাজত্ব করেন"।[২]

২. ইখতিয়ারুদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজীর বিহার বিজয়ের পরবর্তী ঘটনা বর্ণনা করে মিনহাজ বলেন, " বিধর্মীদের হৃদয়ে লখনৌতি এবং বিহার রাজ্য এবং বঙ্গ ও কামরূপ রাজ্যে তিনি পূর্ণ আতঙ্কের ভাব সৃষ্টি করেন"।[৩]

৩. যুবরাজ নাসির উদ্দীন মাহমুদের লখনৌতি আক্রমণের বিষয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, "এই বৎসর গিয়াস উদ্দীন ইওয়াজ হুসায়েন খলজী সসৈন্যে লখনৌতি থেকে বঙ্গ ও কামরূপ অভিযানে গিয়েছিলেন এবং লখনৌতি নগর অরক্ষিত অবস্থায় রেখে গিয়েছিলেন"।[৪]

৪. "তুর্কী আক্রমণের আশঙ্কায় লক্ষণ সেনের দরবারের অধিকাংশ ব্রাহ্মণ এবং সাহাগণ (বণিক সম্প্রদায়) সকোনাত রাজ্য, বঙ্গ ও কামরূপ রাজ্যে গমন করলেন"।[৫]

১। বাংলাদেশ-সৌদী আরব- শাশ্বত ভ্রাতৃত্ব, শাশ্বত ভ্রাতৃত্ব সংকলন, ৯১ সম্পাদনা- বি,এইচ, হারুন- বাংলাদেশ সৌদী আরব ভ্রাতৃ সমিতি, অধ্যাপক ডঃ কাজী দীন মুহাম্মদ, বাংলাদেশে ইসলাম, প্রবন্ধ, পৃঃ- ৩০।

২। মিনহাজ-ই-সিরাজ, তবকাত-ই-নাসিরী, আ,কা,ম, যাকারিয়া কর্তৃক অনুদিত,ঢাকা- ১৯৮৩ ইং, পৃঃ- ২৮।

৩। মিনহাজ-ই-সিরাজ, প্রাগুক্ত, পৃঃ- ২১।

৪। মিনহাজ-ই-সিরাজ, প্রাগুক্ত, পৃঃ- ৬৪।

৫। মিনহাজ-ই-সিরাজ, প্রাগুক্ত, পৃঃ- ২৬।

Dhaka University Institutional Repository

মিনহাজ তাঁর গ্রন্থে বঙ্গকে কোন কোন স্থানে বিলাদ, মমালিক এবং বেলায়েৎ রূপে উল্লেখ করেন। যার অর্থ রাজ্য অর্থাৎ বঙ্গ রাজ্য। আর শব্দগুলি সমার্থক। তাছাড়া 'বঙ্গ'রাজ্য উল্লেখ করার সময় প্রায় ক্ষেত্রে তিনি সকোনাত বা কামরূদ শব্দ উল্লেখ করেছেন। কামরূদ 'কামরূপে'র সঙ্গে এবং সকোনাতকে সমতটের সঙ্গে অভিন্ন মনে করা হয়। সুতরাং দেখা যায়, বঙ্গ কোন ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল না, বরং সমতট এবং কামরূপের মত একটি রাজ্য ছিল। আরও বুঝা যায় যে সমতট এবং কামরূপ এর নিকটেই 'বঙ্গ' রাজ্য অবস্থিত ছিল"।[১]

মিনহাজের বর্ণনায় বুঝা যায়, বিহার ও লখনৌতি এবং বঙ্গ ও কামরূপের অবস্থান কাছাকাছি ছিল। আর 'বঙ্গ' ও কামরূপ লখনৌতির পূর্বদিকে অবস্থিত ছিল। লখনৌতি রাজ্যের অবস্থান নির্দেশ করে মিনহাজ বলেন, "গঙ্গার (নদীর) দুই পার্শ্বে অবস্থিত লখনৌতি রাজ্য দুই অংশে বিভক্ত। পশ্চিমাঞ্চলকে 'রাল' (রাঢ়) বলা হয়ে থাকে এবং সেদিকেই লখনৌতির নগর অবস্থিত। পূর্বাঞ্চলকে 'বরিন্দ' (বরেন্দ্র) বলা হয়ে থাকে এবং দেওকোট (দেবকোট) নগর সেদিকে অবস্থিত"।[২] লখনৌতির বর্তমান পশ্চিম বঙ্গের বীরভূম জেলার নগৌর এবং দেওকোট দিনাজপুর জেলায় অবস্থিত।

মিনহাজের উক্তি, "রায় লখমনিয়া সকোনাত ও বঙ্গ রাজ্যের দিকে পৌঁছে গেলেন ----- তাঁর বংশধরগণ এ সময় পর্যন্ত বঙ্গ রাজ্য রাজত্ব করেন।" তবে এটা সত্য যে, "লক্ষণ সেন নদীয়া থেকে পলায়ন করে বিক্রমপুরে চলে যান এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। তার দুই ছেলে কেশব সেন এবং বিশ্বরূপসেন অন্ততঃ পক্ষে ১২২৩ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। কিন্তু এসময় রাজধানী বিক্রমপুরে ছিল কিনা সন্দেহ। বিজয় সেন এবং বল্লাল সেনের দুইটি তাম্রশাসন এবং লক্ষণ সেনের প্রথম পাঁচটি তাম্র শাসন বিক্রমপুর থেকে জারি করা হয়, কিন্তু লক্ষণ সেনের শেষ দুইটি অর্থাৎ মাঠাইনগর ও ভাওয়াল তাম্র শাসন বিক্রমপুর থেকে জারি হয়নি, বরং ধার্য গ্রাম থেকে জারি হয় ; লক্ষণসেনের উত্তরাধিকারীদের তাম্রশাসন ফলগু গ্রাম থেকে জারি করা হয়"।[৩] বিশ্বরূপ সেন এবং কেশব সেনের তাম্রলিপিতে

১। আব্দুল করিম, বঙ্গঃ বঙ্গালা ঃ বাংলাদেশ, মানববিদ্যা বক্তৃতা- ১৯৮৭,উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃঃ- ৭।

২। মিনহাজ-ই-সিরাজ, প্রাগুক্ত, পৃঃ- ৫৮-৫৯।

৩। R. C. Majumdar, opcit- p-251

Dhaka University Institutional Repository

'বিক্রমপুর ভাগকে' 'বঙ্গ' এর অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। বিশ্বরূপ সেনের সাহিত্য পরিষৎ লিপিতে 'বঙ্গ' এর- 'নাব্য ভাগ' এর কথা বলা হয়েছে। 'বিক্রমপুর ভাগ'কে মুন্সিগঞ্জ ও মাদারীপুর এবং নাব্য ভাগকে ফরিদপুর এবং বাকেরগঞ্জের সঙ্গে চিহ্নিত করা হয়।[১] ফলে বুঝা যায় যে ঢাকা, ফরিদপুর এবং বাকেরগঞ্জ এলাকা 'বঙ্গ' এর অন্তর্ভূক্ত ছিল।

লক্ষণ সেনের রাজত্বের শেষ দিকে উপকূলবর্তী সুন্দরবন এলাকায় ডুম্মনপাল নামক একজন বৌদ্ধ নরপতি একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তার এ রাজ্য চব্বিশ পরগণা, খুলনা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা নিয়ে গঠিত ছিল বলে মনে করা হয়। রণবঙ্কমল্ল হারিকেল দেবের ১২২০ খৃষ্টাব্দের ময়নামতি তাম্রশাসনে দেখা যায় যে অন্ততঃ ১২০৪ খৃষ্টাব্দ থেকে মেঘনা নদীর পূর্ব দিকে কুমিল্লা অঞ্চলে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। দামোদর দেবের চট্টগ্রাম তাম্রলিপি এবং অন্যান্য তাম্রলিপিতে দেখা যায় যে "১২৩০ খৃষ্টাব্দের পর থেকে বেশ কিছু দিন যাবত দেব বংশের স্বাধীন রাজ্য মেঘনা পূর্ববর্তী অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়"।[২]

অতএব দেখা যায় যে কালিদাসের নাটক 'রঘুবংশ' এ গঙ্গার স্রোতের মধ্যবর্তী স্থান অর্থাৎ গঙ্গার পশ্চিম স্রোত ভাগীরথী এবং পূর্ব স্রোত পদ্মার মধ্যবর্তী ভূ-ভাগ 'বঙ্গ'। মিনহাজের বর্ণনায় 'রাঢ়' এবং সেন রাজাদের তাম্রলিপিতে দেখা যায়, ঢাকা-ফরিদপুর-বাকেরগঞ্জ এলাকা 'বঙ্গ' এর অন্তর্ভূক্ত ছিল। শক্তি সঙ্গমতন্ত্রের বর্ণনার আলোকে 'বঙ্গ' এর দক্ষিণ সীমা বঙ্গোপসাগর এবং উত্তর সীমা ব্রহ্মপুত্র। ব্রহ্মপুত্র এবং আরো দক্ষিণে মেঘনা 'বঙ্গ' এর পূর্ব সীমা ছিল। উত্তর দিকে 'বঙ্গ' এর পশ্চিম সীমা এবং বরেন্দ্র এর পূর্ব সীমা এক ও অভিন্ন ছিল। এ প্রেক্ষিতে করতোয়া নদী 'বঙ্গ' এর উত্তর দিকের পশ্চিম সীমানা"।[৩] সুতরাং প্রাচীন জনপদ 'বঙ্গ' বর্তমান দক্ষিণ বঙ্গ ও পূর্ব বাংলার অবস্থান স্থলে ছিল। উহার সীমা সাধারণতঃ এইরূপ ছিল - "পশ্চিমে ভাগীরথী, উত্তরে পদ্মা, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদী এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। কখনও পূর্বে ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীর পূর্ব তীর ও পশ্চিম কাপিশা নদী পর্যন্ত 'বঙ্গ' বিস্তৃত ছিল"।[৪]

১। D.C. Sircar, Studies in the Geography of Ancient and Medieval India, Delhi, 1971, p.p. 36-38.

২। আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃঃ-৮- ৯।

৩। আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃঃ- ৯।

৪। বাংলা বিশ্বকোষ (৩য় খন্ড) ১ম সংস্করণ, নওরোজ কিতাবিস্তান, বাংলাবাজার, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃঃ- ৩৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

ডি, সি, সরকার বলেন, " The country of Vanga is described as extending from sea as far as the Brahmaputra. The sea is no doubt the Bay of Bengal in the south and the Brahmaputra, the northern boundary. Seems to indicate that portion of the river which bifurcates from the Jamuna. Vanga therefore include the eastern part of Sundarbans in the south and half of the Mymensingh district in the north. The verse seems to exclude the region to the east of the Brahmaputra and Meghna and Agrees with medieval epigraphic evidence which places the heart of Vanga in the Vikrampur bhaga comprising the Munshigonj and Madaripur subdivision---------. [১]

ডঃ আব্দুল মোমিন চৌধুরীর মতে, " ব্রহ্মপুত্র নদীর যে প্রবাহ ময়মনসিংহের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হতো, সম্ভবতঃ এ প্রবাহ বঙ্গের উত্তর ও পূর্ব সীমা নির্ধারণ করত বলে বলা যায়। এই সূত্রে বঙ্গের সীমা দক্ষিণে সুন্দর বনাঞ্চলের পূর্ব প্রান্ত থেকে উত্তরে ময়মনসিংহ জেলার ব্রহ্মপুত্র প্রবাহ পর্যন্ত নির্ধারণ করা সম্ভব। খুব সম্ভবতঃ ব্রহ্মপুত্রের পূর্বে অবস্থিত ভূ-ভাগ (মেঘনা অববাহিকা) বঙ্গের বাইরে ছিল বলেই মনে হয়"।[২]

যাকারিয়া সাহেবের মতে, "করতোয়া ও ভাগীরথী নদীর পূর্ব তীরবর্তী ভূ-ভাগ অর্থাৎ বর্তমান ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল, পটুয়াখালী, অবিভক্ত নদীয়া জিলাসমূহ, টাঙ্গাইলসহ ময়মনসিংহ জেলার দক্ষিণাংশ, কুমিল্লা জেলার কিয়দংশ, পাবনা ও বগুড়া জেলার সামান্য অংশ নিয়ে খুব সম্ভবতঃ তদানীন্তন বঙ্গ রাজ্য সীমাবদ্ধ ছিল"।[৩]

যাহোক, আনুমানিক খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত 'বঙ্গ' বিভিন্ন জনপদের সমষ্টি ছিল। "পরবর্তীকালে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন জনপদ এক নামে ঐক্যবদ্ধ হতে আরম্ভ করে"।[৪] "খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে রাজা শশাঙ্ক সর্বপ্রথম বাংলার এ বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত জনপদগুলোকে একত্রিত করার চেষ্টা করেন"।[৫]

১। D.C. Sircar, opcit, p-90.

২। ডঃ আব্দুল মোমিন চৌধুরী, বাংলাদেশের ইতিহাস, নওরোজ কিতাবিস্তান, বাংলাবাজার, ঢাকা, ১৯৮৭ ইং, পৃঃ-২০।

৩। মিনহাজ-ই-সিরাজ, প্রাগুক্ত, টিকা, পৃঃ- ৬০-৬১।

৪। অধ্যাপক,কে, আলী, প্রাগুক্ত, পৃঃ- ৩।

৫। আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃঃ- ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

শশাঙ্কের পরে বাংলা গৌড়, পুন্ড্র ও বঙ্গ এ তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। অষ্টম শতক হতে সব জনপদ ও বিভাগ 'বঙ্গ' জনপদের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়। এসময় হতেই গৌড়ের ঐতিহাসিক গুরুত্ব বাড়তে থাকে। পাল ও সেন যুগে এক রাষ্ট্রীয় ঐক্যে বঙ্গের বিভিন্ন জনপদকে সংযুক্ত করা সম্ভব হলেও বঙ্গ জনপদটি তখনও গৌড়ের প্রতিপক্ষ হিসাবে পরিগণিত হত।

মুসলমান শাসন আমলেই এ বিভিন্ন অঞ্চলকে একত্রিত করার চেষ্টা সফলকাম হয়। বাংলায় পাঠান যুগের পূর্ব থেকে পশ্চিম বঙ্গ 'গৌড়' ও পূর্ব 'বঙ্গ' এ দু'নামে চিহ্নিত হত। ষোড়শ শতকে মোগল শাসন আমল থেকে এ সমগ্র এলাকা বাঙ্গালী নামে অভিহিত হয়েছে। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলার আমলে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা একত্রে ছিল বাংলাদেশ। ১৯০৫ সালে বৃটিশ শাসন আমলে বঙ্গ ভঙ্গের পূর্ব পর্যন্ত এ অবস্থা অপরিবর্তিত ছিল।

"মুসলিম আমলেই কেবল বিভাগ পূর্ব সমগ্র দেশটি বাংলা নামে অভিহিত হ'ত। মুসলমান শাসনামলে বাংলার রাজনৈতিক সীমানা এর ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক সীমানার সঙ্গে এক হয়ে যায় এবং এ দু'টোই বাংলা ভাষাভাষী অধিবাসীদের ভাষাগত ঐক্যের সাথে মিলে যায়। মুসলমান শাসন এভাবে বাঙ্গালী অধিবাসী লোকদের এক সাধারণ জীবনের আওতায় একত্রীভূত করে। প্রকৃত পক্ষে, এসময় থেকেই বাঙ্গালী ও বাংলার ইতিহাস শুরু"।[১]

বঙ্গ ভঙ্গের (১৯০৫ খৃঃ) ফলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল আসাম ও পূর্ব বঙ্গ স্বতন্ত্র প্রদেশের মর্যাদা পায়। কিন্তু ১৯১১ সালে বঙ্গ ভঙ্গ রদ হলেও বাংলাদেশ তার পূববর্তী সীমানায় ফিরে যায় নি। নতুন ব্যবস্থায় পূর্ববঙ্গ, দার্জিলিং ও পশ্চিম বঙ্গ নিয়ে বাংলাদেশ গঠিত হয়। ১৯৪৭ সালে আসামের সিলেটসহ পূর্ববঙ্গ পূর্ব পাকিস্তান নামে পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত স্বাধীন ও সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৭১ সালে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে এ পূর্ব পাকিস্তানই স্বাধীন বাংলাদেশে রূপান্তরিত হয়।

বঙ্গ ঃ বঙ্গালা ঃ বাঙ্গালা ঃ বঙ্গাল ঃ বেঙ্গালা ঃ বাংলা নামের উৎপত্তি ঃ

বাংলার সমগ্র জনপদ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নামে ও বিভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এগুলোকে একত্রিত করে 'বাংলা' নামকরণ মাত্র কয়েকশত বছর আগের ঘটনা।

১। ডঃ এম, এ, রহিম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২ ইং, পৃঃ-১।

Dhaka University Institutional Repository

'বঙ্গ' নামের উৎপত্তি নিয়ে নানা মত প্রচলিত রয়েছে। 'বঙ্গ' নামের উৎস সম্পর্কে পুরাণ, মহাভারত, হরিবংশ প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে দৈত্যকুলের বিষ্ণুভক্ত ধার্মিক রাজা প্রহলাদের পৌত্র বালী ছিলেন একজন পরাক্রান্ত মহাবলশালী রাজা। তিনি শুধু সমগ্র পৃথিবীর অধিশ্বরই ছিলেন না বরং দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাজিত করে তিনি স্বর্গালোকেও স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্র ও বরুণ বাহুবলে পরাজিত হলেও কুটকৌশল ও ছলনার আশ্রয় নিয়ে মহাবলশালী পরম ধার্মিক এবং দানবীর বালীকে স্বীয় রাজ্য ত্যাগ করে পৃথিবীর বাইরে চলে যেতে বাধ্য করেন। বালী পৃথিবী ছেড়ে যখন পাতালপুরীতে স্বীয় পত্নী সুদেষ্ণাকে নিয়ে বাস করছিলেন তখন একদিন স্ত্রী, পুত্র কর্তৃক বিতাড়িত 'দীর্ঘতমা' নামক এক অতি দুশ্চরিত্র অন্ধ ঋষিকে ভেলায় করে নদী পথে ভেসে যেতে দেখলেন। বালী ছিলেন নিঃসন্তান। সুতরাং তিনি এই অন্ধ ঋষিকে নিয়ে এলেন এবং সুদেষ্ণার গর্ভে পুত্র উৎপাদনের জন্য তাকে নিয়োগ করলেন। সুদেষ্ণার গর্ভে এই লম্পট ঋষির ঔরসে পাঁচটি পুত্রের জন্ম হয়। তাদের নাম হল - অংগ, বংগ, কলিংগ, পুন্ড্র ও সুম্ম''।[১]

'অংগ' হল বর্তমানের ভাগলপুর জেলা। 'বংগ' হল বর্তমানের বাংলাদেশ। পুন্ড্র পরে গৌড় বা বরেন্দ্র ভূমি নামে পরিচিত হলেও বর্তমানে উত্তর 'বঙ্গ'কে বুঝায়। সুম্ম পরবর্তীকালের রাঢ় দেশ এবং বর্তমানে পশ্চিম বঙ্গ। কলিংগের বর্তমান নাম উড়িষ্যা।

'বঙ্গ' এর উৎস নির্দেশ প্রসঙ্গে অধিকাংশ লেখক বিনা দ্বিধায় উক্ত কাহিনী গ্রহণ করেছেন এবং এ উদ্ধৃতি নিয়ে তারা এ অঞ্চলের অধিবাসীদের উপর আর্যত্ব আরোপের প্রয়াস পেয়েছেন। "ঋগ্বেদ, মহাভারত, পুরাণ, হরিবংশ ইত্যাদি গ্রন্থে এ অঞ্চলের অধিবাসীগণকে অত্যন্ত হেয় এবং ঘৃণ্য বলে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। এ সমস্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করা হয়েছিল বহিরাগত আর্যদের দ্বারা, তারা তখনও এ অঞ্চলে আগমন করেনি। এ অঞ্চলের প্রতি তারা ছিল বৈরীভাবাপন্ন''।[২] কিন্তু বিদেশী পর্যটক ও ঐতিহাসিকদের বর্ণিত তথ্যে জানা যায় যে বাংলাবাসীগণ তখনও শৌর্য-বীর্য, সভ্যতা এবং কৃষ্টিতে শীর্ষস্থানীয় ছিল। তাই মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান বলেছেন, "ব্রাত্যজনের চরিত্র হননের জন্য এটি একটি চিত্তাকর্ষক ব্রাহ্মণ্য প্রচার''।[৩] আর্যদের পৌরাণিক কাহিনী থেকে 'বঙ্গ' শব্দের যে উৎপত্তি নয় তা সুস্পষ্ট। কাজেই 'বঙ্গ' শব্দের উৎপত্তি ভারতীয় আর্য হিন্দু আমলে হয়েছে বলে গ্রহণযোগ্য নয়।

১। মাহবুবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১-২।
২। মাহবুবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫।
৩। মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, গঙ্গা ঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫ ইং, পৃঃ- ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে সাগরতলের উপর বাংলাদেশের প্রাথমিক ভিত্তি নির্মিত হয়ে তা সাগরতটের সম্পৃক্ত হয়েছিল বলে আদি যুগে এ দেশের অনেক অঞ্চল ছিল প্রধানতঃ জলাভূমি। "তিব্বতী বঙস্ (উচ্চারণ বঙ) শব্দে জলা ও নিম্ন (ভূমি) বুঝায়; এদেশের ভূমি 'জলা'ও 'নিচু' ছিল বলেই এর নামকরণ 'বঙ্গ' (তিব্বতী 'বঙস্') হয়েছিল বলে কোন কোন পন্ডিত মনে করেন"।[১] বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থ ত্রিপিটকের 'অঙ্গুত্তর নিকায়' এ ১৬ টি রাজ্যের উল্লেখ করা হয়েছে। তন্মধ্যে "একটি বার বঙ্গের উল্লেখ আছে"।

"হযরত নূহ (আঃ) এর যুগে যে মহাপ্লাবন অনুষ্ঠিত হয় তাতে দুনিয়ার কাফেরকূল সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়"।[২] এ উপমহাদেশও উক্ত প্লাবন থেকে বাদ পড়েনি। এম.আই. চৌধুরী বলেন, "একথা সত্যি যে খৃষ্টপূর্ব ৩১০০ বা ৩১০২ এ পৃথিবীর অনেক স্থানেই এক মহাপ্লাবন ঘটে। ভারত ও এ প্লাবন হতে বাদ যায় নি"।[৩] "হযরত নূহ (আঃ) সাড়ে নয়শ বছর ধরে ইসলামের প্রচার কার্য চালিয়েছিলেন। এ সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে তাঁর সন্তান-সন্ততিসহ পঁচাশি জন আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন"।[৪] মহাপ্লাবনে এ বিশ্বাসীগণ ছাড়া কাফেরকূল সমূলে বিনাশ হয়।

মহাপ্লাবনের পর হযরত নূহ (আঃ) আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী তাঁর বংশধরদের পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় বসতি স্থাপনের নির্দেশ দেন। তারা বিভিন্ন এলাকায় পরিবেশ ও আবহাওয়ার প্রভাবে বিভিন্ন ভাষা-ভাষী বিভিন্ন জাতি, বর্ণ, গোত্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে। হযরত নূহ (আঃ) এর মহাপ্লাবন থেকে যারা বেঁচেছিলেন তাদেরই উত্তর পুরুষ বর্তমান বিশ্বের মানবগোষ্ঠী। এ কারণে হযরত নূহ (আঃ) কে 'দ্বিতীয় আদম' বলা হয়। হযরত নূহ (আঃ) এর বংশধরদের নামানুসারে বিভিন্ন এলাকায় নামকরণ হয়।

১। ডঃ নগেন্দ্র নারায়ন চৌধুরী, বঙ্গ ভাষা ও বঙ্গ সাহিত্যের ক্রমবিকাশ, ১ম খন্ড, ১৩৪৪ বাংলা, পৃঃ- ৩।

২। আলকুরআন, সূরা আরাফ, আয়াত ৬৪। এতে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন, "কিন্তু তারা নূহ কে (আঃ) বলল মিথ্যাবাদী; সেজন্য তাঁকে এবং যারা তার সঙ্গে ছিল তাদের আমি উদ্ধার করেছিলাম জাহাজে আর যারা আমার নির্দেশাবলী প্রত্যাখ্যান করেছিল তাদের আমি ডুবিয়ে দিয়ে ছিলাম। নিঃসন্দেহে তারা ছিল দৃষ্টিহীন জাতি"।

৩। মনসুর মুসা (সম্পাদিত), বাঙলাদেশ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা,১৯৭৪ ইং, পৃঃ ৪৬।

৪। সাইদুর রহমান, ইসরাইল ও মুসলিম জাহান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৯ ইং, পৃঃ ৪।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত নূহ (আঃ) এর এক পুত্রের নাম সাম। তিনি মধ্য এশিয়ায় বসবাস করেন। বর্তমান 'সেমেটিক' বা সামীয় জাতি তাঁরই বংশধর। এরা মধ্য এশিয়া,আফ্রিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছে। হযরত নূহ (আঃ) এর আরেক পুত্রের নাম হাম। তিনি তৎকালীন পৃথিবীর দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর বংশধরদের বলা হয় হেমেটিক' বা হামীয়। হামের ছয় পুত্র হিন্দ, সিন্দ, হাবাস, বার্বার ও নিউবাহ। তাঁদের মধ্যে যিনি যে অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন তাঁর নামানুসারেই সে জনগোষ্ঠীর নামকরণ হয়, আর তাঁদের অধ্যুষিত এলাকাও তাদেরই নামের স্বাক্ষর বহন করে। এ ভাবে হিন্দ বা হিন্দুস্তান ; সিন্দ বা সিন্ধু ইত্যাদি জাতি ও অঞ্চলের নাম হয়।

হিন্দের চার পুত্র পূরব,বঙ, দাকন, নাহরাওয়াল। হিন্দের জ্যৈষ্ঠ পুত্র পুরবের বিয়াল্লিশ পুত্র। অল্পকালের মধ্যে তাঁদের বংশবৃদ্ধি হয় এবং তারা এই অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েন। যখন তাঁদের সংখ্যা বেড়ে যায়, তখন তাঁদের এলাকার পরিচালনার জন্য নিজেদের মধ্যে একজন প্রধান নিযুক্ত করেন। হিন্দের তৃতীয় পুত্র দাকন বা দক্ষিণের নামানুসারে দাকান বা দক্ষিণ দেশের নাম হয়।

উপমহাদেশের এ অঞ্চলকে এখনও দাকান বা Deccan বলা হয় । দাকানের তিনপুত্র সারহাট, কানাড় ও তালঙ। সারহাটের নামানুসারে সুরাট, কানাড়ের নামানুসারে কানাড়ী, এবং তালঙ এর নামানুসারে তেলেঙ্গু বা তেলেঙ্গ ইত্যাদি নাম হয়। দক্ষিণাঞ্চলবাসী সবাই এদের বংশধর। এরাই সে সব অঞ্চলে প্রাধান্য বিস্তার করে আছেন। নাহরাওয়ালের ছিল তিন ছেলে বাবরুজ, কনোজ ও মালরাজ। তাঁদের নামানুসারে সে সব অঞ্চলও নগরের নাম হয়েছে। এভাবে হযরত নূহ (আঃ) এর বংশ''ধরেরা ক্রমে বংশ বৃদ্ধি করে পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে রয়েছে। ''হিন্দের দ্বিতীয় পুত্র 'বঙ' উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। বঙের বংশধরদের আবাস স্থলই 'বঙ্গ' নামে পরিচিত''।[১] তাঁরা যে এলাকায় বাস করতেন সে এলাকাটি ছিল জলা ভূমি। তাঁদের কৃষি কাজের সুবিধার জন্য জমির

১। গোলাম হুসায়ন সালীম, রিয়াজুস সালাতীন, আকবর উদ্দীন অনূদিত, ঢাকা, ১৯৭৪ ইং, পৃঃ ৩৮ ; কাজী দীন মুহাম্মদ, বাংলায় ইসলাম প্রবন্ধ, বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৯-৭০।

Dhaka University Institutional Repository

চার পাশ উচু আল (বাঁধ) বেধে পানি সরানো হত। বঙ্গ শব্দের সঙ্গে আল যুক্ত হয়ে বঙ্গাল শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। তাই আবুল ফজল বলেন,"The original name of Bengal (Bangalah) was Beng. Its former rulers raised mounds measuring ten yards in height and twenty is breadth throughtout the province which were called el. from the suffix, this name Bengal (Banglah) took its rise and currency" [1]

অর্থাৎ এ দেশের প্রাচীন নাম ছিল বঙ্গ। প্রাচীনকালে এদেশের নৃ-পতিগণ দশগজ উচ্চ ও বিশগজ বিস্তৃত আল (বাধ) নির্মাণ করতেন। কালক্রমে তা থেকেই বাঙ্গাল এবং বাঙ্গালা নামের উৎপত্তি। "বঙ্গ নামের সাথে দ্রাবিড় ধাতু আল সংযুক্ত হয়ে 'বঙ্গাল,' বাঙ্গাল ও বাঙ্গালা' শব্দ সৃষ্টি হয়েছে" ।[২] এদেশে আদিম অধিবাসীরা ছিল দ্রাবিড় এবং মধ্য এশিয়া থেকে তাঁদের আগমন ঘটেছিল এতে সন্দেহ নেই। কাজেই বং বা বঙ্গ থেকেই যে বঙ্গাল, বঙ্গালা ও বাংলা নামের উৎপত্তি হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

অবশ্য সেমেটিক ভাষায় 'আল' অর্থ আওলাদ, সন্তান-সন্তুতি ও বংশধর। এ অর্থে (বং+আল) বঙাল বা বঙ্গাল (অর্থাৎ বং এর বংশধর) শব্দের উৎপত্তিটাকে নেহায়েত উড়িয়ে দেয়া যায়না।[৩] বঙ্গের দক্ষিণে সমুদ্রের নিকটবর্তী খৃষ্টীয় অষ্টম শতক বা আরও পূর্বে বঙ্গাল নামের একটি পৃথক দেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ দেশের অধিবাসীরাও 'বঙ্গ'এর আওলাদ বা বংশধর হতে পারে।

পুরাতন চীনদেশীয় পুঁথিপত্র এবং ইন্দোচীনের আন্তঃপাতী আনাম (Annam) প্রদেশের প্রাচীন বিবরণের বরাত দিয়ে ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক উল্লেখ করেছেন, "খৃষ্ট পূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে ভারতবর্ষের বঙ্গ-লঙ (Bong -long) প্রদেশের লাক-লম (Luck-Lom) নামক এক অসমসাহসী বীর যুবা তাঁর কতিপয় অনুচরবৃন্দ দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় আনাম রাজ্যে গমন করে তথাকার নৃ-পতিকে তাড়িয়ে দিয়ে সে রাজ্যের অধিশ্বর হন এবং 'উকি' (Auki) নাম্নী এক আনাম সুন্দরীকে রাজ মহিষী রূপে গ্রহণ করেন। তার অধঃস্তন আঠারোজন বঙ্গ-লঙ দেশীয় নৃ-পতি আনাম রাজ্যে প্রায় তিনশত বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। উক্ত লাক-লম ও তাঁর অনুচরবৃন্দ ছিলেন নাগ বংশীয় অনার্য। আনাম দেশের তৎকালীন ব্যাকরণে 'লা' নামক একটি

১। আইন -ই-আকবরী, ভল্যুম ২, এইচ, এস, জেরেট কর্তৃক অনুদিত, ১৮৯৪ ইং, কোলকাতা, পৃঃ ১২০।

২। ডঃ মোহাম্মদ এনামুল হক স্মারক বক্তৃতামালা, প্রাগুক্ত, পৃঃ-১৩৪।

৩। আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

অনার্য ব্যবহৃত প্রত্যয়ের প্রয়োগ প্রচলিত ছিল; তাঁরা তাঁদের মাতৃভূমির মূল নাম 'বঙ্গ-লঙ' সংক্ষিপ্ত রূপে 'বঙ্গ' করে এবং তার সঙ্গে লা প্রত্যয় সংযুক্ত করে তাদের অধিকৃত রাজ্যের নতুন নামকরণ হয় বঙ্গ'লা- কালক্রমে তার বিবর্তিত রূপ হয় বঙ্গাল, বাঙ্গাল, বাঙ্গালা।" ১

চোলরাজ রাজেন্দ্র চোল ১০১২ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন; তার ত্রয়োদশ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ তিরুমলৈ শিলালিপিতে তাঁর উত্তরাপথ অভিযানের বিবরণে আছে, "অবিরাম বর্ষাবারিসিক্ত বঙ্গালদেশ। --------তিরুমলৈ পর্বত গাত্রে উৎকীর্ণ-গঙ্গে গোন্ডা (গঙ্গা বিজয়ী) রাজেন্দ্র চোলের লিপিতে 'বঙ্গালম' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। বঙ্গ' সংস্কৃত শব্দ নয়। উপরন্ত 'বঙ্গালম' সংস্কৃত শব্দ , বাংলা ভাষায় তা বঙ্গাল।" ২

কোন কোন ঐতিহাসিক যেমন, রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডি,সি, সরকার, হেম চন্দ্র রায় চৌধুরী প্রমুখ 'বঙ্গ' ব্যতিত 'বঙ্গাল' নামে একটি পৃথক রাজ্য ছিল বলে মত প্রকাশ করেন। বঙ্গাল দেশের সীমানা সম্বন্ধে রমেশ চন্দ্র মজুমদার বলেন, "প্রাচীন বঙ্গাল দেশের সীমা নির্দেশ করা কঠিন, তবে এককালে দক্ষিণ ও পূর্ব বঙ্গের তটভূমি যে এর অন্তর্ভূক্ত ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই"।[৩] বঙ্গ হতে বঙ্গালার উৎপত্তি হয়েছে একথা মানতে তিনি নারাজ। তার মতে, কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণতীরে দীয়াঙ্গ এর সাথে অভিন্ন 'বেঙ্গালা'[৪] নামক শহর হতেই 'বঙ্গালা' নামের উৎপত্তি হয়েছে।

১। ডঃ, মুহাম্মদ এনামুল হক, প্রাগুক্ত, ১৩৫।

২। ডঃ, এনামুলহক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৫।

৩। রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ১ম খন্ড, কলিকাতা, ১৯৭৪ ইং, পৃঃ ২।

৪। ষোল শতকের ইউরোপীয় লেখক যেমন, বারবোসা, ভারথেমা, বেঙ্গালা নামে একটি শহরের (City travels of corne lius de Bruyan- এ) সংযোজিত মানচিত্রে (১৭০১খৃঃ), ব্লাভ (১৬৫০ খৃঃ) এবং সসেন এর মানচিত্র (১৬৫২ খৃঃ) বেঙ্গাল শহরকে চট্টগ্রাম এলাকায় চিহ্নিত করা হয়েছে। এই 'বেঙ্গালা' শহরের অস্তিত্ব এর পরিচিতি নিয়ে বিস্তর গবেষণা হয়েছে কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন প্রশ্নেরই সমাধান হয়নি। রেনেল প্রমুখ পরবর্তী ইউরোপীয় লেখক 'বেঙ্গালা' শহরের অস্তিত্ব খুঁজে পাননি। (১৬৮৯ খৃঃ) ওভিংটন বলেন, "A late French geographer (Baud roud) has put Bengala into his catalogue of imaginary cities and such as have no real existence in the world". আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে এ বিষয়ে বিস্তর মতানৈক্য, কেউ 'বেঙ্গালা' শহরকে সোনার গাঁও; আবার কেউ চট্টগ্রামের সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন। কেউ বলেন বেঙ্গালা শহরের অস্তিত্বই ছিলনা, বেঙ্গালা কোন একটি বড় শহরকে City of Bengala বলা হয়েছে। এটা বিশেষ কোন শহরের নাম নয়। কারো মতে, 'বেঙ্গালা ' শহর সমুদ্রে বিলীন হয়েছে। ঐতিহাসিকদের কাছে বেঙ্গালা শহরের পরিচিতি এখন একটি সমস্যা, যার সমাধান করা এখন আর বোধ হয় সম্ভব নয় (আব্দুল করিম, বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল, পৃঃ ১৩)।

Dhaka University Institutional Repository

এ অভিমত তথ্য ভিত্তিক নয়। বেঙ্গালা শহরের যারা উল্লেখ করেছেন, তাঁরা কেউ ষোল শতকের আগের লোক নয়। অথচ দেখা যায়, চৌদ্দ শতকের মাঝামাঝি সময় হতে মুসলিম ঐতিহাসিকেরা বঙ্গ-কে বঙ্গালা নামে অভিহিত করেছেন। তাই ডি.সি. সরকার বলেন, "As Bengala (like the modern name Bengal) is a foreign corruption of Vangala a celebrated historain (Dr. Majumder) has suggested that this late medieval city of Bengla (which he locates near modern Chittagong) was the capital of the ancient Vangala-desa and gave its name to the kingdom, or vice-versa, and in either case, the old kingdom of Vangla must be located in the region round the city---- the above theories appear to be unwarranted." ১

ডি.সি. সরকারের মতে, 'বঙ্গাল সমুদ্রোপকূলে বাকেরগঞ্জ অঞ্চলে অবস্থিত ছিল''।২

বঙ্গালের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী কোন সিদ্ধান্ত দেননি''।৩ বঙ্গাল নামে পৃথক প্রদেশের অস্তিত্ব নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। রমেশ চন্দ্র মজুমদার প্রাচীন বঙ্গের সীমানা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, "এই প্রাচীন জনপদ বর্তমান কালের দক্ষিণ ও পূর্ব বঙ্গ লইয়া গঠিত ছিল। সাধারণত পশ্চিমে ভাগীরথী, উত্তরে পদ্মা, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা এবং দক্ষিণে সমুদ্র সীমা রেখা ছিল"।৪ কাজেই তাঁর মতে, প্রাচীন বঙ্গ একটি বিস্তির্ণ অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল। ডি.সি. সরকারও প্রাচীন বঙ্গের সীমানা এরূপই নির্ণয় করেছেন।"৫

ডঃ মজুমদারের 'বঙ্গাল' এর দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গের তটভূমি এবং ডি.সি. সরকারের বঙ্গাল' এর সমুদ্রোপকূলে বাকেরগঞ্জ অঞ্চল উভয়েই তাঁদের চিহ্নিত প্রাচীন বঙ্গের সীমানার মধ্যেই অবস্থিত ছিল। কাজেই তাঁদের উভয়ের মতামত থেকে ধারণা হয় বঙ্গাল নামে পৃথক কোন দেশ বা সত্তা ছিলনা। তাই আব্দুল করিমের ভাষায় বলতে হয়, "প্রাচীন কালে বা কোন কালে বঙ্গাল নামে আলাদা কোন দেশ বা ভূ-ভাগ ছিলনা।"৬

১। D.C. Sircar, opcoit,-p.131.

২। D.C Sircar, opcit, p.133.

৩। Hem Chandra Roy Chowdhury, History of Bengal, No-1. pp. 18-19.

৪। রমেশ চন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬।

৫। D.C Sircar, opcit, p.133.

৬। আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম শাসনের প্রথম দিকে বাংলার একমাত্র পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলই বঙ্গ বা বাঙ্গালা নামে অভিহিত হত। বঙ্গালা নামের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ইবনে বতুতার ভ্রমণ বৃত্তান্তে। এ থেকে বুঝা যায়, তার সময়ে পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ বাঙ্গালা নামে পরিচিত ছিল এবং এ অঞ্চলের অধিবাসীরা বাঙ্গালী নামে অভিহিত হত। পরবর্তীকালে বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী শব্দ দুটো এই অঞ্চলের সঙ্গে উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গের অধিবাসীদের প্রতিও প্রযোজ্য হয়"।[১]

মুসলিম ঐতিহাসিকদের মধ্যে মিনহাজ-ই-সিরাজের পরবর্তী জিয়া-উদ-দীন বারণীর 'তারিখ-ই-ফিরুজ শাহী' গ্রন্থের বর্ণনার আলোকে দেখা যায় যে প্রাচীন বঙ্গ' ই পরবর্তীতে বঙ্গলা ' বা বাঙ্গালা নামে পরিচিতি লাভ করে। বঙ্গালা সম্পর্কে তার কয়েকটি উক্তি হলো-

(১) "লখনৌতির শাসক ইলিয়াস, যিনি ঐ রাজ্য জোর পূর্বক দখল করেন, এ সময়ে (দিল্লীর সুলতান ফীরুজ শাহ্ তুঘলকের সময়ে) পানি বেষ্টিত ; বঙ্গালার পাইক এবং ধনুকদের একত্রিত করেন এবং বিনাকারণে ত্রিহুত জয় করেন"।[২]

(২) "বঙ্গালার বিখ্যাত পাইকরা, যাহারা অনেক দিন ধরিয়া আবু বঙ্গাল (বঙ্গালদের পিতা) নামে পরিচিত এবং যাহারা নিজদিগকে বীর পুরুষ বলিয়া দাবি করিত, তাহারা ভাঙখোর ইলিয়াসের নিকট প্রতিজ্ঞা করে যে, তাহারা তাঁহার জন্য প্রাণপণ করিবে এবং পানি বেষ্টিত বঙ্গালার বায়দের সঙ্গে যোগ দিয়া ইলিয়াসের অশ্বারোহী বাহিনীর সামনে সাহসিকতার নিদর্শন স্বরূপ হাতপা ছোঁড়া-ছুড়ি করে"।[৩]

এখানে বঙ্গালাকে বলা হয়েছে 'আব গিরিফতা'। আব অর্থ পানি আর গিরিফতা অর্থ ভেজা। তাহলে আবগিরিফতা অর্থ দাঁড়ায় পানিতে ভেজা, যার উপর বেশী বৃষ্টিপাত হয়; পানি বেষ্টিত; বন্যা কবলিত ; নদ-নদী বেষ্টিত । সুতরাং বারণী বঙ্গালাকে পানি বেষ্টিত; নদ-নদী বেষ্টিত, বন্যাকবলিত এবং অধিক বৃষ্টি পাতের অঞ্চল রূপে চিত্রিত করেছেন। এই অঞ্চল নিঃসন্দেহে বঙ্গ; রঘু বংশের "গঙ্গা স্রোত হস্তরেষু এবং তিরুমাইলিপির "বঙ্গাল দেশ যেখানে বৃষ্টি থামেনা" কথাগুলির প্রতিধ্বনী করে বারণীর 'আবগিরিফতা' বঙ্গালা। বারণীর "আব গিরিফতা" বঙ্গালা কথায় বঙ্গ-এর ভৌগোলিক অবস্থানের নিখুঁত পরিচয় পাওয়া যায় । সুতরাং প্রাচীন কালের 'বঙ্গ' এবং বরণীর 'বঙ্গালা' এক ও অভিন্ন"।[৪]

১। বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮।

২। জিয়া-উদ- দীন বারণী, তারিখ-ই-ফিরুজশাহী, পৃঃ ৫৮৬।

৩। জিয়া উদ-দীন বারণী, প্রাগুক্ত, পৃঃ- ৫৯৩।

৪। আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃঃ- ১০।

Dhaka University Institutional Repository

তের শতকের শেষের দিকে এবং চৌদ্দ শতকের মাঝা-মাঝি সময়ে 'বঙ্গ' 'বঙ্গালায়' রূপান্তরিত হয়। বারণী সুলতান বলবনের নিম্নোক্ত উক্তির উল্লেখ করেন,

(১) ''ইকলিমি-ই-লক্ষণাবতী'-ও 'আরসা-ই বাঙ্গালাহ' বশে আনতে কি রক্তপাতই না আমাকে করতে হয়েছে" ।[১]

(২) "আমি লক্ষণাবতী এবং বাঙলা অঞ্চল আমার কণিষ্ঠ পুত্রকে (বুগরাখান) অর্পন করেছি, এদেশ কিছু কাল যাবৎ ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে" ।[২]

বারণীর এ সমস্ত উল্লেখ থেকে প্রমাণিত হয় যে সুলতান বলবনের সময় লক্ষণাবতী থেকে 'বাঙ্গালাহ' নিঃসন্দেহে একটি সম্পূর্ণ আলাদা অঞ্চল ছিল। ৩

১। জিয়া উদ-দীন- বারণী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৩।

২। জিয়া উদ-দীন বারণী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৩।

৩। গিয়াস উদ্দীন বলবনের উক্তিদ্বয়-এ-লখনৌতিকে 'ইকলিম' এবং বাঙ্গালাকে 'আরসা' বলা হয়েছে। 'ইকলিম' এবং 'আরসা' উভয়ই শাসনতান্ত্রিক বিভাগের নাম; সুলতানী আমলের মুদ্রা এবং শিলালিপিতে ইকলিম দ্বারা বড় এবং আরসা দ্বারা ছোট শাসনতান্ত্রিক বিভাগ নির্দেশ করে। এই সূত্রে আরসা- ইকলিমের অংশ বিশেষ।------ বারণীর উল্লেখিত সময়ে অর্থাৎ বলবনের সময় বাঙ্গালা দিল্লীর সুলতান কর্তৃক (যা মুসলমান কর্তৃক) বিজিত হয় নাই, তবে বিজিত হওয়ার পথে বলবন মুঈজ-উদ-দীন তুঘরলের বিদ্রোহ দমন করে দিল্লী ফিরে যাওয়ার সময় বুঘরা খানকে 'বাঙ্গালা' জয়ের নির্দেশ দেন। বুগরা খানের ছেলে রুকন উদ্দীন কাইকাউসের সময় 'বঙ্গ'এর রাজস্ব দ্বারা মুদ্রা উৎকীর্ণ করা হয় এবং আরও কয়েক বছর পরে শামছ-উদ-দীন ফীরুজ শাহের সময় সোনার গাঁও টাকশালের নাম উৎকীর্ণ করে মুদ্রা জারি করা হয়। অর্থাৎ এসময়ে সোনার গাঁও জয় সম্পূর্ণ হয়। তাই বারণীর ইকলিম 'বঙ্গালা' প্রাচীনবঙ্গ এবং আরসা বঙ্গালা প্রাচীন 'বঙ্গ'এর একাংশে খুব সম্ভবত সোনার গাঁও। বলবন যখন ইকলিম লাখনৌতি এবং আরসা 'বঙ্গালার কথা বলেন, প্রথমটি দ্বারা লখনৌতির গভর্ণর তুঘরলের বিদ্রোহ দমনের কথা বলেন এবং দ্বিতীয়টির দ্বারা সোনার গাঁও এর কথা বলেন। কাজেই দেখা যায় লক্ষণাবতী থেকে বাঙ্গালা একটি সম্পূর্ণ আলাদা অঞ্চল ছিল (আব্দুল করিম, বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল, পৃঃ ১০-১১)।

Dhaka University Institutional Repository

বারণীর পরবর্তী ঐতিহাসিক শামছ-ই-সিরাজ আফীফ সুলতান শামছুদ্দীন ইলিয়াস শাহকে 'শাহ-ই-বাঙ্গালা' শাহ -ই-বাঙ্গালীয়ান এবং সুলতান -ই- বাঙ্গালা রূপে আখ্যায়িত করেন।[১] তার প্রধান আমত্যবর্গ ও সৈনিকরা 'রায়ান-ই-বাঙ্গালাহ্, লস্কর -ই-বাঙ্গালাহ্ ও পাইক-ই-বাঙ্গালাহ নামে পরিচিত হন।[২] ইলিয়াস শাহ বাংলার তিনটি শাসন কেন্দ্রেই লখনৌতি, সাতগাঁও ও সোনার গাঁও এ তাঁর একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপন করেন এবং এ স্বাধীনতা প্রায় দু'শো বছর অক্ষুন্ন থাকে।[৩]

"তাঁর সময় থেকে সমগ্র বঙ্গদেশ বাঙ্গালা (ফারসী বাঙ্গালাহ্) নামে পরিচিত হয় এবং এর অধিবাসীদিগকে বাঙ্গালী নামে অভিহিত করা হয়। তখন থেকেই লখনৌতির সুলতান বাঙ্গালার সুলতান লখনৌতির মুসলিম রাজ্য বাঙ্গালার মুসলিম রাজ্যে পরিণত হয়।"[৪] একথারই সমর্থন পাওয়া যায় ডঃ আহমদ হুসন দানির উক্তিতে। তিনি বলেন, "Shamasuddin Ilyas shah was the first sultan who by his sagacity and political acumen, founded the united kingdom of Bengal and earned for himself the name of shah-i-Banglah. It was from his time that the connotation of the word Banglah changed, and it was thence forward applied to the whole country of Bengal."[৫]

শামস-উদ্দীন ইলিয়াস শাহের সময় হতে 'বঙ্গালা' নাম পরিচিতি লাভকরে। বাংলার রাষ্ট্রীয় ঐক্য গঠনের প্রশ্নে সুলতান শামস-উদ-দীন ইলিয়াস শাহের রাজত্ব কালের গুরুত্ব সম্পর্কে ডঃ আব্দুর রহীম বলেছেন, "এ রূপে সুলতান ইলিয়াস শাহ 'বাঙ্গালার প্রতিষ্ঠাতারূপে পরিগণিত হন। এর ফলে বাংলার সমগ্র এলাকা একত্রীভূত হয় এবং সমস্ত বাঙ্গালী জাতির রাজনৈতিক, সামাজিক ও ভাষাগত ঐক্যের পটভূমি স্থাপিত হয়। এ সময় থেকে তেলিয়াগর্হি থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত এবং হিমালয়ের পাদদেশ থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল জনপদ 'বাঙ্গালা' এই একটি সাধারণ নামে পরিচিত হয়----এ সময় থেকে পূর্ব বাংলার অথবা উত্তর বঙ্গের, অথবা পশ্চিম বঙ্গের - যেখানকারই অধিবাসী হোকনা কেন- তারা 'বাঙ্গালী' এই সাধারণ নামে পরিচিত হল।"[৬]

১। শামস-ই-সিরাজ আফীফ, তারীখ-ই-ফীরুজ শাহী, পৃঃ ১১৪-১১৮।

২। ডঃ এম,এ, রহিম, প্রাগুক্ত, পৃঃ- ৪।

৩। বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ, প্রাগুক্ত, পৃঃ- ৮।

৪। আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃঃ- ১১।

৫। ডঃ আহমদ হুসাইন দানীর উক্তিটি উদ্ধৃত করা হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চতর মানব বিদ্যাগবেষণা কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত মানববিদ্যা বক্তৃতা ১৯৮৪ এর অন্তর্ভুক্ত- প্রবন্ধ আব্দুল করিম, বঙ্গঃ বঙ্গালাঃ বাংলাদেশ, হতে পৃঃ- ১৪।

৬। ডঃ এম,এ,রহিম প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫।

Dhaka University Institutional Repository

মোগল আমলে 'বাঙ্গালা' নামের বহুল প্রচার হয়। সুলতানী আমলে 'বাঙ্গালা' সম্রাট আকবরের 'সুবা-ই-বাঙ্গালাহ'য় রূপান্তরিত হয় । আবুল ফজল -এ সুবার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, "বাঙ্গালাহ চট্টগ্রাম থেকে গর্হি (তেলিয়াগর্হি) পর্যন্ত এর দৈর্ঘ চারশত ক্রোশ । এর পূর্ব ও উত্তর সীমায় পাহাড় পর্বত, দক্ষিণে সাগর ও পশ্চিমে বিহার প্রদেশ। এদেশের প্রান্ত সীমায় আছে 'কামরূপ' এবং 'আসাম'।"[১]

প্রাদেশিক শাসনকর্তারা-বাঙ্গালাহ্‌র সুবাদাররূপে অভিহিত হন। আকবরের আমলে 'বাঙ্গালাহ' নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলিত হয়। আকবরোত্তর যুগে (ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে) পর্তুগীজদের বদৌলতে ইউরোপীয় পন্ডিতদের কাছে এ ভূ-খন্ড বেঙ্গালা নামে পরিচিত ছিল। পতুর্গীজদের 'বেঙ্গলা' ইংরেজ শাসনামলে বেঙ্গল (Bengal) নামে রূপান্তরিত হয় যা ১৯৪৭ সালপর্যন্ত প্রযোজ্য ছিল। যাহোক, বারণী, আফীফ এবং আবুল ফজলের বর্ণনার আলোকে এটা সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয় যে প্রাচীন 'বঙ্গ' এর পরবর্তী নাম বাঙ্গালা । অতএব, 'বঙ্গ' হতেই বাংলা নামের উৎপত্তি। সুতরাং বলা যায় যে বাংলাদেশের নামের উৎস পুরাণ উপাখ্যানে নয়, বরং মহা প্লাবনের পর হযরত নূহ (আঃ) এর প্রপৌত্র হিন্দ এর দ্বিতীয় পুত্র বং ও তাঁর সন্তান সন্ততিরা এ অঞ্চলে বসতি স্থাপনের ফলে বং নামে যে জনগোষ্ঠী গড়ে উঠে তার নাম থেকেই এদেশের নাম হয় বঙ্গ। বঙ্গ হতে 'বঙ্গাল' শব্দের প্রচলন হয়। মুসলমান শাসনামলেই সর্ব প্রথম প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন জনপদ একত্রিত হয়ে 'বঙ্গালা', 'বাঙ্গালা' নামে পরিচিত হয়। এই বঙ্গালা বা বাঙ্গালা পর্তুগীজদের বেঙ্গালা এবং ইংরেজদের বেঙ্গল এ রূপান্তরিত হয়। উপমহাদেশের বিভাগোত্তর যুগে'বেঙ্গল'এর পূর্বাঞ্চল পূর্ববঙ্গ, পরবর্তীতে পূর্ব পাকিস্তান এবং ১৯৭১ সালে স্বাধীন ও সার্বভৌম মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ 'বাংলাদেশ' নামে আত্মপ্রকাশ করে।

বাংলার অধিবাসী

বাংলার আদিম অধিবাসী কারা এ সম্পর্কে প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রাপ্ত নিদর্শন নিয়ে পন্ডিতগণ যে গবেষণা ও পর্যালোচনা করেছেন তা থেকে অনুমান করা হয় যে আনুমানিক ১৩ লক্ষ বছর আগে প্লেইস্টোসিন যুগে বাংলায় মানুষের প্রথম আগমন ঘটে ছোট নাগপুরের মালভূমি ও রাজ মহল পাহাড়ের নিকট অবস্থিত বরিন্দে।[২] "আনুমানিক ৮০০০ খৃঃ পূর্ব সালের দিকে শিলং মালভূমি থেকে

১। আবুল ফজল, আইন-ই-আকবরী, পৃঃ ১৩-৩১।

২। দশ লক্ষ বছর আগে থেকে (আনুমানিক) খৃষ্ট পূর্ব ৩৫০০ সালের দিকে লিপি আবিষ্কারের কাল পর্যন্ত প্রাগৈতিহাসিক যুগ।

৩। তোফায়েল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

সিলেট অঞ্চলে মানুষ আগমন করে। সিলেটের জৈন্তাপুরে অবস্থিত পাথরের বিশাল সৌধ ও স্তম্ভ (Megalithus) একালের স্বাক্ষর বহন করে। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রকের (Millenium) দিকে প্রত্ন প্রস্তর যুগে (Palaeolethic) এ ভূমিতে বিপুল সংখ্যক মানুষের অধিবাস ছিল। এ প্রাগৈতিহাসিক মানবগোষ্ঠীর উত্তরাধিকারী আজকের সাঁওতাল, বাউরী, মারিশা প্রমূখ উপ-জাতি।"[১] খৃষ্ট পূর্ব ৫ম শতাব্দীতে বাংলায় আর্যদের আগমনের পূর্বে অন্ততপক্ষে আরো কয়েকটি জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়, যেমন - নেগ্রিবটো, অষ্ট্রো-এশিয়াটিক, দ্রাবিড় ও ভোটচেনীয়।

নিগ্রোবটোরা প্রত্নপ্রস্তর যুগের লোক। ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়-এর মতে, "আনুমানিক পাচঁহাজার বছর আগে এরা এ দেশে বাস করত। কৃষিকার্য এরা জানতনা, শিকার লব্ধ মাংসে জীবিকা নির্বাহ করত"।২

এর পর ইন্দোচীন থেকে আসাম হয়ে অষ্ট্রিকরা অষ্ট্রো-এশিয়াটিক জাতি বাংলায় আগমন করে। এখানে এসে তারা তামা ও লোহার ব্যবহার শিখে। এরা ছিল কর্মবাদী। এরাই কোলভীল, সাঁওতাল, মুন্ডা প্রভৃতি উপ-জাতির পূর্বপুরুষ রূপে চিহ্নিত হয়। বাংলা ভাষার শব্দে ও বাংলার সংস্কৃতিতে এদের প্রভাব রয়েছে।

অষ্ট্রো-এশিয়াটিক জাতির প্রায় সমকালে বা এদের কিছু পরে প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে দ্রাবিড় জাতি এ দেশে আসে। সেমেটিক সভ্যতার উৎস সামের প্রপৌত্র এবং হযরত নূহ (আঃ) এর সপ্তম অধঃস্তন বংশধর আবু-ফীর ছিলেন উপ-মহাদেশের দ্রাবিড়দের আদি পুরুষ। তাই দ্রাবিড় সভ্যতা সেমেটিক সভ্যতার অন্যতম শাখা হিসাবে পরিচিত। আবু-ফীর ও তাঁর বংশধরেরা "উত্তর, উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারত থেকে শুরু করে পূর্বে গঙ্গার মোহনা পর্যন্ত বিস্তির্ণ এলাকায় বসতি বিস্তার করে। দ্রাবিড়রা ছিল উন্নততর সভ্যতার ধারক।তারা নগর সভ্যতার গোড়া পত্তন করে। উরপুর, প্রভৃতি দ্রাবিড় শব্দ। দ্রাবিড়রা সোনা, রূপা, সীসা, ব্রোঞ্জ এবং টিনের ব্যবহার জানতেন। গরুর গাড়ীর আবিষ্কার হয় এদের কালে। সুতা কাটা ও কাপড় বোনা এদের আয়ত্বে ছিল"।[৩] তাম্র প্রস্তর যুগের চিত্রকলার, জ্যামিতিক রেখা অংকনের এবং অলঙ্করণের,মাটির পুতুল ও খেলনায় যে পরিচয় তা দ্রাবিড় ভাষী নরগোষ্ঠীরই সৃষ্টি"।[৪]

১। এই উক্তিটি আবু বকরের পাকিস্তান এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নাল ১ নং ভলিয়ুম ১৪ থেকে উদ্ধৃত করেছেন তোফায়েল আহমদ তাঁর যুগে যুগে বাংলাদেশ গ্রন্থে, পৃঃ ১৩।

২। তোফায়েল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০।

৩। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য, পৃঃ ৯৫।

৪। ডঃ নীহার রঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব, পৃঃ ৬।

Dhaka University Institutional Repository

"তারা বন্য জন্তু জানোয়ারকে পোষ মানাতে জানত। গো-পালন ও অশ্বচালনা বিদ্যাও তাদের আয়ত্বাধীন ছিল। কৃষিকাজ করে তারা জীবিকা নির্বাহ করত। তারা উপাসনালয় ও গৃহ নির্মাণ করা জানত। মিসর, ব্যাবিলন, আসিরিয়া ও ক্রীটের সাথে তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। দক্ষিণ ভারতীয় উপকুল দিয়ে তারা ভূ-মধ্য সাগরীয় দেশগুলোর সাথে বাণিজ্যিক ও তমদ্দুনিক সম্পর্ক কায়েম রেখেছিল। মোট কথা, তারা নাগরিক সভ্যতার অধিকারী ছিল। তারা ছিল সেমেটিক একেশ্বর বাদী ধর্মের অনুসারীদের উত্তরসূরী"।[১] দ্রাবিড়রা এরূপ উন্নত সভ্যতার ধারক হওয়ার কারণে অষ্ট্রো-এশিয়াটিক জাতির অস্তিত্ব লোপ পায়। অষ্ট্রো-দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর সংমিশ্রণেই আর্য পূর্ব জনগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছে।

খৃষ্ট পূর্ব চতুর্থ শতকে বাংলায় শৌর্য-বীর্য, সভ্যতা ও কৃষ্টিতে শীর্ষস্থানীয় গঙ্গরীডি নামে ভারতের শ্রেষ্টতম যে জাতির উল্লেখ পাওয়া যায় আলেকজান্ডারের সমকালীন গ্রীক ঐতিহাসিকদের লেখায় সে জাতি কারা? নিশ্চয় দ্রাবিড়গণ। গ্রীক ভৌগোলিক টলেমী বলেন,"গঙ্গা মোহনার সব অঞ্চল জুড়ে এ গঙ্গরীডিরা বাস করে। তাদের রাজধানী গঙ্গ আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বন্দর ছিল। তাদের মত পরাক্রান্ত ও সমৃদ্ধ জাতি ভারতে আর নেই।"[২] গ্রীক পন্ডিতগণের উল্লেখিত এ গঙ্গরীডিরা যে বঙ্গ ব-দ্বীপের অধিবাসী বঙ্গ দ্রাবিড় তাতে কোন সন্দেহ নেই। পাচঁ হাজার বছর আগে এ দ্রাবিড় জাতি পশ্চিম এশিয়া থেকে বেলুচিস্তানের মধ্য দিয়ে হিমালয়ান উপমহাদেশে প্রবেশ করে। গ্রীস ও ইউফ্রেতিস নদীগুলোর অববাহিকায় বসবাসকারী এ দ্রাবিড়রা স্বভাবতঃই ভারতের বৃহত্তম নদীগুলোর অববাহিকা ও সমুদ্রোপকূলকে নিজেদের আবাস ভূমি হিসাবে বেছে নেয়। তাদেরই একটি দল গঙ্গা মোহনায় স্থায়ী বসতি স্থাপন করে উন্নততর সভ্যতা গড়ে তোলে।[৩]

দিগ্বিজয়ী আলেকজান্ডার খৃষ্ট পূর্ব ৩২৭ অব্দে যখন বিপাশা নদীর তীরে উপস্থিত হন তখনই গঙ্গা রীডির শৌর্য বীর্য ও পরাক্রমের কথা অবগত হন। গ্রীক ভূগোলবেত্তা ও ঐতিহাসকিদের বর্ণনায় জানা যায় যে, "পূর্ববঙ্গের এ প্রাচীন শক্তিশালী রাষ্ট্রের বিশ সহস্র অশ্বারোহী, দুই লক্ষ পদাতিক, দুই সহস্র রথ ও চার সহস্র হস্তি যুদ্ধের ভয়ে আলেকজান্ডার এদেশ আক্রমণের সাহস পান নি"।[৪]

১। আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০।

২। আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬।

৩। আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬।

৪। বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭।

Dhaka University Institutional Repository

গঙ্গারীডি রাজ্যের রাজধানী ছিল গঙ্গা তীরবর্তী গঙ্গে। এই গঙ্গে নগরী ছিল একটি প্রসিদ্ধ আন্তর্জাতিক বন্দর। এ বন্দরের সঙ্গে রোম, মিসর,চীন, পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও এ উপ-মহাদেশের অন্যান্য এলাকার বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। বিভিন্ন দেশের বাণিজ্য জাহাজ এখানে যাতায়াত করতো এ দেশের স্বর্ণ ও মণিমুক্তা, রেশম ও কার্পাসজাত বস্ত্র, মসলা, গন্ধ দ্রব্য এবং যুদ্ধোপকরণ হিসাবে হাতী বিদেশে রপ্তানী হতো।"[১]

"এ বন্দর থেকে সুদূর পশ্চিমে ঢাকায় সূক্ষ্ম মসলিনও রপ্তানী হত। বহু প্রাচীন কাল থেকেই এদেশের বয়ন শিল্প পৃথিবীব্যাপী সুখ্যাতি অর্জন করেছিল"।[২] বিভিন্ন সূত্রে জানা যায় খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকেও গঙ্গারীডি স্বাধীন সার্বভৌম শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে বিদ্যমান ছিল। "প্রাচীন যুগে অন্ততঃ তিন হাজার বছর বা তাহারও পূর্বে বাংলাদেশের এই অঞ্চলে সুসভ্য জাতি বাস করিত,ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। --------- মোটের উপর আর্যজাতির সংস্পর্শে আসিবার পূর্বেই বর্তমান বাঙ্গালী জাতির উদ্ভব হইয়াছিল এবং তাহারা একটি উচ্চাঙ্গ ও বিশিষ্ট সভ্যতার অধিকারী ছিল, এই সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায়"।[৩] মেগাস্থিনিশ থেকে শুরু করে প্লুতর্ক; প্লিনি, টলেমী প্রমুখ সমকালীন গ্রীক ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও পন্ডিতগণ আর্যপূর্ব বাংলার দ্রাবিড়দের গৌরবোজ্জ্বল যুগ সম্পর্কে সরব হলেও আর্য লেখকরা এব্যাপারে একেবারেই নিরব। যাহোক, এসময় বাংলার রাজা মগধাদি দেশ জয় করে ভারতের পূর্ব সীমান্ত থেকে পাঞ্জাবের বিপাশা নদীর তীর পর্যন্ত এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন।

"দক্ষিণ রাশিয়া ও তুর্কিস্তান ছিল আর্যদের আদিবাসস্থান।"[৪] কাল ক্রমে তারা পৃথিবীর বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েন। এদেরই একটি অংশ আনুমানিক খৃষ্ট পূর্ব ১৫০০ অব্দে এ উপ-মহাদেশে আগমন করেন। খৃষ্ট পূর্ব ৬ষ্ঠ শতক পর্যন্ত হিন্দুস্তানে আর্য উপনিবেশ চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। তাদের আক্রমণও লুণ্ঠণের ফলে দ্রাবিড় অধ্যুষিত সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংস হয়। পাঞ্জাব থেকে শুরু করে উত্তর ভারতের বেনারস পর্যন্ত তাদের বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপিত হয়। এর পূর্বে কয়েকশত বছর ধরে তারা উত্তর পশ্চিম সীমান্ত পথ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করতে থাকে। নিছক অধিকতর উর্বর জমি ও উপযোগী আবহাওয়া যাযাবর আর্যদেরকে হিন্দুস্তানে প্রবেশে অনুপ্রাণীত করেনি। বরং বাদশাহ গশ্তাপ্সের আমলে তাঁদের মাতৃভূমি ইরানে

১। মনসুর মুসা (সম্পাদনা), প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮।
২। বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭।
৩। রমেশ চন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪।
৪। বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯।

Dhaka University Institutional Repository

ধর্ম নিয়ে যে মত বিরোধ, আত্মকলহ ও পরিণামে ভীষণ যুদ্ধ বিগ্রহ শুরু হয়েছিল, তার ফলেই তাদেরকে মাতৃভূমি ত্যাগ করে হিন্দুস্তানের পথে পাড়ি জমাতে হয়।[১] কিন্তু বাংলাদেশে তাদের অভিযান পরিচালিত হয় খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে।[২] এতে বুঝা যায় যে এ উপমহাদেশে আর্য আগ্রাসন ও আর্য ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার পর দু'হাজার বছর পর্যন্ত আর্যদের বাংলাদেশে প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব হয়নি।

১। আব্দুল মান্নান তালিব ইমাম ইবনে হাযম ও শাহরাস্তানীর 'আল মিলাল ওয়ান নিহাল' গ্রন্থের বরাত দিয়ে আর্যদের ভারত আগমনের পটভূমির বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, "ইরানের ধর্মীয় নেতা যরদাশ্‌ত্‌ (যরথুস্ত্র) সেখানে নতুন ধর্মমত প্রচার করেন। তার ধর্মের মূলকথা ছিল আহুরা মাজদা বা জ্ঞানময় আল্লাহ হচ্ছেন পৃথিবী, আকাশ, চন্দ্র,সূর্য প্রভৃতি সমস্ত গ্রহ নক্ষত্রের একমাত্র স্রষ্টা, মালিক ও প্রভূ। মানুষ কোন দেব দেবীর পূজা অর্চনা করবে না। মানুষ একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে, সোমরস বা অন্য কোন মাদক দ্রব্য ব্যবহার করা হারাম। পরকাল ও কর্মফলকে বিশ্বাস করতে হবে। যরদাশ্‌ত্‌ তাঁর সত্য ধর্ম প্রচার করতে গিয়ে প্রথম দশ বছরে তেমন সফল হননি, এ সময় মাত্র একজন লোক তার ধর্ম গ্রহণ করেন। অতঃপর রাজ দরবারে ধর্ম প্রচারের সুযোগ লাভ করলে মন্ত্রীর দু পুত্র ও রাণী তাঁর ধর্ম গ্রহণ করেন। এক পর্যায়ে বাদশাহ গশ্‌তাস্‌পও তাঁর সভাসদবর্গ এ ধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু কুসংস্কার ও সনাতন বিশ্বাসের ধারক ও বাহক পুরোহিত পন্ডিতগণ পূর্বপুরুষের ধর্মের দোহাই দিয়ে অজ্ঞ জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে তোলেন। দেশের সরকার ও নতুন ধর্মের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দেয়। এ সুযোগে তুরাণীয়া ইরান আক্রমণ করে বসে। নব দীক্ষিত মুসলমানেরা একে জেহাদ হিসাবে গ্রহণ করে এ জেহাদকে শেষ পর্যায়ে পৌঁছিয়ে নিঃশ্বাস নেয়। এর ফলে নিজেদের পৈত্রিকধর্ম ও শের্কবাদী সংস্কৃতি সংগে নিয়ে বিদ্রোহী মুশরিকগোষ্ঠীগুলো পার্শ্ববর্তী দেশ সমূহের বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত ভাবে চলে যেতে থাকে। এদেরই একটি অংশ ভারতীয় উপমহাদেশে চলে আসে"। (আব্দুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশে ইসলাম, পৃঃ ১৯)। ঐতিহাসিকগণ যরদাশতকে ইরানের নবী বলে উল্লেখ করে থাকেন। কিন্তু কোরআনে তার নাম উল্লেখ নাথাকায় অনেকেই এব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে থাকেন। কিন্তু এ সন্দেহ কোরআনের শিক্ষার বিপরীত। যেমন, "আর দেখ, তোমার পূর্বে হে মুহাম্মদ। রাসুলগণকে প্রেরণ করেছি, কিন্তু তার মধ্যকার কতক রাসুলের বর্ণনা তোমার কাছে করেছি, আর কতক রাসুলের বর্ণনা তোমার কাছে করি নাই"। (সুরা মোমেন, আয়াত-৭৮)। কুরআনে রাসুলগণের যে সাধারণ লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে যেমন- তিনি আস্তিক হবেন মুশরিক বা শূন্যবাদী হবেন না। তিনি নিজে নর পুজক হবেন না, সৃষ্টির কোন কিছুকে ইশ্বরের অংশে বা তাঁর গুণের অধিকারী বলে গ্রহণ করবেন না ইত্যাদি। যরদাশত এর মাঝে এ লক্ষণগুলো পূর্ণ মাত্রায় লক্ষ্য করা যায়।

২। আখতার -উল-আলম, ইতিহাসে বাংলাঃ বাংলার ইতিহাস, দৈনিক ইত্তেফাক, ১৬ ই ডিসেম্বর ১৯৮৯ ইং, পৃঃ ৭।

Dhaka University Institutional Repository

বৈদিক আর্যগণ ক্রমশঃ পূর্ব দিকে অভিযান পরিচালনা করে উত্তরাপথের অধিকাংশ দখল করেন। এ অধিকৃত এলাকাই 'আর্যাবর্ত' নামে অভিহিত হয়। পূর্বে গঙ্গা যমুনার সঙ্গম স্থল অর্থাৎ এলাহাবাদ, উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা, পূর্বে সুলেমান পর্বত মালা, দক্ষিণে সিন্ধু সঙ্গম পর্যন্ত 'আর্যাবর্ত' বিস্তৃত ছিল। বৌধায়ন ধর্ম সূত্র মতে, আর্যাবর্ত ছিল আর্যদের পবিত্র স্থান এবং এর বাইরে ছিল অনার্যদের বসবাস। বঙ্গ ভূ-খন্ড তখন পর্যন্ত 'আর্যাবর্ত'র বাইরে ছিল। ক্রমে এ ভূ-খন্ডের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। আর্যদের ধর্ম গ্রন্থে এ দেশের প্রাচীন অধিবাসী তথা দ্রাবিড়দেরকে মহাভারতে ম্লেচ্ছ, মনুসংহিতায় সর্প,ঐতরেয় ব্রাহ্মণে অনার্য, দস্যু ও অসুর, ঐতরেয় আরণ্যকে দূর্বল, সুরাহারী ও কাক এবং বৌধায়ন ধর্ম সূত্রে অস্পৃশ্য ও পক্ষীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। বৌধায়ন ধর্মসূত্রে পুন্ড্র ও বঙ্গদেশ বৈদিক কৃষ্টি ও সভ্যতার বহির্ভূক্ত বলে বর্ণিত হয়েছে এবং এ দু'দেশে পদার্পণ করলে আর্যদের প্রায়শ্চিত্য করতে হবে এরূপ বিধান রয়েছে।

আর্যদের ধর্মশাস্ত্রের বক্তব্য বঙ্গের দ্রাবিড়দের বিরুদ্ধে ঈর্ষা ও বিদ্বেষ প্রসূত সত্যের অপলাপমাত্র। প্রকৃত পক্ষে দ্রাবিড়গণ ছিলেন উন্নত এবং একটি উচ্চাঙ্গ ও বিশিষ্ট সভ্যতার অধিকারী অথচ এ জাতির শৌর্যবীর্য ও কৃতিত্ব সম্পর্কে আর্য পন্ডিতগণ কেবল নিরবই নয় বরং তাদেরকে নানাভাবে আরো হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে। রমেশচন্দ্র মজুমদার তাই বলেছেন, "বিদেশীয় ঐতিহাসিকগণ যে গঙ্গারীডিই জাতির সাম্রাজ্য ও ঐশর্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাদিগকে ভারতের শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, মহাকবি ভার্জিল যে জাতির শৌর্যবীর্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন এ দেশীয় পুরাণ বা অন্যকোন গ্রন্থে সেই জাতির কোন উল্লেখই নাই"।[১] এদেশের আদিম অধিবাসী দ্রাবিড়গণ যে অসভ্য ও বর্বর ছিলেন না তা সুস্পষ্ট। এ উপ-মহাদেশে প্রবেশ করতে গিয়ে আর্যগণ দ্রাবিড়দের প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। আর্যাবর্তে আর্যদের প্রতিষ্ঠার পর দ্রাবিড়দের সাথে তাদের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ে। "খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতকের পূর্বে উত্তর ভারতে আর্যদের অনুপ্রবেশ শুরু হলে সম্ভবত বিপুল সংখ্যক অনার্য এবং দ্রাবিড় উৎপীড়ন আর দাসত্ব পরিহার করার জন্য বাংলায় পলায়ন করে"।[২] উত্তর ভারতের এই আর্য অনার্য সংঘর্ষ স্বভাবতই বঙ্গের দিকে প্রসারিত হয় এবং এ সংঘর্ষ বহু কাল অব্যাহত থাকে।

১। রমেশ চন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১।

২। বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০।

Dhaka University Institutional Repository

মহাভারতে উল্লেখিত যুদ্ধে "বঙ্গরাজা চিত্রসেন এবং পুন্ড্ররাজ বাসুদেবের সঙ্গে কৃষ্ণের দ্বন্দ্ব এ সংঘর্ষের সাক্ষ্য বহন করে। পূর্বাঞ্চলে অভিযানে ভীম শক্তিশালী পুন্ড্ররাজ এবং অন্যদের পরাজিত করে বঙ্গের অধিপতির বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। এ সব রাজ্য জয় এবং তাদের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করে তিনি লৌহিত্য অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্রের দিকে অগ্রসর হন। শতপথ ব্রাহ্মণের বর্ণনা মতে: আনুমানিক খৃষ্ট পূর্ব ৭ম শতকের দিকে আর্য সংস্কৃতির প্রতীক খাজন অগ্নি পূর্ব দিকে অনুপ্রবেশ আরম্ভ করে কিন্তু ভাগলপুরের সদানী নদীর পশ্চিম পার অবধি এসে তা থেমে যায়। করতোয়াকে সদানী বলে চিহ্নিত করা হয়। তার পূর্ব পারে ছিল অসভ্য (Saveges)অধ্যুষিত জলাভূমি।" ১

এতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে খৃষ্ট পূর্ব সপ্তম শতকের আর্য অনার্য সংঘর্ষে আর্য ভারতের রাষ্ট্রীয় সীমা বঙ্গের সীমান্ত করতোয়া নদী বরাবরই স্থির ছিল। প্রবল চেষ্টা সত্ত্বেও আর্য ভারতীয়রা সদলবলে করতোয়ার এপারে বঙ্গে আসতে পারেনি। মন্মথ মোহন বসুর ভাষায়, "প্রায় সমস্ত উত্তর ভারত যখন বিজয়ী (বহিরাগত) আর্যজাতির অধীনতা স্বীকার করিয়া ছিল (করতোয়া নদী বরাবর উপরোক্ত সীমানার এপারে) বঙ্গ বাসীরা তখন সগর্বে মস্তক উত্তোলন করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া ছিল"।২

খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতেও বঙ্গ তার স্বাতন্ত্র নিয়ে বিদ্যমান থাকে। এ সময় আর্য হিন্দু ভারতে মৌর্য সাম্রাজ্যের উত্থান পতন, বৈদেশিক আক্রমণ এবং আর্যাবর্তের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের অভ্যুদয় প্রভৃতি ঘটনা সত্ত্বেও প্রাচীন বাংলাদেশে আর্য ক্ষমতা বিস্তার লাভ করতে পারেনি। আর্যরা যুদ্ধে বার বার পরাজিত ও বিতাড়িত হলেও বাংলার ধনসম্পদ ও ভূ-খন্ডের প্রতি তাদের লোভ ও লালসা সংবরণ করতে না পেরে তারা বারবার বঙ্গের বুকে হানা দিয়েছে। বঙ্গবাসীকে শক্তিহীন করতে তারা অস্ত্রের পাশাপাশি চালিয়ে গেছে তাদের চানক্য কৌটিল্য নীতি, বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। দ্রাবিড়রা উন্নত সভ্যতার অধিকারী হলেও উন্নত যুদ্ধাস্ত্র ও অশ্বাদীর ব্যবহারে অদক্ষ হওয়ায় আর্যদের কাছে পরাজিত হয়। এভাবে প্রাচীন বাংলাদেশে আর্যহিন্দু ভারতীয়দের আধিপত্য স্থাপনের পথ সুগম হয়। আর্যদের অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তারের মধ্য দিয়ে পরাজিত দ্রাবিড় ও অন্যান্য অনার্য জাতিরা লোকালয় ছেড়ে দূর পাহাড় পর্বত ও জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাদের অনেকেই আর্যধর্ম সভ্যতা গ্রহণ করে। আবার অনেকেই তা গ্রহণ করেনি।

১। বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০-৩১।
২। মন্মথ মোহন বসু, বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রম বিকাশ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৯ ইং, পৃঃ ২২।

Dhaka University Institutional Repository

বঙ্গের দ্রাবিড়দের সাথে আর্যদের সংঘাত সুদীর্ঘ কাল স্থায়ী হয়। এজন্য শত শত বছর ধরে আর্য ধর্মশাস্ত্রগুলোর মাধ্যমে তারা দ্রাবিড়দের বিরুদ্ধে বিষাক্ত আক্রোশ জিইয়ে রেখেছে। তাদের ধর্মশাস্ত্রে এ দেশীয় বিজিতদের শূদ্র, দাস, অস্পৃশ্য ও অপাংক্তেয় বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তাই তাদের ধর্মীয়শাস্ত্রে এদেশীয়দের বিরুদ্ধাচরণ আর্যদের ধর্মীয় আচরণে পরিণত হয়েছে। এজন্যই হয়ত বৌধায়ণ ধর্ম শাস্ত্রে দ্রাবিড় ও অনার্য অধ্যুষিত বঙ্গ ভূমিকে ঘৃনার্হ ম্লেচ্ছদেশ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এমনকি এ দেশে স্বল্পকালের জন্য বসবাস করলেও আর্য সন্তানদের প্রায়শ্চিত্য করতে হয় বলে তাদের ধর্ম শাস্ত্রে প্রমাণ পাওয়া যায়।

আর্যদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলার কারণে তারা বহু দিন পর্যন্ত বঙ্গ ভূমিতে প্রবেশ করতে পারেনি। ফলে ভারতে আসার পর থেকেই আর্য জনগোষ্ঠী বাংলার অধিবাসীদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও ঘৃণা পোষণ করতে থাকে। আর্যদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুললেও দ্রাবিড়রা তাদের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে নি। বস্তুতঃ দ্রাবিড়রা পরোক্ষভাবে ধীরে ধীরে আর্যদের দ্বারা প্রভাবিত হতে থাকে। খৃষ্ট পূর্ব ৩০০ অব্দের দিকে মৌর্য বিজয়ের কাল থেকে এ প্রভাব শুরু হয় এবং গুপ্ত রাজত্ব কালে (৩২০-৫০০ খৃঃ) খৃষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে আর্যদের ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতি প্রত্যক্ষভাবে এ দেশে অনুপ্রবেশ করে।[১]

রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আর্যদের এ প্রভাব ধীরে ধীরে সর্বগ্রাসী রূপ নেয়। দ্রাবিড় ও অনার্য শক্তি স্তিমিত হবার সঙ্গে সঙ্গে আর্য ও হিন্দু শক্তি দ্রুত বেগে অগ্রসর হতে থাকে। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর চন্দ্র গুপ্ত আর্য ভারতীয় গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। "সমুদ্রগুপ্তের সময় যখন উক্ত সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়ে বিশাল আকার ধারণ করে, তখনও বাংলায় কতকগুলি স্বাধীন রাজ্য ছিল। সমুদ্রগুপ্ত যে সব রাজাকে পরাজিত করেন, চন্দ্র বর্মা তাদের অন্যতম। তাঁর বাবার নাম ছিল সিংহ বর্মা। তিনি বিষ্ণুর পূজা করতেন"।২ চন্দ্র বর্মার রাজ্য বিস্তৃতিকালে চন্দ্র গুপ্ত নামে একরাজা একটি ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন (৩১৯-২০ খৃঃ)। সেই সময় থেকেই 'গৌড়' ও 'রাঢ়' নূতন রাজ্যের অংশে পরিণত হয়েছিল। বাংলাদেশের পূর্বভাগ সমতট, অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র ব-দ্বীপ এবং ডবাক অর্থাৎ পশ্চিমে করতোয়া নদী, পূর্বে মেঘনা নদী, উত্তরে খাসিয়া পাহাড়, দক্ষিণে ঢাকা ও সোনারগাঁও সহ গঙ্গা পর্যন্ত বিস্তৃত ভূ-ভাগ সমুদ্রগুপ্তের প্রভাবাধীন করদ রাজ্য ছিল।[৩] কিন্তু পুন্ড্রবর্ধনভূক্তি অর্থাৎ বাংলাদেশের উত্তর

১। আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১।

২। ফজলুল হাসান ইউসুফ, বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২ ইং, পৃঃ ৭।

৩। V.A. Smith: "The Early History of India" Oxford London, 1967. p. 302.

Dhaka University Institutional Repository

পশ্চিমাংশ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত এবং সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত শাসন কর্তার অধীনে ছিল।[১] এতে বুঝা যায় যে এক পর্যায়ে বাংলাদেশের ফরিদপুরের পশ্চিমে অবস্থিত ভূ-খন্ড ও উত্তর পশ্চিমাংশ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়লেও করতোয়া এবং ফরিদপুর ও গঙ্গার পূর্বতীরের সমগ্র এলাকা আর্য হিন্দু ভারতীয় শাসনমুক্ত ছিল।

খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বার বার হুনদের আক্রমণে শেষ পর্যন্ত গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। ফলে এ সুযোগে ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশই শক্তিশালী স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়। স্কন্দগুপ্তের পাঁচশত বছর পরেও বাংলাদেশে গুপ্ত সম্রাটদের দেয়া উপাধী 'মহারাজাধিরাজ' ধারণ করে অনেকে শাসনকার্য চালাতেন। সমতটের সামন্তরাজা বৈন্যগুপ্ত ৫০৭/৮ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনতা ঘোষণা করে ৫২৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত স্বাধীনভাবে বঙ্গ রাষ্ট্র শাসন করেন। বৈন্যগুপ্তকে পরাজিত করে গোপচন্দ্র বঙ্গের সিংহাসনে বসেন। গোপচন্দ্রের পর ধর্মাদিত্য এবং সমাচারদেব রাজত্ব করেন। এঁরা ৬ষ্ঠ শতকের শেষ পর্যন্ত বঙ্গ রাষ্ট্র শাসন করেন। ৫৯৭-৯৮ খৃষ্টাব্দের কোন এক সময়ে বঙ্গ দেশ চালুক্যরাজ কীর্তিবর্মার হাতে পরাজিত হয়। কিন্তু এ পরাজয় সত্বেও বঙ্গ রাষ্ট্র পরাধীনতা এড়াতে সক্ষম হয়।[২]

রাজা শশাঙ্ক (নরেন্দ্রাদিত্য) ৬০৬ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভ করেন। হর্ষচরিত অনুযায়ী শশাঙ্ক গৌড়ের অধিপতি ছিলেন। শশাঙ্কের সাথে থানেশ্বররাজ রাজ্যবর্ধন ও হর্ষবর্ধনের সাথে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম চলে। হর্ষবর্ধন ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। অন্যদিকে শশাঙ্ক বৌদ্ধ ধর্ম বিরোধী ছিলেন। তাছাড়া বৌদ্ধরাও শশাঙ্কের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল, যাতে হিন্দু শশাঙ্কের স্থলে বৌদ্ধ হর্ষ এ অঞ্চলের রাজা হতে পারেন।

এ সময়ে কামরূপরাজ ভাস্বরবর্মার সাথেও শশাঙ্কের যুদ্ধ হয়। ভাস্বরবর্মা পরে শশাঙ্কের নিকট পরাজিত হয়ে হর্ষের সাহায্য প্রার্থনা করেন। হর্ষ ও ভাস্কর বর্মার সাথে যুদ্ধ করে শেষ পর্যন্ত পরাজিত হন। ৬২০ খৃষ্টাব্দে শশাঙ্কের মৃত্যু হয়।

১। রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম খন্ড, নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৭১ ইং, পৃঃ ১৩।

২। বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

বলা হয়ে থাকে যে ৬৫০-৭৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্গের মাৎস্যন্যায় কাল।[১] একথা মেনে নেয়া যায় না। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর গৌড়ের সামন্ত শ্রেণী যার যার মত ক্ষমতা বিস্তার করে দেশ অরাজকতায়, উচ্ছৃঙ্খলতায় ভরে তুলল। কিন্তু সে অরাজকতা বঙ্গের নয় গৌড় রাষ্ট্রের। বঙ্গ তখনও ভদ্র রাজ বংশ রাষ্ট্র শাসন করছে। কেননা, ঐতিহাসিকগণ সিদ্ধান্তে এসেছেন, "সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে বঙ্গ রাষ্ট্র স্বাধীন ছিল এবং ভদ্র বংশের রাজাগণ কর্তৃক শাসিত হয়েছে। ভদ্র বংশের রাজত্বকালেই রাঢ়ের (পশ্চিম বঙ্গের) সামন্ত শশাঙ্ক গুপ্তবংশীয় নৃ-পতি মহাসেনগুপ্তকে পরাজিত করে প্রথমে রাঢ় এবং পরে পুন্ড্ররাজ্য অধিকার করে গৌড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু শশাঙ্কের সময়ও বঙ্গ রাষ্ট্র স্বাধীন ছিল। শশাঙ্কের বঙ্গ অধিকারের কোন প্রমাণ নেই।২

ভদ্র বংশের পর সমতট এলাকার রাজ বংশ খড়গ রাজগণ দীর্ঘকাল বঙ্গরাষ্ট্র শাসন করেন। এ রাজ বংশের পর রাতরাজবংশ এবং লোকনাথ বংশীয় রাজারা অষ্টম শতকের দ্বিতীয় পাদের কোন এক সময়ে ললিত চন্দ্র বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ----- যশোবর্মার হাতে ললিতচন্দ্রের পরাজয়ের প্রাক্কাল পর্যন্ত অর্থাৎ আনুমানিক ৭২৫-৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্গ রাষ্ট্রের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন ছিল। কেবল অক্ষুন্ন নয়, সুসংহত রাষ্ট্র শক্তিও ছিল।৩

<u>ইসলাম আগমন পূর্ব বাংলার সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা ঃ</u>

খৃষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দে মৌর্য বিজয়কালে এদেশে আর্য প্রভাব শুরু হয় এবং গুপ্তরাজত্বকালে (৩২০-৫০০) খৃষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে আর্য ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতি প্রত্যক্ষভাবে এদেশে শিকর গেঁড়ে বসে। এর পরিণতিতে একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে এসে দেখা যায় 'অসভ্য বঙ্গালদের' মানুষ করার জন্য কণৌজ থেকে পাঁচজন ব্রাহ্মণ সভ্যতার রক্ত বিস্তারের সুযোগ গ্রহণ করা হয়। এ দেশে কৌলিণ্য প্রথার চালু হয়।

১। মাৎস্যন্যায় শব্দের ব্যাখায় বলা হয়েছে যে দক্ষ কেন্দ্রীয় প্রশাসনের অভাবে সামন্ত শাসকরা নিজেরাই কর্তৃত্ব গ্রহণ করে এবং দেশে অরাজকতার সৃষ্টি হয়। কৌটিল্যের অর্থ শাস্ত্রে মাৎস্যন্যায় সম্পর্কে বলা হয়েছে, "দন্ডধরের অভাবে যখন বলবান দুর্বলকে গ্রাস করে অর্থাৎ মাছের রাজত্বের মত যেখানে ছোট মাছকে বড় মাছ গ্রাস করে"। লামা তারানাথ মাৎস্যন্যায়ের ইতিহাস তুলে ধরেছেন এভাবে "সমগ্র দেশে কোন রাজা ছিলনা, প্রত্যেক ক্ষত্রীয় সম্ভ্রান্ত লোক, ব্রাহ্মণ এবং বণিক নিজ নিজ এলাকা স্বাধীনভাবে শাসন করতেন। ফলে দুঃখ- দুর্দশার আর সীমা ছিলনা।"(বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ,পৃঃ ৪৯)

২। বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪।

৩। বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীন বাংলার অধিবাসীদের সম্পর্কে ইতিহাসে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। এ সময়ের অধিবাসীদের মধ্যে কিরাত, নিষাদ, দামিল, পুন্ড্র ইত্যাদি জাতির নাম পাওয়া যায়। তারা একেবারে অসভ্য জাতি ছিল এ কথা বলা যায় না। কৃষিজীবী দামিল ও নিষাদ জাতির ধর্ম, দর্শন, সামাজিক রীতিনীতির প্রচলন থেকে অনুমান করা যায় যে প্রাচীন যুগে বাংলার জনগণ এক উন্নত সভ্যতা ও সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ ধুতি, শাড়ী, সিঁদুর ও হলুদের মাধ্যমে তাদের বিয়ের ব্যবস্থা প্রাগ আর্যদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। পরবর্তী কালে আর্য-অনার্য জাতির সংমিশ্রণে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি নতুনভাবে গড়ে উঠে। হিন্দু সমাজের কালী পূজা, মনসা পূজা, শিবের গাজন এখনও অনার্য যুগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

আর্যদের সংস্পর্শে এসে বাংলার লোকেরা বৈদিক ধর্মের সাথে পরিচিতি লাভ করে। আর্যদের সমাজ ও ধর্মীয় ব্যবস্থায় জনগোষ্ঠী চার শ্রেণীতে বিভক্ত হয় যেমন- ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এদের মধ্যে সমাজের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে ছিল ব্রাহ্মণরা। তাদের দায়িত্ব ছিল শাস্ত্র পাঠ, যাগযজ্ঞ ও আচার অনুষ্ঠানাদি পরিচালনা করা। ক্ষত্রিয়দের উপর ন্যস্ত ছিল দেশ বিজয়, যুদ্ধ বিগ্রহ, সীমান্ত রক্ষা ও রাজ্য শাসন করার কর্তৃত্ব। বৈশ্যদের হাতে ছিল দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য তথা অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ। আর বাদবাকী জনসমষ্টির অধিকাংশ যেমন-তথাকথিত বিজিত দাস, শূদ্র, অন্তজ ছিল অস্পৃশ্য অনার্য জাতি। তাদের জীবন ছিল বিড়ম্বিত। তারা উচ্চ শ্রেণীর দাসত্বে নিয়োজিত থেকে মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য হত। ব্রাহ্মণরা তাদের পৌরহিত্য পর্যন্ত করত না। তাদের খাদ্য গ্রহণ ছিল ব্রাহ্মণদের জন্য নিষিদ্ধ। এ বিধান লংঘন করলে ব্রাহ্মণদের প্রায়শ্চিত্য করতে হত। অস্পৃশ্যদের ছায়া মাড়ালেও 'গোসল' করে ব্রাহ্মণদের শূচিতা অর্জন করতে হত। এমনকি অস্পৃশ্যদের দেশ বঙ্গ বা বঙ্গাল দেশে আগমন করাই ছিল তাদের জন্য নিষিদ্ধ। "অল্প কয়েক দিনের জন্য এ অঞ্চলে অবস্থান করলে গুরুতর প্রায়শ্চিত্য করতে হতো"।[১]

"বৌদ্ধ রাজাদের যুগেও ব্রাহ্মণ্যবাদের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে তেমন কোন শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে উঠেনি বরং ব্রাহ্মণ সমাজের সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠা অক্ষুন্নই ছিল। তাদের চেষ্টায় কঠোর শাস্ত্রীয় অনুশাসনে শূদ্রদের চেয়ে নিচ আরও একটি অন্তজ শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছিল। এরা হলো কাপালিক, যোগী, চন্ডাল, শবর, ডোম

১। রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৬-৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

মালগ্রাহী, কুড়ব, বড়ুয়, বাউরী, তক্ষণকার, চর্মকার, ঘটজীবী (পাটনা), ডোলাবাহী (শিবিকা বাহক), মল্ল, যুরুম, পুলিন্ড, থস, খর, কাম্বাজ, সুত্র, কর্মকার, শৌণ্ডিক, ব্যাধ, তাঁতী, ধুনুরী, ঋষি, ঝাড়ুদার, মলবাহী (মেথর), মাহুত, নটনটী ইত্যাদি। এদেরকে শূদ্রের চেয়েও নিকৃষ্ট মনে করা হত। সমাজ জীবনে তাদের কোন প্রতিষ্ঠাতো ছিলই না বরং তাদের মানুষই মনে করা হত না। তাদের জীবন ছিল পশুর চেয়েও অধম। এই চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর অর্থাৎ শূদ্র ও তার নিচের শ্রেণীর লোকেরা লোকালয়ের বাইরে হীন জীবন যাপন করতে বাধ্য হত। কোনক্রমে পথ অতিক্রমকালে অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজের অজ্ঞাতসারেও যদি শাস্ত্র বাণী শুনে ফেলত, তবে তাদের কর্ণ কুহরে গলিত সীসা ঢেলে দিয়ে শাস্তি দেয়ার ব্যবস্থা ছিল। বৈদিক বা সংস্কৃত ভাষায় শাস্ত্র আলোচনা তো দূরের কথা বর্ণিত 'দেশী ভাষায়' শাস্ত্র বাণী শোনা বা বলা দুই-ই ছিল নিষিদ্ধ। বিধান ছিল-

"অষ্টাদশ পূরাণাকি রামণ্য চরিতানিব
ভাষারং মানবাশ্রুত্বা বৌরবং নরকং ব্রজেৎ"

অর্থাৎ "লৌকিক ভাষায় অষ্টাদশ পুরাণ ও রাম চরিত ইত্যাদি যে মানব শুনবে তার ব্যবস্থা বৌরব নরকে"।[১]

আর্য ব্রাহ্মণ সমাজে বিধবা বিবাহের প্রচলন ছিল না, তবে সহমরণ প্রথা বিদ্যমান ছিল। ধন সম্পত্তিতে তাদের আইনগত কোন অধিকার ছিল না।

"বাংলার প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে সত্য, শৌচ, দয়া, দান প্রভৃতি সর্ববিধ গুণের মহিমাকীর্তন এবং ব্রহ্মহত্যা, মদ্যপান, চৌর্যবৃত্তি, ব্যভিচার ইত্যাদি কঠিন পাপ বলে গণ্য হয়েছে। এতদসত্ত্বেও সমাজে দুর্নীতি এবং অশ্লীলতা প্রচলিত ছিল। বিত্তবানদের কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য দাস-দাসী প্রথা প্রচলিত ছিল। নিহার রঞ্জনের ভাষায়, "গৌড়ের যুবক-যুবতীদের কামলীলার কথা ও গৌড় বঙ্গের রাজ অন্তঃপুরের মহিলারা যে নির্লজ্জভাবে ব্রাহ্মণ, রাজ-কর্মচারী ও দাস ভৃত্যদের সঙ্গে কাম ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইতেন তাহার বিবরণ বাৎস্যায়ণই রাখিয়া গিয়াছেন"।[২]

আর্য ধর্ম ছিল তৌহিদবাদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তারা অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, পবন, ব্রহ্ম, শিব, বিষ্ণু প্রভৃতির পূজা করত। স্বাভাবিকভাবে এ পথে পৌত্তলিকতা ও তাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। সাধারণতঃ হোম, যাগযজ্ঞ ও বলিদানের মাধ্যমে তাদের এ সব পূজানুষ্ঠান সম্পন্ন হত। গুপ্ত যুগে বাংলায় তান্ত্রিক মতবাদ ব্রাহ্মণ্য

১। শাশ্বত ভ্রাতৃত্ব সংকলন -৯১, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২-৩৩।

২। উদ্ধৃতঃ কে, আলী,অধ্যাপক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মের ব্যাপক প্রচলন হয়। এ যুগের তাম্র শাসনে বহু পৌরাণিক দেবদেবী ও তৎসংক্রান্ত আখ্যান পাওয়া যায়। বর্ম ও সেন রাজাগণ ছিলেন বৈষ্ণব ও শৈব ধর্মাবলম্বী। এ দু'টি ধর্ম ছিল পৌরাণিক হিন্দু ধর্মের শাখা। অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বাংলায় বৈষ্ণব ধর্মের যথেষ্ট প্রসার ঘটে। বিজয় সেন ও বল্লাল সেন ছিলেন শৈব। লক্ষণ সেন নিজেকে পরম বৈষ্ণব বলে প্রচার করেন। সেন রাজাগণ পৌরাণিক দেবতাদের পূজার ব্যবস্থা ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। সেন যুগে বিষ্ণু, শিব, পার্বতী প্রভৃতি দেব- দেবীর পূজা শুরু হয়। ফলে বহু মন্দির নির্মিত হয়।

বাংলায় সৌর সম্প্রদায়েরও অস্তিত্ব ছিল। বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেন সূর্য পূজারী ছিলেন। সে সময়ে মহাশক্তির পাদমূলে নরবলির প্রথাও প্রচলিত ছিল। নিষ্ঠাবান আর্য হিন্দুগণ ভক্তিসহকারে প্রত্যেহ নারায়ণশিলা ও শিবপূজা, শরৎকালে দুর্গাপূজা এবং বিভিন্ন সময়ে সূর্য, শিব, মহেশ্বর, শ্যামা, কালী, চন্ডি, কার্তিক, গনেশ, লক্ষী, সরস্বতী প্রভৃতি দেব-দেবীর উপাসনা ও পূজা করত। এ ধারা বর্তমানেও অব্যাহত রয়েছে।

আর্য প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশের ও সমাজের এক বিরাট এলাকা জুড়ে এ ভাবে জনমানুষের উপর নিগ্রহ চলতে থাকে। আর্যরা এ দেশে উপনিবেশ স্থাপন করেছে। কিন্তু এ দেশবাসীকে কখনও আপন করে নিতে পারে নি। আর্য ব্রাহ্মণরা পার্থিব স্বার্থে ধর্ম শাস্ত্রে পৌত্তলিক পূজা অর্চনাদির সাথে এ দেশবাসীর বিরুদ্ধে কঠোর অনুশাসনাদি প্রবর্তন করেন। বৈদিক মতবাদেও ব্রাহ্মণ্য আচারে মুষ্টিমেয় উচ্চকোটির সৌভাগ্যের পথ সুগম করে। কিন্তু এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর জীবনে বয়ে আনে নৈরাশ্য এবং বাড়িয়ে তোলে নিগ্রহ।

এ সময় নির্বাণ বা 'মুক্তির' বাণী নিয়ে আবির্ভূত হন গৌতম বুদ্ধ [১](খৃঃ পূঃ ৫৬৩-৪৮৩)। হিংসা বিদ্বেষ বিবর্জিত কলুষমুক্ত জীবনের বিধান দিয়ে বৌদ্ধ মতবাদ মানুষকে কর্মবিমুখ জীবনের নির্লিপ্ত অভিলাষায় মোহগ্রস্ত করে বঞ্চনা ও লাঞ্ছনা থেকে নিষ্কৃতি দেয়ার প্রয়াস পায়। বৈদিক শাক্ত ও শৈব জন্মান্তরবাদ থেকে অহিংসে জন্মান্তরবাদে উত্তীর্ণ করায় আর্যবোধ ও বোধী মায়ায় পর্যবসিত হয়।

১। <u>গৌতমবুদ্ধ খৃঃ পূর্ব- ৫৬৩-৪৮৩)</u>ঃ গৌতম বুদ্ধ ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক ও প্রচারক। খ্রীষ্ট পূর্ব ৫৬৩ অব্দে তিনি হিমালয়ের পাদদেশে কপিলা বস্তু নগরে এক রাজপরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রাজা শুদ্ধোধন। মাতার নাম মায়াদেবী। তিনি ঊনিশ বছর বয়সে যশোধরা নাম্নী এক অনিন্দ্য সুন্দরী মহিলাকে বিয়ে করে সংসার ধর্ম পালন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রায় একই সময়ে এ উপমহাদেশে উদ্ভূত হয় মহাবীর ১ (খৃঃ পূঃ ৫৯৯-৫২৭) প্রবর্তিত জৈন মতবাদ। বস্তুতঃ এ দু'টি মতবাদ একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। কেননা, জৈন ধর্মের মূল শিক্ষা হচ্ছে অহিংসা পরম ধর্ম। এ অহিংসা মানুষ জীব জন্তু, পক্ষী, উদ্ভিদ সবার প্রতি সমানভাবে প্রযুক্ত হবে। বৌদ্ধধর্মের শিক্ষা হচ্ছে অহিংসা, দয়া, দান, সৎচিন্তা, সংযম, সত্যভাষণ, সৎকার্য সাধন, স্রষ্টাতে আত্মসমর্পণ প্রভৃতি মানুষের মুক্তি লাভের প্রধান উপায়। যাগযজ্ঞ ও পশুবলী দিয়ে ধর্ম পালন করা যায় না। ধর্ম পালন করতে হলে ষড়রিপুকে বশ করে আত্মাকে নিষ্কলুষ করতে হবে।

বিয়ের দশ বছর পর অর্থাৎ ২৯ বছর বয়সে তাঁর একটি পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। তার নাম রাহুল। কিন্তু সুন্দরী স্ত্রী ও গৃহ সংসারের আরাম আয়েশ তার অস্থির চিত্তকে শান্তি দিতে পারেনি। মানুষ ও স্রষ্টার অস্তিত্বের গুঢ় রহস্যের দ্বারোদ্‌ঘাটনে তিনি একদা গভীর রাতে সংসারের মায়া ত্যাগ করে গৃহ ত্যাগ করেন। বহু ব্রাহ্মণ ও পন্ডিতের সাথে তিনি সাক্ষাত করে ধর্ম ও শাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করেন কিন্তু ব্রাহ্মণ ধর্ম ও দর্শন তাঁকে তৃপ্তি সাধনে সক্ষম হয়নি। অবশেষে ছয় বছরের কঠোর সাধানার পর চল্লিশ বছর বয়সে তিনি সত্যের সন্ধান লাভ করেন। পরবর্তী চল্লিশ বছর সত্য ধর্ম প্রচারের পর আশি বছর বয়সে খৃষ্টপূর্ব ৪৮৩ অব্দে কুশি নগরে তিনি দেহত্যাগ করেন।

তিনি দীর্ঘ দিন মধ্যপ্রদেশ (আগ্রা ও অযোধ্যায় সংযুক্ত প্রদেশ) সফর করেন। এ সফরের মধ্যে দেশের একটি বিরাট প্রভাবশালী ও বিত্তশালী দল তাঁর সত্য ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে। তাঁর নিজের সমগ্র পরিবার ও গোত্র তাঁর ধর্ম গ্রহণ করে। দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে তাঁর ধর্ম বিপুল সাড়া জাগায়। কিছু কালের মধ্যেই তাঁর ধর্ম ভারতের প্রধানতম ধর্মে পরিণত হয়। এশিয়ার বিভিন্ন জাতির নিকটও তা সমাদৃত হয়।

১। <u>মহাবীর (খৃঃ পূঃ ৫৯৯-৫২৭)ঃ</u> জৈন ধর্মের প্রবর্তক ও প্রচারক বর্ধমান মহাবীর খৃষ্ট পূর্ব ৫৯৯ অব্দে এক ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বিয়ে করে ২৮ বছর পর্যন্ত তিনি সংসার ধর্ম পালন করেন। তাঁর এক কন্যা সন্তানও জন্মে কিন্তু ২৮ বছর বয়ঃ ক্রমকালে মানবতার দুর্দশা দূরীকরণার্থে তিনি গৃহ ত্যাগ করে সত্যের সন্ধানে বনে জঙ্গলে কৃচ্ছতা সাধনে ব্রতী হন। একাদিক্রমে চৌদ্দ বছর ধ্যান, তপস্যা ও কৃচ্ছতা সাধনের পর তিনি সত্যের সন্ধান লাভ করেন। অতঃপর তিনি এই নতুন ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। দীর্ঘ ৩০ বছর ধর্ম প্রচারের পর খৃষ্টপূর্ব ৫২৭ অব্দে বিহারে বাওয়াপুরী নামক স্থানে তিনি দেহ ত্যাগ করেন। তাঁর প্রচারিত ধর্মের মূল শিক্ষা হচ্ছে, অহিংসা পরম ধর্ম। এ অহিংসা মানুষ, জীবজন্তু, পক্ষী, উদ্ভিদ সবার প্রতি সমান ভাবে প্রযোজ্য হবে। পরবর্তীকালে এ অহিংসা হিন্দু ধর্মেরও অংশে পরিণত হয় এবং ধীরে ধীরে জৈনধর্ম হিন্দু ধর্মের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

এ উভয় ধর্মই আর্যদের ধর্মীয় গ্রন্থ বেদকে ঐশী গ্রন্থ হিসাবে স্বীকার করে না। তপস্যা, যাগযজ্ঞ ও পশুবলীকে অর্থহীন গণ্য করে। ব্রাহ্মণদের পবিত্রাত্মা ও নরশ্রেষ্ঠ হবার ধারণাকে সমাজ থেকে নির্মূল করে দেয়। ফলে বর্ণাশ্রম ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি নড়ে উঠে। স্বাভাবিকভাবে জনসাধারণ এ ধর্মদ্বয়ের আহবানে বিপুলভাবে সাড়া দেয়। দ্রাবিড় ও অন্যান্য অনার্যরা ছাড়াও বিপুল সংখ্যক আর্যও এ ধর্ম গ্রহণ করে। এ পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য আর্য ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এ ধর্মদ্বয়কে প্রথমে নাস্তিক্যবাদের অন্তর্ভূক্ত করে। তাদের মতে, বেদ বিরোধী মাত্রই নাস্তিক। কাজেই, জৈন ও বৌদ্ধরাও নাস্তিক। অতঃপর উভয় ধর্মীদের নিরিশ্বরবাদ প্রমাণ করার চেষ্টা চলে।

গোঁড়া হিন্দু রাজা শশাঙ্কের আমল থেকে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের উৎখাতের চেষ্টা চলে এবং এ প্রক্রিয়া সেন আমলের (১০৯৬-১২০৪) শেষ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ফলে কালক্রমে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের পরিবর্তন এবং চিন্তা ও বিশ্বাসের বিকৃতি দেখা দেয়। মহাযান, হিনযান ও তন্ত্রযান প্রভৃতিতে রূপান্তরিত হয়। বৌদ্ধদের চিন্তার বিকৃতি দূর করার উদ্দেশ্যে প্রথম মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় 'পাটলীপুত্রে'। কিন্তু এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলেও কিছু দিন পরই বৌদ্ধগণ বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ব্রাহ্মণরাও বৌদ্ধ ধর্মকে আর্য ধর্মের একটি শাখা বলে দাবী করতে থাকে। সম্রাট অশোকের আমল (খৃঃ পূঃ ২৬০-২৩২) পর্যন্ত এ অবস্থা অব্যাহত থাকে।[১]

"কুষাণ সম্রাট কনিস্ক খৃষ্টীয় প্রথম শতকে বৌদ্ধদের সম্প্রদায়গত বিরোধ মেটাতে কাশ্মীরের 'কুন্দলাওয়ালা' নামক স্থানে বৌদ্ধগণের চতুর্থ মহাসম্মেলন আহবান করেন। এ সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী পাঁচ শতাধিক বৌদ্ধ পন্ডিতের মধ্যে অশ্বঘোষ, দারুমিত্র ও নাগার্জুনের নাম উল্লেখযোগ্য। এ সম্মেলনে নাগার্জুন কতকগুলো হিন্দু রীতি-নীতি ও নতুন দেব-দেবী স্বীকার করে নিয়ে যে সংশোধিত ও উদার (আর্য ধর্মের দৃষ্টিতে) বৌদ্ধমতের প্রবর্তন করেন তাই হলো বৌদ্ধধর্মের প্রধান শাখা মহাযান ধর্ম। আর প্রাচীন অর্থাৎ বুদ্ধদেবের প্রচারিত মতে যারা বিশ্বাসবান রইলেন তাঁরা হিনযান সম্প্রদায়ভূক্ত হলেন। একে প্রাচীন বা স্থবির মতও বলে"।[২]

এরপর সুবন্ধু নামক বৌদ্ধমুনি পাতঞ্জল দর্শনের যোগাচার ও মন্ত্রাদি মহাযানের অন্তর্ভূক্ত করে দেন, যার নাম হলো নব মহাযান 'যোগাচার'। এমনিভাবে হিন্দু তান্ত্রিকতা ও হিন্দু দেব-দেবী বৌদ্ধ ধর্মে প্রবিষ্ট হওয়াতে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মে একটা মিলন হয়ে যায় এবং গৌতমবুদ্ধ হিন্দুদের দশ অবতারের অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়েন। ফলে বৌদ্ধ ধর্ম জগতে এক নারকীয় বীভৎসতার সৃষ্টি করে। কর্মবিমুখ,

---

১। কে, এম, পানীক্কর, তারীখে হিন্দ-এ কদীম, পৃঃ ২১-২৩।
২। আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

সংসারবিমুখ অসংগ্রামী কৃচ্ছ্রতা নিষিক্তবলে অতি অল্পকালের মধ্যেই বৌদ্ধ ও জৈন উভয় মতবাদ জীবনমুখী মানুষকে ইহ-পারলৌকিক জীবনের আশ্বাস দিতে ব্যর্থ হয়। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বাড়াবাড়ি এবং বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের নিস্পৃহ নির্লিপ্ততা স্বাভাবিক মনুষ্য জীবন বিরোধী। অস্বাভাবিক এ দুই মেরুকরণ এ উপমহাদেশের গণমানসে সৃষ্টি করেছিল এক অচল স্থবিরতা। যাহোক, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম আর্যহিন্দুদের ষড়যন্ত্রের কবলে পড়ে একদিকে হিন্দু ধর্মের মধ্যে বি লীন হয়ে যাচ্ছিল এবং অন্যদিকে আর্য ব্রাহ্মণ্যবাদীদের অত্যাচার ও নিপীড়নে সারা ভারতের জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম ধীরে ধীরে দ্রাবিড় অধ্যুষিত বাংলায় এসে আশ্রয় নিচ্ছিল। সপ্তম শতকের পর বৌদ্ধ ধর্মই বাংলায় প্রবল হয়। অষ্টম শতকে বাংলায় পাল রাজন্যবর্গের অভ্যুদয়ে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। একাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত এ প্রভাব অব্যাহত থাকে। একাদশ শতকের শেষ ভাগ থেকে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকের প্রথমভাগ পর্যন্ত হিন্দু ধর্ম ও সেন রাজবংশের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্মের উপর প্রচন্ড আঘাত আসে। বৌদ্ধরা নিপীড়িত হতে থাকে।

সেন আমলে ব্রাহ্মণদের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি ও বর্ণপ্রথার কঠোর অনুশাসনে সাধারণ মানুষের নির্যাতন চরমে পৌঁছে। সেই সময় হিন্দু রাজাদের হিংসা ও দমন নীতিতে অতিষ্ট ও বিক্ষুব্ধ জনসাধারণের মনে এক চাপা আক্রোশ ধুমায়িত হয়ে উঠেছিল। ত্রয়োদশ শতকের বৌদ্ধ কবি রামাই পন্ডিত তাঁর 'শূন্যপুরানে'র 'নিরঞ্জনের রুস্মা' কবিতায় দেশব্যাপী ব্রাহ্মণ শাসিত সমাজের জুলুম ও নিস্পেষণের চিত্র এঁকেছেন এভাবে ঃ -

" জাজপুর পুরবাদি সোলসঅ ঘর বেদি
বেদি লয় কেবোল দুর্জ্জন।
দখিন্যা মাগিতে জাঅ জার ঘরে নাহি পাঅ
সাঁপ দিআ পুড়ায় ভুবন ।
মালদহে লাগে কর দিলঅ কন্ন মূন
দখিন্যা মাগিতে জায় জার ঘরে নাঞি পায়
সাঁপ দিয়া পুড়াএ ভুবন।
মালদহে লাগে কর না চিনে আপন পর
জালের নাঞিক দিসপাস।
বলিষ্ট হইল বড় দস বিস হয়্যা জড়
সদ্ধর্ম্মিরে করএ বিনাস।
বেদ করে উচ্চারন বেরয়্যাঅ অগ্নি ঘনে ঘন
দেখিআ সভাই কম্পমান।
মনেত পাইআ মম্ম সভে বোলে রাখ ধম্ম
তোমা বিনা কে করে পরিত্তান।
এইরূপে দ্বিজগন করে সৃষ্টি সংহারন

Dhaka University Institutional Repository

ই বড় হোইল অবিচার ।
বৈকণ্ঠে ডাকিআ ধম্ম মনে ত পাইআ মম্ম
মায়াতে হোইল অন্ধকার ।"১

আধুনিক বাংলায় এর সরলার্থ হলো ঃ

জাজপুরে (উড়িষ্যা) ষোলশ বৈদিক ব্রাহ্মণের বাস । তারা কানে পৈতা তুলে দক্ষিণা চাইতে যায় । যার ঘরে দক্ষিণা পায়না, তার সংসার অভিশাপ দিয়ে পুড়িয়ে দেয় । মালদহে তারা আপন পর না ভেবে কর বসিয়ে দেয়; তাদের জাল, জুয়াচুরীর শেষ নেই । তারা বড় শক্তিশালী হয়ে উঠেছে । দলবেঁধে (দশ-বিশ জড় হয়ে) সদ্ধর্মীকে (বৌদ্ধ জন সাধারণকে) বিনাশ করছে । তারা বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে, তাদের মুখ থেকে ঘন ঘন অগ্নি বের হয়; সকলে দেখে কম্পমান । সকলে মনে মনে এর অর্থ বুঝে বলে; হে ধর্ম দেবতা, রক্ষা করো, তুমি ছাড়া কে (আমাদেরকে এ বিপদ থেকে) উদ্ধার করবে ? ব্রাহ্মণেরা এভাবে সৃষ্টি বিনাশ করতে লাগলো, এ যে বড় অত্যাচার । ধর্ম দেবতা বৈকুণ্ঠে বসে মনে মনে সব বুঝতে পেরে মায়াতে আচ্ছন্ন হলেন ।

এমনিভাবে বঙ্গে মুসলিম আগমনের প্রাক্কালে সমাজের সর্বস্তরে অবক্ষয় নেমে আসে এবং আত্মবিপ্লব চলতে থাকে । সাধারণ লোকের চিন্তা ভাবনা সমাজের উচ্চস্তরের ব্রাহ্মণদের স্পর্শ করতে পারত না । সমাজে শূদ্র ও অন্তজ শ্রেণীর মানবগোষ্ঠী সবরকম সুযোগ সুবিধা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে থাকে । এভাবে উচ্চ শ্রেণী ও নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে এক দুর্লঙ্ঘ বাধার প্রাচীর গড়ে উঠে । সমাজের ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের কাছে অপাংক্তেয়রা নিগ্রহ ছাড়া আর কিছুই পায়নি । এ সময়েই তাদের কাছে নতুন জীবন দর্শন ও ধর্মবোধ মানবতার আদর্শ নিয়ে আসে ইসলাম । অস্পৃশ্যতা ভেদ বৈষম্য জর্জরিত এবং পুরোহিততন্ত্রের নিগড়ে আবদ্ধ জনগণের কাছে সূফীয়া-ই-কিরাম আল্লাহর একত্ব ও মানবতার মুক্তিরবাণী প্রচার করেন । এ দেশের হিন্দু, বৌদ্ধ জনসাধারণ সুফীদের কাছে এক সহজ সরল ও অনাড়ম্বর জীবনাচরণের আদর্শ প্রত্যক্ষ করে । এ সকল সাধকের সততা, নিষ্ঠা, ইহজাগতিক নির্লিপ্ততা ও অকৃত্রিম মানব প্রেম এদেশের শান্তিকামী মানুষের হৃদয় সহজেই জয় করে ।

---

১ । রামাই পন্ডিত, শূন্য পুরান , বসুমতি সাহিত্য মন্দির কলিকাতা, ১৩৩৬ বাংলা, পৃঃ ২৩২-৩৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব

মানবতার কল্যাণকামী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ছিলেন ইসলামের সর্বশেষ প্রচারক ও ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির শেষ শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠাতা। চল্লিশ বছর বয়সে নবুয়াত প্রাপ্তির পর ২৩ বছর ধরে তিনি সমগ্র বিশ্বমানবতাকে অন্ধকার,অজ্ঞানতা ও পংকিলতা মুক্ত করার জন্য ইসলাম প্রচার করেন এবং শেষ দশ বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে মদীনায় একটি আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। মানুষকে আল্লাহর নির্ধারিত পথে পরিচালনা করে মানুষের কর্তব্য সম্বন্ধে দিক-নির্দেশনা প্রদান করে যান। তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর সুশিক্ষিত সাহাবীগণ ইসলামের জীবন বিধান ও সমাজ ব্যবস্থার বাণী নিয়ে বিশ্বের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েন।

বাংলাদেশে ইসলামের আগমন কখন, কিভাবে ঘটেছে তা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। তবে অব্যাহত গবেষণার ফলে হয়তো তা জানা যাবে। পূর্বে বাংলাদেশ ভারতীয় উপমহাদেশের একটি এলাকা ছিল। তাই এ দেশে ইসলামের আগমন সম্পর্কে জানতে হলে ভারতীয় উপমহাদেশে কখন ও কিভাবে ইসলামের আগমন ঘটেছে তা জানতে হবে। কারণ, তৎকালে ভারতে ইসলাম প্রচারের মাধ্যমেই বঙ্গ দেশে ইসলাম প্রচারিত হয় এবং পরবর্তীতে তা চীন পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

সুদূর অতীতকাল থেকেই আরবগণ ব্যবসা বাণিজ্যে পারদর্শী ছিল বিধায় উল্লেখিত সময়েও তারা ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নত ছিল। শেষ নবী (সঃ) এর প্রবর্তিত ইসলাম প্রচারের প্রথম দিকে আরব মুসলিম বণিকগণও ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব পালন করেন। ফলে, ইসলামের বাণী পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর উপকূল থেকে পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। বিজয়ী মুসলিম শাসকদের ভূমিকা এ ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও পরিদৃষ্ট হলেও ইসলামের ধারক ও বাহক সাহাবা ও সূফীয়া-ই-কিরামের মাধ্যমেই মূলতঃ ইসলাম প্রচারিত হয়। সমগ্র দক্ষিণ পূর্ব এশীয়দেশ বিশেষ করে ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ, সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও, ফিলিপাইন, সেবিলিশ, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ এমনকি চীন দেশে পর্যন্ত এসব সূফী সাধক ও বণিকের মাধ্যমেই ইসলামের একত্ববাদ প্রচারিত হয়।[১]

১। বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩ইং, ডঃ কাজী দীন মুহাম্মদ, বাংলায় ইসলাম প্রবন্ধ, পৃঃ, ১৭৬; আব্দুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশে ইসলাম, আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮০ইং, পৃঃ ৫৩-৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত চার'শ বছর ভারতীয় উপ-মহাদেশে ইসলাম প্রচারের বিস্তারিত কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। আরব দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার পূর্বে অর্থাৎ হযরত মুহম্মদ (সঃ) এর জন্মের পূর্বে এবং পরে সপ্তম শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্যন্ত এ দেশে আরব বণিকরা এসেছিলেন বলে কোন সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে "এমন কিছু প্রমাণাদি পাওয়া যায়,যাতে পরিস্কার বুঝাযায় যে ইসলাম পূর্ব যুগে বংগ দেশের সাথে আরবদের ব্যবসায় ছিল এবং প্রথম হিযরী শতাব্দীর অর্থাৎ ঈসায়ী ৭ম শতাব্দীর মধ্যেই তদানীন্তন হিন্দ্ তথা বাংলাদেশের সাথে আরব মুসলমানদের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে এবং এদেশে ইসলামের আলো পৌঁসেছে"।[১] নবী করীম (সঃ) এর হাদীস "উতলুবুল ইলমা ওয়া লাউ কানা ফীচ্ছিন" অর্থাৎ 'জ্ঞান অর্জন কর প্রয়োজনে চীন দেশে গিয়ে হলেও' এর মাধ্যমে জানা যায় যে, তাঁর জন্মের আগেও চীন দেশের সাথে আরব দেশের যোগাযোগ ছিল। আর এ যোগাযোগের কারণে ভারতের বিভিন্ন স্থানে এবং তৎকালীন বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে তাদের বাণিজ্য জাহাজ ভিড়ত বলে জানা যায়।[২]

মরু আরবে কৃষিযোগ্য জমির অভাব থাকায় এতদঞ্চলের জনগণ বরাবরই বাণিজ্যিক মনোভাবাপন্ন ছিল। আর বাণিজ্যের কারণেই তারা সমুদ্রবিহারী ছিল। বিশ্বের দেশে দেশে তারা পালতোলা জাহাজে পণ্য নিয়ে ঘুরে বেড়াত। তাদের এই জীবনধারা এ উপ-মহাদেশেও এসে থেমেছে এটা সহজেই অনুমেয়।

আর্য আগমন পূর্বকালে বাংলাদেশ এক উন্নত ও বিশিষ্ট সভ্যতার অধিকারী ছিল। ইতিহাসে সেকালের বাংলাদেশের মানবগোষ্ঠীকে অস্ট্রো-এশিয়াটিক অথবা অষ্ট্রিক নামে অভিহিত করা হত। কারো কারো মতে, এদের পরিচয় ছিল 'নিষাদ' জাতি বলে। রামায়ণে নিষাদ জাতিকে প্রাচীন অনার্য জাতি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ঋগবেদেও বলা হয়েছে, 'নিষাদ' বাংলার প্রাচীন জাতি।

"নব্য প্রস্তর যুগের লোক হলেও তারা (নিষাদ বাংলার প্রাচীন জাতি) ক্রমে তাম্র ও লৌহের ব্যবহার শিক্ষা করে। এরা প্রধানতঃ কৃষি কার্য দ্বারা জীবন ধারণ করত ও গ্রামে বাস করত। সমতল ভূমিতে ও পাহাড়ের গায়ে স্তরে স্তরে ধান উৎপাদন

১। ডঃ আ,ন,ম রইছউদ্দীন, বাংলাদেশ ইসলামের আবির্ভাব, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, সাতাশবর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৯৮৭ইং, পৃষ্ঠাঃ ১৬৭।

২। ডঃ কাজী দীন মুহাম্মদ, বাংলাদেশে ইসলাম, বাংলাদেশ-সৌদি আরব শাশ্বত ভ্রাতৃত্ব প্রকাশনা, বাংলাদেশ-সৌদী আরব ভ্রাতৃ সমিতি, ১৯৯১ইং, পৃঃ ৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

প্রণালী তারাই উদ্ভাবন করে। পান, সুপারী, কলা, লাউ, বেগুন, নারিকেল এবং সম্ভবতঃ আদা ও হলুদের চাষও করত। কুড়ি হিসেবে গণনা করা এবং চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে তিথি দ্বারা দিন রাত্রির মাস তারাই এ দেশে প্রচার করে"।[১]

একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এক ধরনের খাবারে (মান্না-সালওয়া) মানুষের পরিতৃপ্তি হত না বলে মানুষ আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানানোর ফলে আল্লাহ তাদের রকমারী সুস্বাদু খাদ্যের সন্ধান দেন,"আর তোমরা যখন বললে, হে মুসা! আমরা একই ধরনের খাদ্যে ধৈর্য ধারন করবনা। কাজেই তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট প্রার্থনা কর, তিনি যেন আমাদের জন্যে এমন বস্তু-সামগ্রী দান করেন, যা জমিতে উৎপন্ন হয়, তরকারী, কাকড়ী, গম, মশুরী, পেয়াজ প্রভৃতি। মূসা (আঃ) বললেন, তোমরা কি এমন বস্তু নিতে চাও যা নিকৃষ্ট, সে বস্তুর পরিবর্তে যা উত্তম ? তোমরা কোন নগরীতে উপনীত হও, তাহলেই পাবে, যা তোমরা কামনা করছ"।[২]

এটা হযরত মূসা (আঃ) এর নবুয়াত কালের একটি প্রাচীন ঘটনা। যেহেতু প্রাচীন নিষাদ জাতি খাদ্যকে সুস্বাদু করার নানা উপকরণের চাষ জানত, তাই স্বাভাবিকভাবেই অনুমান করা যায় যে এরা নিশ্চয়ই ঐশী হেদায়াতপ্রাপ্ত কোন জাতিরই উত্তরাধীকারী। চন্দ্রমাস আরবদের বৎসরের হিসাব মান। মহানবী (সঃ) এর আবির্ভাব পূর্বকাল থেকেই এটা প্রচলিত ছিল। প্রাচীন অস্ট্রিক জাতির চান্দ্রমাসের হিসাব করার পারদর্শিতা দেখে উপলব্ধি করা যায় যে কোন সুদূর অতীতে আরবদের সাথে অস্ট্রিক জনগোষ্ঠীর নৃ-তাত্ত্বিক যোগ ছিল।

হযরত নুহ (আঃ) এর এক পুত্রের নাম ছিল সাম। তাঁর নাম অনুসারে আরবদেরকে সেমেটিক বলা হয়। এদের হাতেই আবাদ হয়েছিল তাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিস নদীর অববাহিকায় ব্যাবিলনীয় আসেরীয় প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যতা। আর তাদের আদি পিতা হলেন হযরত আদম (আঃ)। বঙ্গোপসাগরের কুল ঘেষে যে সবুজ সমতল জঙ্গলাকীর্ণ জনবসতি গড়ে উঠেছিল, তাও ছিল মূলতঃ আরবীয় সেমেটিক গোষ্ঠীর উত্তর পুরুষ। সে কারণে প্রাচীনকাল থেকেই আরবদের সাথে বঙ্গ জনগোষ্ঠীর একটি আত্মি ক যোগাযোগ ছিল।

মুফাখখারুল ইসলামের লেখায় এ কথারই সুস্পষ্ট স্বীকৃতি পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন, 'আদি মানব' আদি নবী হযরত আদম আলাইহিস সালাম হিন্দ ভূমির

১। বাংলা বিশ্বকোষ,কলিকাতা,পৃঃ ৩১৪।

২। আল কুরআন , সুরা-২, আয়াত-৬১।

Dhaka University Institutional Repository

দক্ষিণাংশের সরন্দীপ থেকে উঠে গিয়ে আরবের পাহাড় বেষ্টিত নিরাপদ 'বালাদিল আমীন' মক্কা শহরেই বসতি স্থাপন করেছিলেন এবং সেখান থেকেই যে তাঁর আওলাদ আদম জাতি দুনিয়ার নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে, গবেষণাকালে সেটুকু একেবারে বিস্মৃত না হলেই বোধ হয় তাদের প্রচেষ্টা সত্যের সূত্রে সহজে উপনীত হতে পারবে। বিস্মৃত প্রাগৈতিহাসিককাল থেকেই আরবদের হাতে দুনিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য মধ্য যুগের শেষ ভাগ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত হওয়ার কথা জানা যায়। তাতে মনে হয় আরবরা দুনিয়ার নানা দিকে ছড়িয়ে পড়া তাদেরই শরীক শরাকতের খোঁজ-খবর করতে গিয়ে ব্যবসা তিজারত ও তাহজীব-তমুদ্দুনের আদান-প্রদান ও আমদানী-রপ্তানী বজায় রেখে আসছিল"।[১]

প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই আরবরা তাদের আদি পিতার অবতরণ স্থান এই উপ-মহাদেশে যাতায়াত করে আসছে। এমনকি এই উপ-মহাদেশের নামটি পর্যন্ত আরবদের দেয়া। পারসিকরা এ মহাদেশের একটি প্রদেশ জয় করার পর সিন্ধু নাম অনুসারে সমগ্র দেশ 'হিন্দ' নামে কথিত হতে থাকে।[২] "পারসিকগণ অপেক্ষা আরবগণ এ উপ-মহাদেশের সাথে অধিকতর ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন বলে তাঁরা সিন্ধুকে সিন্ধ নামেই অভিহিত করতে থাকেন এবং সিন্ধের বহির্ভূত ভূ-ভাগকে হিন্দ বলে আখ্যায়িত করেন"।[৩] ঐতিহাসিক এলফিন্স্টোন বলেছেন যে, "হযরত ইউসুফ (আঃ) - এর আমল থেকেই এ উপমহাদেশের সাথে আরবদের চমৎকার বাণিজ্যিক সম্পর্ক চালু ছিল।"[৪]

জেমস্ টেইলর এর মতে, হযরত ঈসা (আঃ)- এর জন্মের কয়েক হাজার বছর পূর্ব থেকে যে দক্ষিণ আরবের সাবা সম্প্রদায়ের লোকেরা এ উপ-মহাদেশের পূর্বোত্তর এলাকায় পালতোলা জাহাজে করে আসত, তার নিদর্শন তাদের প্রতিষ্ঠিত সাভার বন্দরের নামে রয়েছে। এর দ্বারা তাদের আগমন, বসতি স্থাপন প্রমাণ করে। "সাবাদের 'উর' নগর সাবাউর। এখন সাবাউরের উচ্চারণ সাভার"।[৫] এই সাবা

১। মুফাখখারুল ইসলাম,উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারের প্রথম পর্ব, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, পৃঃ ৭১২।

২। মওলানা আবদুল্লাহিল কাফী আলকোরায়শী সম্পাদিত পাবনা থেকে প্রকাশিত মাসিক তরজুমানুল হাদীস প্রথম বর্ষ দশম সংখ্যায় প্রবন্ধ হিন্দে ইসলামের আবির্ভাব, পৃঃ ৪৩২।

৩। Elphinstone, History of India.

৫। James Tailor, Remarks on the sequel to peripulus of the Erithrean sea, Journal of the Asiatic Society of Bengal, vol. 16. 1847-p.76.

Dhaka University Institutional Repository

কওমের নামে আল কুরআনে একটি সূরা রয়েছে। আরবের দজলা ফোরাতের বসরা নগরী সান্নিধানে মিলিত হওয়ার মত সাভারের সামান্য উত্তর ভাগে দু'টি প্রাচীন গংগা ধারা মিলিত হয়েছে। একটির নাম কাঁকিলা জানি। আরবরা গংগাকে কাঙ্ক (কান্‌ক) বলত। আরবী শব্দ ইলার অর্থ প্রাণপ্রিয় বা আরাধ্য। কাঙ্ক নদী যেখানে আরাধ্যরূপে পূজা পেয়ে থাকে সেখানকার নদ্যাংশের নাম কাংকাইলা বা কাঁকিলা জানি। ১

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক কে, এ, নিজামী লিখেছেন যে, "হযরত মুহাম্মদ (সঃ)- এর আবির্ভাবের আগেই ভারত ও আরব উভয় অঞ্চলে পরস্পরের উপনিবেশ বা বসতি গড়ে উঠেছিল। দুই অঞ্চলের মধ্যে বাণিজ্যিক সংযোগ থেকে সাংস্কৃতিক সম্পর্কের বিকাশ ঘটেছে। এ যোগাযোগ ও সম্পর্কের কারণেই হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ভারতীয় এলাকা থেকে সুগন্ধি দ্রব্য পেয়েছিলেন এবং একজন ভারতীয় রাজা তাঁকে আচার পাঠিয়েছেন বলেও জানা যায়"।২

মাওলানা মিনহাজুদ্দীন সিরাজ ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এ উপমহাদেশের ইতিহাস রচনা করেন। তিনি বররিন্দ লিখেছেন, 'উত্তর বাংলা' বুঝাতে ।৩ সংস্কৃত পন্ডিতরা একে 'বরেন্দ্র' করতে চেয়েছেন বটে, তবে আরবরা যে বররিন্দ বা বরহিন্দ-এর নাম রেখেছিলেন তা সহজেই অনুমেয়। হিন্দু দেবতা ইন্দ্রের বর হিসাবে যদি এরনাম হয়, তবে তা ইন্দ্র-বর হবে, বরেন্দ্র হবে কেন ? আসলে বিশাল সাগর মহাসাগরে আরবরা জাহাজে ভাসতে ভাসতে দূর থেকে যখনই এই লাল মাটিভূমি লক্ষ্য করত তখন 'বররিহিন্দ' 'বররিহিন্দ' বলে চিৎকার করে উঠত। সে থেকেই এ নাম প্রসিদ্ধি লাভ করে। আরবী বররি শব্দের অর্থ স্থলভাগ। ঢাকা-টাংগাইলে স্থলভাগকে এখনো ভড় বলে। এই ভড় আরবী 'বরর' শব্দেরই একটি রূপ। আরবী 'বরর' শব্দ থেকে হিন্দের 'বরর' শব্দের উৎপত্তি। আর হিন্দের 'বরর' শব্দ থেকেই 'ভড়' শব্দের উদ্ভব।৪ বররি হিন্দের সুন্দর মাটি আরবদের পছন্দনীয় ছিল। তাই তারা বরহিন্দের মাটিকে খিয়ার বা পছন্দনীয় বলত, তাই বররিহিন্দের মাটিকে লোকেরা এখনো খিয়ার বলে থাকে।

ভৈরব জায়গাটির নামটিও আরবদের দেয়া। ভৈরব নামে একটি নদী ও একটি বন্দর এখনও আছে। এ নাম দু'টি আরবীয় শব্দ 'বহর-ই-আব' থেকে এসেছে।

১। মুফাখখারুল ইসলাম, প্রত্নময় উত্তর টাঙ্গাইল ইতিহাস, (বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ সম্পাদিত) একাদশ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, শ্রাবণ-চৈত্র, ১৩৮৪, পৃঃ ৬৯ ও ৯৮।

২। কে,এ, নিজামী, মুহাম্মদ যাকী সম্পাদিত Arab accounts of India গ্রন্থের ভূমিকা।

৩। মুফাখখারুল ইসলাম, উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারের প্রথম পর্ব, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭১৩।

৪। মুফাখখারুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃঃ৭১৪।

Dhaka University Institutional Repository

এর অর্থ হয় জলধী। 'বহর' শব্দের অর্থ সাগর এবং 'আব' শব্দের অর্থ পানি অর্থাৎ 'বহর-ই-আব' শব্দের অর্থ পানির সাগর। সাগরের সঙ্গে গংগার সংযোগ ছিল বলে নদীর নাম হয়েছে পানির সাগর। লোহিত সাগরের সঙ্গে মোমেনশাহী জেলার নাসিরাবাদের পূর্ব দক্ষিণে তৎকালে যেখানে পানির সাগর আসা যাওয়া করেছে সেখানকার বন্দর ও 'বহর-ই-আব' বন্দররূপে খ্যাত হয়েছে। [১]

দক্ষিণ পূর্ব ঢাকা জেলার ওয়ারী বটেশ্বর নামক স্থানে একটি সুপ্রাচীন সভ্যতার বিস্তৃত নিদর্শন রয়েছে। সেখানে একটি সুবিস্তৃত টিবির উপর একটি কবরাকৃতি স্থলকে হযরত সুলায়মান নবীর কবর বলে লোকেরা মনে করে। হানিফ পাঠান ও তার পুত্র হাবীবুল্লাহ পাঠান নামক দুই স্কুল শিক্ষক সেখানকার প্রত্ন সম্পদ পাহারা দিচ্ছেন। হয়তো এখানে কোন আরবের কবর হয়েছিল। [২]

ময়মনসিংহের নাসিরাবাদের ১০/১৫ মাইল দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিম তীরে অবস্থিত চেক বন্দর এর নামটাও আরবদের দেয়া এবং বন্দরটি তাদেরই প্রতিষ্ঠিত বলে অনুমান করা হয়। কারণ, ইদ্রিসী, সুলায়মান প্রমূখ আরব ভৌগোলিকগণ 'তওক' বলেই এর উল্লেখ করেছেন। আরবীতে গলার হারকে বলা হয় 'তওক'। লক্ষণসেনের ভাওয়াল তাম্র শাসনোক্ত বানহার নদী বর্তমানে 'বানার' নামে পরিচিত। এ স্থানেই হার বা তওকের মত বেকে গিয়ে ব্রহ্মপুত্রের কণ্ঠ লগ্ন হয়েছে বলে আরবদের দ্বারা তখনকার এ পোতাশ্রয়টি 'তওক' নামে প্রসিদ্ধ হয়।[৩] গারো পাহাড়ের সদর হচ্ছে তুরা। সেকালে গংগা সাগর ও লৌহিত সাগর গারো পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। জাহাজ থেকে গারো পাহাড়ের কুলে নেমে আরবেরা ছোট ছোট গন্ডগিরি ঘেরা এই শহরটিরও পত্তন করে বলে মনে করা হয়। কুরআন মজীদে এ 'তুর' নামে একটি সূরা রয়েছে। হযরত মুসা (আঃ) যে পাহাড়ে আল্লাহর সংগে কথা বলার সুযোগ পেতেন তার নাম ছিল 'তুর-ই-সিনীন' বা তুরসীনা। আর 'তুর' শব্দের অর্থ গন্ডগিরি। কয়েকটি গন্ডগিরির সমাহার আরবী বহুবচন তুরাহ্ বা তুরা।

ভৌগোলিক আরব সওদাগর সুলায়মানের আরবদের নৌ বিহার এর বিবরণে 'সালাহাত' ও 'কামরূপের' নাম পাওয়া যায়। [৪] 'সালাহাত' হল আরবদের দেয়া

১। মুফাখ্খারুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭১৫।
২। মুফাখ্খারুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭১৫।
৩। মুফাখ্খারুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯২।
৪। Travels of marchant sulayman (paris) p-3. সায়্যেদ সুলায়মান নদভীর আরব ওয়া হিন্দ কি তায়াল্লুকাত (এলাহাবাদ) গ্রন্থে উল্লেখিত।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান সিলেটের আদি নাম। আরবী শব্দ সালাহাত শব্দের অর্থ সদনুষ্ঠান। আরব বণিকরা এখানে নেমে কি সদনুষ্ঠান করেছিল তা অবশ্য জানা যায় না। তবে নামটিতে এখনো তাদের স্মৃতি আছে। ইবনে খুরদাবা (মৃতঃ ৩০০ হিঃ) তাঁর 'আল মাসালিক ওয়াল মামালিক' গ্রন্থে বলেন যে, "কামরূত (কামরূপ) থেকে সমন্দরে চন্দন কাঠ মিষ্টি পানির মাধ্যমে (নদী পথে) পনের বিশ দিনের মধ্যে আনিত হয়" ।১

আল ইদ্রিসী (মৃঃ ৫৪৯ হিঃ) তাঁর 'নুযহাতুল মুশতাক' গ্রন্থে বলেন, "সমন্দর একটি বড় শহর, বাণিজ্যকেন্দ্র ও সমৃদ্ধশালী স্থান। এখানে ব্যবসা-বাণিজ্য করে অনেক লাভবান হওয়া যায়। এই বন্দর কণৌজের অধীন। এটা এমন এক নদীর তীরে অবস্থিত যা কাশ্মীর দেশ থেকে উদ্ভূত। এখানে চাউল ও অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী বিশেষ করে গম পাওয়া যায়। পনের দিনের দূরত্বে অবস্থিত কামরূত (কামরূপ) থেকে এখানে চন্দন কাঠ এমন নদী পথে আনা হয় যার পানি সুমিষ্টি। এ শহরের (সমন্দর) একদিনের দূরত্বে একটি দ্বীপ আছে যেখানে অনেক লোকের বাস এবং দেশের সকল ব্যবসায়ী রীতিমত সেখানে যাতায়াত করে" ।২ ডঃ আব্দুল করিম তাঁর 'চট্টগ্রামে ইসলাম' গ্রন্থে এ সমন্দরকে চট্টগ্রামের সাথে অভিন্ন বলে প্রমাণ করেছেন।৩

ডঃ এম, এ, রহিম তাঁর 'Social and cultural history of Bengal' গ্রন্থে বাংলার উপকূল ভাগে আরব বণিকদের আগমন সম্পর্কে বলেছেন যে,"চাটগাঁয়ের সাথে আরবদের সম্পর্ক অতি প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। এমন কি' চাটগাঁ' নামটিও আসলে তাদের দেয়া। গঙ্গার ব-দ্বীপ বা শেষ প্রান্তে এ স্থানটি অবস্থিত বলে আরব বণিকরা এর নাম দেয় 'শাতি উল গঙ্গা' (গঙ্গার শেষ প্রান্ত বা উপদ্বীপ)।এ 'শাতি-উল-গঙ্গা' থেকে কালক্রমে চাটগাঁও, অবশেষে চিটাগাং এবং বর্তমান চট্টগ্রামে রূপান্তর ঘটেছে" ।৪

আরব দেশ এশিয়া ও ইউরোপের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত হওয়ায় এশিয়া ও ইউরোপের বাণিজ্যের চাবি-কাঠী আরবদের হাতে ছিল। ভারতের উপকূলীয় বাণিজ্যে তাদের একচেটিয়া আদিপত্য ছিল। ভারত থেকে তারা প্রধানতঃ

১। আব্দুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশে ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৫।

২। আল-ইদ্রিসী, নুজহাতুল মুশতাক।

৩। ডঃ আব্দুল করিম, চট্টগ্রামে ইসলাম, পৃঃ ৪-১৫।

৪। Dr. A. Rahim, Social and cultural history of Bengal.

Dhaka University Institutional Repository

গরমমশল্লা , গজদন্ত ও নানাবিধ মুল্যবান জিনিসপত্র ইউরোপের বাজারে রপ্তানী করত। সরন্দ্বীপ (সিংহল) ও তার নিকটবর্তী ভারতের দক্ষিণ এলাকায় গরম মশল্লা উৎপন্ন হত। কিন্তু হাতীর জন্য বঙ্গ (বাংলাদেশ) প্রাচীনকাল থেকেই বিখ্যাত ছিল। আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণকালে বঙ্গ রাজ্যের চারি সহস্র সুসজ্জিত হস্তি সেনার কথা শুনা যায়।[১]

ঐতিহাসিক আবুল ফজল তাঁর 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে বলেছেন যে, "বাঙ্গালার পূর্বে ও দক্ষিণে আরখংগ (আরাকান) নামে এক বিরাট দেশ আছে। চাটগাঁও হচ্ছে তার সামুদ্রিক বন্দর। এখানে প্রচুর হাতী পাওয়া যায়"।[২] পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের স্থল ও সামুদ্রিক বাণিজ্যে আরব বণিকদের পূর্ণ আধিপত্য ছিল। কর্ডোবা থেকে শুরু করে চীন সাগরের উপকুল পর্যন্ত স্থল ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের সমস্ত কেন্দ্রস্থলে তাদের যাতায়াত ছিল। কাজেই, হাতীর দাঁত চট্টগ্রাম বন্দর দিয়েই যে বিদেশের বাজারে রপ্তানী হত এবং এ হাতীর দাঁত সংগ্রহ করার জন্য আরব বণিকদেরকে চট্টগ্রাম বন্দরে আসতে হত, এতে সন্দেহের অ বকাশ মাত্র নেই।

ভৌগোলিক আরব সওদাগর সুলায়মানের সফরের বিবরণে যে কামরূতের নাম পাওয়া যায়-লেখক নাজির আহমদ তাঁর 'বাঙ্গালী যুগে যুগে' গ্রন্থে এনামটি 'কওম-এ-হারূত' শব্দদ্বয় থেকে এসেছে বলে উল্লেখ করেছেন। যে সব নামের প্রথমভাগে কম, কাম বা কুম আছে তা যে আর্য ভাষা থেকে আসেনি, সে কথা সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ও স্বীকার করেছেন। আরবদের ভেতর যাদু শিক্ষাদাতা বলে পরিচিত হারূত মারূতের যাদু 'কামরূপ' এলাকার লোকের মধ্যেও প্রচলিত দেখে এ স্থানের বাসিন্দাকে 'কওম-ই-হারূত' বলে উল্লেখ করতে করতে তাদের অবস্থিতি স্থলের নামটিকেও কওম-ই-হারূত বা কামরূপ বলে মশহুর করে তোলে।[৩]

ডঃ রাধা গোবিন্দ বসাক, রমেশচন্দ্র মজুমদার, নিহাররঞ্জন রায় প্রমুখের গ্রন্থাদিতে উল্লেখিত বাংলাদেশে সেকালে নতুন 'খিল' জমি বেচা-কেনার যেসব লিপি প্রমাণ পাওয়া গেছে, তার মুল্যের কথায় দীনার ও দ্রহম (দিরহাম) এই দুই জাতীয় মুদ্রার কথা উল্লেখ আছে।[৪]

১। রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রাচীনযুগ, পৃঃ ৫২।

২। আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৫।

৩। মুফাখ্খারুল ইসলাম, প্রাগুক্ত,পৃঃ ৭১৫।

৪। (ক) নিহার রঞ্জন রায়,বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), প্রথম স্বাক্ষরতা সংস্করন, ১৯৮০, পৃঃ ২০৫-২০৭।
(খ) Dr. R. C. Majumdar (ed) History of Bengal (D.U) Vol. I
(গ) Dr. R.G. Basak , The history of North Eastern India- 1934.

Dhaka University Institutional Repository

এ সব তথ্যের ভিত্তিতে যে সব প্রশ্ন দেখা দেয় তাহলে প্রাচীন বাংলায় গঙ্গা সাগর লোহিত সাগর কুলের লালমাটি এলাকার প্রধান আদি বাসিন্দারা কি তবে আরবরাই ছিল? সাগরে নতুন উত্থিত বিরান ভূমিকে খিল ভূমি বলা হয় যা আরবদের আয়ত্বেই ছিল। 'খিল' আরবী শব্দ, অর্থ খালি বা অনাবাদী জমি। নানা প্রমাণসূত্রে এ কথা প্রায় নিশ্চিত করেই বলা যায় যে নীনার ব্যবহারকারী আরবরাই এ এলাকার মূল বাসিন্দা। বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে আজও সাধারণ কৃষকরা অনাবাদী জমিকে 'খিল' বলে। একইভাবে নদীকে দরিয়া বা গাং বলে। জেলে মাঝিরা এখনও নদীতে একত্রে অনেক নৌকা চলাচলকে 'বহর' বলে। বিপদ আপদকে ঠেকাবার জন্য অনেক নৌকা একত্র হয়ে এখনও বাংলাদেশের সর্বত্র প্রায় চলাচল করে। এসব প্রমাণ দেখে বলা যায় যে আরব ও তাদের বংশধররাই সম্ভবতঃ এ এলাকার মূল অধিবাসী। সামাজিক এবং নৃ-তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যসমূহ বিশ্লেষণ করলে এ সত্যই স্পষ্ট হয় যে নদী ভিত্তিক ব্যবসা-বাণিজ্য, মৎস শিকার এবং ভূমিভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থাই এ দেশের জনগণের প্রাচীন অর্থনীতির ভিত্তি ছিল। আর আরবদের হাতেই যে তার বিকাশ হয়েছিল তাও প্রায় নিশ্চিত।

আগেই বলা হয়েছে আরবদের 'বরহিন্দ' শব্দ থেকে উপমহাদেশের হিন্দ নাম হয়েছে। কাজেই সারা উপ-মহাদেশই আরবদের মুখে 'হিন্দ' নাম পেয়ে দুনিয়ার সর্বত্র পরিচিত হয়েছে। সেখান থেকে হিন্দের বিশেষ অংশের ভাষা 'হিন্দী' নাম পেয়েছে। সমগ্র সংখ্যাগুরু মানুষ তাদের জাতি হিসাবে হিন্দু নাম গ্রহণ করেছে। সুতরাং উপ-মহাদেশে আরবদের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবকে স্বীকার না করে পারা যায় না।

এ আলোচনা থেকে বাংলাদেশের সাথে আরবদের সুপ্রাচীন সম্পর্কের একটা পটভূমি পাওয়া যায়। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে আরবরা বন্দর স্থাপন ও বসতি গড়েছেন, তাদের কাছে তাদের পিতৃভূমি আরবে সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইসলামের নবীর আবির্ভাব হবার খবর এসে পৌঁছাতে বিলম্ব হবার কারণ ছিল না। জানা যায় যে সপ্তম শতাব্দীর প্রথমদিকে নবী করীম (সঃ) এর জীবদ্দশায়ই ভারতের পশ্চিম উপকূলে মালাবার রাজ্যে (বর্তমান কেরালা) ইসলাম প্রচারিত হয়। নবী করীম (সঃ) -এর জীবদ্দশায়, এমনকি সম্ভবতঃ হিজরতেরও আগে কিভাবে বাংলাদেশের উপকূলে ইসলামের বাণী এসে সত্যের আলো জ্বালিয়েছিল সে সম্পর্কে বিস্তারিত এবং প্রামাণ্য বিবরণ পেশ করা প্রয়োজন। ইতিপূর্বে আলোচনায় কিছু প্রমাণ তথ্য তুলে ধরে বলা হয়েছে যে ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে থেকে বাংলাদেশের সাথে আরবদের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ও নিবিড় সম্পর্ক ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

এবার বাংলার উপকূলে সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভেই অর্থাৎ নবী করীম (সঃ) এর নবুয়াত প্রাপ্তির অব্যাবহিত পরেই যে ইসলামের আবির্ভাবের খবর এসে পৌছে ছিল এবং হিযরতের পর পরই ইসলামের আলো বাংলার উপকূলে এসে পৌছেছিল তারই প্রমাণ পেশ করা হবে।

নবী করীম (সঃ) -এর আবির্ভাবের কিছুকাল আগে থেকেই আরব জনগণ ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নৌপথের প্রতি বেশী আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। কারণ, সে সময় ইরান এবং রোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে অব্যাহত যুদ্ধ বিগ্রহের জন্য আরবদের স্থল পথের বাণিজ্য মারাত্মক বিপদ সংকুল হয়ে পড়ে। নৌবাণিজ্যে আরবরাই তখন অভিজ্ঞ এবং শ্রেষ্ঠ ছিল। তাই, স্বাভাবিকভাবেই তারা নৌবাণিজ্যের দিকে বেশী আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। এদের বাণিজ্য বহর নিয়মিত পাক ভারত উপমহাদেশ, বার্মা এবং মালাক্কা প্রণালী পর্যন্ত যাতায়াত করত। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে মক্কার কুরায়শ বণিকরাও নৌপথে বহিঃর্বাণিজ্যের সাথে জড়িয়ে পড়েছিল। [১]

ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক মওলানা মুহিউদ্দিন খান মাওলানা সৈয়দ সুলায়মান নদভীর গবেষণা গ্রন্থ 'আরব ও হিন্দকে তাআল্লুকাত' এর সূত্র উল্লেখ করে বলেছেন, "আরবদের সামুদ্রিক বাণিজ্য প্রসার হওয়ার সাথে সাথে আমাদের এ উপ-মহাদেশের উপকূল অঞ্চলে অবস্থিত প্রসিদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্রগুলোর আশে পাশে আরবদের স্থায়ী উপনিবেশও গড়ে উঠেছিল। দক্ষিণ আরবের মালাবার, কালিকট, চেরর এবং আমাদের চট্টগ্রাম ও আরাকান উপকূলে আরব জনগণের এরূপ বসতি ইসলাম পূর্ব কয়েক শতাব্দী আগ থেকেই গড়ে উঠেছিল বলে প্রমাণ রয়েছে। আরবদেশ থেকে বছরে অন্ততঃ দু'বার এসব উপনিবেশে নৌবহর এসে নোঙর করত। ফলে, বাণিজ্যপণ্যের যেমন আদান-প্রদান হত তেমনি সংবাদাদিরও আদান প্রদান চলত"।[২] বছরে যখন অন্ততঃ দু'বার বাংলাদেশের উপকূলে আরব বণিকদের জাহাজের বহর নোঙর করত তখন নিশ্চিত ভাবেই বলা যায় যে ইসলামের আগমনের সাথে সাথেই তা এ দেশে জনগণের কাছে পৌছেছিল।

ইসলামের আবির্ভাব তখন সমগ্র আরবে একটা দারুন আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এমন একটা সাড়া জাগানো খবর বণিকদের মাধ্যমে বিদেশের অর্থাৎ বাংলাদেশের উপনিবেশগুলোতে পৌছেনি এমনটা ধারণা করা যায় না। নিশ্চয়ই নবী করীম (সঃ) -এর আবির্ভাব এবং তাঁর প্রচারিত ধর্ম ইসলামের কথা লোকের মুখে মুখে বাইরে প্রচারিত হয়েছিল।[৩]

১। মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, বাংলাদেশে ইসলামঃ কয়েকটি তথ্য সূত্র, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, এপ্রিল-জুন সংখ্যা, ১৯৮৮ইং, পৃঃ ৩৪৫।

২। মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪৬।

৩। মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

দাক্ষিণাত্যের মালাবারের এক রাজা নবী (সঃ)-এর চন্দ্র দ্বিখন্ডন দেখেছিলনে এবং পরে এক আরব সওদাগরের নিকট এর মাহাত্ম জানতে পেরে ইসলাম কবুল করেছিলেন বলে জানা যায়। আশরাফ আলী থানবী (রঃ)-এর 'ইসলাম কি সাদাকাত' গ্রন্থে গুজরাটের ধারদার শহরের বাসিন্দা (গুজরাটের রাজা) রাজা ভোজের বংশধর বলে দাবীদার মওলভী হাসান রিজা খানের নিম্নরূপ এক বর্ণনা পাওয়া যায়, "গুজরাটের রাজা ভোজ একদা আকাশে চন্দ্র পর্যবেক্ষণের জন্য নিজ ইমারতের ছাদে উঠেন এবং চন্দ্র দ্বি-খন্ডিত দেখতে পান। এর রহস্য উদঘাটনের জন্য ব্রাহ্মণদের ডেকে পাঠালে তারা যোগ সাধনা বলে বললেন, 'আরব দেশে একজন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি তাঁর নিজ ধর্মের সত্যতা প্রমাণের জন্য আঙ্গুলের ইশারায় এই অলৌকিক ঘটনা দেখান। এ কথা শুনে সত্য পিয়াসী, মুক্তি সন্ধানী, ধর্ম তৃষ্ণাতুর রাজা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ)-এর কাছে দূত পাঠিয়ে দেন। পত্রে লিখেন হে মহামান্য। আপনার এমন একজন প্রতিনিধি আমাদের দেশে পাঠান, যিনি আমাদেরকে আপনার সত্য ধর্ম শিক্ষা দিতে পারেন । তখন বিশ্বনবী তাঁর জনৈক সাহাবাকে হিন্দে পাঠিয়ে দেন। তিনি রাজা ভোজকে ইসলামে বায়আত করে তার নাম রাখেন আব্দুল্লাহ। রাজার ধর্ম পরিবর্তনে ধীরে ধীরে প্রজারা বিক্ষোভ শুরু করে। তারা রাজার বদলে রাজার ভাইকে সিংহাসনে বসায়। যে সাহাবা এসেছিলেন, তিনিও এখানেই ইন্তেকাল করেন। তাঁর ও রাজার মাযার এই ধারদার শহরেই আছে"।[১]

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর নিকট সরবতক নামক জনৈক ভারতীয় শাসক একপাত্র যানজাবিল বা আদ্রক (আদা) উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন বলে একটি হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন, "According to the narration by Abu Sayed Khudri (R) Sarbatak, king of Kunj (India) sent an earthen ware full of ginger to Prophet Mohummed (sm) as presents. It is also reported that Hazrat Mohummad (sm) sent Hudhayfa, Usama and Suhajeb to the king inviting him to accept Islam. Sarbatak embraced Islam. He also said I saw the prophet's face, first in mecca then in Medina. He was middle statured and very handsome."[২]

১। খাতামুন নাবিয়্যীন, কুরআন প্রচার, বৈশাখ ১৩০৮ বাংলা, পৃঃ ১২৪ - ১২৬।

২। উদ্ধৃতঃ শাশ্বত ভ্রাতৃত্ব সংকলন '৯১, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

মুফাখখারুল ইসলাম তাঁর 'উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারের প্রথম পর্ব' নিবন্ধে এ ঘটনা পরিত্যাজ্য বলে বর্ণনা করেছেন। তার মতে, "সরবতক বা শ্রীপাটক নামক হিন্দের রাজার কাছে বিখ্যাত সাহাবী আবু মুসা আল আশআরী মারফত রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর ইসলামের দাওয়াতনামা প্রেরণ, সে দাওয়াতনামার প্রতি রাজার চুম্বন দিয়ে তাজীম প্রদর্শন করা ও রাজার ইসলাম গ্রহণের হাদীসটি ৪র্থ ও ৫র্ম হিজরী শতাব্দীর এক শ্রেণীর মিথ্যাচারী আরবী বিদ্বানের উদ্ভাবন বলে গ্রহণ করা যায় না"।[১]

অনুরূপভাবে বাবা রতন আলহিন্দ নামে এক লোক আরবে গিয়ে রাসুলুল্লাহর (সঃ) এর সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন বলেও জানা যায় ।[২] রাসুলুল্লাহ (সঃ) -এর স্ত্রী হযরত আয়েশা (রাঃ) একবার অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর চিকিৎসার জন্য একজন ভারতীয় চিকিৎসকের সাথে যোগাযোগ করা হয় বলে ইমাম বুখারী উল্লেখ করেছেন।[৩] চিকিৎসক হিসাবে ভারতীয়রা সে যুগে আরবে সমাদৃত ছিলেন, এটা তারই প্রমাণ। ইবনে খাল্লিকান বলেন, "হযরত ইমাম হোসেন (রাঃ) এর পুত্র জয়নুল আবেদীন ভারতীয় মায়ের সন্তান ছিলেন"।[৪]

ঐতিহাসিক বুযুর্গ বিন শাহরিয়ার বলেন, "আরবে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর ইসলাম প্রচারের কথা জানতে পেরে সরন্দ্বীপবাসীরা রাসুল (সঃ) -এর কাছে দূত পাঠান, কিন্তু এ দূত মদীনায় পৌছেন হযরত ওমর (রাঃ)-এর খিলাফতকালে। হযরত উমর(রাঃ)-এর সাথেই সে দূতের সাক্ষাত হয় । ইসলাম, ইসলামের নবী এবং তাঁর অনুসারীদের সম্পর্কে আলোচনা ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে দেশে ফেরার পথে ঐ দূত বেলুচিস্তানের কাছে মাকরান এলাকায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর হিন্দু সাথী সরন্দ্বীপ পৌছে তাদের অভিজ্ঞতার কথা জানান। বিস্তারিত জেনে সরন্দ্বীপের জনগণের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি হয়"।[৫] ফিরিস্তা জানান, "সরন্দ্বীপের রাজা এ সময় ইসলাম গ্রহণ করেন"।[৬]

১। মুফাখখারুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭১৭।

২। ইবন হাজার, ইসাবা ফী তামিইজ আস সাহাবা, ১ম খন্ড, পৃঃ ১০৯৫

৩। কে, এ নিজামী, প্রাগুক্ত, ভূমিকা।

৪। কে,এ, নিজামী, প্রাগুক্ত, ভূমিকা।

৫। কে,এ, নিজামী, প্রাগুক্ত, ভূমিকা।

৬। কে,এ,নিজামী, প্রাগুক্ত , ভূমিকা।

Dhaka University Institutional Repository

এ সব ঘটনা থেকে বাংলাদেশ বিচ্ছিন্ন ছিল না। কেননা, বাংলাদেশের সাথেও আরবদের সুপ্রাচীনকালের সম্পর্ক ছিল। বাংলাদেশে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজির আগমনের অনেক পূর্বেই আরব বণিকদের দ্বারা ইসলাম চট্টগ্রাম ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। রিচার্ড সাইমন্ডস বলেন, "The culture that developed in Bengal was entirely different from that of the Hindus. The ports of the country especially Chittagong had come under the influence of the Arabs as early as the 7th century A.D. and many of the Arab voyegers and traders had left a permanent impress upon the area. Islam, therefore, took root very early in this respective soil". ১

"হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর জীবদ্দশায় তাঁর কয়েকজন শিষ্য ভারতের মালাবার উপকূলে 'চেরূমল জেরূমল' নামে হিন্দু রাজার সাথে সাক্ষাত করেন। এই রাজা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন ও 'শারাফ বিন মালিক' নামক একজন আরবীয় মুসলিমকে ভূমি প্রদান করেন ও ইসলাম প্রচারের অনুমতি দেন। আরবীয় বণিকেরা সমগ্র মালাবার উপকূলে ও দাক্ষিণাত্যে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন" ।২

মালাবার ভারতের মাদ্রাজ প্রদেশের একটি জেলার নাম। ভৌগোলিক পরিভাষায় অনেক সময় সম্পূর্ণ উপ-দ্বীপটাকে মালাবার বলা হয়। সম্পূর্ণ মালাবার নাম আরববাসী কর্তৃক প্রদত্ত হয়।৩ মালাবার আরবী ভাষার শব্দ মলয়+আবার =মালাবার। মলয় মুলত একটি পর্বতের নাম, আবার অর্থ-কূপপুঞ্জ, জলাশয়। আরবরা এ দেশকে মা'বার বলে থাকেন। মা'বার অর্থ অতিক্রম করিয়া যাওয়ার স্থল পারঘাট। আজকালকার ভূগোলে পূর্বঘাট ও পশ্চিম ঘাট। "যেহেতু আরব বণিক ও নাবিকরা এই ঘাট দুইটি পারহইয়ামাদ্রাজ ও হেজাজ প্রদেশে যাতায়াত করিতেন , এই জন্য তাহারা এইদেশকে মা'বার উল্লেখ করিতেন" । ৪

এই নাম দু'টি হতে ইহাও জানা যায় যে এ দেশের সাথে তাদের পরিচয় অতি পুরাতন এবং সম্পর্ক ছিল অতি ঘনিষ্ট। প্রাচীনকাল থেকে আরবরা এ দেশে বসবাস স্থাপনের পর তার পুরাতন নাম পরিবর্তিত হওয়া ও নতুন আরবী নাম প্রবর্তিত হওয়া সম্ভবপর হয়েছিল। মালাবারের মুসলমানেরা মোপলা নামে পরিচিত। ছোট বড় নৌকা চালানোই তাদের জীবিকা অর্জনের প্রধান অবলম্বন

১। Richard Saymonds, The Making of Pakistan- এ অধ্যাপক আহমদ আলীর প্রবন্ধ, পৃঃ ১৯৭।

২। ডঃ হাসান জামান, সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র,ঢাকা, ১৯৮০ইং, পৃঃ ২১১।

৩। মাওলানা আকরাম খাঁ, মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, পৃঃ ৪৭।

৪। মাওলানা আকরাম খাঁ, প্রাগুক্ত,পৃঃ ৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

ছিল। মাছ ধরা, মাল ও যাত্রী বহন করার জন্য তাদেরকে অনেক সময় নদ-নদী এমনকি সমুদ্রেই অবস্থান করতে হত। এ দীর্ঘকালের মধ্যে তাদেরকে রুযী রোযগারের জন্য অনেক সময় ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে আরব দেশে যাতায়াত করতে হত, পুরাতন আত্মীয়তার মায়াও হয়তো তাদের অনেকে কাটিয়ে উঠতে পারেনি। এখানে ইসলামের আগমন সম্পর্কে মওলানা আকরাম খাঁ বলেছেন, "আরব নাবিক ও বণিকগণ সদাসর্বদা এই পথ দিয়া বঙ্গ দেশ ও কামরূপ হইয়া চীন দেশে যাতায়াত করিতেন। এই মালাবারই ছিল তাহাদের মধ্যপথের প্রধান বন্দর। এখানকার মোহাজেরদিগের ভাষাও ছিল আরবী। সুতরাং হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) ও ইসলাম ধর্মের সকল প্রকার বিবরণ যে তাহারা যথা সময়ে সম্যকরূপে অবগত হইতে পারিয়াছিলেন তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে আরব বণিকরাই ছিলেন হিজরী সপ্তম শতক পর্যন্ত এশিয়া ও আফ্রিকায় ইসলাম প্রচারের প্রধান উদ্যোগী ও সদাসক্রিয় উপলক্ষ্য। আমার মতে, এই উৎসাহী ও ধর্ম প্রাণ প্রচারকদিগের সংশ্রবে আসার ফলেই মালাবারের আরব মোহাজেরগণ হযরতের জীবনকালে খুব সম্ভবতঃ হিজরী সনের প্রথম দিকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। মালাবারের অনারব অধিবাসী দিগের মধ্যে ইসলামের প্রসার আরম্ভ হয় ইহার কিছুকাল পরে। স্থানীয় রাজার ইসলাম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে" ।১

কলিকাতা থেকে প্রকাশিত 'বিশ্বকোষে' বলা হয়েছে, "চেরর রাজ্যের শেষ রাজা চেরুমাল পেরুমাল ইচ্ছা পূর্বক সিংহাসন ত্যাগ করিয়া মুসলমান ধর্ম গ্রহণ অভিলাষে মক্কা নগরীতে গমন করেন" ।২ শায়খ জয়নুদ্দীন প্রণীত 'তুহফাতুল মোজাহেদীন' পুস্তকেও উল্লেখ করা হয়েছে, "মালাবারের রাজা মক্কায় গমন করে হযরত (সঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট ইসলামের বায়'আত গ্রহণ করেন। মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করার সময় রাজা আল্লাহর নবীর জন্য আদা ও এদেশে তৈরী একটি মূল্যবান তরবারীসহ কিছু মূল্যবান উপহার সামগ্রী সঙ্গে করে নেন। নবী করীম (সঃ) সেই আদা নিজে খান এবং সাহাবীদের মধ্যেও বন্টন করে দেন। তরবারিটি বরাবরই তাঁর সঙ্গে ছিল । সে সময় থেকেই স্থানীয় মুসলমান ও অমুসলমান সকলেই এধারনাই পোষণ করে আসছে যে রাজা কিছুকাল হযরতের খেদমতে অবস্থান করে দেশে ফেরার পথে 'শহর' নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন। তবে স্থানীয় অমুসলমানেরা বিশ্বাস করে যে রাজাকে উর্দ্ধে তুলে নেয়া হয়েছে। তিনি আবার দুনিয়ায় ফিরে আসবেন" ।৩

১। মাওলানা আকরাম খাঁ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮-৪৯।

২। বিশ্বকোষ, কোলকাতা, খন্ড ১৪, পৃঃ ২৩৪।

৩। শায়খ জয়নুদ্দীন প্রণীত তুহফাতুল মোজাহেদীন গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত বিবরণকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেয়ার কোন কারণ থাকতে পারে না। কারণ, মুসলমান অমুসলমান নির্বিশেষে একটি দেশের জনগণ আবহমান কাল হতে যে ঐতিহ্যকে সমবেতভাবে বহন করে আসছে তাকে অনৈতিহাসিক ও ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেয়া যায় না। মুসলিম বণিকদের মাধ্যমেই যে মালাবারে ইসলাম প্রচারিত হয়েছিল এটাই স্বতঃসিদ্ধ কথা। এতে কোন সন্দেহ থাকতে পারেনা। তাহলে দেখা যায় যে হিজরী প্রথম শতকের প্রারম্ভেই (খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে) ভারতের পশ্চিম উপকূল ইসলামের সত্যবাণীর সংস্পর্শে আসে।

এ ভাবেই বাংলার দক্ষিণ পূর্ব উপকূলে প্রথম যুগেই মুসলিম বণিকদের সাহায্যে ইসলামের সত্যবাণী প্রবেশ করে বলে ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন। তবে শক্তিশালী ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণের অভাবে এ যুগকে চিহ্নিত ক রা যায় না। নিশ্চয়ই আরব বণিকদের জাহায কেবল ভারতের পশ্চিম উপকূলে এসে থেমে যায়নি। কারণ, তৎকালে আরবদের ব্যবসা বাণিজ্য পূর্ব দিকে চীন উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তৎকালীন চীন সম্রাট তাই সুঙ-এর নিকট রাসূল (সঃ) যে পত্র প্রেরণ করেন তাতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। পত্রটির কথা N.G.Wells এভাবে উল্লেখ করেছেন, "To the Monarch (Tai-sung) also came (in A.D.628) messeges from Mohommod. They come to canton on a tradingship. They have sailed the whole way from Arabia along the Indian coasts.Unlike Heracleus and Kavadh, Tai sung gave there envoys a courteous heoring. He expressed his interest in their theological ideas and practices and assisted them to build a mosque in canton, a mosque survives, it is said , to this day the oldest mosque in the world." [১]

চীনের ক্যান্টন শহরে দেড় হাজার বছর আগের একজন সাহাবীর কবর রয়েছে। ইসলাম চীন দেশ ও তার আশে পাশে নিঃসন্দেহে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছিল। নিশ্চয় তা আরব বণিকদের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছিল। সপ্তম শতকে বঙ্গোপসাগর বহির্বাণিজ্যের কেন্দ্র স্থল ছিল। কাজেই,সপ্তম শতকে অর্থাৎ হিজরী প্রথম শতকের শুরুতেই আরব বণিকদের জাহাজ বাংলার উপকূলীয় বন্দর সমূহে নোঙ্গর করেছে এবং তাদের প্রচারিত ইসলামের সত্য বাণীর আলোকে বঙ্গদেশ প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল এবং পরে তা চীনকে স্পর্শ করে, একথা নির্দ্ধিধায় বলা যেতে পারে।

১। শাশ্বত-ভ্রাতৃত্ব সংকলন'৯১, বাংলাদেশ সৌদি আরব ভ্রাতৃ সমিতি প্রকাশিত ডঃ কাজী দীন মুহাম্মদ রচিত নিবন্ধ বাংলাদেশে ইসলাম এ অধ্যাপক N.G.Wells, A History of the World গ্রন্থ থেকে উক্তিটি তুলে ধরা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত রাসূল-ই-করীম (সঃ)-এর মক্কায় অবস্থান কালেই মালাবার বা চেরর রাজ্যে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে কে এসেছিলেন? কি তার পরিচয়? কিভাবেইবা তিনি এখানে এলেন? কেমন করে তিনি বাংলায় ইসলামের আলো প্রজ্জ্বলিত করলেন? ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন দেখা দেয়। এ সম্পর্কে শক্তিশালী ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণ যদিও তেমন একটা পাওয়া যায় না, তবে এসব প্রশ্নের উত্তর খুজতে গেলে ইসলামের প্রাথমিক যুগের পটভূমি পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

নবী করীম (সঃ) -এর নবুয়াতের পঞ্চম সালে মক্কায় বৈরী পরিবেশে ইসলাম অনুসারীদের অস্তিত্ব নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ায় নবী করীম (সঃ) কয়েক দফায় মোট ১০৪ জন সাহাবীকে আবিসিনিয়া (হাবশা) রাজ্যকে নিরাপদ ও বন্ধুসুলভ জেনে সে দেশে হিযরত করার আদেশ দিয়েছিলেন। হাবশায় কেন নবী (সঃ) তাঁর সাথীদের হিযরত করার আদেশ দিয়েছিলেন? এই পদক্ষেপ গ্রহণের পেছনে কি উদ্দেশ্য নিহিত ছিল? সে সম্পর্কে মওলানা সৈয়দ সুলায়মান নদভীর এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, "নবী (সঃ) যখন দেখলেন যে কোরায়শদের প্রতিকুলতার মধ্যে ইসলামী আহকামের উপর প্রকাশ্য আমল এবং অন্যদের সামনে ইসলামকে তুলে ধরা সম্ভব হচ্ছেনা, তখন তিনি সাহাবীদেরকে হুকুম দিলেন, "তোমরা বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ো।" সাহাবাগণ আরজ করলেন, "কোনদিকে ইয়া রাসুলাল্লাহ ? তিনি আবিসিনিয়ার দিকে অঙ্গুলি ইশারা করে বললেন, "ওই দিকে।"[১]

মহানবী (সঃ) কেন সেই দেশটার দিকে ইংগিত করেছিলেন সে বিষয়ে মুহিউদ্দিন খান উল্লেখ করেছেন, "ইসলামের বাণী বাইরে প্রচার করার জন্য সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই রসুলে মকবুল (সঃ) প্রধানতঃ কিছু সংখ্যক বিজ্ঞ সাহাবীকে হাবশায় পাঠিয়েছিলেন। কারণ, লোহিত সাগরের প্রবেশ পথে অবস্থিত হাবশা ছিল তখন একটা উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য কেন্দ্র। পশ্চিমে মিসর এবং পূর্বে চীন পর্যন্ত বিস্তৃত সমুদ্র পথে চলাচলকারী নৌবহর হাবশা এসে যাত্রাবিরতি করত। এখানকার বাজারে বিপুল হারে পণ্য বিনিময় হত। রসুলে মকবুল (সঃ) এই গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্রটি পূর্ণমাত্রায় খবর আদান প্রদানের কেন্দ্ররূপে ব্যবহার করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন"।[২]

এই মহান উদ্দেশ্য কেমন করে একটা স্বার্থকরূপ লাভ করেছিল সে কাহিনী যেমনি অভাবিত তেমনি বিস্ময়কর। সে কাহিনী ইতিহাসে উপেক্ষিত। রাসুল (সঃ)-এর

১। মওলানা সৈয়দ সুলায়মান নদভীর আরব ওয়া হিন্দ কি তা'আল্লুকাত দ্রষ্টব্য।

২। মুহিউদ্দিন খান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

চাচাত ভাই হযরত জাফর ইবনে আবু তালিব (রাঃ) হাবশায় দ্বিতীয় দফায় ৮৩ জন সাহাবীকে নিয়ে গিয়েছিলেন। মহানবী (সঃ) তাঁর হাতে হাবশার খৃষ্টান সম্রাট নাজ্জাশীকে উদ্দেশিত ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত একখানা পত্র দিয়েছিলেন।১ সম্রাট সেই পত্রখানা পাঠ করে দরবারস্থ ধর্মযাজক ও পাদ্রী সম্প্রদায় এবং সভাসদগণের আপত্তি ও বিরোধীতা উপেক্ষা করে ভক্তিভরে সিংহাসন থেকে নেমে আসেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর দৃষ্টান্তে রাজ পরিবারের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিসহ সভাসদগণেরও অনেকে ইসলামে দীক্ষিত হন।

"সম্রাট ইসলাম গ্রহণ করায় খৃষ্টান ধর্ম যাজকদের মধ্যে মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তারা রাজ পরিবারের অন্য একজন সদস্যের সথে ষড়যন্ত্র করে এক ভয়াবহ বিদ্রোহের সৃষ্টি করে এবং রাজ্যে ভীষণ অরাজকতা সৃষ্টি করেন"।২ মহামতি নাজ্জাশী এটা সহজেই অনুমান করতে পেরেছিলেন যে রাজ্যে অরাজকতা সৃষ্টিকারী বিদ্রোহীরা সফল হলে যেমন তার সিংহাসনচ্যুত ঘটবে তেমনি হাবশায় বসবাসরত মুসলমানদের অস্তিত্বও বিপন্ন হয়ে পড়বে। নিজের ভাবনার চেয়ে প্রবাসী মুসলমানদের ভাবনাই তাকে বেশী উদ্বিগ্ন করে তুলল। এই ভাবনা নিয়ে তিনি বিদ্রোহ দমনের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন এবং সেই সঙ্গে তিনি তড়িঘড়ি করে দু'টি সমুদ্রগামী জাহাযও তৈরী করলেন এবং মুসলমানদের নির্দেশ দিলেন যে যুদ্ধের অবস্থা প্রতিকূল দেখলে তাঁরা যেন সেই দুটি জাহাযে চড়ে অন্য কোথাও চলে যান"।৩

মুসলমানদের নেতা বিজ্ঞ ও সাহসী সাহাবী হযরত জা'ফর (রাঃ) নাজ্জাশীর এ প্রস্তাব গ্রহণ না করে সম্রাটের সহগামী হয়ে তাকে সর্বাত্মক সাহায্য দান করলেন এবং আল্লাহর অপার করুণায় সম্রাট বিজয় লাভ করেন। ফলে সম্রাটের যেমন সিংহাসন রক্ষা পেল তেমনি হাবশায় প্রসারমান ইসলাম এবং মুসলমানদের বসবাস ও নিরাপত্তাও সংকট মুক্ত হয়ে গেল।

বিদ্রোহ দমনের পর সম্রাট মুসলমানদেরকে আরেক সংকট থেকে রক্ষা করেছিলেন। হযরত জাফর (রাঃ)-এর নেতৃত্বে ৮৩ জন মুসলমান হাবশায় পৌছার সঙ্গে সঙ্গে মক্কা থেকে দু'জন কুরায়শ প্রতিনিধি প্রবাসী ধর্মত্যাগী মুসলমানদেরকে ফেরত নিতে এসেছিল। নাজ্জাশী তাদেরকে ফেরত পাঠাতে অস্বীকৃতি জানান। তারা বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে গিয়েছিল।

১। মোঃ আফতাব উদ্দিন, মহাচীনে ইসলামের বুনিয়াদ, মাসিক মদীনা, ঈদ সংখ্যা, এপ্রিল, ১৯৯৩ ইং, পৃঃ ৩৬।

২। মোঃ আফতাব উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৬।

৩। মোঃ আফতাব উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

যুদ্ধ ঝামেলা কেটে যাওয়ায় মুসলমানদের জন্য তৈরী দু'টি জাহায সদ্ব্যবহারের জন্য সম্রাট নাজ্জাশী এক অচিন্তণীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। মনে হয় মহানবী (সঃ) এই মুহাজির দল প্রেরণের ভেতরকার গভীর উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি হযরত জাফর (রাঃ)-এর মাধ্যমে সম্যক অবহিত ছিলেন। "তাই এই সুযোগে তিনি সেই দু'টি জাহাজে করে সমুদ্র পথে চীনের উদ্দেশ্যে ইসলামের আলো পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে এক প্রচারক দল পাঠাতে উদ্যোগ নিলেন"।[১] এই অভিযাত্রার দায়িত্ব পালনে তিনি চারজন সুযোগ্য বর্ষীয়ান সাহাবীকে পেলেন। রিজাল গ্রন্থের উল্লেখ মতে, এই সাহাবী দলের নেতৃত্বে ছিলেন হযরত আবু ওয়াক্কাস মালিক ইবনে ওহাব ইবনে মুনাফ এবং তাঁর তিন সঙ্গী ছিলেন হযরত উরওয়া ইবনে আছাছা, হযরত কায়স ইবনে হুযায়ফা এবং হযরত আবু কায়স ইবনুল হারিস রাদি আল্লাহু আনহুম। আসমাউর রিজাল গ্রন্থসমূহে এই চারজন সাহাবীর নামই শুধু পাওয়া যায় এবং তারা যে হাবশায় হিজরত করেছিলেন এ তথ্যও পাওয়া যায়। কিন্তু হাবশা থেকে তারা মক্কায় বা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন কিনা বা কোথায় তাদের মৃত্যু হয়েছিল সে সব গ্রন্থে তার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

হযরত আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) ছিলেন মহানবী (সঃ) -এর মাতা আমিনার ভাই। সে হিসাবে তিনি ছিলেন নবী (সঃ) -এর মামা। হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর নবুয়াতের পঞ্চম বছরের মধ্যেই কোন এক সময়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং কয়েক দফায় পুরুষ ও মহিলা মিলে মোট ১০৪ জন সাহাবীর আবিসিনিয়ায় হিজরতের যে সৌভাগ্য হয়েছিল, তিনি তাদের অন্যতম ছিলেন।[২] কিন্তু অন্যপ্রায় সকলের মত সেখান থেকে তিনি মক্কায় বা মদীনায় ফিরে আসেন নি। সেই প্রবাস স্থল থেকে তিনি মহানবী (সঃ) -এর নবুয়াতের সপ্তম সালে সম্রাট নাজ্জাশীর দেয়া একখানা সমুদ্রগামী জাহায নিয়ে তিনজন সঙ্গীসহ পূর্বদিকে সুদীর্ঘ বাণিজ্য পথটি ধরে বের হয়ে পড়েছিলেন। তিনি ইসলামের ঝাণ্ডা নিয়ে মহাচীনে গিয়েছিলেন এবং সে ঝাণ্ডা সবল হাতে সেখানকার মাটিতে পুঁতে সেখানেই জীবন অতিবাহিত করে সেখানকার মাটিতেই কবরস্থ হয়েছিলেন।

এই প্রচারক দলের পবরর্তী কার্য কলাপের উল্লেখ পাওয়া যায় ইতিহাসবিদ যয়নুদ্দীন ফকীহ প্রণীত 'তুহফাতুল মুজাহিদীন' গ্রন্থে। এ গ্রন্থের উল্লেখ মতে, "অভিযাত্রী দল পূর্ব দিকে জাহায ভাসিয়ে প্রথমে ভারতের মালাবারে উপনীত হন এবং সেখানকার রাজা চেরুমল পেরুমলসহ বহু সংখ্যক লোককে ইসলামে দীক্ষিত

১। মোঃ আফতাব উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৭।

২। মোঃ আফতাব উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

করে শেষ পর্যন্ত এই কাফেলা বাংলাদেশ উপকূল হয়ে মধ্যবর্তী অনেক স্থানে যাত্রা বিরতীর পর চীনের ক্যান্টন বন্দরে উপনীত হয়েছিলেন। চীনা ভাষায় সে দেশে ইসলামের আগমন সম্পর্কিত যে সব তথ্য সূত্র রয়েছে তা থেকে জানা যায় যে খৃষ্টীয় ৬২৬/৩ হিজরী সনের কাছাকাছি কোন এক সময়ের মধ্যে এই ইসলাম প্রচারক দল চীনের উপকূলে অবতরণ করেন এবং এই প্রচারক দলের নেতৃত্বে ছিলেন রাসূল পাক (সঃ) এর মামা হযরত আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) । তাঁর সংগে হযরত রাসুলুল্লাহ্(সঃ)-এর আরও তিনজন সাহাবী ছিলেন।[১] তিনি চীনের ক্যান্টন বন্দরে অবস্থান করেন এবং তাঁর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোয়াংটা মসজিদটি এখনো সমুদ্র তীরে তার সুউচ্চ মিনারগুলি নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মসজিদের অদূরেই তাঁর পবিত্র কবর এখনও বিদ্যমান । তাঁর তিন সঙ্গীর দু'জন সমাহিত রয়েছেন উপকূলীয় ফুকীন প্রদেশের চুয়ান চু বন্দরের নিকটবর্তী লিং নামক পাহাড়ের উপর। তৃতীয় জন সম্পর্কে এটুকু বলা হয়েছে যে তিনি দেশের অভ্যন্তর ভাগে চলে গিয়েছিলেন"।[২]

হযরত আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) সম্পর্কে অন্য একটি সুত্রে জানা যায়, তিনি ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য চীনে আসেন এবং এখানেই ইন্তিকাল করেন। আবু ওয়াক্কাস (রাঃ)-এর চাইনীজ নাম (Yown Gnosu) । তিনি Gungzho (ক্যান্টন) শহরে Huai Sheng মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। মসজিদটি আরবের স্থাপত্য শিল্পের অনুকরণে তৈরী । সেই সময় Perl river মসজিদটির পাশ দিয়ে প্রবাহিত ছিল। এখন নদীটির গতি পথ পরিবর্তিত হয়ে গেছে। "মসজিদের বর্তমান ইমাম নুর মুহাম্মদ-এর চাইনীজ নাম Ma feng da. হযরত আবু ওয়াক্কাস (রাঃ)-এর মাযার শরীফ লিউ হুয়া লেক এর পাশে Guangzhiue Ancestrel fom নামে পরিচিত। তাঁর মাযারটি প্রায় ৯/১০ ফুট দীর্ঘ এবং গাছপালায় পরিবেষ্টিত"।[৩] চীনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে উল্লেখিত হয়েছে,"সপ্তম শতাব্দীতে চীনা ব্যবসায়ীরা মধ্য এশিয়া এবং পশ্চিম এশিয়াতেও যাতায়াত শুরু করেন। আরব দেশ এবং অন্যান্য দেশসমূহ থেকেই বণিকেরা এবং ধর্ম প্রচারকেরা চীনে আসেন। এক সময়ে ছাং আনে বিদেশী বসবাসকারীদের সংখ্যা চার থেকে পাঁচ হাজারে দাঁড়ায়। ঐ শহর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্র রূপে পরিণত হয়"। [৪]

১। জয়নুদ্দীন ফকিহ, তুহফাতুল মুজাহিদীন দ্রষ্টব্য।

২। মোঃ আফতাব উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৫।

৩। ফরিদা রহমান, চীন দেশে ইসলাম, ইত্তেফাক, (মহিলা অঙ্গন) ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭ ইং।

৪। চীনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, চিয়ান পোজান, শাও স্যুনচেং হু হুয়া, বিদেশী ভাষা প্রকাশনালয় পেইচিং, ১৯৮৫ইং।

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন তথ্য সূত্র থেকে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে হযরত আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) -এর নেতৃত্বে যে প্রচারক দলটি হিজরী তৃতীয় সনে চীনে এসে পৌছে ছিলেন তাঁরা সকলেই চীনের মাটিতে মিশে রয়েছেন, হাবশায় বা আরব ভূমিতে ফিরে যাননি। তাঁরা হাবশা থেকে নবুয়াতের সপ্তম সনে যাত্রা করেছিলেন । আর নবুয়াতের ষোড়শ বর্ষে চীনে এসে পৌছান । এতে প্রমাণিত হয় যে তারা পথিমধ্যে অন্যূন নয় বছর অতিবাহিত করেছিলেন। দীর্ঘ নয় বছর কাল তাঁরা সমুদ্রবক্ষে কি কাজে ব্যয় করেছিলেন তা একটা অনুসন্ধানের বিষয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাদের এই নয় বছরের ভ্রমণ বৃত্তান্তের লিখিত কোন দলিল পাওয়া যায় না। তবে ইতিপূর্বে বিভিন্ন সূত্রে প্রমাণ পেশ করা হয়েছে যে হাবশা থেকে যাত্রা করার পর ইসলাম প্রচারের প্রথম মঞ্জিল ছিল মালাবার। মালাবার থেকে রওয়ানা হওয়ার পর হযরত আবু ওয়াক্কাস (রাঃ)- এর দ্বিতীয় মঞ্জিল কোথায় ছিল এ প্রশ্নের জবাব খুব একটা জটিল বলে মনে হয় না। আল্লামা সৈয়দ সুলায়মান নদভী লিখেছেন, "মিসর থেকে সদূর চীন পর্যন্ত প্রলম্বিত সূদীর্ঘ সমুদ্র পথে আরব নাবিকগণ নৌ-পরিচালনা করতেন। মালাবার উপকূল হয়ে তারা চীনের পথে বঙ্গোপসাগরে এসে প্রবেশ করতেন। এখানকার চট্টগ্রাম এবং কামরূপে তাদের বাণিজ্যবহর নোঙ্গর করত। দীর্ঘ পথে পালটানা জাহাজের একটানা যাত্রা সম্ভবপর ছিল না। পথে পথে যে সব মঞ্জিল ছিল সেগুলিতে আবশ্যিকভাবেই থেমে জাহাজ মেরামত এবং পরবর্তী মনজিলের জন্য রসদপাতি সংগ্রহ করতে হত"।১

উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে মালাবার থেকে রওয়ানা হওয়ার পর হযরত আবু ওয়াক্কাস (রাঃ)-এর জাহায বাংলার বন্দরে নোঙ্গর করেছিল। চীনের পরিব্রাজক মাহুয়ানের বর্ণনানুযায়ী জানা যায়, "বর্তমান চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজারের মধ্যবর্তী কোন একটি স্থানে এমন একটা বন্দরনগরী ছিল, যেখানে খুব উন্নত মানের সমুদ্রগামী জাহাজ তৈরী হত। এসব তৈরী জাহাজ সমগ্র প্রাচ্য জগতে ব্যবহৃত হতো। এই বন্দরে জাহাজ মেরামতও করা হতো। দূর থেকে প্রতিটি জাহাজ এই বন্দরে যাত্রা বিরতি করত"।২

হযরত আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) -এর কাফেলা বাংলার সেই বিখ্যাত বন্দরে যাত্রা বিরতি না করেই সুদূর চীনের পথে অগ্রসর হয়েছিলেন এমনটা ভাবা যায় না। কাফেলা অবশ্যই বাংলার বন্দরে যাত্রা বিরতি করেছিল এবং এখানে বেশ একটা যুক্তি সঙ্গত সময় পর্যন্ত অবস্থান করে কিছু লোককে ইসলামের দীক্ষা দিয়েছিল।

১। সৈয়দ সুলায়মান নদভী, আরবোকা জাহাজরানী দ্রষ্টব্য।

২। মুহিউদ্দিন খান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

আর এসব লোকই নীরবে এদেশে তাওহীদের বাণী প্রচার কার্য চালিয়ে গেছেন- ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক ১২০৩ সনে বঙ্গ বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত এই অবস্থাই স্বাভাবিকভাবে বিরাজমান ছিল। এছাড়াও এই প্রচারক দলের নয় বছরের কার্য কলাপের উপর কয়েকটি অনিবার্য ধারণা করা যায়, যেমন, প্রথমতঃ হাবশা থেকে সরাসরি চীনে পৌঁছা তাঁদের লক্ষ্য ছিলনা এবং হাবশা সম্রাটের নির্দেশও তেমন ছিলনা। তাঁরা এ সময়টা প্রমোদ ভ্রমণ বা দৃশ্যাবলোকনেও অতিবাহিত করেন নি। যাত্রা পথের সমস্ত সময়টাই তারা প্রচার কার্যে নিরত ছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ বাংলাদেশে ইসলামের প্রথম আলো জ্বালানো হয়েছিল মহানবী (সঃ) -এর জীবদ্দশায়ই এই সম্মানিত সাহাবীদের দ্বারা, স্বয়ং তাঁর মাতুলের দ্বারা। তাঁরাই মালাবারের পরে চট্টগ্রামে যাত্রাবিরতি করে সেখানে চাঁটি গেঁড়েছিলেন, যা থেকে চাটিগাঁও বা চট্টগ্রাম নামের উৎপত্তি।

তৃতীয়তঃ চট্টগ্রামের পর চীনের পথে ব্রহ্মদেশ ও মুসলিম অধ্যুষিত মালয়েশিয়ায়ও ইসলাম প্রচারের কাজ তাঁরা করেছিলেন। তাছাড়া ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপাঞ্চল এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় যে সমস্ত দ্বীপাঞ্চল মুসলিম বসতিপূর্ণ দেখা যায়, সেসব অঞ্চলে ইসলামের সূচনার কাজ তাঁরাই করেছিলেন।

চতুর্থতঃ নয় বছরের প্রতি এক বছরে এক একটি স্থানে জাহায ভিড়িয়ে প্রচার কাজ করে থাকলে এ হিসাবে মালাবার ও চট্টগ্রামসহ অন্ততঃ নয়টি স্থানকে তাঁরা ভ্রমণ কালের কর্মস্থল করেছিলেন। এ হিসাবে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কোন গুরুত্ব পূর্ণ দ্বীপ বা স্থান তারা বাকি রাখেননি। আরব বণিকেরা পরে ইসলাম বিস্তারের কাজ করলেও সূচনার কাজ এই কাফেলার দ্বারাই সাধিত হয়েছিল বলে মনে করা যেতে পারে।

জলপথের ন্যায় স্থল পথেও এই উপমহাদেশে মুসলিম প্রচারকদের আগমন ঘটে। স্থল পথে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গিরিপথ দিয়ে তাঁরা এদেশে আসেন। দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রাঃ) -এর আমলে (খৃঃ ৬৩৭-৪৮) হিজরী১৪ সনের মধ্যভাগ থেকে সিন্ধু প্রদেশের সাথে আরবদের যোগাযোগ বাড়তে থাকে।

"হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালেই (খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে) কয়েকজন প্রচারক (মুমিন) বাংলাদেশে আসেন। তাঁদের নেতা ছিলেন হযরত মা'মুদ ও হযরত মুহায়মিন। তারপর এ দেশে ইসলাম প্রচার করতে আসেন হযরত হামিদুদ্দীন (রাঃ), হযরত হোসেন উদ্দীন (রাঃ), হযরত মুর্তজা, হযরত আব্দুল্লাহ ও হযরত আবু তালিব। এরকম পাঁচটি দল পর পর বাংলাদেশে আসেন"।[১]

১। ডঃ হাসান জামান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১২।

Dhaka University Institutional Repository

তাদের সংগে কোনও অস্ত্র সস্ত্র বা বই কিতাবও থাকত না। তাঁরা রাজ ক্ষমতার সাহায্যও নিতেন না। তাদের প্রচার পদ্ধতির একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে তাঁরা এ দেশের চলতি ভাষার মাধ্যমেই ধর্ম প্রচার করতেন। অল্প সংখ্যক সত্যিকার মুসলমান তৈরী করা তাদের লক্ষ্য ছিল। তাঁরা গ্রামে বাস করতেন ও সফর করে ধর্ম প্রচার করা তাদের প্রধান কাজ ছিল। "এরপর আরও পাঁচটি দল মিসর ও পারস্য থেকে বাংলাদেশে এসেছিলেন। তাদের বলা হত 'আবিদ'। তাঁরা বিভিন্ন স্থানে 'খানকাহ' বা প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করে ধর্ম প্রচার চালিয়ে যেতেন"।[১]

আগেই বলা হয়েছে হযরত উমর (রাঃ) -এর শাসনামলেই সিন্ধু প্রদেশের সাথে আরবদের যোগাযোগ বাড়তে থাকে। ঐতিহাসিক বালাজুরী তাঁর 'ফুতূহুল বুলদান' গ্রন্থে -এর বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেছেন। "ওসমান ইবনে আবুল আবী সাকাফী, তাঁর ভাই মুগীরা, সাকাফ হারিস ইবন মুররী আবদী প্রমুখ সেনাপতি কয়েকবার সিন্ধু সীমান্তে অভিযানে আসেন এবং বিভিন্ন এলাকা দখল করেন। চুয়াল্লিশ হিজরীতে আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর শাসনামলে সেনাপতি মুহাল্লাব ইবনে আবু সফুরী সিন্ধু সীমান্ত অতিক্রম করে মুলতান ও কাবুলের মধ্যবর্তী বান্না ও আহওয়াজ নামক স্থানে পৌঁছেন। মুহাল্লাবের পর আব্দুল্লাহ ইবনে সাওয়ার, রাশেদ ইবন আমর জাদীবী, সিনান ইবন সালমাহ, আব্বাস ইবনে যিয়াদ ও মুসজির ইবনে জারুদ আবদী কয়েকবার হিন্দুস্থান সীমান্তে অভিযান চালান"।[২]

ভারত অভিযান সম্পর্কে নবী করীম (সঃ) -এর দুটি হাদীস প্রাথমিক যুগের মুসলমানদেরকে এ অঞ্চলের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর দু'টি হাদীসের মাধ্যমে হিন্দুস্তান বিজয়ের স্বীকৃতি মেলে। নাসায়ী ও মুসনাদে আহমদে সংকলিত সাহাবী হযরত সাওবান বর্ণিত একটি হাদীসঃ "আমার উম্মতের মধ্যে দু'টি দলকে আল্লাহ তায়ালা জাহান্নামের আগুন থেকে নিষ্কৃতি দেবেন। তার মধ্যে একটি দল হিন্দ অভিযানকারী সেনাদল, আর দ্বিতীয়টি হল ইসা ইবন মরিয়ম (আঃ) এর সহযোগী দল"।[৩]

নাসায়ীতে সংকলিত অন্য একটি হাদীসে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেছেন, "রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে ভারত অভিযানের নিশ্চিত ওয়াদা দিয়েছেন।

১। ডঃ হাসান জামান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১২।

২। আব্দুল গফুর, মহানবীর যুগে উপমহাদেশে, অগ্রপথিক, সীরাতুন্নবী সংখ্যা ১৯৮৮ইং, পৃঃ ৪৯ - ৫৪।

৩। উদ্ধৃতঃ মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান, বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের প্রথম পর্যায়, সীরাতুন্নবী (সঃ) স্মরণীকা, ১৪০৭ হিঃ, পৃঃ ৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

কাজেই সে সময় পর্যন্ত আমি জীবিত থাকলে অবশ্যই আমার ধন ও প্রাণ দান করতে কুণ্ঠিত হব না। এতে যদি আমাকে হত্যা করা হয়, তবে আমি শ্রেষ্ঠ শহীদের অন্তর্ভূক্ত হব। আর যদি সহি সালামতে ফিরে আসতে পারি তাহলে আমি হব দোজখমুক্ত"।[১]

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এভাবে মুসলমানদের ভারত অভিযানে উদ্বুদ্ধ করায় সাময়িক ব্যর্থতা সত্ত্বেও তাঁদের অভিযান প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়নি। অবশেষে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সাকাফী ইরাকের গভর্ণর নিয়োজিত হওয়ার পর সতের বছরের তরুণ মুহাম্মদ বিন কাসিম সাকাফীকে সেনাপতি করে ভারত অভিযানে পাঠান। তিনি সমগ্র সিন্ধু জয় করে মুলতান পর্যন্ত দখল করেন। এ অভিযানে তাঁর সংগে চার হাজার ভারতীয় জাঠ সৈন্যও ছিল। আর তিনি যখন পুরনো ব্রাহ্মণাবাদ জয় করেন তখন তার সংগে সাবওয়ান্দার অধিবাসীরা মিলিত হয়ে সহায়তা করেন। "এরা সবাই ছিলেন মুসলিম"।[২]

মুহাম্মদ বিন কাসিম কোন জনপদ জয় করেই সেখানে একজন গভর্ণর নিয়োগ করতেন। তিনি দেবল (করাচী) নগর জয় করে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করেন এবং সেখানে চার হাজার মুসলিম অধিবাসীর বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। অনেককে জায়গীরও দান করেন। "এভাবে হিজরী প্রথম শতকেই ভারতের মূল ভূ-খন্ডে ইসলামের আগমন ও প্রতিষ্ঠা ঘটে। মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয় স্থল পথে মুসলিম ও ইসলামের আগমন সহজতর করে দেয়। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে সিন্ধু ও পাঞ্জাবের বিভিন্ন এলাকায় মুসলিম বসতি গড়ে উঠে । ধর্মীয় ও সামাজিক দিক থেকে নির্যাতিত বহু বৌদ্ধ ও হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে"।[৩]

৮ম শতাব্দীর শেষের দিকে বঙ্গ দেশের বৌদ্ধ সম্রাট ধর্মপাল (৭৭০-৮১০ খৃঃ) পশ্চিমে সিন্ধু নদ ও উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত জয় করে রাজধানী কান্যকুব্জে এক বিরাট রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। প্রাপ্ত তথ্য সুত্রানুসারে জানা যায়, "এ অনুষ্ঠানে ভোজ, মৎস, মদ, কুরু, যবন অবন্তী, গান্ধার ও কীর প্রভৃতি রাজ্যের রাজন্যবর্গ উপস্থিত ছিলেন"।[৪] "এসবের মধ্যে সিন্ধু দেশকে বা সিন্ধুর তীরবর্তী কোন অঞ্চল বা রাজ্যকে 'যবন' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে"।[৫] এতে প্রতীয়মান হয় যে অষ্টম শতকের শেষ নবম শতকের প্রথম দিকে সিন্ধুর মুসলিম শাসকের সাথে ধর্মপালের যোগাযোগ ছিল।

১। উদ্ধৃতঃ শাশ্বত-ভ্রাতৃত্ব সংকলন, ৯১, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৭।
২। এ,কে,নিজামী, প্রাগুক্ত, ভূমিকা।
৩। ফজলুল হাসান ইউসুফ, বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২ইং, পৃঃ ২৬-২৯।
৪। অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, গৌড় লেখমালা, প্রথম সবক, রাজশাহী ১৩১৯ বাংলা, পৃঃ ২১-২।২
৫। রমেশ চন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৩-৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

এতে আরও বুঝা যায় যে ঈসায়ী সপ্তম শতাব্দী হতে দশম শতাব্দীর মধ্যে বঙ্গ দেশ ইসলামের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসে। কিন্তু সঠিক ও বিস্তারিত তথ্যের অভাবে কখন, কারা, কিভাবে এ সময়ে এদেশে ইসলাম প্রচার করেন, তাদের সকলের বিবরণ নিশ্চিত জানা যায়না। তবে ১২ থেকে ২৪ হিজরীর মধ্যে ইসলাম প্রচারকের কয়েকটি দল বাংলাদেশে আগমন এবং তাদের নাম সংক্রান্ত তথ্যটি এতদিন কেউ কেউ সহজে মেনে নিতে পারেন নি। ১৯৮৬ সালে রংপুর শহর থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে লালমাটিরহাট সদর উপজেলার পঞ্চগ্রাম ইউনিয়নের রামদাস মৌজার 'মজদের আড়া' গ্রামে ৬৯ হিজরীতে প্রতিষ্ঠিত একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। এ মসজিদ বাংলাদেশে এ যাবত প্রাপ্ত ইসলামের প্রাচীনতম নিদর্শন। মজদের আড়া নামে পরিচিত ৩০ শতাংশ জমিতে একটি বাঁশঝাড়ের উঁচু মাটির টিলা সমতল করতে গিয়ে এ মসজিদ আবিষ্কৃত হয়। এর গম্বুজ থেকে প্রাপ্ত ৬×৬×১---- আকৃতির বিশেষ ধরনের ইটগুলোতে নানা প্রকার ফুল, নকশা ও আরবী হরফে কালেমা তাইয়্যেবাহসহ হিজরী ৬৯ সন লেখা আছে। এছাড়া ১৭ হাত দীর্ঘ ও ১৫ হাত প্রস্থের একটি দালানের ছাদের ছক মাটির নিচে দেখা যায়, যা মসজিদের ছাদ বলে মনে হয়। এ স্থানটি থেকে মাত্র দু'শ গজ দূরে প্রায় দশ গজ উঁচু প্রাচীর বেষ্টিত প্রায় এক হাজার গজ দীর্ঘ ও একহাজার গজ প্রস্থ বিশিষ্ট একটি গড় ছিল বলে জানা যায়। এ গড়টিকে এখন আবাদী জমিতে পরিণত করা হয়েছে। গ্রামের নাম মজদের আড়া যে মসজিদের আড়া'র অপভ্রংশ তা বুঝতে কষ্ট হয় না। এ মসজিদকে ঘাঁটি করে ইসলাম প্রচারের প্রথম যুগে এখানে একটি মুসলিম জনপদ গড়ে উঠেছিল এবং এ অঞ্চলটি মসজিদের আড়া' নামে পরিচিত হয়েছিল। [১]

৬৯ হিজরীর এ মসজিদ আবিষ্কার থেকে বুঝা যায় যে মসজিদ প্রতিষ্ঠার অনেক আগে থেকেই বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার শুরু হয়েছিল এবং মুসলিম জনপদ গড়ে উঠেছিল। এমনি ধরনের মুসলিম জনপদ এবং তাদের ধর্মীয় কার্যক্রমের কেন্দ্র হিসাবে বাংলাদেশের অন্যকোন অঞ্চলেও সে সময় মসজিদ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না। ঐতিহাসিকগণ সে যুগে ভারতীয় পন্ডিত ও আরব মুসলমানদের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে সংলাপ বা মত বিনিময়ের কথা উল্লেখ করেছেন। ভারতীয় বিভিন্ন রাজার দরবারে মুসলমান বিচারক বা হনুরমানগণ উচ্চ আসন লাভ করেন। [২]

১। দৈনিক বাংলা, ২৩শে এপ্রিল ১৯৮৬ইং, পৃঃ ৪এ 'হিজরী ৬৯ সনের মসজিদ আবিষ্কৃত' শিরোনামে কুড়ি গ্রাম হতে পাঠানো খবর।

২। কে, এ, নিজামী, প্রাগুক্ত, ভূমিকা।

Dhaka University Institutional Repository

বালাজুরী উল্লেখ করেছেন যে, "উমাইয়া খলিফা উমর বিন আব্দুল আযীয (৭১৭-৭২০ খৃঃ) ভারতীয় রাজাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানিয়ে বহু সংখ্যক পত্র লিখেন"।[১]

রাজশাহী জেলার পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত আব্বাসীয় খলিফা হারুন-অর-রশীদের আমলে (৭৮০-৮০৯ খৃঃ) একটি মুদ্রা সে যুগে বাংলায় স্থল পথে ইসলাম প্রচারের ঐতিহাসিক প্রমাণ বহন করে। ৮ম, নবম ও দশম শতকে চট্টগ্রাম উপকূল থেকে মেঘনার তীর পর্যন্ত এবং স্থল পথে রাজশাহীর পাহাড়পুর ও কুমিল্লার ময়নামতিতে ইসলাম পরিচিতি লাভ করে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

সম্প্রতি কুমিল্লা জেলার ময়নামতিতে খনন কার্যের ফলেও কতিপয় আরবীয় মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। "ধর্ম পালের পুত্র দেবপালের রাজত্বের (৮১০-৮৪৫ খৃঃ) পর ময়নামতিতে শক্তিশালী দেব বংশীয় রাজারা রাজত্ব করেন"।[২] খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে কোন এক সময়ে ঝড়ে একটি আরবদেশীয় বাণিজ্য জাহাজ বঙ্গোপসাগরে ডুবে যায়। আরোহীদের অনেকেই প্রাণ হারায়। যাদের প্রাণ রক্ষা পায় তাদেরকে আরাকান রাজার নিকট উপস্থিত করা হয়। রাজা এদের নিকট ইসলামের বিবরণ শুনে মুগ্ধ হন এবং কয়েকটি পল্লীতে তাদের স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি দেন। এভাবে সপ্তম শতাব্দী থেকে বিভিন্ন সময়ে বঙ্গের অভ্যন্তরে ও আশে পাশে বিভিন্ন এলাকায় মুসলিম ওলী, দরবেশ, আলিম, ফকীহ, মুহাদ্দিছ ও তাবেয়ীদের আগমন ঘটে এবং তাদের মাধ্যমে ইসলাম প্রচার ত্বরান্বিত হয়। [৩]

বঙ্গোপসাগরে মুসলিম বণিকদের জাহাজ ভাঙ্গার ঘটনার সাথে এ মুদ্রাগুলোর সম্পর্ক থাকা বিচিত্র কিছুই নয়। কারণ, স্বাভাবিকভাবেই ধারণা করা যেতে পারে যে মুদ্রাগুলো সেগুলোতে উল্লেখিত সময়েই (৭৮৮ খৃঃ) বাংলায় আনীত হয়েছিল। জাহাজ ভাঙ্গার ঘটনাটিও ঘটে ৭৮৮-৮১০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। সম্ভবতঃ আরব বণিক দল বাংলায় বৃহত্তম নদী গঙ্গার উপকূল বেয়ে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ব্যবসা বাণিজ্য করতেন এবং তাদের মাধ্যমেই পাহাড়পুরের সোমপুর বৌদ্ধবিহারে এ মুদ্রাটি আমদানী হয়।[৪]

১। কে, এ, নিজামী, প্রাগুক্ত, ভূমিকা।

২। আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৭।

৩। ডঃ হাসান জামান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১২; ডঃ আব্দুল করিম, চট্টগ্রামে ইসলাম, পৃঃ ১৫-১৬।

৪। আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

ডঃ এনামুল হক তাঁর 'পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম' গ্রন্থে এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত মন্তব্য পেশ করেছেন, "আমাদের বিশ্বাস কোন ইসলাম প্রচারকের দ্বারা পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহারে খলিফার এ মুদ্রা নীত হয়। সম্ভবতঃ তিনি এই মুদ্রা লইয়া তথায় ইসলাম প্রচার করিতে গমন করেন। তিনি বৌদ্ধদের হাতে প্রাণ হারাইয়া ছিলেন এবং তাঁহার মুদ্রাটি বৌদ্ধ ভিক্ষুদের হস্তগত হইয়াছিল"।[১]

কেউ কেউ মন্তব্য করে থাকেন যে, "চট্টগ্রাম অঞ্চলে আরবীয় মুসলমানগণ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করেছিলেন"।[২] কিন্তু ডঃ আব্দুল করীম তাঁর 'চট্টগ্রামে ইসলাম' গ্রন্থে এ ধারণা সংশয়মুক্ত নয় বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।[৩]

তবে আরব বণিকগণ চট্টগ্রামে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন না করলেও প্রাচীনকাল থেকে আরবদের যোগাযোগের ফলে চট্টগ্রামের সংস্কৃতিতে তাদের গভীর প্রভাব লক্ষণীয়। চট্টগ্রামী ভাষায় প্রচুর আরবী শব্দ ব্যবহৃত হয়। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবী শব্দের তুলনায় এর সংখ্যা দ্বিগুণের চেয়েও বেশী বলা যেতে পারে। চট্টগ্রামী ভাষায় ক্রিয়া পদের পূর্বে 'না' সূচক শব্দের ব্যবহার আরবী ভাষার প্রভাবের ফল। চট্টগ্রামী লোকদের মুখের আদল অনেকেই আরবদের অনুরূপ বলে মনে করেন। চট্টগ্রামে অনেক পরিবার নিজেদেরকে আরব বংশোদ্ভূত বলে দাবী করে। চট্টগ্রামের কোন কোন এলাকা যেমন, আল-করণ, সুলক বহর, খাকালিয়া ইত্যাদি আজও আরবী নাম বহন করছে। এসবই চট্টগ্রাম বা বাংলার উপকূলীয় অঞ্চলের সাথে আরব বণিকদের প্রাচীনতম যোগাযোগের প্রমাণ। "আরবী ভাষা, আরবীয় সংস্কৃতি ও আরবীয় রক্তের মিশ্রণই এ এলাকায় ইসলামের ব্যাপক বিস্তৃতির সহায়ক হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে"।[৪]

যা হোক সপ্তম থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত চারশো বছরের ইসলাম প্রচারের কোন বিস্তারিত বিবরণ তেমন একটা পাওয়া যায় না। এ পর্যন্ত বঙ্গ দেশে স্থল ও সমুদ্রপথে ইসলামের আগমন সম্পর্কে যা কিছু আলোচনা করা হয়েছে তা এ সম্পর্কিত ছিটে ফোটা আভাস ইঙ্গিত ও আন্দাজ অনুমান ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু এ প্রসঙ্গে এর উপর সন্তুষ্টি হওয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই। তবে এটা নিশ্চিত করে বলা যায় যে পাক-ভারত অভিমুখে ইসলামের অভিযান মুহাম্মদ বিন কাসিম হতেই শুরু হয়নি বরং খলিফা ওমরের যুগ হতেই তার সূচনা হয়েছিল। আর এ

১। ডঃ এনামুল হক,পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম,পৃঃ ১২।
২। ডঃ এনামুল হক, আরাকান রাজ সভায় বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ৪।
৩। ডঃ আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬-১৭।
৪। আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃঃ, ৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

সূচনার মধ্য দিয়ে ইসলাম যেমন পাক- ভারতে আত্মপ্রকাশ করেছিল তেমনি আরব বণিক, আরবী নাবিক এবং মুসলমান সাধুদের দ্বারা যে বাংলা দেশেও ইসলাম প্রচার লাভ করেছিল এতে কোনই সন্দেহ থাকতে পারে না। কারণ, ভারতীয় উপমহাদেশে আরবীয় মুসলমানদের অভিযানের মুলে যতটা না রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিহিত ছিল তদপেক্ষা ধর্ম প্রচারের বিষয়টি অগ্রগণ্য ছিল।

ইসলামের মূলনীতি ও প্রধান আদর্শ হচ্ছে অনাবিল একত্ববাদ। নর পূজা, প্রতীক পূজা, অবতারবাদ এবং পৌত্তলিকতার অভিশাপগুলিকে আল্লাহর দুনিয়া হতে ধুয়ে মুছে সেই সর্বশক্তিমান মঙ্গলময় একমাত্র আল্লাহর পূজাকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করা এবং তার সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ মানব সমাজকে তাঁরই নামে এক অবিচ্ছিন্ন ভ্রাতৃ সমাজে পরিণত করা। নবী করীম (সঃ)- এর ইন্তিকালের পর আরবরা নিজেদের আবাসভুমি হতে বের হয়ে পড়েছিলেন প্রধানতঃ এই আদর্শের প্রেরণায় আত্মহারা হয়ে। এদিকে ইঙ্গিত করেই ডঃ ঈশ্বরী প্রসাদ লিখেছেন ঃ The earliest Muslim inavaders of Hindustan were not the Turks but the Arabs who issued out from their desert homes after the death of the great prophet to Spread their doctorine throughout the world, which was according to them, "the key of heaven and hell." Wherever they went their intrepedity and vigour roused to the highest pitch by there proud feeling of a common nationality and their zeal for the faith, enabled the Arabs to make themselves masters of Syria, Palestine, Egypt, Persia, within the short space of twenty years. The conquest of Persia made them think of their expantion eastward and when they learnt of the fabolous wealth and idolatry of India from the merchants who sailed from shiraz and Hurmuz and landed on the Indian coast, they discounted the difficulties and obstacles which nature placed in their way and determined to lead and expedition to India, which at once recieved the sanction of religious enthusiasm and political ambition. The first recorded expedition was sent from Uman to pillage the coast India in the year 636-37 A. D. during the Khilafat of Umar.[১]

এভাবেই একাদশ শতকের আগে থেকেই দেশের বিভিন্ন এলাকায় ইসলাম প্রচারিত হওয়ার সুযোগ হয়েছিল। বস্তুতঃ এগার শতক থেকে সতের শতক পর্যন্ত এই সাত'শ বছর এদেশে ইসলাম প্রচারের সমৃদ্ধ যুগ। এ সময়ে বঙ্গদেশের চারদিকে ইসলামের বাণী ছড়িয়ে পড়ে এবং মুসলমানের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

১। উদ্ধৃতঃ মওলানা আকরাম খাঁ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলায় ইসলাম বিস্তার ও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের পটভূমি

Dhaka University Institutional Repository

বাংলায় ইসলাম বিস্তার ও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের পটভূমিঃ

একথা সর্বজন বিদিত যে ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে (১২০৩খৃঃ) ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী লক্ষ্মৌতিকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে প্রথম মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন করেন। সাধারণ লোকের ধারণা যে তখন থেকেই অর্থাৎ ১২০৪ খৃষ্টাব্দে বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বঙ্গে মুসলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এ দেশে ইসলাম বিস্তৃত হয়েছিল এবং তাদের শক্তি বলেই এ দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এ ধারণা আংশিক সত্য হলেও পুরোপুরি সত্য নয়। মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার সাথে ইসলাম বিস্তৃতির ইতিহাস বহুল পরিমাণে জড়িত এর পেছনে ঐতিহাসিক স্বীকৃতি থাকলেও প্রাচীন যুগে এর সাথে মুসলিম শাসনের কোন সংশ্রব ছিলনা। কেননা, ত্রয়োদশ শতাব্দীর অনেক আগেই এ দেশের বিভিন্ন স্থানে ইসলাম বিস্তৃত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে ডঃ এনামুল হক বলেছেন, "ইত্যাকার ধারণাসমূহের মূলে যে ঐতিহাসিক সত্য একেবারেই নাই, সে কথা বলিলে প্রকৃত ইতিহাসকে অনেকখানি অবমাননা করা হয়, তবে এ সত্যের পরিমাণ নিতান্তই অল্প। এ দেশে ইসলাম বিস্তৃতির ইতিহাস মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার সহিত নানা পরিসরে বহুল পরিমাণে বিজড়িত হইলেও প্রাচীনতম যুগে ইহার সহিত মুসলিম শাসনের কোন সংশ্রব ছিলনা। কেননা, তুর্কী শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বেও এ দেশের নানা স্থানে ইসলাম বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। বাস্তবিকই ইতিহাস অনভিজ্ঞতার ফলে লোকের পূর্ব বিশ্বাস আজও এত বলবৎ"।[১]

বঙ্গে তুর্কী শাসন প্রতিষ্ঠাকালে সমগ্র উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব বঙ্গ মুসলমানদের করতলগত হয়েছিল কিনা তা বলা যায়না। এর প্রায় তিন শতাব্দীকাল আগে থেকেই বঙ্গে মন্থরতম গতিতে ইসলাম বিস্তৃত হতে থাকে। ১২০৩ খৃষ্টাব্দে বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের পর থেকে এদেশে ইসলাম রাজশক্তি হিসাবে আত্ম প্রকাশ করে। "তখন থেকে শুরু করে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে নবাব সিরাজ উদ্দৌলার পতন পর্যন্ত সাড়ে পাঁচশ বছর প্রায় অবিচ্ছিন্নভাবে মুসলমান সুলতান , সুবেদার ,নবাব, নাজিম বাংলাদেশে রাজত্ব করেন। মাঝখানে রাজা গনেশ চার বছর (১৪১৪-১৪১৮ খৃঃ) স্বাধীনভাবে বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রাজা তোডরমল (১৫৮০-৮২ খৃঃ) এবং মানসিংহ (১৫৮৯-৯৬ খৃঃ) বাংলাদেশ শাসন করেছিলেন; কিন্তু তারা ছিলেন আকবরের প্রতিনিধি নাজিম"।[২]

---

১. ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হক, পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম, আদিল ব্রাদার্স এ্যান্ড কোং পাটুয়াটুলি, ঢাকা, ১৯৪৫ইং, পৃঃ ১০।

২. ডঃ ওয়াকিল আহমদ, উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩ ইং, পৃঃ ১।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ বিজিত হওয়ার অনেক আগে ৮ম শতকের গোড়ার দিকে উত্তর ও উত্তর পশ্চিম ভারতে আরবীয় মুসলমানদের আগমন ঘটে। ক্রমে তারা ভারতের অধিশ্বর হন। এ প্রসঙ্গে আব্দুল মওদুদ বলেন, "খৃষ্টীয় আট শতকের প্রথমেই আরব ও দশ শতকের শেষের দিকে তুর্কী, ইরানী ও আফগানী প্রভৃতি ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানবগোষ্ঠী পাক ভারতের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন পথে আগমন করত ও স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে। কালক্রমে তারা সমগ্র উপ-মহাদেশটিতে ছড়িয়ে পড়ে, সিলেট থেকে কুমারিকা পর্যন্ত। তারা শুধু স্থায়ী বাসিন্দা হয়েই নিশ্চেষ্ট থাকেনি, এ উপ-মহাদেশের মহাশক্তিধর শাসক হিসাবে একচ্ছত্র শাসনদন্ড পরিচালনা করেছে প্রায় সাত শতাব্দী ধরে এবং একটা গৌরবমন্ডিত মানবগোষ্ঠী হিসাবে বিশ্বের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় স্বাক্ষর প্রতিষ্ঠিত করেছে।"[১]

প্রাচীনতম কালে এদেশে ইসলাম বিস্তৃতির মূল উৎস ছিল আরব দেশ। আরবের সাথে বঙ্গের প্রাচীন সম্বন্ধ খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর শেষপাদ বলে অনুমান করা হয়। বিভিন্ন তথ্যসূত্রে তা আজ প্রমাণিত হচ্ছে। বিভিন্ন ঐতিহাসিক আজ এ কথা স্বীকার করে নিচ্ছেন। ইতিপূর্বে বাংলাদেশে ইসলামের আগমন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বিভিন্ন তথ্যসূত্রে প্রমাণ করতে চেষ্টা করা হয়েছে যে, কেবল ৮ম শতাব্দীর শেষপাদেই নয়, মহানবী (সঃ)-এর জীবদ্দশায়ই ভারতীয় উপমহাদেশ তথা বাংলাদেশের সমুদ্রোপকূলীয় অঞ্চলে ইসলামের (মানবিকতার) ঢেউ এসে লেগেছিল। এ সম্পর্কে যা কিছু আলোচনা করা হয়েছে, তা শুধু আভাস ইঙ্গিত ও আন্দাজ অনুমানের উপর ভিত্তি করেই করা হয়েছে। কেননা, খৃষ্টীয় সপ্তম থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত চারশত বছরের ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারের কোন বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে বাংলায় ইসলাম প্রচারের ইতিহাস একাদশ থেকে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত সাতশত বছর একটি চিহ্নিত সময়কাল। এ সময় ইসলাম বাংলার চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হয় এবং অচিরেই এ উর্বর এলাকায় শ্রেষ্ঠ ধর্মের রূপ লাভ করে।[২]

বাংলাদেশে ইসলামের আগমন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বিভিন্ন আভাস ইঙ্গিত দিয়ে দেখানো হয়েছে যে এ দেশে ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছে আরবে ইসলাম প্রচারের সাথে সাথেই। তবে এ সম্পর্কিত ঐতিহাসিক কোন দলিল বর্তমান না থাকলেও পাক ভারতে তথা বিভাগ পূর্ব বাংলাদেশে ইসলামের আগমন কোনও আকস্মিক ঘটনা নয়। পাক ভারতের পশ্চিম উপকূলে আরব সাগর অবস্থিত এবং এই সংকীর্ণ জলভাগ অতিক্রম করলে পশ্চিম পার্শ্বে আরব উপদ্বীপের সাক্ষাত মেলে। পুরাকালে এই জলভাগের বিস্তার খুব বেশী ছিল না এবং এই জলপথ বেয়ে আরব ও পাক ভারতের পশ্চিম উপকূলের বাণিজ্যিক

---

১. আব্দুল মওদুদ, মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশঃ সংস্কৃতির রূপান্তর, পৃঃ ৪।
২. আব্দুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশে ইসলাম, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮০ইং, পৃঃ ৬২।

Dhaka University Institutional Repository

সংযোগ ছিল। হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর একটি উক্তিতে ভারতের উল্লেখ আছে[১] ও জনৈক হিন্দের কথাও আছে। তাঁর ওফাতের পর স্বল্পকালের মধ্যেই ইরান থেকে স্পেন পর্যন্ত ইসলামের বিস্তৃতি ঘটে ও বিদ্যুৎগতিতে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। সওদাগরদের মারফত ইসলামের নাম পাক-ভারতেও শ্রুত হয় স্বল্পকালের মধ্যেই। এমনকি এমন প্রমাণও পাওয়া গেছে যে,"দ্বিতীয় পুলকেশিনের শাসনকালে বোম্বাই এর নিকট থানায় আরব সৈন্য হানা দিয়েছিল (৬৩৭ খৃঃ) হযরত ওমর খেলাফত আমলে"।[২]

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এ দেশে ইসলাম রাজশক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ লাভ করার পূর্বে ইসলাম যে মন্থরতম গতিতে বিস্তৃতি লাভ করেছিল সে সম্পর্কিত কিছু প্রমাণ -তথ্য ও নমুনা পেশ করা হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রাজশাহী জেলার অন্তর্গত পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহারে ধ্বংস স্তুপে আবিস্কৃত ও কুমিল্লার ময়নামতিতে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে প্রাপ্ত আব্বাসীয় খলিফা হারুন অর রশীদ (৭৮৬-৮০৬ খৃঃ)-এর রাজত্বকালের মুদ্রা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অতএব, তখন থেকেই বাংলাদেশে কিভাবে ইসলাম দ্রুত প্রসার লাভ করল এবং মুসলমানেরা একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতিতে পরিণত হল বক্ষমান আলোচনায় সে সম্পর্কেই আলোকপাত করা হল।

সমগ্র বাংলাদেশে মুসলমানেরা কিভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ে পরিণত হল, এটি একটি বিতর্কিত প্রশ্ন। তবে, ঐতিহাসিকেরা মোটামোটিভাবে একমত যে পাক-ভারতীয় উপ-মহাদেশে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে প্রধানত তিনটি কারণে- (১) বহিরাগত মুসলমানদের আগমন ও এ দেশে স্থায়ী ভাবে বসবাস, (২) ধর্মান্তরকরণ এবং (৩) জন্মহার বৃদ্ধি।[৩] ধর্মান্তরকরণ ঘটেছে কিছুটা মুসলমান শাসকদের প্রভাবে, প্রলোভনে ও সরকারের প্রতিপত্তি তথা মর্যাদা লাভের আকর্ষণে, কিন্তু ইসলাম প্রধানতঃ এ দেশে বিস্তার লাভ করেছে মুসলিম সূফী দরবেশ ও ধর্ম নেতাদের প্রচার কার্যে।[৪] তবে এ সম্পর্কিত সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করাতে হলে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে অষ্টম শতাব্দীতে এ দেশে ইসলাম

---

১. মহানবী (সঃ) এর বাণী,"আমার উম্মতের মধ্যে দুটি সেনা দলকে আল্লাহ তায়ালা জাহান্নামের আগুন থেকে নিস্কৃতি দেবেন। তার মধ্যে একটি হচ্ছে ভারত আক্রমণকারী সেনাদল, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে ঈসা ইবন মরিয়ম (আঃ) এর সহযোগী সেনাদল"।

২. আব্দুল মওদুদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭।

৩. আব্দুল মওদুদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১।

৪. আব্দুল মওদুদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯।

Dhaka University Institutional Repository

বিস্তৃতির ইতিহাসে। এ কথা আজ দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে জলপথে এবং অষ্টমশতাব্দীর প্রথমপাদে স্থলপথে বাংলাদেশ ইসলামের সংস্পর্শে আসতে থাকে। কিন্তু এ সময়কার তেমন কোন ঐতিহাসিক বিবরণ বর্তমান না থাকায় প্রমাণ করা যাচ্ছেনা যে এ দেশে কোন পর্যায়ে ইসলামের আগমন হয়েছিল, কারা ইসলাম প্রচারে নিবেদিত প্রাণ ছিলেন এবং বাংলার মানুষের মধ্যে ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে কি পরিমাণ সাড়া পাওয়া গিয়েছিল। তবে একাদশ শতক থেকে এ দেশে ইসলাম প্রচারের কিছু কিছু ঘটনা আমরা জানতে পারি, যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে একাদশ শতকের অনেক পূর্ব থেকেই বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় ইসলামের যথেষ্ট প্রচার হয়েছিল। আর এর সূচনা হয়েছিল বাণিজ্য পথে।

ইসলামের আবির্ভাবের বহু পূর্ব থেকেই আরববাসীরা ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষ্যে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করতে অভ্যস্ত ছিলেন। ইসলাম তাদের এই উদ্যমকে দমন করেনি বরং ইসলাম ও কুরআনের শিক্ষার প্রভাবে অল্পকালের মধ্যেই তা আরো বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফলে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকেই দলে দলে আরব বণিকগণ মৌসুমী বায়ু ভর করে অসীম সাহসে দুনিয়ার বিভিন্ন সাগরে-সমুদ্রে তাদের বাণিজ্য পোত চালিয়ে দূর দেশান্তরে গমনা-গমন করতে থাকেন।

অতএব, "বহির্বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সহিত আরবদের যোগাযোগের প্রধান পথ ছিল সমুদ্রপথ এবংএই পথেই আরবেরা বিভিন্ন দেশের সহিত যোগ-সূত্র স্থাপন করেন। আবিসিনিয়ায় আরবের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল এবং আরবরা সমুদ্র পথেই তথায় গমনাগমন করতেন, ভারত মহাসাগর অতিক্রম করে চীন সমুদ্রে জাহাজ পরিচালনা করতঃ আরবেরা মহাচীনে নির্মিত দ্রব্য স্বদেশে আনয়ন করতেন"।১

"আরব সাগর পাড়ি দিয়ে চীন সমুদ্রে জাহাজ পরিচালনার পর তারা দক্ষিণ বাংলার বন্দরে নোঙ্গর করত এবং সেখানে অবস্থান কালে তারা ইসলাম প্রচার করতেন। এভাবে আরবদের সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রসার হওয়ার সাথে সাথে এ উপ-মহাদেশের উপকূল অঞ্চলে অবস্থিত প্রসিদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্রগুলোর আশে-পাশে আরবদের স্থায়ী উপনিবেশও গড়েছিল"।২ "দক্ষিণ ভারতের মালাবার, কালিকট, চেরর এবং চট্টগ্রাম ও আরাকান উপকূলে আরব জনগণের এরূপ বসতি ইসলাম পূর্ব কয়েক শতাব্দী আগ থেকেই গড়ে উঠেছিল বলে বহু প্রমাণ রয়েছে"।৩

---

১. মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, আজাদ অফিস, ঢাকেশ্বরী রোড, ঢাকা, ১৯৬৫ ইং, পৃঃ ৬০।

২. মুহিউদ্দিন খান, বাংলাদেশে ইসলামঃ কয়েকটি তথ্যসূত্র, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, এপ্রিল - জুন সংখ্যা, ১৯৮৮ ইং, পৃঃ ৩৪৬।

৩. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখা যেতে পারে মাওলানা সৈয়দ সুলায়মান নদভীর বিখ্যাত গবেষণা গ্রন্থ আরবও হিন্দকি তায়াল্লুকাত।

Dhaka University Institutional Repository

এ কথা আজ প্রমাণিত যে বাংলাদেশে ইসলাম প্রথম এসেছে সমুদ্রপথে, স্থলপথে নয়। তাই বাংলাদেশে ইসলাম বিস্তৃতির ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে সমুদ্র পথে, স্থল পথে নয়। তাই বাংলাদেশে ইসলাম বিস্তৃতির ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই আসে চট্টগ্রামের কথা। কেননা, এ দেশে ইসলাম বিস্তৃতির আদি যুগে চট্টগ্রাম অঞ্চলে যেরূপ নিয়মিত ও ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচারিত হয়েছিল, বাংলার আর কোন অঞ্চলে সেরূপভাবে তখন ইসলাম প্রচারিত হয়েছিল বলে এ পর্যন্ত জানা যায়নি। তবে দেখা যায় যে এ সময়ে বঙ্গের নানা অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্নভাবে ইসলাম প্রচারের প্রচেষ্টা চলেছে।

সুতরাং দেখা যায়, বাংলাদেশের সমুদ্রোপকুলবর্তী অঞ্চলের সাথে আরবদের সম্পর্ক অতি প্রাচীন। সিন্ধুদেশ, মালদ্বীপ, লাক্ষাদ্বীপ, সন্দ্বীপ, জাভা, সুমাত্রা, বোর্ণিও ও মালয় উপকূলে যেমন আরবীয় বণিকগণ ইসলামের বাণী বহন করে নিয়ে যান বাংলাদেশেও তেমনি তারা মুসলিম শাসনের অনেক আগেই ইসলামের বাণী বহন করে এনেছিলেন। বাংলার যে অংশের সাথে আরবীয় বণিকদের প্রাচীনতম সম্বন্ধ স্থাপিত হয় তা-ই আজ আধুনিক চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগের সমুদ্রোপকুলবর্তী স্থান নামে পরিচিত। খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দী হতে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপ পুঞ্জের সহিত প্রাচীন আরবদের যে বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তার ফলে পূর্ব ভারতের একমাত্র বন্দর চট্টগ্রাম আরবদের একটি বিশ্রাম স্থান ও ঔপনিবেশে পরিণত হয়েছিল"।[২] বর্তমান ইতিহাসেও এর প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। বাংলার উপকুল থেকে নিয়ে অভ্যন্তর ভাগ পর্যন্ত আরব বণিকদের যাতায়াত সম্পর্কে ডঃ এনামুল হক-সুলায়মান (৮৫১ খৃঃ জীবিত), আবু জায়দুল হাসন (সুলায়মানের সমসাময়িক), ইবন খুরদাদবা (মৃঃ ৯১২ খৃঃ), আল মাসুদী (মৃঃ ৯৫৬ খৃঃ), ইবন হাওকল (৯৭৬ খৃঃ), আল ইদ্রিসী (জন্ম-একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ) প্রভৃতি প্রাচীন আরব পরিব্রাজক ও ভৌগোলিকদের মতামত উদ্ধৃত করে গঙ্গার এ ব-দ্বীপ অঞ্চলের সাথে আরব বণিকদের প্রাচীন সম্পর্কের কথা প্রমাণ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, "আরাকান হইতে মেঘনা নদীর পূর্ববর্তী বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগটি খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে আরব বণিকদের কর্মতৎপরতায় ভরপুর হইয়া উঠেছিল।" [২]

---

১. ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২।

২. ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫।

৩. ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫।

Dhaka University Institutional Repository

একথা সত্য যে কেবল ব্যবসা-বাণিজ্য করাই মুসলিম বণিকদের লক্ষ্য ছিল না, এ সঙ্গে নিজেদের উপর অর্পিত ইসলাম প্রচারের দায়িত্বও পালন করে যেতেন। প্রত্যেক মুসলমান স্বধর্ম প্রচারক, একথা প্রাচীন আরবদের জীবনে, কর্মে ও চিন্তায় প্রকাশ পেয়েছে। তাই তারা যে সত্যের আলোকে নিজেদের হৃদয়দেশ উদ্ভাসিত করেছে অন্ধকারে নিমজ্জিত দুনিয়ার প্রতিটি মানুষকে সেই আলোকের সন্ধান দেয়া তারা নিজেদের ধর্মীয় ও মানবিক কর্তব্য বলে মনে করতেন এবং বাণিজ্যের পাশাপাশি স্বধর্ম প্রচারে ব্রত থাকতেন। ফলে, এসব অঞ্চলে দ্রুত ইসলাম বিস্তার লাভ করে এবং মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

ইসলামের প্রাথমিক যুগেই চট্টগ্রামে ইসলাম বিস্তৃতি লাভ করে। "তৎকালে আরবেরা যে যে স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন, সেখানেই তারা বিভিন্ন কায়দায় ইসলাম প্রচার করেছিলেন। আরবীয় বণিকগণ স্ত্রী পরিজন নিয়ে কোথাও দূরদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন বলে জানা যায় না। যে স্থানে তারা বসতি স্থাপন করেছিলেন, তথায় স্থানীয় রমণীদের পাণি গ্রহণ করে বসবাস করেছেন। এই স্থানীয় রমণীদিগকে ইসলামে দীক্ষিত না করে তারা কখনও বিয়ে করেন নি। সুতরাং, এভাবেও এ অঞ্চলে ইসলাম বিস্তৃত হয়। এছাড়াও আরবীয় বণিকগণ যে সকল স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করতেন সে সকল স্থানে তারা নিজ দেশীয় প্রথানুযায়ী মুসলিম উপনিবেশিক ও স্থানীয় নব দীক্ষিত মুসলমানদের সুখ সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য এক একজন 'আমীর' বা নেতা নিযুক্ত করতেন। এই আমীর কোন কোন স্থানে শক্তিশালী হয়ে উঠার পর 'সুলতান' বা রাজা পদবী গ্রহণ করে রাজদন্ড পরিচালনা করতেও কুণ্ঠিত হতেন না"।[১]

ডক্টর আব্দুল করিম তাঁর 'চট্টগ্রামে ইসলাম' ও ডক্টর এনামুল হক তাঁর 'পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম' নামক গ্রন্থদ্বয়ে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দির মধ্যেভাগে আরব উপনিবেশকে কেন্দ্র করে একটি ক্ষুদ্র আরব রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল বলে ধারণা পোষণ করেছেন। মেঘনা নদীর পূর্বতীর হতে নাফ নদীর তীরবর্তী সমুদ্রোপকূলস্থিত ভূ-ভাগ তখন এই আরব সুলতানের অধীন ছিল বলে ডক্টর এনামুল হক সম্ভাবনা ব্যক্ত করেছেন এবং এর স্বপক্ষে যুক্তি পেশ করে বলেছেন, "আরাকান রাজ্যের উত্তর উপকণ্ঠে একটি মুসলমান রাজ্য গড়িয়া উঠার ন্যায় আশংকাজনক ব্যাপার আরাকান রাজা সহ্য করেন নাই। তাই দেখিতে পাই, খৃষ্টীয় ৯৫৩ অব্দে রোসাঙ্গ (আরাকান) রাজ সুলতৈং চন্দয় (৯৫১-৫৭ খৃঃ) স্বীয় রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া বাঙ্গালা অভিমুখে বহির্গত হইয়া'থুরতন'কে পরাজিত করেন

---

১. ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১।

Dhaka University Institutional Repository

এবং স্বীয় দিগ্বিজয়ের স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ চেত্তাগৌং অর্থাৎ চট্টগ্রাম নামক স্থানে এক প্রস্তর নির্মিত বিজয় স্তম্ভ স্থাপন করিয়া পাত্র-মিত্রের অনুরোধে ফিরিয়া যান। এই চেত্তাগৌং তাঁহার বিজিত স্থানের শেষ সীমা ছিল। কারণ, আরাকানের জাতীয় ইতিহাসের মতে 'চেত্তাগৌং' শব্দের অর্থ 'যুদ্ধ করা অনুচিত' বলিয়া রাজা সুলতৈং চন্দয় যেখানে পৌঁছিয়া যুদ্ধ করা অনুচিত বিবেচনা করিয়াছিলেন, সেখানেই বিজয় স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন" ।[১] অতএব, এভাবে রাজশক্তি প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাসহ চট্টগ্রাম অঞ্চলে আরব প্রভাবের ফলে ইসলামের বিস্তৃতি ঘটে এবং মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এ সময় হতে চট্টগ্রামের সাথে আরবদের যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল তা ধীরে ধীরে মুছে না গিয়ে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফখরুদ্দীন মুবারক শাহের (১৩৩৬-৫২ খৃঃ) রাজত্বকালে ১৩৪৬ খৃষ্টাব্দে ইবনে বতুতা চট্টগ্রাম ভ্রমণ করতে এসে অনেক মুসলমান দেখেছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে পর্তুগীজ ভ্রমণকারী বার্বোসা পূর্ব বঙ্গের সামুদ্রিক বন্দরগুলিতে অনেক আরবী, ফার্সী ও হাবসী দেখেছিলেন।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে আরবীয় বণিকগণ বাণিজ্য ব্যাপদেশে বাংলাদেশের সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে আগমন করে স্থানীয় লোকদেরকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। তাছাড়াও বহু আরবীয় সাধু ও ধর্ম প্রাণ ব্যক্তি ইসলাম প্রচারের জন্য আরব দেশ থেকে নানা দিগ্বিদেশে ছড়িয়ে পড়েন। চট্টগ্রামেও এ ধরনের সাধু পুরুষ ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির আগমন ঘটে বলে জানা যায়। চট্টগ্রাম রেল ষ্টেশনের উত্তর পার্শ্বস্থ কুমাদান পাহাড়ের উপর এরূপ অনেক প্রাচীন আরবীয় সাধু পুরুষের কবর আছে বলে উল্লেখ করা হয়। এ সময়ে সুলতান বায়জিদ বিস্তামী নামে একজন ঐতিহাসিক সাধকের চট্টগ্রাম আগমনের কথা জানা যায়। ৮৭২/৮৭৪ খৃষ্টাব্দে তিনি পারস্যের বিস্তাম নগরে ইন্তিকাল করেন ও সমাহিত হন। চট্টগ্রাম শহর হতে প্রায় পাঁচ মাইল উত্তরে নাসিরাবাদ গ্রামের এক পর্বত চূড়ায় তাঁর একটি স্মারক সমাধি তাঁর চট্টগ্রামে আগমনের স্মৃতি বহন করছে। তিনি এ অঞ্চলে আগমন করে ইসলাম প্রচার করেন। ফলে এখানে জনবসতি গড়ে উঠে।[২] "ত্রয়োদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে শায়খ ফরীদুদ্দীন নামে একজন ধর্মপ্রচারক চট্টগ্রামে এসেছিলেন এবং এখানে কিছু দিন অবস্থান করে ইসলাম প্রচার করেন। পরে ফরিদপুর জেলা ভ্রমণ করে সেখানে ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচার করেন" ।[৩]

---

১. ডঃ এনামুল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭-১৮।

২. আব্দুল মান্নান তালিব,প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৩-৯৪।

৩. আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়াও খৃষ্টীয় চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে অনেক আরবীয় ইসলাম প্রচারে চট্টগ্রামে আগমন করেন। ফখরুদ্দীন মুবারক শাহের (১৩৩৬-৫২ খৃঃ) রাজত্বকালে তাঁর চট্টলা বিজয়ী সেনাপতি কদল খাঁ গাজী চট্টগ্রাম জয় করার পর একদল সাধু পুরুষের সাক্ষাত লাভ করেছিলেন। তন্মধ্যে হাজী খলিল ও বদর আলমের নাম উল্লেখযোগ্য।[১] "১৫০৫ খৃষ্টাব্দে শায়খ জালাল হবশী নামে আলেমের আরো এক ধর্ম প্রচারক চট্টগ্রাম এসে ইসলাম বিস্তারে প্রানান্ত ভূমিকা পালন করেন। ১৫৫৭ সালে তিনি ওফাত পান। বখৎপুর গ্রামে তাঁর অনেক বংশধর বাস করেন"।[২]

চট্টগ্রামের ন্যায় বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্নভাবে তখন ইসলাম বিস্তার লাভ করে। তন্মধ্যে বগুড়ার মহাস্থান এর নাম অন্যতম। এটা বরেন্দ্র ভূমির প্রাচীন রাজধানী এবং হিন্দুদের একটি প্রাচীন তীর্থক্ষেত্র। উত্তর বঙ্গের এ প্রাচীন মহানগরীতে পরশুরাম নামে এক রাজা রাজত্ব করছিলেন। তখন শাহ সুলতান বলখী মাহীসাওয়ার নামে এক দরবেশ এখানে আগমন করেন। ইসলাম প্রচার করার জন্য জলপথে মৎস্যারোহণ করে বঙ্গ দেশে যাত্রা করেন এবং সরন্দীপে (সম্ভবতঃ বর্তমানে সন্দ্বীপ) পৌঁছেন। সেখান থেকে তিনি হরিরাম নগরে উপস্থিত হন। হরিরাম নগরে এসে তিনি সোজাসুজি কালী ভক্ত রাজা বলরামের কালী মন্দিরে গিয়ে আযান দেন। আযানের ধ্বনীতে মন্দিরের সকল মুর্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। এতে ভীত হয়ে তাঁকে তাড়াতে গিয়ে রাজার সাথে তাঁর যুদ্ধ বাধে। যুদ্ধে রাজা নিহত হন এবং তাঁর মন্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করে রাজপদে বহাল থাকেন।

হরিরাম নগরে অবস্থান কালেই তিনি বগুড়ার মহাস্থানের অত্যাচারী রাজা পরশুরামের কথা জানতে পারেন। রত্মামনি নামে রাজার এক কন্যা ছিল এবং যাদু বিদ্যায় পারদর্শিনী যোগসিদ্ধা বোন ছিল। রাজা তার আরাধ্যা দেবী কালী করালীর মন্দিরে প্রতি বছর একটি করে নরবলী দিত। হরিরাম নগরে বসে শাহ সুলতান তাদেরকে ইসলামে দীক্ষিত করার মনস্থ করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি মহাস্থান অভিমূখে রওয়ানা হলেন। মহাস্থান পৌঁছে তিনি রাজার নিকট নিজের ক্ষুদ্র জায়নামাযটি বিছাবার উপযোগী এক চিলতে জায়গা চান। রাজা তাঁকে জায়গা দিলেন। সবাইকে অবাক করে দরবেশের জায়নামাযখানা প্রসারিত করার সাথে সাথেই রাজ প্রাসাদের চতুর্দিকের সমস্ত জায়গা ঘিরে ফেলল। এ আশ্চর্য ঘটনায় ভীত হয়ে রাজা বোন শীলা দেবীর কাছে এ ঘটনা প্রতিরোধের পরামর্শ চাইলেন।

---

১. ডঃ এনামুল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২।

২. ডঃ এনামুল হক, প্রাগুক্ত,পৃঃ ২২।

Dhaka University Institutional Repository

শীলাদেবী রাজাকে যাদুর সাহায্যে দরবেশকে পরাস্ত করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু দরবেশের বিরুদ্ধে তার সমস্ত যাদু ও তান্ত্রিক অস্ত্র দরবেশের কেরামতির সামনে বিফলে গেল। শীলাদেবী পরাজিত ও ভীত হয়ে কালীদেবীর মন্দিরে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিলেন। "রাজা দরবেশকে শান্তিপূর্ণভাবে দেশ থেকে বহিষ্কার করতে অক্ষম হয়ে সেনাবাহিনীর আশ্রয় নিলেন। কিন্তু যুদ্ধে রাজা পরাজিত ও নিহত হন। পরে তাঁর মন্ত্রীও নিহত হন। যুদ্ধ বিজয়ী দরবেশ শীলাদেবীর সন্ধানে রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন এবং রাজ কন্যা রত্মমনিকে ইসলামে দীক্ষিত করেন। পরে শীলাদেবী পলায়নকালে করতোয়া নদীতে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। করতোয়ার যে স্থানে শীলাদেবী আত্মহত্যা করেন, তা আজও শীলাদেবীর ঘাট নামে পরিচিত। অতঃপর দরবেশ পরশুরামের সেনাপতি ও অন্যান্য বহু হিন্দুকে ইসলামে দীক্ষিত করেন। তিনি পরশুরামের সেনাপতি সুরখাবের সাথে রত্মমনির বিবাহ দেন"।[১] এভাবে মহাস্থানে ইসলাম বিজয়ীর আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়। মহাস্থান বিজয়ের পর দরবেশ সেখানে একটি মসজিদ ও আস্তানা নির্মাণ করেন। এস্থান থেকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত তিনি ইসলাম প্রচার করেছিলেন এবং মৃত্যুর পর এখানেই সমাহিত হন।[২]

এরপর ধর্ম প্রচারকদের প্রানান্ত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের যে অঞ্চলে ইসলাম প্রচার ও বিস্তার লাভ করে এবং মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় তার মধ্যে বর্তমান বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনার (বর্তমানে জেলা) মদনপুর উল্লেখযোগ্য। এ অঞ্চলে তখন এক কোচ রাজা রাজত্ব করতেন। তার রাজত্বকালে শাহ মুহাম্মদ সুলতান রুমী নামে একজন দরবেশ তাঁর গুরু সুরখখোল আস্তিয়াসহ ১০৫৩ খৃষ্টাব্দে মদনপুরে আগমন করেন। কথিত আছে যে ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম প্রতিপন্ন করার মানসে রাজা দরবেশকে সভায় বিষ পান করতে দিয়েছিলেন। দরবেশ পরিবেশিত বিষের অধিকাংশই আল্লাহর নাম বলে পান করেন এবং অবশিষ্টাংশ অল্প অল্প করে তাঁর উপস্থিত শিষ্যদের মধ্যে বিতরণ করে দেন। এতে কারো শরীরে কোন প্রকার বিষক্রিয়া না হতে দেখে রাজা দরবেশের মাহাত্মে মুগ্ধ হয়ে পড়েন এবং আরো নানা পরীক্ষার পর তিনি ইসলামে দীক্ষা লাভ করেন। সমগ্র মদনপুর গ্রাম দরবেশের নামে পীরোত্তর স্বরূপ দান করে দিলেন। "এই পীরোত্তরকেই ১৬৭১ খৃষ্টাব্দে শাহ্ শূজা বহাল করেছিলেন"।[৩]

---

১. আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৬-৬৭।

২. আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬১।

৩. আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

এরপর ইসলাম প্রচারে যার নাম সর্বাগ্রে আসে, তিনি হলেন বাবা আদম। তিনি রাজা বল্লাল সেনের রাজত্বকালে (১১৫৮-৭৯ খৃঃ) কিছু সংখ্যক অনুচরসহ তৎকালীন ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের আবদুল্লাহপুরে আগমন করেন এবং নিজের আধ্যাত্মিক শক্তি ও ইসলামের অন্তর্নিহিত অনাবিল সত্যের জোরে পৌত্তলিকতার এ কেন্দ্রভূমিতে আল্লাহ পাকের একত্ববাদ প্রচার করেছিলেন।১

জানা যায়, রাজা বল্লাল সেনের রাজত্বকালে (১১৫৮-৭৯ খৃঃ) গো-কোরবানীর অপরাধে নির্যাতিত জনৈক হজ্জযাত্রীর মুখে তার নির্যাতনের কাহিনী শুনে বাবা আদম একটি ক্ষুদ্রাকারের সেনাবাহিনী নিয়ে ঢাকা বিভাগের বিক্রমপুর জেলার অন্তর্গত আবদুল্লাহপুর গ্রামে উপস্থিত হন। সেখানে তাবু স্থাপনের পর আহার্যের জন্য তাঁর সৈন্যগণ একটি গরু জবেহ করেন। মুসলিম শিবির থেকে এক টুকরা গো-মাংস চীল কর্তৃক রাজপুরীতে নিক্ষিপ্ত হয়। এতে স্বীয় রাজ্যে গো-বধ করার অপরাধের শাস্তি প্রদান করতে রাজা বল্লাল সেন যবন তথা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। পক্ষকালব্যাপী সর্বাত্মক যুদ্ধ চালিয়েও যখন মুসলমানদের সাথে হিন্দু সেনাবাহিনী পেরে উঠছিল না, একের পর এক বিপর্যয় ঘটতে থাকল, তখন রাজা হতাশ হৃদয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুতি নিলেন। 'যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হলে 'দুরাত্মা যবনের' হাতে রাজ পরিজনবর্গ অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে' এ আশংকায় রাজা যুদ্ধ যাত্রার প্রাক্কালে রাজান্তঃপুরে চিতা প্রজ্জ্বলিত করে রেখে স্বীয় পরিজন বর্গকে আদেশ দিলেন যে তারা যেন তার পরাজয় সংবাদে চিতার জ্বলন্ত আগুনে প্রাণপাত করেন। পরিজনবর্গকে যথাশীঘ্র সংবাদ প্রদানের উদ্দেশ্যে এক জোড়া সংবাদবাহী কবুতর পোশাকের নিচে সংগোপনে রেখে দিলেন।

যুদ্ধে রাজা বিজয় লাভ করেন। একে একে সমস্ত মুসলিম বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। সর্বশেষ বাবা আদম অন্তিম নামায সমাধান্তে রাজার হাতে শহীদ হন। বাড়ী ফেরার পূর্বে রাজা বস্ত্র খুলে নিকটবর্তী কোন পুকুরে গোসল করতে যান। এ অবসরে কবুতর যুগল রাজার অজ্ঞাতসারে রাজধানীতে পালিয়ে যায়। এতে অন্তঃপুরের মহিলারা রাজার পরাজয় ঘটেছে মনে করে চিতায় আত্মবিসর্জন করেন।

---

১. আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭০।

Dhaka University Institutional Repository

রাজা গোসলান্তে যখন জানতে পারলেন যে কবুতর যুগল পলাতক, তখন তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে দেখলেন, ইতিমধ্যে সকলেই পুড়ে ভস্ম হয়েছে। এতে মর্মাহত হয়ে রাজাও স্বয়ং পুড়ে মরলেন[১] এবং লোকমুখে 'পোড়া' রাজা উপাধী লাভ করেন। অন্যদিকে রাজার হস্তে নিহত হয়ে বাবা আদম 'শহীদ' উপাধী লাভ করলেন। তিনি শাহাদাৎ বরণ করলেও তাঁর সাধনা ও আদর্শ সফল হয়। সমগ্র এলাকায় ইসলাম বিজয় লাভ করে। আব্দুল্লাহপুরে দরবেশের মাজার অবস্থিত। মাজারের অদূরে 'আদম শহীদের মসজিদ' নামে একটি জীর্ণ প্রায় মসজিদও দেখা যায়। মসজিদটিতে একটি আরবী লিপি উৎকীর্ণ রয়েছে। জালালুদ্দীন ফতেহ শাহের আমলে (১৪৮২-৮৭ খৃঃ) উৎকীর্ণ উক্ত শিলা লিপি থেকে জানা যায় যে ৮৮৮ হিজরী সনে (১৪৮৩ খৃঃ) কাফুর নামক জনৈক ব্যক্তি কর্তৃক মসজিদটি নির্মিত হয়। [২]

বাবা আদমের পর ঢাকায় শাহ নিয়ামুতুল্লাহর আগমনের মাধ্যমে ইসলামের বিস্তার ঘটে। তিনি 'মূর্তিনাশক' পীর নামে খ্যাত। তিনি কোথা থেকে ঢাকা আগমন করেছিলেন সে সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। যতদুর জানা যায়, পূর্ববঙ্গে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার বহু পূর্বে তিনি ঢাকা অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন।

কিংবদন্তীতে জানা যায় যে শাহ নিয়ামুতুল্লাহ ঢাকার সন্নিহিত হিন্দু প্রধান অঞ্চল খিলগাঁও এ ইসলাম প্রচারকালে স্থানীয় প্রভাবশালী হিন্দুদের দ্বারা নানাভাবে বাধাপ্রাপ্ত হন। একদিন তিনি ইবাদতে মশগুল থাকাকালীন অবস্থায় হিন্দুরা ঢাক ঢোল পিটিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়। তারা প্রতিমা বিসর্জন দেবার জন্য শোভাযাত্রা নিয়ে বুড়িগঙ্গায় যাচ্ছিল। দরবেশের আস্তানার কাছে এসে তারা বাদ্যের আওয়াজ বৃদ্ধি করে ভীষণ শোরগোলের সৃষ্টি করে। ফলে তাঁর ইবাদতে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। তিনি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে মূর্তিগুলোর প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করেন। ফলে পথের উপরই মুর্তিগুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। শোভাযাত্রীরা ভীত হয়ে পলায়ন করে। এ অভাবনীয় দৃশ্যে হিন্দুদের মনে ভাবান্তর দেখা দেয়। এ ঘটনার পর দলে দলে হিন্দুরা তার আস্তানায় এসে ইসলাম গ্রহণ করে। এ সময় হতেই তিনি 'বুতশিকন' (মুর্তিনাশক) উপাধী লাভ করেন। বর্তমান ঢাকা নগরীর পুরানা পল্টন এলাকায় দিলকুশা শাহবাগে তাঁর মাজার অবস্থিত। মাজারের পার্শ্বে পাঠান আমলে নির্মিত একটি প্রাচীন মসজিদ বিদ্যমান। [৩]

---

১. বাংলাদেশের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, ১ম খন্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩ইং, পৃঃ ১১০-১১; ডঃ এনামুল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭-২৮; ডঃ আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭১-৭২।

২. ডঃ এনামুল হক, A History of Sufism in Bengal, p. 211.

৩. ডঃ এনামুল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯; আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত,পৃঃ ৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

রাজশাহী অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে হযরত শাহ মাখদূম রূপোশের দান অতুলনীয়। রাজশাহীর 'দরগাহপাড়া' নামক স্থানে সরকারী কলেজ প্রাঙ্গনে তাঁর মাযার অবস্থিত। মাযার গাত্রে খোদিত নাম ফলকে তাঁকে 'সাইয়েদে সনদ শাহ দরবেশ' নামে উল্লেখ করা হয়েছে।১ শাহ মাখদূম ১১৮৪ সালে রাজশাহীতে ইসলাম প্রচারের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তুর্কীদের বাংলা অভিযানের পূর্বে যে সব ইসলাম প্রচারক বাংলায় আগমন করে সম্পূর্ণ বিরোধী পরিবেশে ইসলামের সত্যবাণী প্রচার করে এদেশে ইসলামের ভীত গড়ে তুলেছিলেন শাহ মাখদূম তাদের অন্যতম।

পাবনা জেলার শাহজাদপুরে হযরত মাখদুম শাহদৌলা শহীদের মাজার রয়েছে। বলা হয়ে থাকে, ইয়েমেন থেকে তিনি এক বোন, তিন ভাগ্নে ও বহু অনুচরসহ বাংলায় আগমন করেন। বাংলায় আসার পূর্বে তিনি বুখারায় গিয়ে জালালুদ্দীন বুখারীর (১১৯৬-১২২১ খৃঃ) সাথে সাক্ষাত করে আসেন। দলবলসহ শাহজাদপুর এসে তিনি একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। প্রতিদিন তাঁর হাতে দলে দলে লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। স্থানীয় হিন্দুরাজা তাদের ইসলাম প্রচারের খবর শুনে নানাভাবে তাদেরকে উৎপীড়ন করতে থাকে। অবশেষে একদিন রাজার লোকজন দরবেশের আস্তানা আক্রমণ করল এবং উভয় পক্ষে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। যুদ্ধে মুসলমানগণ জয় লাভ করলেও দরবেশ ও তার ২১ জন অনুচর শহীদ হন। দরবেশের মাযারের কাছেই এ ২১ জন অনুচরের মাযার রয়েছে। দরবেশের অবশিষ্ট মুরীদগণ অত্যন্ত উৎসাহ সহকারে ইসলাম প্রচার শুরু করেন। ফলে অল্পকালের মধ্যেই পাবনা ও বগুড়া জেলায় ইসলাম বিস্তার লাভ করে। ২

বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর পরই সে সময়ে যে সকল সূফী-সাধক এদেশে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং হাজার হাজার অমুসলমানকে ইসলামে দীক্ষিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন হযরত শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজী ছিলেন তাদের পুরোধা। বখতিয়ার খিলজীর নদীয়া অভিযানের পর সুলতান গিয়াস উদ্দীন ইউনুস খিলজীর শাসনামলের কোন এক সময়ে তিনি তৎকালীন বাংলার রাজধানী মালদহ জেলার লাখনৌতি নগরে উপস্থিত হন এবং সেখান থেকে ১৭ মাইল দূরে অবস্থিত

---

১. ইনক্রিপ্সি পশানস অব বেঙ্গল, ৪র্থ খন্ড, শামছুদ্দিন আহম্মদ এম, এ, কর্তৃক সম্পাদিত ও বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত, পৃঃ ২৭১-৭৬।

২. আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

পান্ডুয়ায় আস্তানা স্থাপন করেন। বাংলার রাজধানীর উপকণ্ঠে আস্তানা স্থাপনের কারণে তাঁর ইসলাম প্রচারের প্রভাব সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে এবং বিশেষ করে বাংলার উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু ও বৌদ্ধ সমাজ তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়। লক্ষণ সেনের সভাপন্ডিত 'হলায়ুধ মিশ্র' কর্তৃক সংকৃত ভাষায় রচিত 'শেক শুভোদয়া' গ্রন্থটিই এর অন্যতম প্রমাণ। এ গ্রন্থে তাঁর জীবনের অলৌকিক কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে।১

'শুভোদয়া' গ্রন্থের বর্ণনা মতে দেখা যায় যে তৎকালীন বাংলার মানুষের উপর তিনি ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাবরিজীর অলৌকিক ক্ষমতায় মুগ্ধ হয়ে রাজা লক্ষণ সেন তাকে পান্ডুয়ায় একটি মসজিদ নির্মাণের অনুমতি দেন এবং ঐ মসজিদ ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত খানকাহ পরিচালনার জন্য তাঁকে কয়েকটি গ্রাম দান করে। তবে মসজিদ ও খানকাহ প্রতিষ্ঠার অর্থই হচ্ছে তাঁর কর্মক্ষেত্রের বিস্তৃতি এবং অসংখ্য লোকের ইসলাম গ্রহন। 'তাযকিয়া-ই-হিন্দ' গ্রন্থে একই ধরনের তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, "জালালুদ্দীন তাবরিজী বাংলায় পৌঁছার পর অল্প দিনের মধ্যে সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তাঁর জন্য একটি খানকাহ নির্মিত হয়। তিনি বহু জমি ক্রয় করে সেগুলোকে বাগানে রূপান্তরিত করেন, অতঃপর মুসাফির ও সেখানে অবস্থানরত লোকদের ভরণ-পোষণের জন্য সেগুলো ওয়াক্ফ করেন। সংশ্লিষ্ট এলাকায় কতিপয় প্রাচীন মন্দির ছিল। মন্দিরের উপাসনাকারীদেরকে তিনি ইসলামে দীক্ষিত করেন এবং মন্দিরগুলো ভেঙ্গে সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন"।২

তার মৃত্যুকাল নিয়ে ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। 'খুরশীদ-ই-জাঁহানুমা' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে তিনি হিজরী ৭৩৮ মোতাবেক ১৩৩৭ খৃষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। খান সাহেব আবেদ আলী রচিত 'মেম্যুইরস অব গৌড় এ্যান্ড পান্ডুয়া' গ্রন্থের টিকাকার এইচ,ই, স্ট্রেপেল্টন ১৩৪৬ বা ১৩৪৭ কে তাঁর মৃত্যু সাল অনুমান করেন। ৩ তাযকিরার বর্ণনায় পাওয়া যায় তিনি হিজরী ৬২২ মোতাবেক ১২২৫ খৃষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।

---

১. আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৮।

২. তাযকিরা-ই-আওলিয়া-ই-হিন্দ, ১ম খন্ড, পৃঃ ৫৬।

৩. M. Abid Ali khan (khan sahib), Memoirs of Gour and pandua, Calcutta, 1931, p. 99.

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় কিছু সংখ্যক সাধকবেশী ইসলাম প্রচারক ঢাকায় আগমন করেছিলেন। বাবা আদম শহীদের পর ঢাকায় ইসলাম বিস্তারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন মীর সৈয়দ আলী তাবরেজী। তিনি এ জেলার ধামরাই অঞ্চলে বহু শিষ্য সমবিহারে আগমন করেছিলেন। এখানেই তিনি দেহত্যাগ করেন ও সমাহিত হন। তিনি কখন এ অঞ্চলে আগমন করেছিলেন তা জানা যায় না। তবে এ সম্পর্কিত একটি তথ্যসূত্র পেশ করেছেন ডঃ এনামুল হক-যাতে ধারণা করা হয় মীর সৈয়দ আলী তাবরেজী খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্বে ধামরাই অঞ্চলে আগমন করেছিলেন। তথ্যটি নিম্নরূপ ঃ "বঙ্গে মুসলিম রাজত্বের প্রাচীন স্থানগুলির মধ্যে ধামরাই অন্যতম। এই স্থান হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপিগুলির মধ্যে প্রাচীনতম শিলালিপিখানী ১৪৮২ খৃষ্টাব্দে আবুল মুযফফর ফৎহ শাহের (১৪৮২-৮৭) রাজত্বকালে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। আমাদের বিশ্বাস, মীর সৈয়দ আলী তাবরেজী খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্বেই ঢাকার ধামরাই অঞ্চলে আগমন করিয়াছিলেন"।[১]

এসময়ে আরেকজন খ্যাতনামা দরবেশ সুলতানুল আউলিয়া শাহ আলী বাগদাদী (মৃঃ ৯১৩/১৪৫৮) ঢাকার মিরপুর এলাকায় আগমন করেন। এখানে তাঁর মাযার রয়েছে। তিনি ফরিদপুর ও ঢাকায় ইসলামের বাণী প্রচার করেন। হযরত শাহ আলী এবং তাঁর সাথে বাগদাদ থেকে আগত ১০০ আউলিয়া ও সূফী দরবেশ বাংলাদেশকে ইসলামের আলোতে উদ্ভাসিত করে তোলেন।[২] মীর সৈয়দ আলী তাবরেজী ও শাহ আলী বাগদাদী উভয়ের ইসলাম প্রচার তৎপরতায় ধামরাই মীরপুর ও তৎসন্নিহিত অঞ্চল আজ মুসলিম প্রধান।

নোয়াখালী জেলার সূফী সাধকগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মাওলানা আহমদ তান্নুরী তারাককোৰ্ণী ওরফে মীরান শাহ। অত্র জেলার কাঞ্চনপুর গ্রামে তাঁর মাযার আছে। তিনি বড় পীর হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রঃ)-এর পৌত্র ছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল মওলানা আজাল্লা (রঃ)। হালাকু খান কর্তৃক বাগদাদ ধ্বংসের (১২৫৮ খৃঃ) পর হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রঃ)-এর অনেক আত্মীয়-স্বজন ও বংশধর ইরান, আফগানিস্তান ও হিন্দুস্থান উপ-মহাদেশে চলে আসেন। মাওলানা সাইয়্যেদ আজাল্লা (রঃ) নানাস্থান ঘুরে অবশেষে দিল্লীতে আগমন করেন এবং সেখানেই সাইয়্যেদ আহমদের জন্ম হয়। সাইয়্যেদ আহমদের

---

১. ডঃ এনামুল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৯।

২. আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২১-১২২।

Dhaka University Institutional Repository

পিতা এক সময় বাগদাদ চলে যাবার পর তিনি বারজন শাগরিদসহ পান্ডুয়ায় আগমন করেন। পরবর্তী পর্যায়ে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে নোয়াখালী জেলার সোনার বাগে পৌছেন। ১

ডঃ এনামুল হক এর 'পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম' গ্রন্থের মাধ্যমে জানা যায় যে, "তিনি বঙ্গে ইসলাম প্রচারে আদিষ্ট হয়ে আগমন করেন এবং তৎকালীন দিল্লীর সুলতান ফিরোজ শাহ্ তাঁকে লাখেরাজ ভূমিও দান করেছিলেন। সাইয়্যেদ মীরান শাহ দিল্লী অবস্থানকালে বঙ্গে ইসলাম প্রচারের প্রত্যাদেশ লাভ করিয়া তথা হইতে বাংলার রাজধানী পান্ডুয়ায় আসেন। দিল্লীর তৎকালীন সুলতান ফীরুয শাহ তাঁহাকে তাম্রশাসনে লিখিয়া বঙ্গে তাঁহার যে কোন অভিপ্রেত স্থানে স্বীয় জীবিকা নির্বাহের জন্য লাখেরাজ ভূমি দান করিয়াছিলেন। তিনি নাকি পান্ডুয়া হইতে কুফর বা পৌত্তলিক ধর্ম ধ্বংস করিতে করিতে নোয়াখালী জেলার সোনারবাগে উপস্থিত হইয়াছিলেন"।২ এ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি ও তার সঙ্গীরা ইসলাম প্রচারে ভূমিকা পালন করেন।

পূর্ববঙ্গে ও আসামের পশ্চিমাংশে ইসলাম প্রচারে হযরত শাহ জালালের দান অতুলনীয়। সমকালীন পর্যটক ইবনে বতুতা লিখেছিলেন, "তাঁর হাতে এ দেশের অধিকাংশ লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে।৩ বস্তুতঃ সিলেট, মোমেনশাহী, ত্রিপুরা (বর্তমান কুমিল্লা), নোয়াখালী ও আসামের পশ্চিমাংশের বিভিন্ন জেলার অধিকাংশ লোক যে তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছে, এতে সন্দেহ নেই। এ জেলাসমূহের অধিবাসীদের উপর আজও তাঁর অপ্রতিহত প্রভাব একথাই প্রমাণ করে। সিলেট শহরে তাঁর মাযার অবস্থিত। হিজরী ৭০৩ সনে অর্থাৎ ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি সিলেট আগমন করেন।

সুলতান ফিরোজ শাহের আমলে (১৩০১-১৩২২ খৃষ্টাব্দে) তিনি বাংলায় প্রবেশ করেন। সম্ভবতঃ তিনি তখন গৌড়ে অবস্থান করে গৌড় রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় ইসলাম প্রচারের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। হযরত শাহ জালালের সিলেট আগমন সম্পর্কে 'সুহাইল-ই-ইয়ামেন' এ নিম্নোক্ত বিবরণ পাওয়া যায়, "শায়েখ বোরহানুদ্দীন নামক একজন মুসলমান সিলেটে বাস করতেন। পুত্র সন্তানের জন্য

১। আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২১-১২২

২. ডঃ এনামুল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬০।

৩. ইবনে বতুতা,আজায়েবুল আসফার, উর্দু অনুবাদ, ২য় খন্ড, পৃঃ ৩৮০।

Dhaka University Institutional Repository

উপলক্ষ্যে তিনি একটি গরু কোরবানী করেন। একথা জানতে পেরে রাজা গৌর গোবিন্দ গো-হত্যার শাস্তি স্বরূপ তাঁর দক্ষিণ হস্ত ছেদন করার ও নবজাত সন্তানটিকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। রাজার আদেশ কার্যকরী হবার পর শাস্তিপ্রাপ্ত মজলুম বোরহানুদ্দীন গৌড়ের সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহের দরবারে উপনিত হয়ে এ অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য ফরিয়াদ জানান। সুলতান তাঁর ভাগিনা সিকান্দার খানকে সিলেট আক্রমণ করার আদেশ দেন। সিকান্দার খান তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে সিলেট আক্রমণ করলে রাজা গৌড় গোবিন্দের হাতে পরাজয় বরণ করেন। সুলতান তার ভাগ্নেয়ের পরাজয়ের খবর শুনে সাতগাঁও এর গভর্ণর নাসীরুদ্দীনকে সিকান্দর খানের সাহায্যার্থে গমনের নির্দেশ দেন। হযরত শাহ জালাল তাঁর ৩৬০ জন শিষ্যসহ তৎকালে সাতগাঁও অঞ্চলে মুশরিক ও বিধর্মীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে ইসলাম প্রচারের কাজে রত ছিলেন। সিলেটে মুসলিম নির্যাতনের ঘটনা শুনে তিনি তাঁর ৩৬০ জন শিষ্য সমভিব্যাহারে ত্রিবেনী নামক স্থানে সিকান্দার খানের সাথে যোগ দেন। এবারের যুদ্ধে রাজা গৌড় গোবিন্দ শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করেন। তিনি আসামের পার্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করেন। মুসলমানরা সিলেট জয় করে তাকে গৌড়ের অঙ্গীভূত করে। ৯১৮ হিজরী সনে (১৫১২ খৃঃ) উৎকীর্ণ একটি শিলালিপিতে এ বিজয় বার্তা সুন্দরভাবে উল্লেখিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, "শায়খুল মাশায়েখ মখদুম শায়খ জালাল মুজাররাদ ইবনে মুহাম্মদের অনুকম্পায় শ্রীহট্ট শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় ইসলামের প্রথম বিজয় সম্পন্ন হয় সিকান্দর খান গাজীর হাতে এবং সুলতান ফিরোজ শাহ দেহলবীর শাসনামলে ৭০৩ হিজরী সনে (১৩০৩ খৃঃ)"।[১]

সুতরাং উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে বলা যায় যে ১২০৩ খৃষ্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বাংলাদেশ জয়ের মধ্য দিয়ে এ ভূখন্ডে মুসলমান ও তাদের ধর্মের আগমন ঘটে বলে যে সাধারণ ধারণা রয়েছে, তা খন্ডিত হল। উপরোক্ত বিবরণের মাধ্যমে বিভিন্নভাবে প্রমাণিত হল বাংলাদেশে ইসলামের প্রচার ও প্রসার লাভ করে এরও বহু আগে। ইসলাম পূর্ব যুগ হতে আরব বণিকরা সামুদ্রিক পথে চীন এবং ইন্দোনেশিয়ার জাভা, সুমাত্রা যাবার পথে চট্টগ্রাম বন্দরে জাহায ভিড়াতেন এবং পণ্য বিনিময় করতেন। সেই যোগাযোগের সূত্র ধরে দক্ষিণ চীনে এবং বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় খৃষ্টীয় অষ্টম শতকে আরবের মুসলিম বণিক ও ধর্ম প্রচারক মুবাল্লিগদের দ্বারা ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু হয়। এদেশে প্রথম চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, সন্দীপ এবং পরে ব্রহ্মপুত্র নদীর পথ ধরে সিলেটে

---

১. Journal of the Asiatic society of Bengal,1982, p.413.

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে। মুসলিম শাসকের সিলেট বিজয়ের পূর্বে রাজা গৌড় গোবিন্দের রাজ্যে বোরহানুদ্দীন নামক যে মুসলমান বাস করত, অগ্রযাত্রী মুসলিম মুবাল্লিগদের দ্বারাই তা সম্ভব হয়েছিল। বাংলাদেশে এভাবে বেসরকারী পর্যায়েই ওলামা মাশায়েখ, পীর আউলিয়া দ্বারা ইসলাম প্রচারিত হয়েছে। রাজা বাদশাহরা এসেছেন পরে।

বাংলা সে সময়ে একক শক্তিশালী কোন রাজ্য ছিল না। ছোট ছোট অনেক রাজ্যে বিভক্ত ছিল এ এলাকা। ফলে এখানে মুসলমানদের স্ব-শাসিত বা সামাজিক শাসিত অঞ্চল গঠনে অপেক্ষাকৃত কম বেগ পেতে হয়। সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে পাঁচশত বছর যাবত রাজশক্তির কোনরূপ পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই ইসলাম প্রচারকগণের ত্যাগ ও কুরবানীর মাধ্যমে এ দেশে মুসলিম শাসনের ভিত্তি ভূমি রচিত হয়।

"১২৫৮ খৃষ্টাব্দে হালাকু খান কর্তৃক মধ্য এশিয়ায় ধ্বংস ও তান্ডব চলাকালে ইরান, ইরাক, ইয়েমেন ও তুর্কিস্তান এবং হিন্দুস্তানের উত্তরাংশ থেকে অসংখ্য আলিম, সুফী ও মুজাহিদ বাংলাদেশে আসেন। প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করে তাঁরা অনেকেই বাংলাকে তাঁদের কর্মস্থলরূপে বেছে নেন। ফলে, এ ভূখন্ডে ইসলাম প্রচারের এক স্বর্ণযুগের সূচনা হয়। এ পরিবেশেই মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা করেন"।১

এ দীর্ঘ সময়ে অসংখ্য আলিম সুফী ও মুজাহিদ বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার করেন। তাঁদের ইসলাম প্রচারের ধারাবাহিকতায় চতুর্দশ শতকের শেষ পর্যন্ত বাংলায় ইসলাম প্রচারের প্রবল গতিধারা অব্যাহত থাকে। বাংলায় ইসলাম প্রচারের এই স্বর্ণ যুগের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গ হলেন ঃ

(১) ফরিদউদ্দিন শকরগঞ্জ। তের শতকের মাঝামাঝি তিনি চট্টগ্রাম অঞ্চলে আসেন এবং ফরিদপুর এলাকা ভ্রমণ করেন। শুল্‌ক বহরে তাঁর নামে একটি ঝরনা আছে।

(২) মাখদুম শাহ গজনবী ওরফে রাহীপীর। বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট এ দরবেশের আস্তানা ছিল এবং এখানে তাঁর মাজার রয়েছে। সম্ভবতঃ

---

১. মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের প্রথম পর্যায়, সীরাতুন্নবী স্মরণিকা, ১৪০৭ হিঃ, পৃঃ ৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

ত্রয়োদশ শতকে তাঁর আগমন হয়। তাঁর সাথে আরো ১৭ জন দরবেশ এ দেশে আসেন। তাদের মধ্যে ছিলেনঃ সৈয়দ শাহ তাজুদ্দীন, খাজাদীন চিশতী, শাহ হাজী আলী, শাহ সিরাজুদ্দীন, শাহ ফিরোজ, পীর পাঞ্জাতন, পীর ঘোড়া শহীদ এবং আরো এগার জন। তাঁদের সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

(৩) মাওলানা তাকী উদ্দিন আল আরবী। তের শতকের প্রথম দিকে তিনি এদেশে আসেন। সম্ভবত তিনি দেশে ফিরে গিয়ে ই ন্তকাল করেন।

(৪) শাহ তুর্কান শহীদ। উত্তর বঙ্গের বগুড়া তাঁর প্রচার কেন্দ্র ছিল এবং সেখানেই তাঁর মাজার আছে।

(৫) শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা। সম্ভবত ১২৭০ মতান্তরে ১২৭৮ সালে তিনি সোনার গাঁয়ে আসেন। তিনি হাদীস, তাফসীর ও ফিক্‌হ-এ গভীর পারদর্শী ও পন্ডিত ছিলেন। তিনি ইসলামী শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে সোনার গাঁয় একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন, যাতে দেশ-বিদেশের বহু ছাত্র অধ্যয়ন করতো। বিহারের প্রসিদ্ধ সূফী দরবেশ শায়খ শরফুদ্দীন আহমদ বিন ইয়াহইয়া আল মুনীরী তাঁরই তত্ত্বাবধানে সুদীর্ঘ ২২ বছর-এ সোনার গাঁয় জ্ঞান সাধনা করেন । শায়খ আবু তাওয়ামা ৭০০/১৩০০-তে ইন্তিকাল করেন।[১] এখানে তার মাযার রয়েছে।

(৬) শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মানেরী ১২৭০-৭৫ সালে সোনার গাঁয়ে আসেন। তিনি স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর ইন্তিকাল করেন।

(৭) আমীর খান লোহানী। আফগানিস্তান থেকে আগত এই পীর ইসলাম প্রচার করেন। খড়গপুরে তাঁর মাজার রয়েছে।

(৮) শায়খ সূফী শহীদ ১২৯০ সালে তিনি সাতগাঁও আসেন। হুগলী পান্ডুয়ায় তাঁর মাযার আছে।

(৯) উলুগ-ই-আজম হুমায়ুন জাফরখাঁ বাহরাম ইৎসীন গাজী, সংক্ষেপে জাফর খাঁ গাজী। ইনি একজন সেনাপতি ও ধর্মীয় নেতা। উত্তরবঙ্গ ও হুগলী নদীর ধারে ত্রিবেনীতে তাঁর মাযার রয়েছে।

১। ডঃ আ,ন,ম, রইছ উদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭০।

Dhaka University Institutional Repository

(১০) পীর শাহ বদর উদ্দীন, সংক্ষেপে বদর পীর। দিনাজপুরের হেমায়াতাবাদ তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল। সেখানেই তাঁর মাযার রয়েছে।

(১১) সৈয়দ আব্বাস আলী। তিনি ১৩৯১ সালে দিল্লীতে এবং ১৩২৩ সালে বাংলাদেশে আসেন। চব্বিশ পরগনার হাড়োয়া নামক স্থানে তিনি খানকাহ নির্মাণ করেন এবং সেখানে তাঁর মাযার ও বংশধর রয়েছে।

(১২) সৈয়দ রওশন আরা মক্কী, সৈয়দ আব্বাস আলী মক্কীর বোন। চব্বিশ পরগনার তারাগুনিয়ার খানকায় তিনি থাকতেন। সেখানে তাঁর মাযার রয়েছে। তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে তিনি এদেশে আসেন এবং ১৩৪২ সালে তিনি ইন্তিকাল করেন।

(১৩) শাহ বদর উদ্দীন আল্লামা, সংক্ষেপে বদর পীর। ১২৪০ সালে বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান ফখরুদ্দীন মোবারক শাহ-এর আমলে চট্টগ্রামে আসেন এবং চট্টগ্রামে স্বাধীন মুসলিম রাজ্য গঠনে সহায়তা করেন। চট্টগ্রাম শহর বখশী বাজার মার্কেটের দক্ষিণে তাঁর মাযার রয়েছে।

(১৪) কাত্তাল পীর। চট্টগ্রামের উত্তরে কাতালগঞ্জে তাঁর মাযার আছে। তাঁদের পরে আরও অনেক দরবেশ এখানে এসেছিলেন। যেমন, শাহ্ মোল্লা মিসকিন, শাহ নূর , শাহ আশরাফ, কাবুলী শাহ, বান্দা মিয়া শাহ, চট্টগ্রামের চন্দনপুরা টিলার উপর তাঁদের মাযার বিদ্যমান।

(১৫) শাহ্ কামাল ১৩৮৫ সালে এদেশে আসেন। তিনি সুনামগঞ্জে শাহার পাড়া এলাকায় ইসলাম প্রচার করেন। পাহাড়ীয়া এলাকায় তাঁর মাযার রয়েছে।

(১৬) শাহ কালাম। তার মাযার কুমিল্লার উৎমুড়া গ্রামে।

(১৭) সৈয়দ আহমদ কল্লা শহীদ। নোয়াখালী ও কুমিল্লায় ইসলাম প্রচার করেন। কুমিল্লার আখাউরার খরমপুরে তাঁর মাযার রয়েছে।

(১৮) শরীফ শাহ। কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব দিকে কুটিয়ারে তাঁর মাযার ।

(১৯) শাহ মালেক ইয়ামানী। ঢাকা ওসমানী উদ্যোনের পূর্ব পাশে তাঁর মাজার রয়েছে।

(২০) শাহ কলমী, শাহ ইয়ামানীর মাযারের পাশেই তাঁর মাযার।

Dhaka University Institutional Repository

(২১) শায়খ বখতিয়ার সাইফুর। দিল্লী থেকে তিনি এদেশে আসেন। সন্দ্বীপের রোহিনীতে তাঁর মাযার বিদ্যমান।

(২২) মাখদুম শাহ জালালুদ্দীন গাজী গাশ্‌ত বুখারী প্রথমে পাভুয়ায় ও পরে রংপুর জেলার মাহীগঞ্জে ইসলাম প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করেন। ১৩৮৩ সালে উক্ত নগরে তাঁর মৃত্যু হয়। সেখানেই তাঁর মাযার রয়েছে।

(২৩) রাসতি শাহ্। চাঁদপুর জেলার শাহরাস্তি থানাধীন শ্রীপুর গ্রামে তাঁর মাযার। তিনি চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এ দেশে আসেন।

(২৪) শাহ মুহাম্মদ বাগদাদী। তিনি একই সময় এদেশে আসেন। কুমিল্লার শহর তলীতে তাঁর মাযার রয়েছে।

(২৫) শায়েদুল আরেফীন, পটুয়াখালীর ফালীগুড় গ্রামে তাঁর মাযার রয়েছে।

(২৬) শাহ জালাল। তিনি সোনার গাঁও এর মুয়াজ্জিমপুরে আস্তানা স্থাপন করেন। সেখানে মসজিদের সাথে তাঁর মাযার রয়েছে।

(২৭) শাহ মুহসিন আউলিয়া। তিনি ১৩৯৭ সালে ইন্তিকাল করেন। চট্টগ্রামের আনোয়ারা থানার বটতলীতে তাঁর মাযার রয়েছে।

(২৮) শাহ আলাউদ্দিন আলাউল হক। প্রথমে পাভুয়া ও পরে সোনার গাঁও-এ খানকাহ্ স্থাপন করেন। ১৩৯৮ সালে তিনি ইন্তিকাল করেন। পাভুয়াতে ছাট দরগায় তাঁর মাযার রয়েছে।

পনের শতক থেকে বাংলাদেশে ইসলামের অগ্রযাত্রা ক্রমশ স্তিমিত হয়ে এলেও কখনও তা একেবারে থেমে যায় নি। কারণ, "ইসলাম এক নতুন এবং যুগান্তকারী আদর্শ- যার প্রবর্তনে ভারতীয় উপমহাদেশে এক অভূতপূর্ব আলোড়নের সৃষ্টি হয়। ইসলাম ভারত উপমহাদেশে মানবমুক্তি ও কল্যাণের যে আদর্শ নিয়ে আসে তার আংশিক সাফল্য লক্ষ্য করা যায় হিন্দু সমাজের অনুন্নত জনসাধারণকে সামাজিক, অর্থনৈতিক, আধ্যাত্মিক মুক্তি এবং মনীষা ও চিন্তার ক্ষেত্রে শ্রেণী নির্বিশেষে সমান সুযোগ ও সুবিধা দানের মধ্যে শাসক গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতা, সুফী দরবেশদের আধ্যাত্মিক মনোবল ও প্রভাব এবং তৌহিদের অমোঘ বাণী বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে সহায়ক ছিল।"১

---

১. বাংলাদেশ সৌদি আরব ভ্রাতৃ সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত, বাংলাদেশ-সৌদি আরব শাশ্বত ভ্রাতৃত্ব, গ্রন্থে ডঃ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান এর প্রবন্ধ, বাংলাদেশে মুসলিম স্থাপত্যের বিকাশ, ১৯৯১ ইং, পৃঃ ৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের আদর্শকে সামনে রেখে ইসলাম প্রচারকগণ জনগণের নৈতিক ও মানসিক উন্নতি বিধানে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেন। তাঁদের চরিত্র, নৈতিক শক্তি এবং মানুষের প্রতি অকৃত্রিম দরদ ও ভালবাসা হিন্দু, বৌদ্ধ নির্বিশেষে সকল স্তরের জনগণকে তাদের প্রতি বিপুলভাবে আকৃষ্ট করে। আলাউল হক, আখি সিরাজ, জালালুদ্দিন তাবরিজী, নুর কুতুব উল আলম এবং তাঁদের সংস্পর্শে এসে উত্তর বঙ্গের বিপুল সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত শাহ জালাল সিলেটসহ আসামের বিস্তীর্ণ এলাকার লোককে ইসলামের ছায়াতলে আনেন। খান জাহান আলী(মৃঃ ১৪৫৮খৃঃ)-এর প্রচেষ্টায় খুলনা ও যশোরে ইসলামের ব্যাপক বিস্তার ঘটে। চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী মুসলিম শাসনাধীনে আসে চৌদ্দ শতকের মাঝামাঝি, অথচ তার আগেই এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারকদের দ্বারা বিজিত হবার আগে সোনার গাঁও এলাকায় ইসলামের প্রসার ঘটে। "তেরো শতকের সত্তর দশকে আবু তাওয়ামা কর্তৃক সোনারগাঁয়ে সে যুগের বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা এবং সেখানে উপমহাদেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে শিক্ষার্থীদের আগমন নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে মুসলিম বিজয়ের বহু আগেই এ অঞ্চল ইসলামের একটি কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল"।[১]

এ ভাবে ইসলামের সাথে বাংলাদেশের যে যোগসূত্র স্থাপিত হল তা আর বিচ্ছিন্ন হয় নি। ক্রমে তা বৃদ্ধিই পেতে থাকে। অষ্টম, নবম ও দশম শতকে চট্টগ্রাম উপকূল থেকে মেঘনার তীর পর্যন্ত এবং স্থল পথে রাজশাহীর পাহাড়পুর ও কুমিল্লার ময়নামতিতে ইসলাম পরিচিতি লাভ করে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। বাংলাদেশের সকল গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের মধ্যে নৌ-যোগাযোগের মাধ্যমেই যে দেশব্যাপী ইসলাম প্রচারিত হয়েছিল তার একটি সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান বলেছেন, "আরব বণিকদের আগমনের কালে বর্তমান চট্টগ্রাম অঞ্চলটি গঙ্গার ব-দ্বীপ গঙ্গার মোহনার নিকটবর্তী ছিল এবং চট্টগ্রামে ও সোনার গাঁও এর মধ্যে সংক্ষিপ্ত নদী পথ ছিল। পনেরো শতকের গোড়ার দিকে সে সংক্ষিপ্ত নদীপথ বিদ্যমান ছিল এবং এ পথেই চীনা পর্যটক মাহুয়ান চট্টগ্রাম থেকে নৌকাযোগে রাজধানী সোনারগাঁয়ে গিয়াস উদ্দীন আযম শাহের দরবারে হাজির হয়েছিলেন। ইসলামের ব্যাপক প্রচারের যুগে পদ্মানদী রামপুর বোয়ালিয়া (রাজশাহী শহর) পাশে রেখে চলন বিলের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন অঞ্চল অতিক্রম করে বর্তমান ধলেশ্বরী ও বুড়িগঙ্গার গতিপথে প্রবাহিত হত। তারপর এ নদী ঢাকা শহরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ফিরিঙ্গি বাজারের

১. মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

কাছে মেঘনায় পতিত হত। বুড়িগঙ্গা নাম স্মরণ করিয়ে দেয় যে এ নদীর মধ্য দিয়ে এক সময় গঙ্গার গতিপথ প্রবাহিত হত। এ নদী ধীরে ধীরে অনেক দক্ষিণে সরে যায়।"[১]

ষোল শতকের ইংরেজ পর্যটক র‍্যালফফিশ ১৫৮৬ সালে ঈসা খাঁর শাসনাধীন সোনারগাঁও সফর করে লিখেছেন যে, "তিনি সোনারগাঁও থেকে ১৮ মাইল দক্ষিণে শ্রীপুর থেকে গঙ্গা নদী পথে চট্টগ্রাম বন্দর হয়ে পেগু গমন করেন। লোহিত নামে অভিহিত বাংলার অন্যতম প্রধান নদী ব্রহ্মপুত্র মধুপুরের পাশ দিয়ে মোমেনশাহী জেলার মাঝামাঝি অঞ্চল ও ঢাকার পুর্বাংশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সোনার গাঁও -এর দক্ষিণ পশ্চিমে লাঙ্গলবন্দে পতিত হয়েছে। ব্রহ্মপুত্র সতের শতকে এ গতি পথ পরিত্যাগ করে এবং ভৈরব বাজারের কাছে সুরমা মেঘনার সাথে মিলিত হয়। ভৈরব বাজার থেকে সন্দ্বীপের কাছে সমুদ্র পর্যন্ত এই যুক্ত স্রোতধারা মেঘনা নামে পরিচিত। ব্রহ্মপুত্রের মোমেনশাহী প্রবাহটি উনিশ শতকের মাঝামাঝি শুকিয়ে যায় এবং যমুনা নামে পরিচিত শাখা নদী প্রধান নদী হয়ে দেখা যায়"।[২]

দেশের প্রধান প্রধান নদীর পুরনো প্রবাহ সম্পর্কিত এ আলোচনা থেকে বাংলাদেশের সকল গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের মধ্যে নৌ যোগোযোগের যে চমৎকার ধারণা পাওয়া যায়, এ যোগাযোগ পথে বাংলাদেশে দ্রুত ইসলাম বিস্তার লাভ করে এবং বাংলাদেশ তৎকালীন সময়ে একটি সমৃদ্ধশালী অঞ্চল হিসাবে পরিচিত লাভ করে। "বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান ফখরুদ্দীন মোবারক শাহ-এর আমলে (১৩৩৬-১৩৫২ খৃঃ) রাজধানী সোনার গাঁও সফরকালে বিশ্ববিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা সোনার গাঁওকে দেখেছেন একটি প্রসিদ্ধ ও সমৃদ্ধশালী বন্দররূপে। প্রাচীনকাল থেকে বিদেশী বাণিজ্য জাহাযসমূহ এ বন্দরে আসত বিভিন্ন পণ্য সংগ্রহের জন্য। ইবনে বতুতা এখানে পালতোলা চীন দেশীয় তলাচ্যাপ্টা বাণিজ্য জাহায দেখেছেন জাভা যাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ইবনে বতুতার আগমনের অনেক আগে থেকেই সোনারগাঁও ব্যবসা বাণিজ্যে সমৃদ্ধ ছিল। মিসরের পীড়ামিডে ফেরাউনের মমিতে সোনারগাঁও-এর মসলিন প্রাপ্তিও বহিঃর্বাণিজ্যে এ অঞ্চলের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের প্রমাণ বহন করে"।[৩] "ইসলাম প্রচারকগণ দুর্লংঘ ও অপরিচিত পথ ও পরিবেশের বাধা অতিক্রম করে ইসলামের শিক্ষা ও প্রচার কেন্দ্র

---

১. মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান , প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৪।

২. উদ্ধৃতঃ আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত,পৃঃ ৪৬।

৩. মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

গড়ে তুলে স্থান থেকে স্থানান্তরে সফরের মাধ্যমে প্রধানত গ্রাম এলাকায় বাংলার জনগণের ভাষায় তাদের প্রচার কাজ চালান"।[১]

তাই দেখা যায় যে বাংলদেশে ইসলাম প্রচারের সাথে সুফী ও আলেমদের নাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আরব, ইয়েমেন, ইরাক, ইরান, খোরাসান, মধ্য এশিয়া ও উত্তর ভারত থেকে সকল সুফী-সাধক ও আলিম-ওলামা বাংলায় আগমন করে ইসলাম বিস্তারে বিস্ময়কর অবদান রেখে গেছেন। ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে অনেকে একাকী, এ দূর দেশে পাড়ি দিয়েছেন আবার অনেকে নিজের অনুচরবর্গসহ এ অজ্ঞাত অপরিচিত দেশে আবহাওয়ার যাবতীয় প্রতিকুলতা অগ্রাহ্য করেও বসতি স্থাপন করেছেন। চতুর্দশ শতকের পর্যটক ইবনে বতুতাকে বাংলাদেশের খাদ্য দ্রব্য ও অন্যান্য জিনিস পত্রের সস্তামূল্য যেমন তাঁকে বিস্ময়াভিভূত করে তুলেছিল তেমনি এ দেশের আবহাওয়া তাঁকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। তাই তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে 'দেশটি ভেজা ও অন্ধকার' এবং খোরাসান বাসীদের মতে 'ঐশ্বর্য সম্ভার পরিপূর্ণ দোজখ'।[২]

প্রথম যুগের অনেক সুফী আলিম সমুদ্র পথে এ দেশে আগমন করেন। বাংলার সমুদ্র পথ আরবদের নিকট সুপরিচিত থাকা এবং বাংলার সমুদ্রোপকুলবর্তী এলাকার সাথে আরবদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠাই ছিল এর মূল কারণ। "সমগ্র হিমালয়ান উপ-মহাদেশের মধ্যে বঙ্গ ব-দ্বীপে ইসলামের দ্রুত প্রসার ও অভূতপূর্ব সাফল্যের এটাও একটি প্রধান কারণ"।[৩]

বাংলাদেশের আবহাওয়ার ন্যায় তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিও ছিল ইসলাম প্রচারকদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। স্বাভাবিক কারণেই হিন্দু রাজারা ইসলাম প্রচারকদের সুনজরে দেখতে পারেনি। তাই তারা এসব প্রচারকদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালাতে থাকে। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে তাদের কার্যধারা ব্যাহত করার প্রয়াস পায়। ফলে, ইসলাম প্রচারক সুফী ও আলিমদের অনেককে এ দেশের হিন্দু সামন্ত রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করতে হয়। এ সব যুদ্ধে কেউ কেউ শহীদও হয়ে যান। তাই তাঁদেরকে ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে রাজ শক্তির আশ্রয় নিতে হয়েছে। তারা রাজ শক্তির পাশাপাশি অবস্থান করে ইসলাম বিস্তারে অবদান রেখে যান। ডঃ তারা চাঁদও একথা স্বীকার

---

১. আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৬।

২. উদ্ধৃত ঃ আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৩।

৩. আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

করে বলেছেন, "মুসলিম সেনারা যেখানেই অভিযান করেছেন কিংবা মুসলিম বণিকরা যেখানেই বসতি স্থাপন করেছেন সেখানেই মুসলিম ধর্ম প্রচারকরা উপস্থিত হয়েছেন"।১

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে আরবীয় বণিকদের প্রদর্শিত পথেই এ দেশে ইসলাম প্রচারকদের আগমন ঘটেছিল। তাঁরা আজ বাংলাদেশে দরবেশ বা সূফী নামে পরিচিত। আরবীয় বণিকগণ এ দেশে ইসলাম প্রচার করেছিলেন সত্য কিন্তু ইসলাম প্রচারের জন্য খুব বেশী সময় ব্যয় করা বা দীর্ঘদিন কাটিয়ে দেয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ধর্ম প্রচারক সূফীগণই জীবনব্যাপী প্রচার করে এ দেশে ইসলাম বিস্তারে সাহায্য করেছিলেন। তাঁরা স্ত্রী পরিজন নিয়ে বিদেশ সফরে বের হতেন না। দীর্ঘ সফরের কোন স্থানে তাঁরা প্রয়োজনমত বিরতি করতেন, কোন কোন ক্ষেত্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন। ইসলামী শরিয়তের নির্দেশানুসারে ইসলামে দীক্ষিত না করে তারা যে এ সব মহিলাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতেন না, এতে কোন সন্দেহ নেই। কাজেই এভাবে বহু স্থানীয় মহিলা ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিল বলে মনে হয়। ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হক এ প্রসঙ্গে আলোকপাত করতে গিয়ে বলেছেন, "কোন কোন ইসলাম প্রচারক হিন্দু রমণীর পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াও জানা যাইতেছে। যে স্বাভাবিক কারণে এদেশে ধীরে ধীরে বিজিত ও বিজেতা জাতির মধ্যে একটি সমঝোতার ভাব আসিয়া পড়িতেছিল। বৈবাহিক সম্বন্ধের মধ্য দিয়া এই ভাব এই সময়ে দেশে দৃঢ়তর হইয়া আসিতেছিল। বাংলার মুসলমানদের উৎপত্তির প্রতিও এই সম্বন্ধ সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করিতেছে। বাংলার অনেক মুসলমান এই শ্রেণীর বৈবাহিক সম্বন্ধ হইতে সমদ্ভূত।"২ মরক্কো দেশীয় মুসলিম পর্যটক ইবনে বতুতা (হিজরী ৭০৩-৭৭৮) তাঁর সফরনামায় উল্লেখ করেছেন যে, "তিনি আরাকানে বাংলার ও ইন্দোনেশিয়ার মুসলমানদের কলোণী ও মালদ্বীপে এক বাঙালী মুসলিম রাজ বংশের রাজত্ব দেখেন। তিনি তাঁর সফরনামায় বলেছেন, "পরমাশ্চর্যের বিষয় হল এই যে, এই দ্বীপপুঞ্জের (মালদ্বীপের) বাদশাহ হচ্ছেন 'খাদিজা' নাম্নী জনৈকা মহিলা। তিনি সুলতান জালাল উদ্দীন উমর ইবনে সুলতান সালাহুদ্দীন সালেহ বাঙ্গালীর কন্যা। তাঁর দাদা বাদশাহ ছিলেন, অতঃপর তাঁর পিতা বাদশাহ হন"।৩ "চীনের কুচু শহরে এক বিদ্রোহ চলাকালে দেড়লক্ষ মুসলমান নিহত হয়। এ মুসলমানরা সবাই ছিল বিদেশাগত"।৪

---

১. ডঃ তারাচাঁদ, ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব,এস মুজিব উল্লাহ কর্তৃক অনূদিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯১ইং, পৃঃ ৪২।

২. ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৬।

৩. ইবনে বতুতা, আজায়েবুল আসফার, ২য় খন্ড, খানবাহাদুর মহাম্মদ অনূদিত দিল্লী, ১৯১৩ইং, পৃঃ ৩২১।

৪. খ্যাতনামা পর্যটক মাসরিকীর উক্তি দিয়ে খানবাহাদুর মুহাম্মদ হোসাইন আযায়েবুল আসফারের ভূমিকায় একথা বলেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে ইসলাম বিস্তৃতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ইসলাম প্রচারে নিবেদিতপ্রাণ মুসলিমগণ হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল অধিকারের চেষ্টা করেছেন। পাহাড়পুর, মহাস্থান, মদনপুর, বিক্রমপুর প্রভৃতি প্রত্যেকটি স্থানই প্রাচীন হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। আর এ জাতীয় প্রাচীন স্থানগুলোর প্রতি প্রচারকদের দৃষ্টি কেন পড়েছিল। এ প্রসঙ্গে ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক তাঁর 'পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম' গ্রন্থে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, "সম্ভবতঃ তাহারা মনে করিয়াছিলেন যে, প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার কেন্দ্র স্থলে ইসলাম বিস্তার করিতে পারিলে দেশের অপরাপর স্থানে উহা আপনিই ছড়াইয়া পড়িবে। তাহাদের প্রতি আরোপিত এই ধারণা একেবারে অমূলক বলিয়া মনে হয় না। কেননা, বনে জঙ্গলে সাধনা করিয়া ইসলাম কখনও বিস্তৃত হয় নাই, লোকালয়ে মানুষের মধ্যেই ইসলাম বিস্তৃত হইয়াছে"।[১]

ইসলাম প্রচারশীল পীর-আউলিয়া দরবেশগণ ধর্ম প্রচারকে পবিত্র কর্ম বলে মনে করতেন। তাই তাঁরা ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব নিয়ে দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েন। ইসলামের ধর্মনীতি ও মুসলমান সমাজ ব্যবস্থায় এমন কতগুলো গুণ ছিল যা সে যুগের মানুষকে চমকিত করেছিল। "ভারতের হিন্দু ধর্মনীতিতে ও সামাজিক আচরণ বিধিতে কতক বিষয়ে কঠোর মনোভাব পোষণ করা হত, বিশেষ করে বর্ণভেদ, দাস, অস্পৃস্য প্রভৃতি প্রথার কারণে নিম্ন শ্রেণীর মানুষের সামাজিক মর্যাদা ও মানবিক অধিকার বলতে বিশেষ কিছু ছিলনা"।[২]

মূল ইসলামে জাতিভেদ, বর্ণভেদ, অস্পৃশ্যতার স্থান নেই, বরং তা নীতিগতভাবে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শ সমর্থন করে। "ইসলামের প্রথম গৌরবোজ্জ্বল যুগের এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পীর দরবেশগণ মানব সেবায় ও পরহিতব্রতে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। তারা সৎ ও পবিত্র জীবন যাপন করতেন এবং সাধারণ মানুষের মাঝে থেকে তাদের প্রতি দয়া ধর্ম প্রদর্শন করতেন। তাঁদের অনেকেরই আধ্যাত্মিক মহিমা দেখে মানুষ তাঁদের কাছে আসত এবং ক্রমে ভক্ত শ্রেণীতে পরিণত হত। একটি বিদেশী রাষ্ট্রে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী শাসকের অধীনে ধর্ম প্রচারকগণ কখনও বল প্রয়োগ করতে পারেন না, সাধারণ দয়াধর্ম, হৃদয় ধর্ম ও মানব ধর্মের আবেদনকে তাঁরা মোক্ষ অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেন"।[৩]

---

১. ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১।

২. গোপাল হালদার, সংস্কৃতির রূপান্তর, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, কলিকাতা, ১৯৬৫ইং, পৃঃ ১৭৩।

৩. ডঃ ওয়াকিল আহমদ,প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩।

Dhaka University Institutional Repository

রাজদরবারেও ধর্ম প্রচারকদের বহুল প্রভাব পড়েছিল। এ প্রসঙ্গে শেখ জালালুদ্দীন তাবরিজীর কথা উল্লেখ যোগ্য । "তিনি আধ্যাত্মিক শক্তিতে বলিয়ান ছিলেন। তিনি বহু জনপদকে নিপীড়নের হাত থেকে উদ্ধার করেন এবং তাদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন" ।১

ত্রয়োদশ শতকে তুর্কীরা এদেশ জয় করে জালালুদ্দীন তাবরিযীর (মৃ ১২২৫ খৃঃ) আরব্ধ কাজে হাত দিয়েছিলেন। সদ্য ইসলামে দীক্ষিত বৌদ্ধ তুর্কীগণ একটু বেশী পরিমাণে নবধর্মে আগ্রহশীলতা প্রদর্শনের জন্য ইতিহাসে সুপরিচিত। দিগ্বিজয়ের দুর্দম বাসনা পার্বত্য তুর্কী জাতির একটি স্বাভাবিক বৃত্তি। ব্যক্তিগত জীবনে তাঁরা ইসলামী বিধি নিষেধের প্রতি কিছুটা উপেক্ষা প্রদর্শন করেছে। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে ইসলামী রাষ্ট্রের মূলনীতি উপেক্ষিত হয়েছিল। তা সত্ত্বেও তারা এ দেশে প্রতিষ্ঠিত জুলুম শাসনের অবসান করেছিলেন। এ দেশে হতাশাক্লিষ্ট নির্যাতিত মানবতাকে জাতীয় জীবনে উচ্চ আসন দান করেছিলেন। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের বাংলার মুসলিম বিজেতাগণ ইসলামের প্রথম যুগের ন্যায় পূর্ণাঙ্গ ইসলামী অনুশাসন ভিত্তিক রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হলে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এ দেশের অনুকূল পরিবেশে ইসলাম শতকরা একশত ভাগ সাফল্য লাভ করত।

যা হোক, তুর্কীদের দেশ জয়ের দুর্দম আকাংখার পেছনে একটি শক্তিশালী ধর্মীয় প্রেরণা বিদ্যমান ছিল তা অস্বীকার করার উপায় নেই। ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজীর কথা ধরা যাক । "লক্ষণাবতী জয় করিয়া তিনি যখন তিব্বৎ অভিযান করেন, তখন আধুনিক কোচবিহার রাজ্যের জনৈক কোচ রাজাকে তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। দীক্ষার পর রাজার নাম হইয়াছিল 'আলীমেচ'। এই 'আলীমেচ' তাঁহার তিব্বৎ অভিযানের পথ প্রদর্শক হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশ জয় করার পর মুহাম্মদ ইহাতে তুর্কী শাসনের প্রতিষ্ঠা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনিও তাঁহার আমীরগণ দেশ জয়ের সঙ্গে সঙ্গে মসজিদ প্রতিষ্ঠা ও তথায় নিয়মিতভাবে খুৎবা (সাপ্তাহিক ধর্মোপদেশ) প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া ধর্ম বিস্তৃতিতে সহায়ক স্থানে স্থানে মাদ্রাসা বা বিদ্যাপীঠ নির্মাণ করিয়া মুসলিম সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার পৃষ্ঠপোষক এবং দরবেশদের জন্য খানকাহ্ প্রতিষ্ঠা করিয়া ইসলাম প্রচারের পরিপোষক হইয়া উঠিয়াছিলেন" ।২

তাঁর পরে হুসামুদ্দীন ইবজ (১২১১-২৬ খৃঃ) -এর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি মসজিদ নির্মাণ এবং ধর্ম প্রচার ও বিস্তারে দরবেশদেরকে বৃত্তি দান করেন। নাসির

---

১. Doctor Sukumar Sen, (edited) Sekesubhudaya, The Asiatic Society, Calcutta, 1962.

২. ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হক, প্রগুক্ত, পৃঃ ৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

উদ্দিন মাহমুদ (১২২৬-২৮ খৃঃ)-এ দেশে ইসলাম বিস্তারে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছিলেন। তাঁর শাসনামলে উৎকীর্ণ একটি শীলালিপিতে তাঁকে 'যীল আমানি লি আহলিল ঈমান' বা মুসলমানদের রক্ষাকর্তা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।১

নাসিরুদ্দীন মাহমুদ-এর পর তিনজন শাসন কর্তা মাত্র পাঁচ বছর (১২২৮-১২৩৩ খৃঃ) ধরে বঙ্গদেশ শাসন করেছিলেন। তাঁরা কেউ ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও ইসলাম বিস্তৃতির জন্য তেমন কিছু করতে পারেন নি। সম্ভবতঃ আশু রাষ্ট্র পরিবর্তনই এর জন্য বহুলাংশে দায়ী। "তারপর ১২৩৩-৪৪ খৃঃ ইজদুদ্দীন তুঘরল খান বাংলার শাসন ভার গ্রহণ করেন। তাঁর শাসনামলে তিনি ইসলাম ও মুসলমানদের সাহায্যকারীরূপে বর্তমান থেকে এ দেশে ইসলাম বিস্তারে অপরিমিত সাহায্য করেছিলেন"। ২

বলবন বংশীয় তুর্কী শাসনকর্তা কৈকায়ুস শাহ (১২৯১-১৩০২ খৃঃ) আল্লাহর প্রতিনিধির (খলীফাতুল্লাহ) দক্ষিণ হস্ত ও বিশ্বাসীদের নেতা (আমীরুল মুমিনীন) ও সাহায্যকারীরূপে পরিচিত ছিলেন। তাঁর পরবর্তী শাসক শামছুদ্দিন ফীরুয শাহ (১৩০২-২২ খৃঃ) -এর হাতিমখাঁ নামক এক প্রতিনিধি বিহারে এক প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। এ প্রাসাদের শিলা লিপিতে প্রাসাদ নির্মাতা হাতিমখাঁকে 'গাজী' বা ধর্মযোদ্ধা আখ্যা দেয়া হয়েছে।

বাংলার তুর্কী শাসকগণ যে সব বিশেষণে বিশেষিত হয়েছেন তাতে বুঝা যায়, স্ব-ধর্ম ও স্ব-জাতির প্রতি তাদের মনোভাব কিরূপ ছিল। তুর্কীদের প্রাধান্যকালে এদেশে ইসলাম বিস্তার বেশ অগ্রসর হয়েছিল। এ সময় ইসলাম রাজশক্তির নিকট থেকে যেরূপ সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করেছিল পরবর্তীকালে তদ্রূপ লাভ করেনি।

বঙ্গে তুর্কী শাসনের যুগে এদেশে ইসলাম বিস্তৃতির আরেকটি সহায়ক ছিল আরব, পারস্য, বুখারা, খুরাসান, সমরকন্দ ও আফগানিস্তান প্রভৃতি মুসলিম অধ্যুষিত রাজ্যসমূহ থেকে বঙ্গে মুসলমানদের আগমন ও স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন। নানাকারণে এ সকল দেশ থেকে বঙ্গে মুসলমানদের আগমন ঘটেছিল। তারা বাংলাদেশে বসতি স্থাপন করে প্রতিবেশী প্রজা ও প্রতিবেশী হিন্দু, বৌদ্ধ ও অনার্য জাতির মধ্যে ইসলাম বিস্তারের জন্য ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টা করেছিলেন।

---

১. ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৩৯।

২. আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩২।

Dhaka University Institutional Repository

এ সময় তুর্কী শাসনকর্তাদের মধ্যে কারো কারো সাথে বাগদাদের আব্বাসী খলিফাদের উপঢৌকনাদি বিনিময়ে মিত্রতা ও ভাবের আদান প্রদান হওয়ায় আরব ও পারস্য প্রভৃতি দেশ হতে বঙ্গে অধিক সংখ্যায় মুসলমান আগমনের সুযোগ ঘটেছিল। প্রাথমিক তুর্কী শাসনকর্তাদের অতিরিক্ত স্বধর্ম ও স্ব-জাতি প্রীতি, দানশীলতা ও অনুকম্পার ফলে এ সময়ে বহু বিদেশীয় দরবেশ, আলিম, ধর্মাচার্য, ভবঘুরে ও ভাগ্যানুসন্ধানী বঙ্গে এসে বাস করতে থাকেন। বিদেশাগত মুসলমানদের মধ্যে যারাই বিদ্যাবর্তা, বুদ্ধি, শক্তি, সাহস ও দুঃসাহসিক ক্রিয়াকলাপের জন্য খ্যাতি অর্জন করতে পারতেন, তারাই বাংলার নানা রাজপদে নিযুক্ত হতেন। "এসময় বঙ্গে যাবতীয় তুর্কী সৈন্য নানা গোত্রভুক্ত বিদেশীয় মুসলিম তুর্কী জাতির মধ্য হতে সংগৃহীত হত। এরা আর দেশে ফেরত যান নি। তাদের অনেকেই বাংলার নানাস্থানে বাস করেছিলেন"।[১] মুসলমানদের উন্নত ক্রিয়াকলাপ, আচার-ব্যবহার, শিক্ষা-দীক্ষা, সামাজিকতা প্রভৃতি দ্বারা তাঁরা বিজাতীয় প্রতিবেশীদের সম্মুখে ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির এক উচ্চ আদর্শ স্থাপন করেছিলেন। ফলে এ দেশে ক্রমশ একটি শক্তিশালী ইসলামিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

বঙ্গে তুর্কী বিজয়ের দেড়শত বছর অতীত হতে না হতেই বাংলাদেশের নানা স্থানে দ্রুতগতিতে ইসলাম বিস্তৃত হয়ে পড়ে। এ ব্যাপারে সুফী , দরবেশ ও ইসলাম বিশারদ আলিম-ওলামাদের সক্রিয় ভূমিকা থাকলেও তাদের পেছনে কাজ করেছে তুর্কী শাসক সম্প্রদায়ের ক্ষাত্রশক্তি। এ প্রচারের পেছনে মুসলিম রাজশক্তি না থাকলে এরূপ ইসলামিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারতনা। ডঃ এনামুল হক বলেছেন, "দরবেশ ও ধর্মাচার্য্যেরা ইসলাম বিস্তার করিয়াছেন সত্য, কিন্তু প্রত্যেক স্থানের প্রচার তৎপরতার সাফল্যের মূলে তাঁহাদের প্রচার শক্তির চেয়ে তুর্কী জাতির ক্ষাত্র শক্তিকে অধিক দেখিতে পাই"।[২]

খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দিল্লীর অধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করে শামছুদ্দিন ইলিয়াস শাহ্-এর নেতৃত্বে মুসলিম বাংলা স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতা অর্জনের

---

১. এর বিস্তারিত প্রমাণের জন্য দেখা যেতে পারে রিয়াজুস সালাতিন, তারিখ ই-ফিরুযশাহী,তারীখ-ই-ফিরিস্তা,তবকাৎ-ই-নাসিরীও তবকাৎ-ই-আকবরী।

২. ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

সঙ্গে সঙ্গে এ দেশের রাষ্ট্রনীতি ও সমাজনীতিতে আমূল পরিবর্তন দেখা দেয়। এ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের ধর্মনীতিতেও পরিবর্তন সাধিত হয়। এ যুগের উৎকীর্ণ শিলালিপিগুলো পাঠ করলে ইসলাম বিস্তারে শাসক সম্প্রদায়ের মনোভাব উপলব্ধি করা যায় না। ১৩৭৩ খৃষ্টাব্দে সুলতান প্রথম সিকান্দার শাহ এর আমলে (১৩৫৮-৮৯) একখানা আরবী শিলা লিপিতে তাঁকে, 'যুগ ও কালের অধিপতি, ন্যায় নিষ্ঠা ও উদারতার কর্তা', 'রাজ্যের রক্ষাকারী', 'প্রজার পালক', 'করুণাময়ের করুণায় বিশিষ্ট ব্যক্তি' প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করা হয়েছে কিন্তু ধর্মযোদ্ধা আখ্যা দেয়া হয়নি"। [১]

382362

সিকান্দার শাহের পিতা শামছুদ্দীন ইলিয়াস শাহের আমলে (১৩৪২-৫৮) বাংলাদেশে তিনজন শ্রেষ্ঠ আলিম ও সূফী বর্তমান ছিলেন। তারা হচ্ছেন, আখী সিরাজুদ্দীন উসমান, শায়খ আলাউল হক ও রাজা বিয়াবানি। "ইলিয়াস শাহ সূফী ও আলিমগণকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন এবং তাঁদের ইসলাম প্রচারে সর্বতোভাবে সহায়তা দান করতেন"।[২]

১৪৫৫ খৃষ্টাব্দে ত্রিবেনীতে সুলতান বারবক শাহ এর আমলের (১৪৫৫-১৪৭৬ খৃঃ) একখানা শিলা-লিপিতে দেখা যায়, 'আদিনা মসজিদটি ন্যায়নিষ্ঠ', 'উদারচেতা', 'জ্ঞানী ও পূর্ণতালব্ধ' সুলতান বারবক শাহ এর শাসনকালে নির্মিত হয়েছিল। ১৪৭৭ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলার ত্রিবেনীতে আবিষ্কৃত সুলতান ইউসুফ শাহকে (১৪৭৪-১৪৮২) "শুধু 'কালের অধিপতি' ও 'সুলতানের পুত্র' বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে"।[৩]

আবুল মোজাফফর ফতেহ শাহ এর শাসনামলের (১৪৮২-৮৭) আবিষ্কৃত একটি শিলালিপিতে দেখা যায়, "তাতে ফতেহ শাহকে 'যুগ ও কালের অধিপতি', 'করুণাময়ের সাহায্য দ্বারা অনুগৃহিত ব্যক্তি', 'ইসলাম ও মুসলমানের সাহায্যকারী ব্যক্তি', 'সুলতানের পুত্র সুলতান' ইত্যাদি বিশেষণ আরোপ করা হয়েছে। এ সময়েই উৎকীর্ণ আরেকটি শিলালিপিতে সুলতানের পুত্র অথবা শ্রেষ্ঠ ও প্রধানতম সুলতান বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

১. ডঃ এনামুল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৮।

২. আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৯-৪০।

৩. এর জন্য বিস্তারিত দেখা যেতে পারে,ডঃ এনামুল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৮-৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

শামছুদ্দীন মুজাফফর শাহের রাজত্বকালে (১৪৯০-৯৩ খৃঃ) উৎকীর্ণ শিলালিপির একটাতে তাঁকে শুধু সুলতান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয়টিতে তাঁকে 'ন্যায়নিষ্ঠ', 'উদার' ও 'পন্ডিত সুলতান' এবং 'ইসলাম ও মুসলমানের সাহায্যকারী' বলে নির্দেশ করা হয়েছে।

এতে বুঝা যায়, এ যুগের সুলতানগণ অন্য আর যা কিছুর জন্যই প্রসিদ্ধি লাভ করুক না কেন অন্তত: প্রবল ধর্মীয় চেতনার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাই বলে ইসলাম বিস্তারে তাদের দান নেই এ কথা বলা যাবে না। এক্ষেত্রে তাঁদের প্রত্যক্ষ দান কম হলেও পরোক্ষ দান অনেক ছিল। "মুসলিম রাজ শক্তির প্রভাব এ যুগে বাংলার সর্বত্র পূর্ণভাবে অনুভূত হয়েছিল। মুসলিম রাজশক্তির সূত্র ধরে মুসলিম শিক্ষা ও সভ্যতা দেশে বিস্তৃত হয়ে পড়ায় ইসলাম বিস্তৃতির পথ দেশে সুগম হয়ে উঠেছিল"।[১]

তবে একথা ধ্রুব সত্য যে বাংলায় তুর্কী শাসনামলের ন্যায় এদের মধ্যে প্রবল ধর্মীয় উত্তেজনা ছিল ঠিকই কিন্তু তারা কখনও স্বীয় রাজ্যে ইসলাম ধর্মের অবমাননা করেননি। এক প্রকার রাজাশ্রয়ে থেকে এ যুগে বাংলাদেশে ইসলাম বেশ শান্তভাবেই বিস্তৃত হয়েছিল। এ যুগেও ইসলাম বিস্তৃতির প্রধান কর্তা ছিলেন বঙ্গের দরবেশ ও মুসলিম ধর্মাচার্য্যগণ। অসংখ্য ইসলাম প্রচারক সমগ্র বঙ্গ দেশ ভরে গিয়েছিল।

এ ভাবেই ত্রয়োদশ শতকের শেষার্ধ থেকে চতুর্দশ শতকের শেষ অবধি একদিকে আরব ইয়েমেন, ইরাক, ইরান, তুর্কিস্তান, মধ্য এশিয়া ও হিন্দুস্থানের উত্তরাংশ থেকে অসংখ্য আলিম-ওলামা, সূফী ও মুজাহিদ বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচার অভিযান চালান এবং অন্যদিকে এ আমলের মুসলিম শাসকদের মধ্যেও ইসলাম প্রচারের প্রেরণা পুরোপুরি বিদ্যমান ছিল। ইসলাম প্রচারকদের প্রচেষ্টার সংগে শাসকদের শক্তি সংযুক্ত হয়ে এ আমলে ইসলাম দ্রুত প্রসার লাভ করে। এ সময় এই উভয় শক্তির সমন্বয়ে ইসলাম নিরবচ্ছিন্ন শান্তিতে দ্রুত গতিতে বিস্তৃত হয়ে থাকলেও ইসলামের বিস্তৃতি সদাসর্বদা একই গতিতে সম্ভবপর হয়নি। উত্তর বঙ্গে ভাতুরিয়ার জমিদার রাজা গনেশ (১৪০৯-১৪১৪) এসময় ইসলামের অপ্রতিহত গতি অবরোধ করে দাঁড়ান । তিনি গৌড়ের বাদশাহ বায়িজিদ শাহকে হত্যা করে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহাসনারোহণ করেই তিনি বাংলাদেশ থেকে ইসলামকে দূর করার চেষ্টা করেন।

---

১. ১৪৮৫ সালে সুলতান মাহমুদ শাহের রাজত্বকালে উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপিতে এ সময়ের সুলতানদের অভিভাবকত্বের কথা স্পষ্টভাবে দেখতে পাওয়া যায়। এ শিলালিপিতে মাহমুদ শাহকে 'রাজ চক্রবর্তী এবং ইসলাম বিশ্বাসী ও 'মুসলিম রাজ্যের রক্ষাকারী' বলে উল্লেখ করা হয়েছে (ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭১)।

Dhaka University Institutional Repository

রাজা গণেশের স্বল্পকাল স্থায়ী শাসনকালকে কোন কোন হিন্দু ঐতিহাসিক হিন্দু শাসন প্রতিষ্ঠা ও হিন্দু ধর্মের প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা বলে উল্লেখ করেছেন। "তিনি বহু আলিম ও দরবেশকে পানিতে ডুবিয়ে হত্যা করেন। বাংলার বৃহত্তম আদীনা মসজিদকে তিনি তাঁর কর্মচারী বাড়ীতে পরিণত করেন"।[১] রাজা গণেশের অত্যাচারের মুখে ইসলাম প্রচারক আলিম ও দরবেশগণ নতি স্বীকার করেননি বরং এ বিপদ মুকাবিলায় মুসলমানদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। "রাজা গণেশ তাঁর সামনে মাথা নত না করার অপরাধে দরবেশ বদরুল ইসলামকে নির্মমভাবে হত্যা করে এবং একদিনেই পাণ্ডুয়ার অন্যান্য দরবেশ ও উলামাকে তাঁর আদেশে জলে ডুবিয়ে হত্যা করা হয়"।[২]

বাংলার মুসলমানদের এ দুর্দিনে শেখ আলাউলের পুত্র নুর কুতুবুল আলম এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেন। তিনি মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ মতানৈক্য দূর করে ঐক্যবদ্ধ করেন। তাঁর আহবানে সাড়া দিয়ে জৌনপুরের সুলতান ইবরাহীম শার্কী রাজা গণেশের বিরুদ্ধে বাংলায় অভিযান চালান। এ সময় জৌনপুরের বিখ্যাত আলিম আশরাফ সিমনানী সুদূর জৌনপুর থেকে নুর কুতুব, শেখ হোসেন, যোককর পোশ প্রমুখ বাংলার সমসাময়িক আলিমের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেন এবং ইবরাহীম শার্কীকে বাংলায় অভিযান চালাতে উদ্বুদ্ধ করেন।

"সুলতান গৌড় আক্রমণার্থে বঙ্গ দেশের সীমানায় এসে উপস্থিত হলে রাজা গণেশ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে সপরিবারে ইসলাম গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাজ্য রক্ষা করেন। পরে অল্প বয়স্ক পুত্র যদুকে ইসলামে দীক্ষিত হতে দিয়ে ইবরাহীম শাহ শার্কীকে ফিরে যাবার অনুরোধ করেন। ইবরাহীম শার্কীর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার পর পরই রাজা গনেশ পুনরায় হিন্দু ধর্মের মানসিকতা নিয়ে পুরোদমে মুসলিম দলন নিধন শুরু করেন"।[৩] যদুকেও প্রায়শ্চিত্য করে জাতে তুলেছিলেন।

---

১. শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাসের দু'শ বছরঃ স্বাধীন সুলতানদের আমল', পৃঃ ১৪৯।

২. আকবর কর্তৃক অনূদিত গোলাম হোসেন সেলিম-এর রিয়াজুস সালাতিন দ্রষ্টব্য।

৩. রাজ্য হারাবার ভয়ে রাজা গণেশ ইবরাহীম শার্কীর পীর নূর কুতুবুল আলমের স্মরণাগত হয়ে ইসলাম গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে রাজা গণেশ স্বধর্ম পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর স্ত্রীর পরামর্শে অল্প বয়স্ক পুত্র যদুকে ইসলামে দীক্ষিত হতে দিয়ে তিনি কোন প্রকারে ধর্ম রক্ষা করেছিলেন। নূর কুতুবুল আলম যদুকে তাঁর মুখের উচ্ছিষ্ট খাওয়ায়ে মুসলমান করে নিয়েছিলেন (ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৭-৮৮)।

Dhaka University Institutional Repository

"মুসলিম বঙ্গের একমাত্র ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় নেতা নূর আলমকেও রাজা গণেশ ছাড়িলেন না। তিনি দরবেশের পুত্র শায়খ আনোয়ার ও শায়খ যাহিদকে কারাগারে আবদ্ধ করেন এবং কিয়ৎকাল পরে সুবর্ণ গ্রামে (ঢাকা জেলার সোনারগাঁয়ে) নির্বাসিত করালেন। তথায় শায়খ আনোয়ার রাজার অনুচর কর্তৃক নিহত হলেন। গৌড়েও দরবেশের পরিচারক ও অনুচর বর্গের যাবতীয় সম্পত্তি রাজার আদেশে বাজেয়াপ্ত করা হইল"।[১]

উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে রাজা গণেশ হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু রাজ্য বিস্তারে বদ্ধ পরিকর ছিলেন। কিন্তু তাঁর অল্পকাল রাজত্বের (১৪০৯-১৪১৪) মধ্যে তিনি এ ব্যাপারে কিছুই করে উঠতে পারেন নি। তাঁর পর আরো দু'জন রাজা মর্দন দেব ও তাঁর উত্তরাধিকারী মহেন্দ্রদেব ইসলামের বিরুদ্ধে একই রকম ভূমিকা নিয়েছিলেন। তারা ১৪০৯ থেকে ১৪৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে পূর্ববঙ্গে প্রবল হয়ে উঠেছিলন। এতে বুঝা যায় যে মাত্র চল্লিশ বছরের মধ্যে (১৪০৯-১৪৫০) সমগ্র বঙ্গে মুসলিম রাজ্য ও ইসলামের বিরুদ্ধে হিন্দু জেহাদ ঘোষিত হয়েছিল। কিন্তু এ জেহাদ ফলপ্রসু হয় নি। রাজা গনেশের পুত্র যদু এর বিরুদ্ধে দাঁড়ান। তিনি প্রায়শ্চিত্তের পরেও অন্তরে মুসলমান রয়ে গেলেন"।[২]

রাজা গণেশের মৃত্যুর পর যদু 'জালালুদ্দীন মুহাম্মদ শাহ' নাম ধারণ করে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ইসলামের প্রতি ভয়ানক অনুরক্ত হয়ে পড়লেন। ফলে বাংলার মুসলমানদের মাথার উপর থেকে দুর্যোগের সে ভয়াবহ কালো মেঘ কেঁটে যায়। "তিনি অনেক হিন্দুকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করতে থাকেন। তাঁর প্রায়শ্চিত্য অনুষ্ঠানে যোগদানকারী ব্রাহ্মণদের শাস্তিদেন এবং গো-মাংস ভক্ষণে বাধ্য করে জাতিচ্যুত করেন। ধীরে ধীরে তাঁর রাজ্য সীমা আসামের সীমা থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত সমগ্র বঙ্গে বিস্তৃত হয়েছিল"।[৩] ১৪৪৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ইন্তিকাল করেন। এ ছাড়াও ধর্ম প্রচারে সোলায়মান কররানির সেনাপতি কালাপাহাড় (১৫৬৫-৮৩খৃঃ) তরবারী প্রয়োগ করেছিলেন।[৪] "ইউসুফ শাহের রাজত্বকালে

---

১. ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৯।

২. ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯০।

৩. আব্দুল মান্নান তালিব রচিত, বাংলাদেশে ইসলাম ও ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হকের পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম গ্রন্থ দ্বয়ের বর্ণনার সংক্ষিপ্তরূপ।

৪. কালা পাহাড় বাংলার স্বাধীন সুলতান সোলায়মান কররানীর (১৫৬৫-৭২) সেনাপতি ছিলেন। তিনি উড়িষ্যা আক্রমণ করে দখল করেন এবং পুরীর জগন্নাথ মন্দির ধবংস করেন। তাঁর পূর্ব নাম ছিল রাজু। তিনি ধর্মান্তর গ্রহণ করেন। (Jadhunath Sarker (edited) History of Bengal. Vol. II, University of Dacca, Dacca 1972.pp. 183-84--202).

Dhaka University Institutional Repository

(১৪৭৪-৮২) রাঢ়ে ছোট পাণ্ডুয়ার হিন্দু রাজ্য বিজিত হয়েছিল এবং সুর্য ও নারায়ণের মন্দির মসজিদ ও মিনারে পরিণত হয়েছিল" ।[১]

সুতরাং দেখা যায় যে পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র মুসলিম রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেও তখনও দেশের কোন কোন স্থানে হিন্দু সামন্ত ও জমিদারদের প্রভাব অপরিবর্তিত ছিল। মুসলিম আলিম ও সুফীগণ ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে বিভিন্ন স্থানে এ সব সামন্ত ও জমিদারদের চক্ষুশূল হন এবং অনেক ক্ষেত্রে এদের বিরুদ্ধে তাঁরা সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে বাধ্য হন। এ সব সংগ্রামে কেউ কেউ শহীদও হয়েছেন। আবার অনেক ক্ষেত্রে বিজয়ও লাভ করেছেন। তাঁদের জীবন, কর্ম, চরিত্র ও চিন্তা চতুর্পাশ্বস্থ অমুসলিম জনগোষ্ঠীর উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করে, বিশেষ করে দখলদার আর্য বর্ণ হিন্দু শাসনে জর্জরিত বৌদ্ধ ও অবর্ণ হিন্দু জনতা ইসলামের মানবতা ও সাম্যের আদর্শের সাথে পরিচিত হবার সুযোগ লাভ করে। ইসলাম প্রচারকগণ তাদের সামনে নতুন জীবনের এক স্বাদ তুলে ধরেন। জনগণের স্বতঃস্ফুর্ত সাড়া দানের ফলে বাংলার বিভিন্ন স্থানে মুসলিম প্রধান ছোট ছোট এলাকা গড়ে উঠে। ইসলাম প্রচারের এই অব্যাহত ধারা চলতেই থাকে। ফলে, ধীরে ধীরে সংশ্লিষ্ট এলাকা ইসলামের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা কারণে বাংলাদেশে ইসলাম দ্রুত বিস্তৃত হয়েছে এবং মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে। বলা বাহুল্য, এ সময়ে বাংলাদেশের সর্বত্র ইসলাম প্রচার তৎপরতায়, বিস্তৃতিতে ও প্রভাবে ভরে উঠে। হিন্দু ধর্ম, সমাজ, সভ্যতা ও সাহিত্য প্রভৃতি জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি দিকেই ইসলামের মুখ্য কিংবা গৌণ প্রভাব পড়েছে অর্থাৎ এ সময় ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম সমাজ হিন্দুদের ধর্ম ও সমাজকে দ্রুত গতিতে গ্রাস করছিল। এতে চিন্তাশীল ও দুরদর্শী হিন্দুগণ বিচলিত হয়ে পড়ল। ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে চাঞ্চল্যের লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে। এ সামাজিক ও ধর্মীয় চাঞ্চল্য বঙ্গে চৈতন্য দেবের (১৪৮৫-১৫৩৪ খৃঃ) আবির্ভাবের পূর্বে বিশেষ ফলপ্রসু হয় নি। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ও ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলায় হিন্দু ধর্ম ও সমাজকে ইসলামের গ্রাস থেকে রক্ষা করার চেষ্টার কোন ত্রুটি করা হয় নি। শ্রীচৈতন্য দেবের ইসলামের বিরুদ্ধে সার্ভাশী অভিযানও হিন্দুদের ধর্ম ও সমাজকে ইসলামের গ্রাস

---

১. ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

থেকে রক্ষা করতে পারে নি। অপ্রতিরোধ্য গতিতে মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে। ঘটকগণ, রাজন্যবর্গ ও পন্ডিতমন্ডলী সামাজিকতা, রাজশক্তি, আচার-বিচার বা জ্ঞানের প্রাচীর তুলে তাঁর অন্তরালে জাতিকে আবদ্ধ রেখে জাতীয় বিশুদ্ধ রক্ষায় সচেষ্ট হলেন বটে কিন্তু ইসলামের প্রবল আক্রমণে এ প্রাচীর বারংবার ভূমিসাৎ হয়েছে। একদিকে দলে দলে হিন্দুগণ প্রকাশ্যে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করতে থাকেন। অন্যদিকে তাঁরা নানাভাবে ইসলামী প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে ও ইসলামী আচারে চলতে থাকে।[১]

বাংলায় ইসলাম প্রচারের প্রতিক্রিয়ারূপেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের উদ্ভব ঘটেছিল। ১৫০৬ খৃষ্টাব্দ থেকে চৈতন্য দেব এ মতবাদ প্রচার করেন। এটা ছিল হিন্দু ধর্মের প্রগতিশীল মতবাদ। ফলে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ প্রগতিশীল বৈষ্ণব মত গ্রহণ করে ইসলামের হাত থেকে রক্ষা পায় এবং গোপনে ইসলামের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালায়। মহাপ্রভু চৈতন্য দেব স্বয়ং এর নেতৃত্বে ছিলেন।

ইসলামের বিরুদ্ধে চৈতন্যদেব একাই যে তৎপর ছিলেন তা নয়, তাঁর পশ্চাতে গোটা হিন্দু সমাজ, বিশেষকরে নব প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণব সমাজও এ বিষয়ে সক্রিয় সাহায্য করে যাচ্ছিল। তন্মধ্যে

(১) অদ্বৈত্যাচার্য- (১৪৩৪-১৫৫৭ খৃঃ) নদীয়ার শান্তিপুর;

(২) হরিদাস ঠাকুর - (১৫৫৯-১৬২৫ খৃঃ) যশোর;

(৩) নিত্যানন্দ প্রভু (১৪৭৩-১৫৪২ খৃঃ) গৌর মন্ডলে;

(৪) জাহ্নবা দেবী (১৫০৯-১৫৮৪ খৃঃ) গৌর মন্ডলে;

(৫) বীর ভদ্র বা বীর চন্দ্র (১৫৩৫-১৫৮৩ খৃঃ) পূর্ব বঙ্গে;

(৬) নরোত্তম ঠাকুর (১৫৩১-১৬১১ খৃঃ) রাজশাহীতে;

(৭) শ্যামানন্দ (১৫৩৫-১৬৩০ খৃঃ) ধারেন্দা বাহাদুর পুর গৌরমন্ডলে;

(৮) রসিকানন্দ (১৫৬৩-১৬৫৪ খৃঃ); বাংলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে বহু মুসলমানকে বৈষ্ণব করেছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পাদ থেকে শুরু করে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রায় পৌনে দু'শত বছর বীর হিন্দু মুসলমানকে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা দিয়ে বাংলায় ইসলাম বিস্তারকে খর্ব ও পঙ্গু করে তুলেছিল। ঘোরতর এই দুযোর্গ মুহুর্তেও এ দেশে ইসলাম বেওয়ারিশ অবস্থায় ছিল না।

---

১. ডঃ এনামুল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০০।

Dhaka University Institutional Repository

এ সময় ইসলামকে রক্ষা করার উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দেখা যায় বিভিন্নভাবে। সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে তখন ইসলাম অত্যন্ত সবল ও দৃঢ় ছিল। এজন্য তারা বৈষ্ণবদের প্রতিমা, ভাগবত, তুলসী ও সাধুগণকে মোটেই গ্রাহ্য করতেন না। তারা আন্তরিক প্রয়োগে বৈষ্ণব মতকে বাধা দেবার চেষ্টা করেন। ইসলাম বিশেষজ্ঞ কাজীগণও সংঘবদ্ধভাবে বৈষ্ণব মতকে বাধা দেবার চেষ্টা করেন।

এসময় কালা পাহাড় বা রাজুর ন্যায় ব্যক্তির আবির্ভাবেও ইসলাম বহুল পরিমাণে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়। কালাপাহাড় হিন্দু ছিলেন, ধর্মান্তর করে তিনি মুসলমান হন এবং মুহাম্মদ ফরমুলী নাম গ্রহণ করেন। "১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে সোলায়মান কররানির সেনাপতিরূপে কালা পাহাড় উড়িষ্যা জয় করেছিলেন। এ সময়ে বঙ্গীয় বৈষ্ণবদের প্রধান আড্ডা শ্রী ক্ষেত্রে অর্থাৎ পুরীতে লোমহর্ষক অত্যাচার করেছিলেন বলে জানা যায়। এতে বুঝা যায়, বৈষ্ণব মতবাদের প্রতি তাঁর জাত ক্রোধ ছিল"।[১]

এসময় মুসলমানদের মধ্যে বৈষ্ণব মত বিস্তৃতির পথে প্রতিবন্ধক হিসাবে হিন্দুদের মধ্যে ইসলাম প্রচারে সচেষ্ট হন ইসলাম প্রচারক উলামাগণ। এদের কর্ম তৎপরতা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। এখানে আরো কয়েকজন দরবেশের নাম উল্লেখ করা হলঃ (১) ফখরুদ্দীন আমুলীর পুত্র সৈয়দ জামালুদ্দীন আমুলী, সপ্তগ্রামে, (২) হুসেন শাহ এর রাজত্বকালে (১৪৯৩-১৫১৯) শাহ চাঁদ প্রকাশ দাদা পীর, পশ্চিম বঙ্গের মুর্শিদাবাদের আতাই নামক স্থানে ইসলাম প্রচার করেছিলেন (৩) আবু সাইদ তিরমিযি-শেখের দীঘিতে, (৪) শের শাহ এর (১৫৩২-১৫৩৮) গুরু শায়খ খলিল এবং (৫) শাহ সুলতান হুসেন মুরীয়া বরহিনা ইসলাম প্রচারক ছিলেন।

এদের প্রচারণার ফলে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধ হতে বঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব আন্দোলনে ভাটা পড়ে এবং ইসলামও তার পূর্ব সবলতা, দৃঢ়তা ও নানা বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়। এ দেশে ইসলামের বহুল বিস্তৃতিই এর একমাত্র কারণ। এদেশের বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করলেও তারা ভাবে, ভাষায়, সংস্কৃতিতে, আচারে, ব্যবহারে হিন্দুই রয়ে যায়, মুসলমান হয়ে উঠতে পারে নি। এ দেশে ইসলাম হিন্দু পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে বাস করায় মুসলমানেরা এর দ্বারা ক্রমশ

---

১. ডঃ এনামুল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩১।

Dhaka University Institutional Repository

প্রভাবিত হতে থাকে। বিদেশীয় মুসলমানেরা বংশ পরস্পরায় ধীরে ধীরে স্বীয় ইসলামী দেশের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে থাকে। বাঙ্গালী মুসলমানেরা অতি মাত্রায় বাঙ্গালী সাজতে লাগলেন। বাংলাদেশে ইসলামের প্রভাব একেবারেই শিথিল হয়ে পড়ল। ফলে বঙ্গে শাস্ত্রীয় ইসলাম (শরীয়তী ইসলাম) ধীরে ধীরে লৌকিক ইসলামের (শিরক ও বিদ্‌য়াত) দ্বারা অপসারিত হতে লাগল।

বঙ্গে ইসলামের স্থায়িত্ব প্রাপ্তির ইতিহাস প্রধানত ঃ "এই লৌকিক ইসলামেরই ইতিহাস সপ্তদশ শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে অষ্টাদশ শতাব্দীর অবসান পর্যন্ত বঙ্গে লৌকিক ইসলামের প্রাধান্য দেখা যায়। তাই বলে এই সময় ইসলাম বিস্তার বন্ধ থাকেনি"।[১]

আর ইসলাম প্রচারকগণ বাংলাদেশে কেবল ইসলামের প্রচার ও প্রসারই করেন নি, মুসলমানদের রাজ্য বিস্তার, রাষ্ট্রীয় ঐক্য, সংহতি বিধান প্রভৃতি দায়িত্ব পালন করেন। তারা কখনো নিজেরা কখনো সেনাপতিদের সাথে মিলিতভাবে বাংলার শেষ সীমা পর্যন্ত মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলাম প্রচারকদের কেউ কেউ ইসলামী শাসন সীমা বিস্তার এবং ছোট ছোট রাজা ও জমিদারদের এলাকায় মুসলমানদেরকে জুলুমের হাত থেকে রক্ষা করতে মুসলিম শাসনকর্তা ও সেনাপতিদের সাথে যোগ দেন। তাদের যোগদানের ফলে মুসলিম বাহিনীতে অপরাজেয় নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি সৃষ্টি হয়। মুজাহিদ দরবেশ জাফর খাঁ গাজী ও শাহ সফিউদ্দিন সাতগাঁয়ের হিন্দু রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধকরে এ অঞ্চলকে মুসলিম রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত করেন। এভাবে ইসলাম প্রচারক ও শাসকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এ দেশে ইসলাম দ্রুত প্রসার লাভ করে এবং ক্রমান্বয়ে এ অঞ্চলে মুসলমানেরা একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতিতে পরিণত হয়।

মধ্যযুগে লোক গণনার কোন রীতি ছিলনা। সুতরাং কোন শ্রেণীর মুসলমান কি হারে বৃদ্ধি পেয়েছে তার আর নির্ণয় করার উপায় নেই। মুসলমান আমলে এ দেশ সম্বন্ধে যেসব ইতিহাস রচিত হয়েছে সেসব ইতিহাসে প্রধানতঃ রাজ বংশের উত্থান পতনের কাহিনী প্রাধান্য লাভ করেছে, জনসাধারণের কথা প্রায়ই স্থান পায় নি। "বৃটিশের শাসনামলে ইংরেজ রাজ কর্মচারী এবং পন্ডিতরা শাসনকার্য পরিচালনার জন্য সমাজতত্ত্ব, নৃ-তত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি বিজ্ঞান ভিত্তিক জ্ঞানের আলোকে বাংলার বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করেন"।[২] তাদেরই প্রচেষ্টায় ১৮৭২ সালে প্রথম আদম শুমারী অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৮১ সালে দ্বিতীয় ,

---

১. ডঃ ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪ ।

২. ডঃ ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত,পৃঃ ৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

১৮৯১ সালে তৃতীয় ইত্যাদি দশ বছর অন্তর অন্তর নিয়মিত ভাবে লোক গণনারীতি চলতে থাকে। ১৮৭২ সালের সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী "মূল বাংলার ৩ কোটি ৫৭ লাখ ৬৯ হাজার ৭ শত ৩৫ জন লোকসংখ্যার মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ১ কোটি ৭৬ লাখ ৯ হাজার ১ শত ৩৫ জন এবং হিন্দু ১কোটি ৮২ লাখ ৪শত ৩৮ জন। বাকী অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোক। শতকরা হিসাবে হিন্দু মুসলমানের হার যথাক্রমে ৫০.১% এবং ৪৮.৮%"।[১]

১৮৮১ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী "মোট ৩৫,৬০৭,৬২৮ জনের মধ্যে মুসলমান ১৭,৮৬৩,৪১১ ও হিন্দু ১৬,৩৭০,৯৬৬ জন। শতকরা হিসাবে মুসলমান ও হিন্দুর সংখ্যা যথাক্রমে ৫০.১৬% এবং ৪৮.৪৫%"।[২] আগের রিপোর্ট-এ প্রায় ছয় লাখ মুসলমান কম ছিল, পরের রিপোর্টে মুসলমানের সংখ্যা বেড়ে প্রায় ১৫ লাখ বেশী হয়েছে। ১৮৯১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা ১৫ লাখের ও অধিক দেখা যায়"।[৩]

১৮৭২ সালে হেনরী ব্রেভর্লি সেন্সাস রিপোর্টে জেলা ভিত্তিক লোক সংখ্যা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে বাকেরগঞ্জ, ত্রিপুরা, রংপুর ও মোমেনশাহীর দুই তৃতীয়াংশ এবং দিনাজপুর, নদীয়া, যশোর ও ফরিদপুরের অর্ধেকের বেশী মুসলমান। ঢাকায় মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর তুলনায় সামান্য বেশী। মালদহে ৪৬ ভাগ, মুর্শিদাবাদে ৪৫ ভাগ, রাজশাহীতে ৭৭ ভাগ এবং চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীতে ৮০ ভাগেরও বেশী মুসলমান । আর মুসলিম জনসংখ্যার দিক দিয়ে সবার উপরে বগুড়া। মুসলিম শাসকদের দ্বারা কয়েক শ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা শহরে তখন মুসলমানের সংখ্যা ছিল ৩৪২৭৫ জন আর হিন্দুর সংখ্যা ছিল ৩৪৪৩৩ জন। "অন্যদিকে ঢাকার গ্রাম এলাকায় হিন্দু ছিল আট লাখ আর মুসলমান ছিল দশ লাখেরও বেশী"।[৪]

বাংলায় এভাবে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ইউরোপীয় পন্ডিতগণ প্রধানতঃ হিন্দু সম্প্রদায়ের নিম্নবর্ণের জনগণের ব্যাপক হারে ধর্মান্তর গ্রহণের উপর জোর দিয়েছেন। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের কেউ কেউ বলেছেন "একহাতে তরবারী ,অন্যহাতে কুরআন নিয়ে মুসলমানেরা ধর্ম প্রচার করেছেন"।[৫] তাদের এ মন্তব্য আদৌ সত্য নয়। বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার

---

১. Report on the sensus of Bengal, 1872, Calcutta, 1872. pp. xxxii-ii.

২. Report on the sensus of Bengal 1818. Calcutta,1883-p. 74.

৩. Report on the sensus of Bengal, 1891-vol-iii, p. 147.

৪. Henri Brevergely, District of Bakengong.

৫. J.J. Deboer. History of philosophy in Islam, P. 30.

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্কে কিছুতেই এ কথা মেনে নেয়া যায় না। শুধু অস্ত্রের সাহায্যে পৃথিবীতে ইসলাম বিস্তারের কাহিনী নিতান্তই অলীক, ভিত্তিহীন ও পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের উর্বর মস্তিস্ক প্রসূত। "প্রধানতঃ প্রবর্ত্তনা বা ধর্মান্তর গ্রহণে প্রেরণা দান দ্বারাই পৃথিবীতে ইসলাম বিস্তৃত হইয়াছিল। তবে, এই প্রেরণা দানের পশ্চাতে মুসলিম ক্ষাত্র শক্তির প্রভাবও কিয়ৎ পরিমাণে ক্রিয়া করে থাকবে। ------------ এ শক্তি যে কদাচিৎ সক্রিয় হয়ে উঠেনি তেমন কথা কোন সত্যবাদী ঐতিহাসিক অস্বীকার করতে পারবেন না। ----- তবে ইসলাম বিস্তারে এ শক্তির প্রভাব পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যতটা ক্রিয়া করেছে, এদেশে ততটা ত দূরের কথা তার শতাংশের একাংশও ক্রিয়াশীল হয়ে উঠে নাই।----- বঙ্গে-ইসলাম বিস্তারকারীগণও দক্ষিণ হস্তে তরবারী ও বাম হস্তে কুরআন ধারণ করে বঙ্গে প্রবেশ করেনি"। [১]

এ প্রসঙ্গে ডঃ ওয়াকিল আহমদ বলেছেন, "এদেশে ইসলাম প্রচারে শাসক শ্রেণী অপেক্ষা সাধক শ্রেণীর ভূমিকা অধিক ছিল। সাধু দরবেশগণই ইসলাম ধর্ম প্রচারের মূলদায়িত্ব পালন করেন। তাঁদের হাতে কোরআন ছিল বটে, কিন্তু তরবারী ছিল না। বাংলার পীর দরবেশগণ সূফীমতের ধারক ছিলেন। সূফিরা উদার মানবতাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। বাংলাদেশে শত শত দরগাহ, খানকাহ, মাজার, মসজিদ আছে, সেগুলি শহর বন্দর অপেক্ষা গ্রামে গঞ্জে বেশী ছড়িয়ে আছে। পীর দরবেশগণ লোকালয়ের মধ্যে সাধারণ মানুষের সংগে থাকতেন, তাঁদের সৈন্য সামন্ত বা দেহ রক্ষী ছিল না, তাঁরা উচ্চবিত্তের মালিকও ছিলেন না; তাঁরা অতি সাধারণ ভাবে জীবন যাপন করতেন। কেউ কেউ সরকারের দেয়া নিস্কর ভূমি তথা পীরোত্তর সম্পত্তির সুবিধা ভোগ করতেন সত্য, তবে বেশীর ভাগ সাধুসন্ত ভক্তের স্বতঃস্ফুর্ত দর্শনীর উপর নির্ভর করে চলতেন। তাঁরা বল প্রয়োগ করলে গ্রামমণ্ডলে টিকতে পারতেন না"।[২]

ধর্ম প্রচারে ও ধর্ম কার্য সম্পাদনের জন্য পীর মুর্শিদগণ শাসকদের কাছ থেকে বিভিন্ন সুবিধা ভোগ করলেও ইউরোপীয় যাজকতন্ত্রের মত পীরতন্ত্র বা মোল্লাতন্ত্র, কোন সুগঠিত সংঘ শ্রেণী ভূক্ত ছিল না। এগুলি অধিকাংশ ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্ন প্রয়াস ও উদ্যোগ ছিল। মুসলিম বিশ্বের রাজতন্ত্র ও পীরতন্ত্রের মধ্যে ইউরোপীয় রাজতন্ত্রের সাথে যাজকতন্ত্রের মত সম্পর্ক ছিল না। পীর দরবেশগণ রাজ দরবারে সম্মান পেতেন, কিন্তু দরবারে স্থায়ী আসন পেতেন না। সুতরাং মুসলমান কর্তৃক রাজ্য বিজয়ের পূর্বে কি পরে তাঁরা নিজেরা তরবারী ধারণ করেন নি। এমনকি কৃপনধারী শাসক শ্রেণীর ছত্র-ছায়াও তাঁরা সমভাবে ও অবিচ্ছিন্ন ভাবে পাননি।

---

১. ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩-৩৪।

২. ডঃ ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬।

Dhaka University Institutional Repository

সুফী ও দরবেশগণের অনেকেই নিজেদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ও অলৌকিক শক্তির (কারামত) সাহায্যে সাধারণ মানুষকে সম্মোহিত করতেন বলে জানা যায়। কিন্তু "জনগণের ব্যাপকহারে ইসলাম গ্রহণের মূলে এ অলৌকিক শক্তির তাড়না যতটুকু ছিল তার চেয়ে অনেক বেশী ছিল ইসলামের অন্তর্নিহিত সম্মোহনী ও আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাব । ইসলামের মূলনীতি ও প্রধান আদর্শ অনাবিল এক ইশ্বরবাদ (তৌহিদবাদ) এবং নর পূজা, প্রতীকপূজা,পৌত্তলিকতা ও অবতারবাদের অভিশাপমুক্ত একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে মানুষকে তার যথার্থ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে বর্ণ সম্প্রদায়ও অস্পৃশ্যতার কলুষমুক্ত এক ভ্রাতৃ সমাজে পরিণত করার আদর্শই বাংলার ধর্ম বিভ্রান্ত ও সামাজিক ক্ষেত্রে নিগৃহিত জনগোষ্ঠীকে পতঙ্গের ন্যায় ইসলামের আলোক রশ্মির দিকে ধাবিত করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল"।[১]

শুধু ভারত বর্ষেই নয় ইসলাম দ্রুত গতিতে পৃথিবীর চার ধারে কিভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল, তার মূলে কোন বৈপ্লবিক শক্তি নিহিত ছিল। তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে এম, এন, রায় বলেছেন, "ইসলামের এই বিজয় অভিযানের কারণ ছিল এক অভূতপূর্ব বৈপ্লবিক সুরের মধ্যে লুকিয়ে ; গ্রীস, রোম, পারস্য , চীন এমনকি ভারত বর্ষেরও প্রাচীন সভ্যতায় ঘুন ধরে যাওয়ায় , বিপুল জনসাধারণ যে চরমতম দুঃখ দুর্দশার সম্মুখীন হল, তা থেকে বাঁচিয়ে ইসলাম এক আলো ঝলকিত দেশের নির্দেশ তাদের দিতে পেরেছিল বলেই তার এই অসাধারণ বিস্তার সম্ভব হয়েছিল ।"[২]

তিনি আরো বলেছেন, "শুধু তরবারীর সাহায্যে রাজ্য জয় আরও অনেক জাতি করেছিল, কিন্তু তারা ধূমকেতুর মতো উদিত হয়ে লুপ্ত হয়ে গেছে, বিশ্বসভ্যতায় তাদের কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু ইসলামের রাজ্য জয় সে ধরনের ছিলনা, ক্ষীয়মান বিশ্ব সভ্যতায়-সংস্কৃতিতে সে একটি নতুন শক্তি সঞ্চারিত করেছে। আরবদের বিস্ময়কর সামরিক সফলতা এই প্রমাণ করে যে, তাদের তলোয়ার ইতিহাসের সেবায় তথা মানবতার অগ্রগতির পথেই চালিত হয়েছিল।--- ইসলাম একাধারে সমাজ ও রাজনীতি সম্মত রূপ, মানব সভ্যতার এই মহামূল্যবান অবদানকে রক্ষা ও পুষ্ট করে য়ুরোপকে মধ্য যুগের অন্ধকার থেকে মুক্তি দিল, আর তারই সঙ্গে গড়ে উঠল আধুনিক সভ্যতার গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতিস্তম্ভ।"[৩]

---

১. আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৪ ।

২. ডঃ মানবেন্দ্র নাথ রায়, The Historical Role of Islam, মুহাম্মদ আব্দুল হাই অনূদিত, ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান, কলিকাতা, ১৯৪৯ইং, ভূমিকা, পৃঃ ৯ ।

৩. মুহাম্মদ আব্দুল হাই অনূদিত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

ইউরোপীয় পন্ডিতদের যুক্তি খন্ডন করতে গিয়ে ডঃ আব্দুল করিম বলেছেন, "ইসলাম শান্তির ধর্ম, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব ইসলামের মূল কথা; সুতরাং ধর্মে বিশ্বাসীরা শুধু তরবারীর জোরে শাসন করবে একথা বিশ্বাস যোগ্য নয়। যদি তাই হয়, তাহলে সাতশ বছর ধরে প্রবল পরাক্রমে শাসন করার পরেও মুসলমানরা উপমহাদেশে সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারলনা কেন? এমনকি, মুসলমান শাসনের কেন্দ্রস্থল দিল্লী এবং আগ্রায়ও মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি। সুতরাং বিনা দ্বিধায় বলা যায় যে, তরবারী দ্বারা ইসলাম প্রচারিত হয়নি। উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারে রাজা বাদশাহরা কোন সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন নি বরং ইসলাম প্রচারিত হয় মুসলমান আলিম এবং সূফী দরবেশদের চেষ্টায় তাদের সরল অনাড়ম্বর জীবনযাপনে এবং ইসলামের শান্তির বাণীতে এবং সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের শিক্ষায় মুগ্ধ হয়ে দলে দলে লোক ইসলাম গ্রহণ করেন"।[১] সতীশ চন্দ্র মিত্র বলেছেন, "অস্ত্রবলে দেশ জয় করা যায় কিন্তু মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করা যায় না। সৌভাগ্যবশত মুসলমানেরা ক্রমে যতই দেশ জয় করিতে লাগিলেন দরবেশরাও ততই অধিক সংখ্যায় এ দেশে আসিতে আরম্ভ করিলেন। তাহারাই অগ্রদূত হইয়া দেশের নানা স্থানে প্রবেশ করিয়া তাহাদের আধ্যাত্মিক শক্তি ও ধর্ম জীবনের আদর্শ দেখাইয়া অমুসলমানদিগকে বশীভূত করেন। ধর্মের খাতিরে হিন্দুরা তাহাদিগকে নির্যাতন করিতেন কিন্তু সূফী সাধকগণও নির্যাতনের মধ্যে সহিষ্ণুতা দেখাইয়া স্বধর্ম প্রচারের জন্য স্বার্থ ত্যাগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। তাহাদের সেই আত্ম বলিদানের উপরই আজ ইসলাম ধর্মের বিজয় বৈজয়ন্তী উড়িতেছে"।[২]

পবিত্র কুরআনও বল প্রয়োগে ধর্ম প্রচারের বিরোধী এবং ধর্মের ব্যাপারে জোর জবরদস্তি করতে মুসলমানদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা প্রদান করে। কুরআনের ঘোষণা, "ধর্মে জোর জবরদস্তি নেই। সত্য ভ্রান্তিরপথ থেকে আপনদীপ্তিতে সুপরিস্ফুট"।[৩]

শুধু আক্রান্ত অবস্থায়ই আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করারজন্য কুরআন মুসলমানদেরকে নির্দেশ দান করে। "তোমাদের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করে তাদের সঙ্গে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করো কিন্তু সীমা লঙ্ঘন করোনা। কেননা,আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘন কারীদের ভালবাসেন না"।[৪]

---

১. ডঃ আব্দুল করিম, চট্টগ্রামে ইসলাম, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, চট্টগ্রাম,১৯৮০ইং,পৃঃ ৯৪।

২. মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী,উজ্জ্বল এক পায়রা, পৃঃ ২৭।

৩. আল কুরআন ,সুরা-২ আয়াত ২৫৬।

৪. আল কুরআন ,সুরা- ২ আয়াত ১৯০।

Dhaka University Institutional Repository

আবার অন্য ধর্মের সাথে কোন প্রকার সংঘর্ষে অবতীর্ণ না হওয়ার জন্য কুরআনে নির্দেশ রয়েছে। ঘোষণা করা হয়েছে, "আপনি বলুন, হে অবিশ্বাসীগণ, তোমরা যার পূজা করছ, আমি তার পূজা করি না। আর আমি যার উপাসনা করি, তোমরা তার উপাসক নও। আর তোমরা যার পূজা কর, আমি তার পূজারী নই। আর আমি যার উপাসনা করি, তোমরা তার উপাসক নও। তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম এবং আমার জন্য আমার ধর্ম"।[১]

ইসলামের এই নির্দেশ মুসলমানেরা অক্ষরে অক্ষরে প্রমূর্ত করে তুলেছে। কালের ইতিহাস তার সাক্ষী। "ইসলাম প্রচারের মূলে তরবারী, বল প্রয়োগ বা কোন দমন মূলক ব্যবস্থা কাজ করে নি। ইসলামের মহান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ইহার মহান ঐক্য, সাম্য ও বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের আদর্শই মানুষকে ইসলামের পতাকাতলে সমবেত করিয়াছে। ইসলাম এক মহান ঐতিহাসিক প্রয়োজনেরই পরিণতি। কোন দমন মূলক ব্যবস্থার প্রভাবে কেহ ইসলাম গ্রহণ করে নাই; ইসলামের উন্নত নৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মাহাত্মে মুগ্ধ হইয়া মানুষ ইসলামের শান্তির ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, এখনও করিতেছে।"[২]

ইউরোপীয় পন্ডিতগণ প্রধাণতঃ হিন্দু সম্প্রদায়ের নিম্নবর্ণের জনগণের ব্যাপক হারে ধর্মান্তর গ্রহণের উপর জোর দিয়েছেন। হিন্দু সমাজে জাতিভেদের কঠোরতার কারণে মুসলমান পীর দরবেশগণ নিম্নবর্ণের হিন্দুদের সহজেই ধর্মান্তর করতে পেরেছেন। আরব, পারস্য, আফগানিস্তান থেকে আগত অভিজাত শ্রেণীর বসতি স্থাপনের ফলে বাংলার মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, একথা তাঁরা স্বীকার করেন না।[৩]

মুসলমানদের পক্ষে অবমাননাকর এবং মুসলমান সম্প্রদায়কে হেয় প্রতিপন্ন করার ষড়যন্ত্র বলে মুসলমান পন্ডিতগণ ইউরোপীয়দের এ তত্ত্ব মানতে চান নি। এর বিরুদ্ধে প্রচন্ড প্রতিবাদ তোলেন খোন্দকার ফজলে রাব্বি। তিনি বাংলার মুসলমান আমলের নবাব সুলতানদের ধারাবাহিক ইতিহাস, পারিবারিক ইতিহাস, মুসলমানদের নৃ-তত্ত্ব ও অন্যান্য লক্ষণ বর্ণনা করে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান বিদেশ থেকে আগত অভিজাত শ্রেণীর লোক। তাঁর যুক্তি হলোঃ-

১. "বাংলা বখতিয়ার খিলজীর সময় থেকে কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের সময় পর্যন্ত মুসলমান শাসকের অধীনে ছিল।

---

১. আল কুরআনঃ সুরা- ১০৯।

২. ডঃ রশীদুল আলম, মুসলিম দর্শনের ভূমিকা, সাহিত্য কুটির, বগুড়া, ১৯৮৪ইং, পৃঃ ২২৬।

৩. Shila sen, Muslim Politics in Bengal (1937-1947), Newdelhi, 1976, p.3.

Dhaka University Institutional Repository

২. সুলতান শাসকগণ অন্য অঞ্চলের স্বধর্মীয়দের আহবান করেছেন, সৈয়দ, মোঘল, পাঠানদের চাকুরী দিয়েছেন, শিক্ষিত, ধার্মিক, নিঃস্ব ব্যক্তিদের-করমুক্ত ভূমি দিয়েছেন বসবাস করার জন্য। গিয়াসুদ্দীন (১২১৪-২৭), নাসীরুদ্দীন (১৪২৬-৫৭), হুসেন শাহ (১৪৯২-১৫২১) সম্ভ্রান্ত ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের বাংলায় আসতে এবং বসতি স্থাপন করতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

৩. বাংলার শাসকদের সৈন্যবাহিনী বাইরের মুসলমান দ্বারা গঠিত, তাদের অধিকাংশ ঐ সব দেশ থেকে এসেছে।

৪. অনেক ব্যক্তি বাংলার সম্পদের প্রাচুর্য ও ভূমির উর্বরতায় আকৃষ্ট হয়ে এদেশে এসে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেছে।

৫. উত্তর ও পশ্চিম ভারতের বাস্তুত্যাগী ও পলাতকদের আশ্রয়স্থল ছিল বাংলাদেশ। বিশেষকরে স্বাধীন সুলতানদের দু'শবছর রাজত্বকালে (১৩৩৮ -১৫৭৬) এ ধরনের রাজনৈতিক আশ্রয় অনেক ছিল। ঘোরী বংশের পতনের কালে এবং মুহাম্মদ তুঘলকের রাজত্বকালে বহু মুসলমান পরিবার বাংলায় আশ্রয় গ্রহণ করে। আকবরের রাজত্বকালেও বহু ধর্মীয় নেতা বাংলায় প্রেরিত হয়েছেন"।[১]

মুহাম্মদ আব্দুর রহীম তুর্কী ও মোঘল আমলে বাংলায় আগত বিদেশী মুসলমান অপেক্ষা হিন্দু, বৌদ্ধ থেকে ধর্মান্তরিত দেশীয় মুসলমানের সংখ্যা বেশী বলে উল্লেখ করেছেন।[২]

বাংলায় মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতার মূলে রয়েছে, "শাসক গোষ্ঠীর সঙ্গে সামরিক ব্যক্তি, প্রশাসনিক কর্মচারী, শিক্ষাবিদ, ব্যবসাদার ও আরো অনেক ভাগ্যান্বেষীর দল এসেছিলেন এই বাংলায়। কেন্দ্রের রাষ্ট্র বিপ্লবের ফলে অনেকে বিতাড়িত হয়ে ভারতের পূর্ব প্রান্তে বাংলায় আশ্রয় প্রার্থী হয়েছিলেন। রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বন্দ্বে দিল্লীতে অনেকবার রাষ্ট্র বিপ্লব হয়েছে। শেষের দিকে মারাঠা, অমেঠী, নাদির শাহ, আহমদ শাহ আবদালীর আক্রমণ ও লুণ্ঠনের ফলে দিল্লীর নাগরিক জীবন বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত হয়। জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তার কারণে লোকে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ত। এদের একটি স্রোত বাংলাদেশে প্রবাহিত হয়েছে। পরে শান্তি স্থাপিত হলেও তাদের অনেকেই আর ফিরে যাননি। তাঁরা বসতি গড়ে তুলেন এবং স্থানীয় নারী-পুরুষের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। শাসক, সৈনিক, বণিক,

---

১. Khondker Fazlee Rubbe, The origin of the Musalmans of Bengal, Calcutta, 1895.

২. Mohammuad Abdur Rahim, social and cultral History of Bengal, VoL-1-11, Karachi- 1961.

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মপ্রচারক প্রভৃতি বহিরাগত মুসলমান, ধর্মান্তরিত স্থানীয় জনসাধারণ এবং বৈবাহিক সূত্রে জাতমিশ্র রক্তধারার মানুষ এই ত্রিবিধ পদ্ধতিতে বাংলায় মুসলমান সমাজের সৃজন, গঠন ও বর্ধনের কাজ সারা মধ্যযুগ ধরে চলেছিল। সুতরাং বাংলাদেশে ইসলাম ধর্মের প্রচার এবং মুসলমান সমাজের পত্তন কোন আকস্মিক ঘটনা নয়, দীর্ঘকালের ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রক্রিয়ার দ্বারাই বাঙ্গালী মুসলমানের গঠন ও বিকাশের কাজ সম্পন্ন হয়েছে"। [১]

বাংলার মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধির আরো কারণ হলো-ধর্মান্তরকরণ। এই ধর্মান্তরের কারণ হিসেবে ইউরোপীয় পন্ডিতগণ হিন্দুর 'জাতিভেদ' প্রথার উল্লেখ করেন। হেনরী ব্রেভার্লি ১৮৭২ সালের সেন্সাস রিপোর্টে জেলা ভিত্তিক লোক সংখ্যা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে বাংলার সর্বত্র প্রায় মুসলমানের হার অনেক বেশী। এরূপ তত্ত্বের ভিত্তিতে তিনি মন্তব্য করেছেন, "This circumstances again seems to point out to the conclution that the existence of Muhammadans in Bengal is not due to so much to the introduction of mughal blood into the country as to the conversion of the former inhabitants for whom a rigid system of cast discipline rendered Hinduism intolarable." [২]

এ প্রথা ভারতের হিন্দু সমাজের সর্বত্র ছিল। হিন্দু শাস্ত্রমতে যবন সংশ্রবে হিন্দুর জাতি পাত হয়। মধ্যযুগে এই শাস্ত্র ব্যবস্থাই হিন্দুদের কাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। 'যবনেরা' (মুসলমান) যখন দেশের রাজা; সুতরাং যবন সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া কূপমন্ডুকরূপে বাস করা হিন্দুদের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। তখন নানা উপলক্ষ্যে তাহাদিগকে যবন সংস্পর্শে আসিতে হইত ও নানাভাবে তাহাদের সামাজিকতা ইত্যাদিতে যোগ দিতে হইত। ইহাতে সমাজের কঠোর শাসনে হিন্দু কুলিনেরা কুলিনত্ব হারাইতে লাগিলেন ; সংশ্রবের গুরুত্ব ও লঘুত্ব হিসাবে দোষী ও সমাজচ্যুত বলিয়া ব্যবস্থা পাইতে লাগিলেন। বহু কুলিনের মেলে 'যবন দোষ' ঢুকিয়া পড়ায়, অন্যান্য নির্দোষ কুলিনগণ তাহাদিগকে সমাজে হেয় ও তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের সামগ্রী করিয়া তুলিয়াছিলেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে দেবীর ঘটক ৩৬ (ছত্রিশ) মেলের সৃষ্টি করেন"। [৩]

---

১. ডঃ ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩-৪।

২. Report on the sensus of Bengal, 1872. p. 132.

৩. ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৩-৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমান কর্তৃক কুলিন কন্যার বলাৎকার ও অপহরণ, মুসলমানের প্রতি কুলিন কন্যার আসক্তি ও তৎসঙ্গে বিবাহ, কুলিন কন্যার যবন গামিনী হওয়া বা কুলিন পুত্রের যবন গমন করা, কুলিনের যবনান্ন ভক্ষণ করা বা যবনের সাথে কুলিনের সংশ্রব ঘটা ইত্যাদি নানা যবন দোষ প্রবিষ্ট হয়েছিল। এতে কুলিন সমাজচ্যুত হয়েছিলেন। এভাবে হিন্দু সমাজ অতি বিশৃংখল ও আত্মঘাতী হয়ে উঠেছিল। কথায় কথায় হিন্দুর জাতিপাত হত এবং সহস্র প্রায়শ্চিত্ত করলেও আর সেই পতিত ব্যক্তি সমাজে গৃহিত হত না। সুতরাং হিন্দু সমাজ থেকে পরিত্যক্ত লোকেরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সেই সমাজে মিলিত হতে বাধ্য হত।

বাংলায় সেনরাজারা ছিলেন গোঁড়া হিন্দু। "সেন আমলে (১০৯৫-১২০০ খৃঃ) সমুদ্র যাত্রা নিষিদ্ধ করা হয়। সমুদ্র যাত্রা করলে হিন্দুদের জাতিচ্যুত হতে হত। তাই জাহাজে মাঝি-মাল্লা হবার জন্যেও অনেকে ইসলাম গ্রহণ করে থাকতে পারে"।১

এ প্রসঙ্গে বাংলার বৌদ্ধ সমাজের কথা ভেবে দেখতে হয়। অষ্টম শতক থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় চারশত বছর বাংলার বৃহত্তর অংশ বৌদ্ধ রাজার শাসনাধীনে ছিল। মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর, ময়নামতিতে বৌদ্ধ বাঙালী বৌদ্ধ কোথায় গেলেন ? বৌদ্ধদের সাথে হিন্দুদের সম্পর্ক ভাল ছিল না। "সেনরাজাদের আমলে (১০৯৫-১২০০ খৃঃ) ব্রাহ্মণদের বহু ভূমি দান করা হয়। ব্রাহ্মণরা হয়ে উঠেন এ দেশের ভু-স্বামী শ্রেণী। অন্য দিকে বৌদ্ধরা হয়ে উঠেন সাধারণ কৃষক প্রজা। ভু-স্বামী ও কৃষক প্রজার অর্থনৈতিক স্বার্থের দ্বন্দ্ব রূপ নেয় ধর্মীয় বিরোধ হিসাবে"।২

"ব্রাহ্মণ্য ধর্মাদর্শে প্রভাবিত সেন ও বর্ম রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও প্রশাসনে বৌদ্ধদের কোন স্থান ছিলনা। সেন ও বর্ম প্রশাসকদের প্রচেষ্টায় সেকালের রাষ্ট্র, সমাজ ও ধর্মের উপর ব্রাহ্মণ্য সমপ্রদায় একচ্ছত্র আদিপত্য বিস্তার করতে চেয়েছিলেন। এ ধরনের মানসিকতা পাল ও চন্দ্র রাজাদের কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সমন্বয় কারী রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও সমাজ কাঠামোর বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে কাজ করেন।"৩ "উত্তর ভারতে আর্যদের অত্যাচার ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আধিপত্য বিস্তার বৌদ্ধ ধর্মসহ বৌদ্ধদের পূর্বদিকে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য করে। সেন রাজারা বাংলায় প্রতিষ্ঠা করেন বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা-(Caste System); এবং ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যের কৌলিণ্য প্রথা।৪

---

১. ডঃ এবনে গোলাম সামাদ,বাংলাদেশে ইসলাম, পৃঃ ১২।
২. ডঃ এবনে গোলাম সামাদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৩।
৩. বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ,প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৬।
৪. V.A. Smith, The oxford history of India, (Ed. p. spear, clarendon press. oxford), p.p. 20-22.

Dhaka University Institutional Repository

বৌদ্ধদের উচ্চবর্ণের হিন্দুরা মনে করত অশূচি (Undeasy)। এই অপমানিত বৌদ্ধরাই বিশেষভাবে সাড়া দেয় ইসলামের ডাকে। বৌদ্ধদের উপর বর্ণ হিন্দুদের অত্যাচার চরম আকার ধারণ করে। বৌদ্ধগণ নাথ মতবাদের ছদ্মাবরণে নিজেদের আত্মরক্ষার চেষ্টা করেও রেহাই পায়নি। "যখন ব্রাহ্মণেরা অত্যাচারে উৎপীড়নে বৌদ্ধদের অস্তিত্ব এমনি বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল, তখন ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে তাহারা এই অত্যাচার উৎপীড়ন হইতে নিষ্কৃতি লাভের একটা উপায় খুঁজিয়া পায় এবং বহু বৌদ্ধ ইসলাম গ্রহণ করে। অনুরূপ কারণে অনেক নিগৃহিত হিন্দুও ইসলামের ছায়াতলে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে।"[১]

জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী বলেন, "বঙ্গে যখন তুর্কী আফগানের আবির্ভাব ঘটে, তখন তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের প্রায় ভগ্নদশা। স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিলেও অনেক বৌদ্ধ হিন্দু সম্প্রদায়ের নিম্নস্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সমাজে তাহারা ছিলেন অপাঙক্তেয়। নবাগত তুর্কী, আফগান বঙ্গ বিহারের বহু সঙ্ঘারাম ধুলিসাৎ করিয়াছিলেন, ফলে অনেক বৌদ্ধ নেপাল তিব্বতে পলায়ন করিয়াছিলেন। আবার অনেকে স্বেচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হোক, মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।"[২]

হিন্দু সম্প্রদায়ের 'নিম্নস্তর' কে কেন্দ্র করে অপাঙক্তেয় হয়ে থাকার চেয়ে সাম্যবাদী ইসলাম গ্রহণ করে সামাজিক ও মানবিক মর্যাদা লাভ অধিকতর বাঞ্ছনীয় মনে করেছিলেন তাঁরা। তাই হ্যাভেল বলেছেন, "মুহাম্মদের সমাজ ব্যবস্থা প্রত্যেক মুসলমানকে সমান আত্মিক মর্যাদা দান করেছে, ইসলামকে রাজনীতি ও সমাজ নীতি মিলন ভূমি করেছে আর এই মৌল অধিকারের উপর ন্যস্ত করেছে সমাজ শাসনের ভার। পৃথিবীকে সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করে সাধারণ মানুষের পক্ষে সুখী হওয়ার বিধান হিসাবে ইসলাম যথেষ্ট। বৌদ্ধ দর্শন এবং ব্রাহ্মণ্য চিন্তা ধারার গোঁড়ামী যখন সমগ্র উত্তর ভারতে একটা রাজনৈতিক বিক্ষোভ সৃষ্টি করেছিল, সেই সংকট কালে ইসলাম তার চূড়ান্ত রাজনৈতিক শক্তি সঞ্চয় করে"।[৩]

বাংলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি হিসাবে মুসলমানদের উত্তরণের কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে দেওয়ান ফজলে রাব্বি ও ডঃ জেমস্ ওয়াইজ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বহু পণ্ডিত ও ঐতিহাসিক তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। এসব মতামতের প্রতিনিধিত্ব কারী বিশিষ্ট ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের উক্তিটি এখানে

---

১. মোহাম্মদ আকরাম খাঁ,প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৩।
২. জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী,বঙ্গে ইসলামী ধারা ও বৌদ্ধ সহজমত, বাংলা সাহিত্য পত্রিকা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৩য় বর্ষ, ১৯৭৫ইং।
৩. Aryan Rule in India-Havell এর থেকে উদ্ধৃতঃ আব্দুল মওদুদ, মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশঃ সংস্কৃতির রুপান্তর, পৃঃ ১৫।

Dhaka University Institutional Repository

উদ্বৃতির যোগ্য, "প্রথম যুগে তুর্কি সেনাগণ ও ধর্মান্তরিত নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদিগকে লইয়াই বাংলার মুসলমান সমাজ গঠিত হয়। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বাহির হইতে উচ্চশ্রেণীর মুসলমানও আসিয়া বাংলাদেশে স্থায়ী ভাবে বসবাস করে। বোখারা, সমরকন্দ প্রভৃতি ইসলামী সংস্কৃতির প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলি হইতে পলাতকেরাও দলে দলে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং পরে তাহাদের অনেকেই বাংলাদেশে বসতি স্থাপন করে। পরবর্তীতে দিল্লীতে বিভিন্ন তুর্কী রাজ বংশের উত্থান ও পতনের ফলে বিতাড়িত অনেক তুর্কি সম্ভ্রান্ত লোক বাংলায় আশ্রয় লইলেন। বাংলায় মোঘল রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে অনেক সম্ভ্রান্ত মুসলমান রাজ কর্মচারীরূপেও বাংলায় আসিতেন। এই রূপে কালক্রমে বহু পন্ডিত ও উচ্চ শ্রেণীর মুসলমান বাংলায় আসিলেন। সূফী ও দরবেশ নামে পরিচিত একটি মুসলমান পীর বা ফকির সম্প্রদায়ের চেষ্টায়ই বাঙ্গালী মুসলমানদের উন্নততর ধর্ম ভাব ও সংখ্যা বৃদ্ধি সম্ভব হইয়াছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাংলার সর্বত্র শহরে ও গ্রামে সুফীরা দর্গা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। প্রত্যেক সূফীরই বহু শিষ্য ছিল। এই শিষ্যরাও আবার বড় হইয়া দর্গা প্রতিষ্ঠিত করিয়া নূতন নূতন শিষ্যকে শিক্ষা দীক্ষা দিতেন। অমুসলমানকে দীক্ষা দেয়া মুসলমান শাস্ত্রমতে পূণ্য কার্য। সূফীরা এই বিষয়ে অতিশয় তৎপর ছিলেন। তাহাদের দৃষ্টান্তে ও উপদেশে অনেক হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিত আবার পীর ও দরবেশ সূফীরা অনেক সময় হিন্দু রাজ্য জয় করিবার জন্যও যুদ্ধ করিতেন---। ধর্ম প্রচার ও শাস্ত্র চালনা এই দুই উপায়ে বাংলায় মুসলমান রাজ্য ও ইসলাম ধর্মের বিস্তারে সহায়তা করিতেন।" ১

ডঃ আরনল্ড বলেন, "ইসলামে জাতিভেদের বালাই নেই; আর এজন্যই অগণিত হিন্দু স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণে আকৃষ্ট হয়েছিল। ভারতীয় বহু লক্ষ মুসলমানের ধর্মান্তর গ্রহণে বল প্রয়োগের কারণ ছিলনা, শান্তি প্রিয় প্রচারকদের শিক্ষায় তারা সহজে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছি, ইসলাম প্রচারের সর্বাপেক্ষা স্থায়ী ও ফলপ্রসূ বিজয় হয়েছে সেই সময়ে ও সে সবক্ষেত্রে যখন মুসলিম রাষ্ট্রীয় শক্তি দূর্বল ছিল ও যেখানে রাজ শক্তির প্রভাব অনুভূত হয়নি। যেমন- দক্ষিণ ভারতে ও পূর্ব বাংলায় (বর্তমান বাংলাদেশ)। বাংলাদেশেই মুসলিম ধর্ম প্রচারকরা সর্বাপেক্ষা বেশী সকলকাম হয়েছিলেন ধর্মান্তরিতের বিপুল সংখ্যার দিক দিয়ে। অবশ্য বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে কোন সুসংবদ্ধ শক্তিশালী অন্যধর্মের মোকাবিলা করতে হয় নি। উত্তর পশ্চিম ভারতে সদ্য বৌদ্ধ ধর্মের উৎখাতকারী শক্তিশালী ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রচন্ড বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল ইসলামকে। কিন্তু বাংলাদেশে ধর্ম প্রচারককে দু'বাহু বাড়িয়ে অভিনন্দন

---

১. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাসঃ মধ্যযুগ, পৃঃ ২৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

জানিয়েছিল বর্ণবাদের যাতাকলে নিষ্পেষিত হিন্দুরা। এভাবে ইসলাম বিনা বাধায় এমনকি সাদর আহ্বানে অভিনন্দিত হয়ে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ভারতের সর্বাপেক্ষা উর্বর ও জনবহুল প্রদেশে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ধারক ও বাহক উচ্চবর্ণের হিন্দুরা উৎপীড়ন,অবজ্ঞা ও অমানুষিক ব্যবহারে উত্যক্ত সাধারণ হিন্দুরা সাম্য ও মৈত্রীর একটা মহৎ ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করল ইসলাম অনুসারীদের মধ্যে। এদের মধ্যে তারা একটা মহৎ একত্ববাদের সন্ধান পেয়েছিলেন, একটা জীবন্ত ও প্রাণবন্ত নয়া সমাজ ব্যবস্থারও সাক্ষাৎ লাভ করেছিল"। ১

কাজেই দেখা যায়, বহিরাগত মুসলমানদের বিরাট অংশই ইসলাম প্রচারক আলিম ও সূফী। তাঁরা এসেছেন বিপুল সংখ্যায় এবং দলে দলে দেশের গভীরতম অঞ্চলে প্রবেশ করে স্থায়ী বসতি স্থাপন ও ইসলাম প্রচার করে সেখানেই সমাহিত হয়েছেন। বাংলার এমন কোন লোকালয় পাওয়া যাবে না, সেখানে তাঁদের আগমন ঘটেনি। এদেশে তুর্কী পাঠান ও আফগানরা এসেছেন বিজয়ী বেশে। বিজয়ী হয়ে সেনা বাহিনী সহ এ দেশে স্থায়ীভাবে বাস করেছেন। যারা এসেছেন সওদাগর হিসাবে তাঁরাও বিয়ে-শাদী করে এখানে বংশ বিস্তার করেছেন এবং অনেকে এদেশে স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছেন। মোঙ্গল ও তাতারদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে কিংবা ভাগ্যন্বেষণে এসে হাজার হাজার মুসলমান তাদের অভিন্ন ধর্মাবলম্বী রাষ্ট্রে আশ্রয় নিয়েছেন রুযী রোযগারের তাগিদে। এভাবে বহিরাগত ও ধর্মান্তরিত মুসলমানরা শত শত বছর একসাথে অন্তরঙ্গভাবে বাস করে এদেশের জীবন স্রোতে এমন ভাবে মিশে গেছেন যে, তুর্কী , আরবী, পাঠান, মোগল প্রভেদ করার সামান্য সুযোগ এখন আর নেই। ধর্মান্তরের মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে প্রাথমিক প্রচার যুগের গোষ্ঠীভিত্তিক সমাজ অনেকটা সহায়তা করেছে। কোন বৌদ্ধ বা হিন্দু সমাজপতি ইসলাম গ্রহণ করলে তার সাথে সাথে সে সমাজের অন্য সদস্যরাও ইসলাম গ্রহণ করেছে। আর এভাবেই বাংলাদেশ মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল হিসাবে পরিণত হয়েছে।

মুসলিম সমাজে বহুবিবাহ ও দ্রুত জন্মহার বৃদ্ধি বাংলায় মুসলামনদের সংখ্যাগরিষ্ঠ হবার অন্যতম কারণ। মুসলিম প্রধান পূর্ব ও উত্তর বাংলার মাটির উর্বরা শক্তি বেশী। জীবতত্ত্বের নিয়মে মাটির উর্বর শক্তি হ্রাস বৃদ্ধি অনুযায়ী অধিবাসীদের জন্ম হারের হ্রাস বৃদ্ধি হয়। তাছাড়া হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহে বিধি নিষেধের কারণে সন্তান ধারণ যোগ্য স্বামী-হীনা নারীর সংখ্যাধিক্য, উৎকট জাতি ভেদ ও পণ প্রথার কারণে মেয়েদের দীর্ঘ সময় অবিবাহিত থাকা, হিন্দু শিক্ষিত আধুনিকদের মধ্যে

১. Dr. Arnold, The Preaching of Islam, Chapter,ix.

Dhaka University Institutional Repository

জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি প্রচলনের কারণে প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস প্রভৃতি নানা কারণে হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধির তুলনামূলক হারটা বেশী গতি লাভ করে।

তাই বলা যায় একদিকে বাহিরে থেকে অনেক মুসলমান এখানে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন, অন্যদিকে বহু স্থানীয় বাসিন্দাও ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তদুপরি মুসলমানদের মধ্যে বহুবিবাহ ও দ্রুত জন্মহার বৃদ্ধি এসব মিলেই গড়ে উঠেছে আজকের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমাজ বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

সূফী দর্শন

Dhaka University Institutional Repository

সূফী দর্শন

(মহান আল্লাহ তাআলা মানব জীবনের যাবতীয় কর্মকান্ডকে যথাযোগ্যভাবে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করতে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর মাধ্যমে যে জীবন বিধান পেশ করেছেন তার নাম ইসলাম। আল্লাহর কাছে ইসলামই একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন বা জীবন বিধান।[১]) সার্বিক পর্যায়ে ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবহারিক জীবন ব্যবস্থা। কেননা, এতে পার্থিব এবং অপার্থিবের মধ্যে কোন বিভাজন নেই। ইসলাম একদিকে স্রষ্টা ও মানুষের মাঝে সম্পর্ক নির্ণয় করে, অন্যদিকে মানুষে মানুষে সম্পর্ক, মানুষের সাথে জগতের অন্যান্য প্রাণী- প্রজাতির সম্পর্ক সংজ্ঞায়িত করে ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক, ইহলৌকিক, পারলৌকিক, ব্যক্তিগত, সামাজিক, নৈতিক, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি মানব জীবনের সকল বিষয়ের দিক নির্দেশনা দান করে।

জীবনের এসব দিককে সাধারণতঃ দু'ভাবে ভাগ করা যায়। বাহ্যিক (বস্তুগত) এবং অভ্যন্তরীণ (আধ্যাত্মিক)। ইসলাম ইহলৌকিক জীবনের চেয়ে পারলৌকিক জীবনকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে ইসলাম অন্যান্য ধর্মের ন্যায় ইহজীবনকে পরিত্যাগ করেছে বা সন্ন্যাসব্রত পালনে প্রেরণা দিয়েছে। বরং তা নিষেধই করেছে।[২] মহানবী (সঃ) ধর্ম প্রচারের সাথে সাথে সংসার জীবনও পালন করেছেন। তিনি সহজ সরল জীবন যাপন করেছেন কিন্তু সংসার বিমুখ ছিলেন না। তাঁর অনুসারী সাহাবীগণও এমনি স্বভাবের ছিলেন । কিন্তু কালক্রমে ইসলামের মত কর্মের ধর্মেও আধ্যাত্মিকতা সর্বাধিক গুরুত্ব পায়। ফলে, এমন একটি চিন্তাধারা গড়ে উঠে, যার প্রধান নীতি সংসার ত্যাগ না হলেও এ চিন্তাধারার অনুসারীদের অনেকেই সংসারের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়েন। এ চিন্তাধারাকে বলা হয় 'আত-তাসাউফ'। আর এর মতানুসারীদের বলা হয় 'সূফী'।

আগেই বলা হয়েছে যে জীবনের প্রত্যেকটা দিক দু'ভাগে বিভক্ত। একটি বাহ্যিক, অন্যটি অভ্যন্তরীণ। বাহ্যিকভাগ বস্তুগত (নিম্নমুখী) আর অভ্যন্তরীণ ভাগ আধ্যাত্মিক (উর্ধ্বমুখী) । পবিত্র কুরআন ও হাদীসে এ দু'টি ভাগের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন, "আমি তোমাদের জন্য একটি বিধি বা জীবন ব্যবস্থা এবং একটি বিশেষ পথ নির্ধারণ করে দিয়েছি" ।[৩] এখানে বিধি বিধান বলতে যাহিরী দিক বা শরীআতের কথা এবং বিশেষ পথ বলতে ইসলামের

১। আল কুরআন, সূরা-৩, আয়াত -১৯।

২। আল কুরআনে বলা হয়েছে, 'এ বৈরাগ্যবাদ, ও সব ধর্মে তা মনগড়াভাবে শামিল করা হয়েছে। আমরা তা তাদের জন্য বিধিবদ্ধ করে দেয়নি' (৫৭ঃ২৭)। মহানবী (সঃ) বলেছেন, 'ইসলামে বৈরাগ্য বাদ নেই'।

৩। আল কুরআন, সূরা-৫, আয়াত -৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

বাতিনী দিক বা সুফীতত্ত্বের কথা বলা হয়েছে। হাদীসেও এ কথার সমর্থন পাওয়া যায়। "হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে দু'প্রকার জ্ঞান লাভ করেছি। এক প্রকার সাধারণ জ্ঞান, যা আমি সর্বসাধারণের নিকট প্রকাশ করেছি। আরেক প্রকার বিশেষ জ্ঞান- যা সবার কাছে প্রকাশ করিনি। যদি তা প্রকাশ করতাম, তবে আমার গর্দান যেত" ।১ সুতরাং দেখা যায় যে ইসলামে শরীআতের অভ্যন্তর ভাগ জুড়েই তাসাউফের শিক্ষা রয়েছে।

শরীআত শব্দটি এসেছে 'শরা' শব্দ থেকে যার অর্থ পথ, বিধান, ব্যবস্থা ইত্যাদি। জীবনের ব্যক্তিগত ও সামাজিক দিকের বাহ্যিক রূপের যে বিধি বা নিয়ম, তা-ই শরীআত। ইহজীবনের প্রয়োজন, গুরুত্ব, অভাব অভিযোগ এবং ঈমান, নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাতের বাহ্যিক ক্রিয়া পদ্ধতির রূপ শরীআতের অন্তর্গত। তাই কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াসের উপর ভিত্তি করে যে জীবন ব্যবস্থা গড়ে উঠে, তাকেই শরীআত বলা হয়। শরীআত ইসলামের যাহিরী বা বাহ্যিক দিকের পরিচায়ক। আর ইসলামের বাতিনী বা আধ্যাত্মিক দিকের পরিচায়ক তাসাউফ বা সূফী দর্শন। যেমন- একটি বৃক্ষের শিকড়, গুড়ি, পাতা, ডালপালা প্রভৃতি ঐ বৃক্ষের বাহ্যিক দিকের পরিচয় বহন করে এবং সেজন্য তা ঐ বৃক্ষের শরীআত। আবার ঐ বৃক্ষের ফুল, ফল ও জীবনী শক্তি ঐ বৃক্ষের তাসাউফ বা অভ্যন্তরীণ দর্শন।২ বৃক্ষের শাখা প্রশাখা, শিকড়, গুড়ি, পত্রাদী না থাকলে যেমন ফুল, ফল ও ঐ বৃক্ষের জীবন অসম্ভব, তেমনি শরীআত ব্যতিত তাসাউফের স্থানও কল্পনা করা যায় না। শরীআত তাসাউফের ভিত্তিভূমি। শরীআত দেহ, তাসাউফ আত্মা বা প্রাণ। যার পেছনে রয়েছে কুরআন ও হাদীসের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থন। সূফী তত্ত্ব মুলতঃ কুরআন হাদীসের মগজ, ইসলামের আত্মা। মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী (রঃ) বলেছেন, "হাম যেকোরা মগজে রাবার দাস্তাম উস্তে খাঁ পেশে ছাগা আনদাখতাম" । অর্থাৎ "আমি কুরআনের মগজ বা মূল বস্তু তুলে নিয়েছি অস্থি চর্ম কুকুরের জন্য ফেলে দিয়েছি" ।৩

শাস্ত্রীয় বাহ্যিক বিধান অপেক্ষা আধ্যাত্মিক জ্ঞান-বিজ্ঞান অধিকতর মূল্যবান। এ আধ্যাত্মিক জ্ঞান -বিজ্ঞানের ধারক-বাহক হলেন সূফী-সাধকগণ। এজন্যই পবিত্র কুরআন ও হাদীস জাহিরী ও বাতিনী জ্ঞান সম্পন্ন এমন এক পরিপূর্ণ জীবন বিধান ও দর্শন যাতে বস্তুবাদ ও আধ্যাত্মবাদের অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হয়েছে। 'যাহিরী' ও 'বাতিনী' এ উভয় দিকই ইসলামের অপরিহার্য অঙ্গ। তাসাউফের অভিজ্ঞতা

১। সহীহ আল বুখারী, কুতুব খানা রশিদিয়াহ, দিল্লী হিজরী, ১৩০৫, পৃঃ ২৩।
২। ফকির আব্দুর রশীদ, সূফিদর্শন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০ ইং, পৃঃ ৫।
৩। জালালুদ্দীন রুমীর (রঃ) উক্ত শ্লোকটি ফকির আব্দুর রশিদ রচিত সূফীদর্শন গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে, পৃঃ ৭।

Dhaka University Institutional Repository

অপ্রকাশ্য ও অবর্ণনীয়। শরীআতের জ্ঞানের উৎস পবিত্র কুরআন, হাদীস ও ফিকহ্‌। পক্ষান্তরে, তাসাউফের মূল ভিত্তি পবিত্র কুরআন ও হাদীস হলেও এর জ্ঞান সূফীর অভিজ্ঞতা প্রসূত। এখানে যে জ্ঞানের কথা বলা হয়, তা এক হৃদয় থেকে অন্য হৃদয়ে সরাসরি গমন করে। "এ জ্ঞান যৌক্তিক বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের উপর প্রতিষ্ঠিত সমপ্রত্যয়গত (Conceptual) জ্ঞান নয়, বরং অনুভূতি ও অনুধ্যানের উপর প্রতিষ্ঠিত স্বজ্ঞা (Intuition) প্রসূত জ্ঞান। এটি এমন এক ধরনের জ্ঞান যা ব্যক্তি মানব ধ্যানমগ্ন অবস্থায় অপরোক্ষভাবে অর্জন করে থাকে"।[১]

অতএব দেখা যায় যে তাসাউফ বা সূফীতত্ত্ব ইসলামের একটি রহস্যময় আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা। এ চিন্তাধারার লক্ষ্য হল আল্লাহর গূঢ় অনুভূতির অন্বেষণ ও আত্মার পবিত্রতা বিধান। মানবাত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন সাধন সূফীদের সাধনার মূল কথা। কাজেই বলা যায়, "নৈতিক শৃংখলা, আত্ম-শুদ্ধি এবং আল্লাহর সান্নিধ্য কামনার্থে ইসলামে যে মরমী ভাবধারার উৎপত্তি হয় উহাকেই 'সূফী দর্শন' বলা হয়।[২] "এ ভাবধারা অদ্ভুত কিংবা সম্পূর্ণ অভিনব কিছু নয় এবং তা সব সময় সব সমাজে কিছু কিছু ব্যক্তির মনে কোন না কোনরূপে উপস্থিত থাকে। এটি মনের এমন অবস্থা যার উৎপত্তি ঘটে আল্লাহর ভীতি থেকে, এমন ভীতি যা কিছু কিছু ব্যক্তির মনে ক্রমশ বদ্ধমূল হয়ে উঠে। আত্মঅনুশীলন ও শৃংখলা চর্চার মাধ্যমে সে সব ব্যক্তি এই ভীতিকেই গভীর ঐশীপ্রেমে পরিণত করেন । এ মানসিক অবস্থা কখনও কখনও সে সব ব্যক্তির মধ্যেই পাওয়া যায়, যারা জীবনে হতাশাগ্রস্থ হয়ে নৈরাশ্যবাদ (Pessimism), নিষ্ক্রিয়তা ও বৈরাগ্যের দিকে অগ্রসর হয়। এ দিক থেকেও বলা যায় যে সূফীবাদ আল্লাহর প্রেম ও ধ্যানের উপর প্রতিষ্ঠিত এক ধরনের চিন্তাধারা"।[৩]

সূফী দর্শন যে জীবন দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহল, সূফীরা আধ্যাত্মিক বিকাশ লাভের লক্ষ্যে পার্থিব সব কিছুকে ভুলে থাকতে চায় এবং কৃত পাপের জন্য অতীতকে অনুশোচনার সঙ্গে বর্ণনা করতে চায়। তাদের এ লক্ষ্য কোন যৌক্তিক আলোচনার মাধ্যমে অর্জন করা যায় না। সূফীগণ পবিত্র কুরআনও হাদীসের বাণীকে সূফীতত্ত্বের প্রাথমিক উপাদান হিসাবে গ্রহণ করেন। তাঁরা আল্লাহর ধ্যান ও প্রেমের মধ্যে এমন মগ্ন হয়ে যান যে পার্থিব বস্তুর প্রতি তাঁদের সকল মোহ

১। আমিনুল ইসলাম (রূপান্তর ও সম্পাদনা), মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃঃ ১৬৮।

২। ডঃ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, ইসলামের ইতিহাস, পৃঃ ৬৮৭।

৩। আমিনুল ইসলাম (রূপান্তর ও সম্পাদনা), প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

বিলুপ্ত হয়ে যায়। তাদের এ তন্ময়াবস্থাকে বর্ণনার চেয়ে বেশী অনুভব করা যায়। এটি প্রধানতঃ এমন একটি আবেগাত্মক অভিজ্ঞতা যা আল্লাহর ধ্যান ও প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত। কেবলমাত্র ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও আত্মিক অনুশীলনের মাধ্যমেই এই অবস্থায় উপনীত হওয়া যায়। এ অবস্থায় সত্যের জ্ঞান ও আল্লাহর প্রেম অর্জন করা যায়। গভীর ঐশীচেতনার এমন এক নিগূঢ় অবস্থা উন্মোচিত করে, যেখানে ব্যক্তিত্ব (Individuality) লীন হয়ে ক্রমশ সীমাহীন ঐশী সত্তায় মিশে যায়"। [১]

ইসলামে পার্থিব ও অপার্থিবের মধ্যে কোন বিভাজন নেই বলে ইসলাম ইহলোকের চেয়ে পরেলোকের উপর বেশী গুরুত্ব দিয়েছে ঠিকই তাই বলে ইহলোককে ইসলাম পরিত্যাগ করেনি, আবার ইহলোককে মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্বও দেয়নি। ইহজগত পরলোকের জন্য সাময়িক কর্মক্ষেত্র স্বরূপ।[২] তাই, ইহজগতের কর্ম অনুসারে বান্দা পরকালে তার প্রতিফল ভোগ করবে। ন্যায়-নীতপূর্ণ বিবেক-বুদ্ধিজাত ভাল কাজের জন্য বান্দা আল্লাহর নিকট পুরস্কৃত হবে। ইসলাম যাকে বেহেস্তের পরম সুখ ও শান্তি বলে বর্ণনা করেছে।[৩] পক্ষান্তরে অন্যায়, অবৈধ ও খারাপ কাজের জন্য পরকালে মানুষকে গ্লানী ভোগ করতে হবে। ইসলাম যাকে দোজখরূপে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুন্ডের শাস্তি বলে উল্লেখ করেছে।[৪] কাজেই, পারলৌকিক জীবনের তুলনায় ইহলোকিক জীবন ক্ষুদ্র হলেও তা ইসলামে মোটেই

১। আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৯।

২। মহানবী (সঃ) এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'এ দুনিয়া আখেরাতের শস্যক্ষেত্র স্বরূপ'।

৩। <u>জান্নাতঃ</u> শব্দটির আভিধানিক অর্থ উদ্যান বা পুষ্প দ্বারা আচ্ছাদিত স্থান।পবিত্র কুরআনে অসংখ্যবার আল্লাহ জান্নাত বা বেহেস্তের কথা উল্লেখ করেছেন। যে সব মুমিন ইহকালে সৎকর্ম করেন তাদেরকে পরকালে সুখশান্তিপূর্ণ উদ্যানে অর্থাৎ জান্নাতে থাকতে দেয়া হবে। যেমন- আল্লাহ্ বলেছেন, ''যারা ঈমান আনে ও সৎকর্মকরে তাদের জন্য আছে জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় নির্ঝরনীসমূহ। এটাই মহাসাফল্য।"(সুরা বুরুজ- ১১) জান্নাতের বিভিন্ন স্তর আছে। বেহেস্তবাসীগণ নিজ নিজ সৎকর্ম অনুসারে যোগ্য আসন লাভ করবেন। কুরআনে জান্নাত বুঝাতে আটটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে- যেমন -দারুল খুলদ, দারুল মাকাম, দারুস্ সালাম, জান্নাতুল আদন, দারুল কারার, দারুন নাঈম, জান্নাতুল মাওয়া, জান্নাতুল ফেরদৌস। জান্নাতের এই আটটি স্তরকে অনেকেই জান্নাতের সংখ্যা আটটি বলে মনেকরেন। তন্মধ্যে জান্নাতুল ফেরদৌস সর্ব শ্রেষ্ঠ।

৪। 'দোজখ' ফার্সি শব্দ। এর আরবী প্রতিশব্দ "নার" অর্থ অগ্নিগহ্বর। আল্লাহ তার পাপী বান্দাদের জন্য প্রস্তুত অগ্নীকুন্ডলী সম্বলিত ৭টি দোজখের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। যেমন - হাবিয়া, জাহান্নাম, সাখার, হুতামা, জাহিম, সাঈর, লাজা। আল্লাহ পাক বলেছেন, "আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কাফির তারা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ী ভাবে থাকবে। তারাই সৃষ্টির অধম"। (সুরা-বায়্যিনাহ্, আয়াত- ৬)

Dhaka University Institutional Repository

উপেক্ষনীয় নয়। ইসলাম উভয় জীবনের কোন বৃত্তিকেই তুচ্ছ মনে করেনা, আবার কোনটিকে জীবনের একমাত্র নিয়ন্তাও মনে করেনা। ইসলাম সমষ্টিগতভাবে (উভয় জগতের) মানব প্রকৃতির স্থুল ও সূক্ষ্ম সবগুলো বৃত্তিরই সুসামঞ্জস্য ও কল্যাণমুখী পরিচর্যা এবং ব্যবহারিক জীবনে ও বাস্তব পরিবেশে তার প্রকাশ চায়। আর এটাই ইসলামী জীবন ব্যবস্থা। এটাই মানব সত্ত্বার পূর্ণ বিকাশ লাভের প্রকৃষ্টতম পন্থা।

কিন্তু পরবর্তীকালে পারলৌকিক ও খোদা প্রেমের উপর অতিশয় জোর দিতে গিয়ে সূফীদের মাঝে ইসলামের প্রায়োগিক (Emperical) দৃষ্টি ভঙ্গিকে উপেক্ষা করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ফলে, সূফীতত্ত্বে পরাজয়, জড়তা ও নিক্রিয়তার এক অশুভ ভাবধারা এবং জগতের অন্যায় ও অশুভকে পরাভূত করার কাজে আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখা দেয়। এ দিকে ইঙ্গিত করেই সাইদুর রহমান বলেছেন, "সূফীবাদ ইসলামী শিক্ষার সেই দিকটিরই নির্দেশ করে যেখানে পারলৌকিকতা, বৈরাগ্যবাদ ও খোদা ভক্তির ওপর অতিশয় জোর দেয়া হয়েছে। সূফীবাদ তাই ইসলামের সেই প্রয়োগিক (Emperical) দৃষ্টি ভঙ্গিকে উপেক্ষা করেছে, যেখানে বলা হয়েছে যে, পার্থিব অশুভ অমঙ্গলাদিকে বর্জন করে নয়, বরং তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই মানুষ উত্তরোত্তর অগ্রগতি সাধন করতে পারে। এ জন্যই সূফীবাদের সঙ্গে সূচিত হয়েছে পরাজয়, জড়তা ও নিক্রিয়তার এক অশুভ ভাবধারা। একই সঙ্গে আবার সূচিত হয়েছে জগতের অন্যায় অশুভকে পরাভূত করার কাজে আত্মবিশ্বাসের অভাব।"[১]

যা হোক, মহানবী (সঃ) যে ওহীর প্রেরণায় সম্প্রসারিত উচ্চ অনুভূতির দ্বারা প্রয়াশ কথা বলতেন, আর তাঁর মুরাকাবার মধ্যে ঐকান্তিকতা ও ভাব-বিহলতার যে গভীরতা দেখা যেত, প্রধানতঃ তারই উপর ভিত্তি করে ইসলামে সূফীতত্ত্ব বা ইলমে তাসাউফ গড়ে উঠে। মু'তাজিলাদের বুদ্ধিবাদ এবং প্রথম তিন হিজরী সালের গোঁড়া রক্ষণশীল বা সূত্রবাদীদের (Formularists) নির্বিচার ধর্ম বিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ ইসলামে সূফীবাদের আবির্ভাব ঘটে।

খোলাফায়ে রাশেদার যুগের শেষের দিকে মুসলিম জাহানে নেমে আসে ভয়ানক ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত। এই দুঃখজনক পরিস্থিতি, খেলাফতের অবসান, দামেস্কের শাসকদের স্বেচ্ছাচারমূলক শাসন ব্যবস্থা ইসলামে সূফীবাদের উৎপত্তির মূলে অনেকটা দায়ী। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ আমীর আলীর বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, "হযরত আলীর (রাঃ) শাহাদাতের সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভাগ্যক্রমে আদি ও সত্য

১। আমিনুল ইসলাম (রূপান্তর ও সম্পাদনা), প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

খিলাফত বিধ্বস্ত হবার পর যে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হয়, মদীনায় নর হত্যা ও লুণ্ঠণের পর যে ভীতির সঞ্চার হয়, আর দামেস্কের অধিকতর অসচ্ছরিত্র শাসন কর্তাদের আমলে যে বর্বরতা সমাজ জীবনে নেমে আসে, তা বহু নিষ্ঠাবান মুসলিমকে একান্তে ইবাদত বন্দেগীতে মশগুল হতে বাধ্য করে। তাকওয়া থেকে মাত্র এক হাত দূরত্ব হচেছ নিরাসক্ত জীবনের। আর সেখান থেকে অতীন্দ্রিয়বাদ স্বাভাবিক পথেই অগ্রসর হতে থাকে"।[১]

যাহোক, কৃচ্ছধর্মী সূফীদর্শন মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যেই পবিত্র কুরআন ও হাদীসের অমীয় বাণীর গভীরতর ও অন্তরতর অর্থের উপর ভিত্তি করে জন্মলাভ করেছে। উমাইয়াদের অনৈসলামিক কার্যকলাপ, সুন্নী মাযহাবের প্রভাব, মু'তাযিলাদের যুক্তিবাদের প্রতিক্রিয়া, মু'তাযিলা ও রক্ষণশীলদের দ্বন্দ্ব, মুসলমানদের বিলাস-ব্যসন ও অতুলনীয় বিত্তবৈভব আধ্যাত্মিকতার প্রতি গভীর প্রবণতা, 'যাহির' ও বাতিনের পার্থক্যকরণ এবং জ্ঞানার্জনের প্রশ্নে সূফীগণ স্বজ্ঞার (intuition) উপর অতিশয় জোর দেয়া প্রভৃতি কারণে ইসলামে সূফী দর্শনের উন্মেষ ঘটে। এসম্পর্কে আল্লামা ইকবাল বলেছেন, "কৃচ্ছধর্মী সূফী মতবাদ মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যেই জন্মলাভ করে থাকলেও প্রসারের সাথে সাথে ক্রমশ এটা অন্যান্য অনৈসলামিক ধর্ম সম্প্রদায়ের মতবাদ আহরণ করে পরিপুষ্ট হতে থাকে। সূফীদের দৃষ্টিভঙ্গি পুরোপুরি চিন্তামূলক ছিল। এই বৈরাগ্যধর্মী সূফীবাদের অভ্যুদয় এবং প্রসার লাভ রক্ষণশীলদের বিভিন্ন মনোভাবের অন্যতম কারণ। কেবলমাত্র ধর্মীয় দিক থেকে বিচার করলে বলা যায় যে সূফীবাদ প্রকৃত পক্ষে আমাদের ধর্মাচার্যদের দ্ব্যর্থবোধক বাক বিস্তারের বিরূদ্ধে বিদ্রোহ বিশেষ। সুফিয়ান সাওরীর দৃষ্টান্ত এ স্থলে প্রনিধানযোগ্য। সে সময়কার প্রখর বুদ্ধি আইনজ্ঞদের (মাযহাবী ইমাম) মধ্যে তিনি একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। অক্লান্ত সাধনা ও গবেষণা দ্বারা তিনি একটি নতুন মাযহাব প্রবর্তনের কাজ প্রায় সম্পূর্ণ করে এনেছিলেন। কিন্তু আধ্যাত্মিকতার প্রতি তাঁর গভীর প্রবণতা তখনকার আইন দাতাদের কাষ্ঠ-শুষ্ক বাক বিতন্ডার কাছে প্রতিহত হয়ে তাঁকে বৈরাগ্যধর্মী সূফীবাদের ক্রোড়ে ঠেলে দেয়। চিন্তার দিক থেকে সূফীবাদ ক্রমশঃ পূর্ণ মুক্তবুদ্ধির পথে এগিয়ে আসতে থাকে এবং যুক্তিবাদের সাথে হাত মিলায়। 'যাহির ও বাতিন' (দৃষ্টরূপ ও গূঢ় সত্য)- এর পার্থক্যের উপর সূফীবাদ এত বেশী জোর দেয় যে, বহির্জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত কিছুর প্রতিই সূফী জগতের ঔদাসীন্যভাব দেখা দিতে থাকে"।[২]

১। অধ্যাপক মুহাম্মদ দরবেশ আলী খান অনূদিত সায়্যিদ আমীর আলীর দি স্পিরিট অব ইসলাম , পৃঃ ৪৬৭।

২। ডঃ মুহাম্মদ ইকবাল, ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পূণর্গঠন, পৃঃ ১৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

সাইদুর রহমানের ভাষায়, "অন্যান্য মুসলিম সম্প্রদায়ের ন্যায় সূফীদের মূল মতাবলী ইসলাম বিষয়ক এক পেশে দৃষ্টির উপর প্রতিষ্ঠিত। জ্ঞানার্জনের প্রশ্নে এখানে স্বজ্ঞার(intuition) ওপর অতিশয় জোর দেয়া হয় এবং প্রজ্ঞা (Reason), ঐতিহ্য (Tradition), অভিজ্ঞতাকে উপেক্ষা করা হয়"।[১]

সূফী শব্দের উৎপত্তিঃ-

সূফীবাদ উন্মেষের মূলে অনেক কারণ থাকলেও কৃচ্ছ্রধর্মী মতবাদ মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যেই পবিত্র কুর'আন ও হাদীসের অমীয় বাণীর গভীরতর ও অন্তরতর অর্থের উপর ভিত্তি করে সূফীদর্শন জন্ম লাভ করেছে। সূফী শব্দটির উৎপত্তি নিয়ে বিভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়। সূফী শব্দটি বিভিন্ন উৎস হতে উৎপন্ন বলে অনেকেই যুক্তি পেশ করেছেন। কোন কোন পন্ডিত এটাকে আরবী শব্দ 'সূফ' (পশম) হতে উদ্ভূত বলে বর্ণনা করেছেন। তাদের মতে, 'যিনি দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ও ত্যাগের প্রতীক হিসাবে পশমী পোশাক পরিধান করেন তিনিই সূফী। পশমী পোশাক পরিধান করার কারণেই তাঁদেরকে 'সূফী' নামে আখ্যায়িত করা হয়। "মহানবী (সঃ) মাঝে মাঝে পশমী পোশাক পরিধান করতেন"।২

মোল্লা জামি ও তাঁর অনুসারীদের মতে, 'সাফা' অর্থাৎ পবিত্রতা শব্দটি থেকে 'সূফী' শব্দটি এসেছে। আত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন সাধনই হল সূফীবাদের লক্ষ্য। এই অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য প্রয়োজন আত্মিক পবিত্রতা। এই উদ্দেশ্যে সূফীরা পবিত্রতা রক্ষা করার চেষ্টা করতেন। এ জন্যে তাদেরকে 'সূফী' বলা হত।

অধ্যাপক নিকলসনসহ অনেক পাশ্চাত্য পন্ডিতদের মতে, 'সূফী' শব্দটি 'সুফিয়া' শব্দ থেকে এসেছে। তাঁদের মতে, সূফী কথাটি গ্রীক 'সোফিষ্ট' কথাটির রূপান্তর মাত্র।৩ আল্লামা লুৎফী জুময়ার বরাত দিয়ে মাওলানা আব্দুর রাহীম হাযারী উল্লেখ করেছেন যে, 'সূফী' শব্দটি গ্রীক 'সুইউসুফিয়া' শব্দ থেকে উদ্ভূত গ্রীক ভাষায় এই শব্দটির অর্থ 'প্রভুর জ্ঞান'। কেননা, সূফীও একজন বিজ্ঞানী। যেহেতু তিনি প্রভুর জ্ঞান সাধনায় সদামত্ত থাকেন। কারণ, যিনি প্রকৃত অর্থেই সূফী তিনি আত্মসাধনার মাধ্যমে স্রষ্টা ও সৃষ্টি কৌশলের রহস্যভেদ উদঘাটনে সর্বক্ষণ নিমগ্ন থাকেন। আর ইহাই প্রভু প্রদত্ত জ্ঞান। এই জ্ঞান একটি বিশেষ জ্ঞান। যিনি বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী তিনিই বিজ্ঞানী। জ্ঞানের উন্মেষ ঘটে হৃদয়ে আত্মসাধনার মাধ্যমে। ইহাই সূফী সাধনার অভিষ্ট লক্ষ্য"। ৪

১। আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৮।
২। K.W. Morgan, Islam, the straight path.
৩। আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭১।
৪। মাওলানা আব্দুর রাহীম হাযারী, সূফীতত্ত্বের আত্মকথা, পৃঃ ১-২।

Dhaka University Institutional Repository

আবার কেউ কেউ 'সাফ' কে 'সূফী' শব্দের উৎস বলে মনে করেন। আর সাফ শব্দের অর্থ কাতার, সারি, পংক্তি। কেননা, সূফীরা জ্ঞান, পবিত্রতা, সাধনা, প্রভৃতি দিক দিয়ে সাধারণ মানুষের তুলনায় প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা সম্পন্ন বলে তাদেরকে 'সূফী' বলা হয়।[১] সূফী শব্দটির উৎপত্তি সম্পর্কে মুসলিম পন্ডিতদের মধ্যে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হলেও এ ব্যাপারে তারা একমত যে সূফী সাধনা মহানবী (সঃ) থেকেই শুরু। কেননা, সূফীদর্শনের মূল বিষয়গুলো পবিত্র কুর'আন ও হাদীসেই রয়েছে যা মানুষের কলব বা অন্তরে বিশেষ ধরনের মানসিক অবস্থার সৃষ্টি করতে সহায়তা করে। এ বিশেষ অবস্থাই আত্মাকে পরমাত্মার সাথে মিলনের পথ সুপ্রশস্ত করে দেয়। পরমাত্মার সাথে পরিপূর্ণ মিলনেই মানব জীবনের একমাত্র সার্থকতা। কিন্তু এ মিলন বা একত্ববোধ জ্ঞান বুদ্ধির অতীত। এ মিলন কোন জ্ঞান প্রসূত বা কোন আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ামূলক নয়, এ মিলন একান্তভাবে হৃদয়াবেগ প্রসূত। এ মিলনে মানুষের ব্যক্তিগত সত্তা রূপান্তরিত হয়ে ঐশী সত্তার গুণ লাভ করে। ঐশী ঐক্যলাভই সূফীদের চরম লক্ষ্য। মানুষের ক্ষুদ্র আমিত্ব বা অহং জ্ঞানের বিনাশ ও আল্লাহর সত্তায় পুণর্জীবন লাভ সূফীদের শিক্ষার মূল কথা।

শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর হেরা পর্বতের গুহায় নির্জন আরাধনা, ভোগ বিলাসহীন সহজ সরল জীবন যাপন, আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা ও তাঁর নিকট হতে সাহায্য প্রার্থনা করা ইত্যাদি সূফীদর্শন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। মানবাত্মা, পরমাত্মা, বিশ্বজগত ও পরম সত্তার মধ্যে সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর উক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গি সূফীদর্শনের মূল ভিত্তি হিসাবে গৃহীত হয়। সূফী শব্দটি তৎকালে প্রচলিত না থাকলেও সূফীদর্শনের আচার অনুষ্ঠান হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর জীবনে পালিত হয়েছে। ধর্ম প্রচারের সাথে সাথে সংসার ধর্ম পালন করলেও অনেক ক্ষেত্রে তাঁর মাঝে সূফী সুলভ আচরণ পরিস্ফুটিত হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন,

(১) "আপনি আপনার পালনকর্তার নাম স্মরণ করুন এবং একাগ্রচিত্তে তাতে মগ্ন হোন। তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা। তিনি ব্যতিত কোন উপাস্য নেই। অতএব, তাঁকেই গ্রহণ করুন কর্ম বিধায়করূপে"।[২]

(২) "বিশ্বাসী তো তারাই যাদের হৃদয় কম্পিত হয় যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয় এবং যখন তাঁর আয়াত তাদের নিকট পাঠ করা হয় তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপরই নির্ভর করে"।[৩]

১। মোঃ সোলায়মান আলী সরকার, ইবনুল আরবী ও জালাল উদ্দীন রুমী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪ ইং, পৃঃ ৩।

২। আল কুরআন, সূরা-৭৩, আয়াত ৮-৯।

৩। আল কুরআন, সূরা-৮, আয়াত-২।

Dhaka University Institutional Repository

(৩) "হে পরিতুষ্ট আত্মা। তুমি প্রসন্ন ও সন্তোষপ্রাপ্ত অবস্থায় তোমার প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন কর। অতঃপর আমার সেবকগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হও এবং আমার স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ কর"।[১]

(৪) "অবশ্যই সেই সকল লোক যারা নিজেদের প্রতিপালকের ভয়ে ভীত থাকে, নিজেদের প্রতিপালকের আয়াতের প্রতি বিশ্বাস রাখে, নিজেদের প্রতিপালকের সাথে শরীক করেনা এবং যারা যা দান করার তারা তা দান করে ভীত সন্ত্রস্ত হৃদয়ে এ বিশ্বাসে যে, তারা তাঁদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে, তারাই সতত সম্পাদন করে মঙ্গলকাজ এবং তাতে তারা অগ্রগামী"।[২]

(৫) "এ সকল লোক যাদের অবস্থা এই যে, দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে (সর্বদাও সর্বাবস্থায়) স্মরণ করে"।[৩]

(৬) "এতে যারা তাঁদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের গাত্র রোমাঞ্চিত হয়। অতঃপর তাদের দেহ মন প্রশান্ত হয়ে আল্লাহর স্মরণে ঝুঁকে পড়ে"।[৪]

(৭) "সিদ্ধ মনোরথ হয়েছে সে সব লোক যারা ঈমানকে মজবুত করেছে, যারা নামাজের মধ্যে খুশুখুজু হাসিল করেছে, যারা বৃথা জীবন নষ্ট করা হতে পরহেজ করেছে, যারা মালের এবং নফসের পবিত্রতা হাসিল করেছে, যারা বিবাহিত স্ত্রী ব্যতিত সর্বত্র সংযম অভ্যাস করে কামরিপুকে দমন করে রেখেছে, যারা অঙ্গীকার ও আমানতের হেফাজত করেছে।"[৫]

এ সকল আয়াত সমূহে ঈমান্দারদের জন্য যে সব গুণ ও অবস্থা দরকারী বলে নির্ধারিত হয়েছে এবং যা তাঁদের নিকট থেকে দাবী করা হয়েছে তা হলঃ

"১. সমস্ত বস্তু ও অবস্তু হতে আল্লাহ তায়ালার প্রতি তাহাদের অধিক মহব্বত হইবে।

২. তাহাদের অন্তরের অবস্থা এই রূপ হইতে হইবে, যখন আল্লাহ তায়ালার স্মরণ করা হয়, তখন তাহাদের হৃদয় ভীতসন্ত্রস্ত ও কম্পিত হইয়া পড়িবে।

১। আল কুরআন, সূরা- ৮৯, আয়াত ২৭-৩০।

২। আল কুরআন, সূরা-২৩, আয়াত ৫৮-৬১।

৩। আল কুরআন, সূরা-৩, আয়াত ১৯১।

৪। আল কুরআন, সূরা-৩৯, আয়াত ২৩।

৫। আল কুরআন, সূরা- ২৩, আয়াত ১-৮।

Dhaka University Institutional Repository

৩. যখন তাহাদের সামনে কুরআন শরীফের আয়াত পাঠ করা হয় তখন তাহাদের ঈমানের নুর বৃদ্ধি পাইবে।

৪. তাহারা আল্লাহ তায়ালার উপর তাওয়াক্কুল ও ভরসা রাখিবে এবং উহাই তাহাদের জীবনের বড় সম্বল হইয়া পড়িবে।

৫. তাহারা সর্বক্ষণ আল্লাহ তায়ালার ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত থাকিবে।

৬. আল্লাহ তায়ালার ভয় তাহাদের মনে এত প্রবল হইয়া উঠিবে যে, নেক কাজ সম্পাদনের সময় উহা আল্লাহ তায়ালার দরবারে কবুল হইল কিনা, এই ভয়ে তাহাদের হৃদয় সন্ত্রস্ত থাকিবে।

৭. সর্বক্ষণ, সর্বাবস্থায় তাহারা আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণে রাখিবে এবং কোন অবস্থাতেই তাহারা আল্লাহ তায়ালা হইতে উদাসীন থাকিবেনা।

৮. কুরআন শরীফ তেলাওয়াত বা ইহার আয়াত শ্রবণে তাহাদের শরীর কাঁপিতে থাকিবে এবং তাহাদের দেহ মন আল্লাহ তায়ালার দিকেও তাহার স্মরণের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িবে।

৯. সর্বদিক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আল্লাহতায়ালার প্রতি নিবিষ্ট হওয়া তাহাদের হালে (মানসিক অবস্থায়) পরিণত হইবে"।[১]

পবিত্র কুরআনের ন্যায় হাদীসেও উক্ত মানসিক অবস্থা ও গুণাবলীর বর্ণনা রয়েছে যাতে ঈমানের পূর্ণতা সাধিত হয়। যেমন, নবীকরীম (সঃ) বলেছেন,

(১) "যার নিকট তিনটি জিনিস আছে সে-ই ঈমানের মাধুর্য লাভ করেছে। তিনটি জিনিস হল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সঃ) প্রতি তাদের ছাড়া আর যা কিছু আছে সবার চেয়ে অধিক মহব্বত হওয়া; কারো প্রতি তার মহব্বত হলে তাও কেবল আল্লাহর ওয়াস্তে হওয়া; ঈমান আনয়নের পর কুফরের দিকে প্রত্যাবর্তন তার জন্য এমন বিস্বাদ ও কষ্টদায়ক হওয়া যেন অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়া।"

(২) "যে ব্যক্তির অবস্থা এমন হয়েছে যে, সে কেবল আল্লাহর জন্যই মহব্বত করে (যাকে সে মহব্বত করে), কেবল আল্লাহর জন্যই শত্রুতা রাখে (যার সাথে সে শত্রুতা করে), শুধু আল্লাহ তায়ালার জন্যই দান করে (যাকে সে

১। মাওলানা মুহাম্মদ মনযুর নোমানী, তাসাওউফ কাহাকে বলে, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৯ ইং, পৃঃ ১৭।

Dhaka University Institutional Repository

যা কিছু দান করে); এবং কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই কাকেও কিছু দান করা হতে বিরত থাকে, তবে সেই ব্যক্তিই নিজের ঈমান পূর্ণ করে নিয়েছে।"(মিশকাত)

(৩) "তুমি এভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছ। কারণ, তুমি যদিও তাকে দেখতে না পাও তিনি তো তোমাকে সর্বস্থানে ও সর্বাবস্থায় দেখছেন।" (ফতহুল বারী) [১]

এসব মানসিক গুণাবলী অর্জনের নিমিত্তেই রাসূলুল্লাহ (সঃ) সর্বদা আল্লাহর নিকট তন্ময় হয়ে প্রার্থনা করতেন-

(ক) "হে আল্লাহ। তোমার যিকরের জন্য আমার হৃদয়ের কর্ণ খুলে দাও।"

(খ) "হে আল্লাহ। আমাদের এমন অন্তর দান কর যা প্রেম বেদনায় ব্যথিত, তোমার সামনে অবনত এবং তোমার দীনের কাজে চিররত থাকে।"

(গ) "হে আল্লাহ। তোমার ভালবাসা যেন আমার জীবনের চেয়ে এবং ধন সম্পদ, স্ত্রী পুত্র ও ঠান্ডা পানি হতেও আমার নিকট অধিক প্রিয় হয়।"

(ঘ) "হে আল্লাহ। আমাকে এ তওফীক দাও, যাতে আমি তোমার ভয় হৃদয়ে এমনভাবে জাগ্রত রাখতে পারি যেন আমি তোমাকে সর্বদা দেখছি। আমি যেন সম্পূর্ণ জীবন এ অবস্থায়ই কাটিয়ে তোমার দরবারে উপস্থিত হতে পারি এবং আমাকে তাকওয়া দান করে সৌভাগ্যবান কর এবং তোমার নাফরমানী করে যেন কখনো আমি নিজের কপালে নিজে আগুন না দেই।"

(ঙ) "হে আল্লাহ, আমার অন্তরে নূর[২] দান কর, আমার চোখে নূর দান কর, আমার কর্ণে নূর দান কর, আমার ডানে-বামে নূর দান কর, আমার পেছনে সামনে চতুরর্দিকে নূর দান কর, আমার স্নায়ুতে নূর দান কর । আমার চর্মে নূর দান কর। আমার রসনায় নূর দান কর। আমার প্রবৃত্তিতে নূর দান কর। আমাকে অতি বেশী এবং বড় নূর দান কর এবং আমার নিম্নে নূর দান কর"।[৩]

১। হাদীস তিনটি উদ্ধৃতঃ মাওলানা মুহাম্মদ মনযুর নোমানী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫ ও ১৮।
২। উক্ত হাদীসটিতে যে নূরের কথা বলা হয়েছে তাদ্বারা আল্লাহর যিকরকে বুঝানো হয়েছে। (হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রঃ), তাছাওওফ তত্ত্ব, পৃঃ ১৫)।
৩। হাদীসগুলি উদ্ধৃতঃ মাওলানা মনযুর নোমানী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯,২০,২১,২৩।

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে মহানবী (সঃ) কায়মনোবাক্যে আল্লাহর নিকট দোয়া করতেন এবং তাঁর উম্মতকে এ সব দোয়া শিক্ষা দিতেন, যাতে সকল জিনিস হতে আল্লাহ তাআলার প্রতি সর্বাধিক ভালবাসার উদ্রেক হয় এবং অধিক ভয় ভীতির সঞ্চার হয়। আল্লাহ তাআলার দীদার লাভের আগ্রহ মনে এত প্রবল হয়ে উঠে যেন দুনিয়ার প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী ও মনের কামনা বাসনার কথা বিনষ্ট হয়ে যায়।

এতে বুঝা যায় যে যিক্‌র, ধ্যান মগ্নতা, গূঢ়তত্ত্ব আলোচনায় জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে সূফী সাধনার প্রয়োগ এবং কথা বার্তায় সূফীবাদের প্রভাব হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর জীবনেও ঘটেছে। তাঁর সাহাবীদের মধ্যেও এ প্রভাব লক্ষণীয়। হযরতের জীবদ্দশায় মসজিদ-ই-নববীতে কিছু সংখ্যক সাহাবা ধ্যানমগ্ন অবস্থায় থাকতেন। তাঁদেরকে আসহাবে সুফফা বা আহলুস্‌সুফ্‌ফা (বারান্দার অধিবাসী) বলা হত। তাঁরা দুনিয়ার কাজ কর্ম ছেড়ে মদীনার মসজিদে আল্লাহর ধ্যান ও উপাসনায় সময় কাটাতেন। দুনিয়ার প্রতি তাঁদের কোন আকর্ষণ ছিল না। তাঁদের সংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচ শত। তাঁদের জীবনে কোন আড়ম্বরতা ছিল না। দারিদ্রই ছিল এঁদের ভূষণ। তাঁরা রাসূল (সঃ)-কে এত ভালবেসেছিলেন যে, নিজেদের জীবন, ধন, মান, সংসার, স্ত্রী, পুত্র পরিজন সকল কিছু আল্লাহ ও রাসূলের নিমিত্তে উৎসর্গ করে 'ফানা ফীর রাসূল' হয়ে গিয়েছিলেন। "তাঁদের অনেকেই বস্ত্রাভাবে পশমী কম্বল পরিধান করতেন। এ জন্য অনেক সময় তাঁদেরকে 'কম্বল পরিধান কারী' বলেও অভিহিত করা হত"।[১] তাঁরা আবার জনগণের নিকট 'কাঠ কাটা লোক' বলেও পরিচিত ছিলেন। তাঁরা জ্বালানী বিক্রি করে জীবন ধারণ করতেন। তাঁরা কিছুর রক্ষণাবেক্ষণের দিকে মোটেও আগ্রহী ছিলেন না, দিনে এনে দিনে খেতেন এবং ভবিষ্যতের জন্য কোন সঞ্চয় করতেন না। তাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভক্তি ও অনুরাগ নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন। "সর্ব প্রথম যিনি এ সূফী উপাধি গ্রহণ করেন, তিনি ছিলেন হাশিম আস-সাদ বিন আহমদ।[২] এই আসহাবে সুফফা থেকেই 'সূফী' শব্দের উৎপত্তি।

ইবনে খালদুন, আলকালাবাদী, আর রুদবারী প্রমুখ মনীষীগণ বলে থাকেন। 'সূফ' শব্দ থেকে সূফী শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। 'সূফ' শব্দের অর্থ পশম। যারা পশমী কাপড় পরিধান করেন, অনাড়ম্বর জীবন যাপন করেন, তারাও 'সূফী' নামে

১। ফকির আব্দুর রশীদ, সূফী দর্শন, পৃঃ ১২।

২। আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭১-৭২।

Dhaka University Institutional Repository

অভিহিত। এটি সূফীদের অবয়ব ও পোশাকের প্রতিই বেশী ইঙ্গিত বাহক। কিন্তু তাসাউফ যেহেতু বাতিনী দিকের পরিচায়ক, সেহেতু শুধু বাহ্যিক দিকের নির্দেশক 'সূফ' বা পশম থেকে সূফী শব্দের উদ্ভব হয়েছে- এ কথা বলা যায় না।

সূফীরা প্রথম কাতারের মানুষ ছিলেন বলে যারা 'সাফ' বা কাতার - 'সারি' শব্দ থেকে 'সূফী' শব্দের উদ্ভব হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেন তাদের মতও গ্রহণ যোগ্য নয়। এটা কল্পনা প্রসূত মাত্র।

মোল্লা জামী ও তাঁর অনুসারীগণের মতে 'সাফা (পবিত্রতা) শব্দ থেকে 'সূফী' শব্দের উৎপত্তি ঘটেছে। সূফীরা পূত পবিত্র চরিত্রের অধিকারী বলে এটা ধরা হয়। কিন্তু এটা শুধু সূফী জীবনের একটি দিকের নির্দেশক।

ডক্টর আর. এ. নিকলসনসহ পাশ্চাত্যের পন্ডিতগণ সূফী শব্দটিকে গ্রীক শব্দ 'সোফিস্ট' থেকে আগত বলে মনে করে থাকেন। সোফিষ্ট অর্থ জ্ঞান এবং তাঁরা বলেন, সূফীরা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ জ্ঞানের সাগর। কাজেই 'সোফিষ্ট' শব্দ থেকে 'সূফী' শব্দের উৎপত্তি। কিন্তু এ বিদেশী পরিভাষা শব্দ বা ভাবটি যে ইসলামী সংস্কৃতি বা তাহজীব তমুদ্দুনে অনুপ্রবেশ লাভ করেছে- এ দাবীর স্বপক্ষে তাঁরা কোন প্রমাণ পেশ করতে পারেননি।[১] কাজেই এমতও গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা।

একমাত্র 'আসহাবে সুফফা' শব্দেই সূফীতত্ত্বের ও সূফীজীবনের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দিক পরিস্ফুট হয়ে উঠে। তাঁরাই বস্ত্রাভাবে পশমী পোশাক পরিধান করতেন, সব সময় আল্লাহর স্মরণে ব্যাপৃত থাকতেন। তাঁরাই আল্লাহর সম্মানের চাদরে আবৃত, তাঁরাই হযরত (সঃ)-এর সাহচর্যে থেকে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ জ্ঞানে জ্ঞানবান হয়েছিলেন। কাজেই 'আসহাবে সুফফা' থেকে 'সূফী' শব্দের উৎপত্তি ও সূফীতত্ত্বের অন্তর্নিহিত অর্থ ও ভাবের প্রকাশ লাভ ঘটেছে। তাই 'আসহাবে সুফফা' থেকেই যে 'সূফী' শব্দের উদ্ভব হয়েছে এতে দ্বিমতের কোন অবকাশ থাকতে পারেনা।

<u>সূফীতত্ত্ব বা তাসাউফের সংজ্ঞা ঃ</u>

ইসলামে সূফীতত্ত্বের অপর নাম 'ইলম-ই-তাসাউফ'। ইহাকে সূফী দর্শন বা সূফী শাস্ত্র নামেও অভিহিত করা হয়। এটা ইসলামের একটা গবেষণামূলক শাস্ত্র।

১। ফকির আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

সূফীতত্ত্ব বা 'ইলম-ই-তাসাউফ' এমন একটি নাম যার মধ্যে বহু বিচিত্র অর্থের সমাবেশ ঘটেছে, এটা একটা বহুরূপী বিষয় এবং এজন্যই বিভিন্ন সূফীর ক্ষেত্রে এর বর্ণনা বিভিন্ন হয়ে থাকে। তাই, এর কোন ধরাবাধা সংজ্ঞা দেয়া কঠিন। তার পরেও বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন ভাবে সূফীতত্ত্ব বা 'ইলম-ই-তাসাউফকে' সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেমন,

'তাসাউফ' শব্দটি 'সাওফ' ধাতু থেকে উদ্ভুত। শব্দটির আভিধানিক অর্থ, 'পশমী কাপড় পরিধান করা'। আর পরিভাষিক অর্থ-সূফী সাধানায় ব্রত হওয়া, "তরীকত সাধনায় আত্মনিয়োগ করা, আত্মোৎকর্ষ সাধনে ব্রত হওয়া, নৈতিক চরিত্রের উন্নতি সাধনে নিয়োজিত হওয়া, আল্লাহতে নিজেকে উৎসর্গ করে দেয়া, আল্লাহর সন্তুষ্টিকল্পে নিজেকে বিলিয়ে দেয়া, আল্লাহতে সমাহিত হয়ে যাওয়া, আল্লাহর ধ্যানে ব্রত থাকা, আল্লাহর রঙ্গে রঞ্জিত হওয়া, আল্লাহর স্বভাবে স্বভাবিত হওয়া, ঐশীগুণে গুণান্বিত হওয়া, আল্লাহতে বিলোপ হয়ে যাওয়া, প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে রত হওয়া, পাশব প্রভৃত্তির তাড়না থেকে পূত পবিত্র থাকা, কু-প্রবৃত্তি, কামনা, বাসনা, থেকে বিরত থাকা প্রভৃতি সাধ্যাতিত সাধনায় সফলতা লাভের পর সৃষ্টি জগতের প্রত্যেক বস্তুতে মহান স্রষ্টার জ্যোতির্ময় সত্তার অবলোকন, আল্লাহর সন্দর্শন লাভ প্রভৃতি অর্থ সমাহারে যে শাস্ত্রের উদ্ভব ঘটেছে, তাকে বলা হয় 'তাসাউফ' বা সূফীতত্ত্ব"। ১

সায়্যিদ আমীর আলী বলেছেন, ''রাসূলুল্লাহ (সঃ) ওহীর প্রেরণায় সম্প্রসারিত উচ্চ অনুভূতি দ্বারা প্রায়শঃ কথা বলতেন, আর তার মুরাকাবার মধ্যে ঐকান্তিকতা ও তার বিহবলতার যে গভীরতা দেখা যেত, প্রধানতঃ তারই উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে মুসলিম অতীন্দ্রিয়বাদ বা 'ইলম-ই-তাসাউফ'। ইসলামী জগতের উচ্চতর মনের মধ্যে এই বলে যে ধারণা রয়েছে যে, কুরআন মজীদের বাণীতে গভীরতর ও অন্তরতর অর্থ নিহিত আছে, তা ভাষা ও বিশ্বাসের বাহ্য কঠোরতা থেকে বাঁচবার প্রয়াস থেকে উৎপন্ন নয়, বরং এ রকম দৃঢ় মূল বিশ্বাস থেকে উদ্ভুত যে, সাধারণ ব্যাখ্যাকারীরা যেটুকু অর্থ আছে বলে মনে করেন কুরআন মজীদের ভাষা তার চেয়ে অধিকতর তাৎপর্যমন্ডিত। এ বিশ্বাস মিলিত হয়েছে আল্লাহর নৈকট্য লাভের অনুভূতির সঙ্গে। সে এমন এক অনুভূতি যার সঙ্গে কুরআন মজীদের শিক্ষার আর রাসূলুল্লাহর উপদেশ মালার সঙ্গতি রয়েছে। আর এ মিলনের ফলে মুসলমানদের মধ্যে সেই ধ্যানমূলক বা আদর্শবাদী দর্শনের সৃষ্টি হয়েছে, যাকে বলা হয় সূফীবাদ"।২

১। মাওলানা আব্দুর রাহীম হাযারী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৭।

২। অধ্যাপক মুহাম্মদ দরবেশ আলী খান অনূদিত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৬৩- ৪৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

সূফীবাদের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে মাওলানা আবদুর রহীম হাযারী বলেছেন, "রাসুলুল্লাহ (সঃ) নির্দেশ করেছেন, "তোমরা মহান আল্লাহর স্বভাবে স্বভাবিত হও" । তাঁর এ মহান উক্তির প্রকৃত অর্থ, আল্লাহ তায়ালার যে সব গুণাবলী রয়েছে, সে সব গুণাবলীতে গুণান্বিত হওয়াকেই আল্লাহ তায়ালার স্বভাবে স্বভাবিত হওয়া বুঝানো হয়েছে। যেমন- আল্লাহতাআলার স্বভাবে বা তার পূত-পবিত্র চরিত্রে কোন প্রকার কামনা - বাসনা, লোভ - লালসা, হিংসা - বিদ্বেষ, মিথ্যা - প্রতারণা, পরস্ত্রীকাতরতা, যৌনোত্তেজনা, পানাহার, প্রত্যাশা প্রভৃতি পাশব প্রবৃত্তির লেশমাত্র নেই। এমন ঐশী স্বভাবে স্বভাবিত হতে পারলেই জৈবিক উপাদানে আবদ্ধ মানবাত্মা ঐশী সত্তায় পৌছতে পারে। এজন্যই আল্লাহ বলেছেন, "তোমরা আল্লাহর রঙে রঞ্জিত হও আর আল্লাহ ছাড়া এমন কে আছে যে সর্বোত্তম রং প্রদান করতে সক্ষম?" সুতরাং যিনি আল্লাহর স্বভাবে স্বভাবিত হতে পেরেছেন তিনিই আল্লাহর বেলায়াত প্রাপ্ত সূফী অথবা ইনসান-ই-কামিল বা পরিপূর্ণ মানব নামে অভিহিত। এদের সম্পর্কেই পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "তাদের জন্যই রয়েছে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুসংবাদ" । এমন খোদাপ্রেমিক খোদাভীরু, খোদাভক্ত ওলীদের অনুসৃত পথকেই বলা হয় তাসাউফ বা সূফীশাস্ত্র" ।১

'ইলম-ই-তাসাউফ' এমন একটি নাম, যার মধ্যে বহু বিচিত্র অর্থের সমাবেশ ঘটেছে। 'তাসাউফ' বিষয়টি একটি আধ্যাত্মিক গুপ্ত রহস্যভেদ দ্বারা আবৃত। 'তাসাউফ' শব্দটির মধ্যেও একটি গোপন তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট নিহিত রয়েছে। 'তাসাউফ' আরবী শব্দটির চারটি বর্ণ যেমন (তা-সোয়াদ-ওয়াও-ফা) এর সমন্বয়ে গঠিত। এর প্রতিটি বর্ণ এক একটি অর্থপূর্ণ উদ্দেশ্য দ্বারা রহস্যাবৃত হয়ে আছে। যথা, 'তা' দ্বারা 'তাওবাহ'র প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে। কেননা, তাসাউফ বা সূফী শিক্ষার প্রথম পাঠ শুরু হয় 'তাওবাহ' দ্বারাই। 'তাওবাহ' দ্বারাই আত্মবিশোধন লাভ হয়। এই আত্মবিশোধন লাভকারী ব্যক্তিকেই আল্লাহ ভালবাসেন। যেমন আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তাওবাহকারী ও শুদ্ধাচারীদেরকে অধিক ভালবাসেন" ।২

"যে তাওবাহ করেছে এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছে, আর সৎকর্মও করেছে, আল্লাহ তাদের পাপকর্ম পূর্ণকর্ম দ্বারা পরিবর্তিত করে দেবেন। কেননা, আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়ালু" ।৩

১। মাওলানা আব্দুর রাহীম হাযারী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৯-৭০।

২। আল কুরআন, সূরা-২৮, আয়াত ৩।

৩। আল কুরআন, সূরা-১, আয়াত ৪।

Dhaka University Institutional Repository

'সোয়াদ' দ্বারা 'সাফা' বুঝানো হয়েছে। এর অর্থ আত্মশুদ্ধি লাভ বা আত্মার পবিত্রকরণ পদ্ধতি। এ আত্মশুদ্ধি লাভ করাই সূফী সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য। আত্ম শুদ্ধি ছাড়া সূফী সাধনায় সফলতা লাভ করা যায়না। এই আত্মবিশোধন হল জাগতিক ধনসম্পদ, মান সম্মান ও ঐশ্বর্য্য লাভের মোহ থেকে অন্তর বা মন মানসিকতাকে পূত পবিত্র রাখা এবং আল্লাহ তাআলার ভীতি ও প্রীতি দ্বারা সর্বদা মন প্রাণকে সংযত রাখা। 'ওয়াও' দ্বারা বেলায়াত অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে। তাসাউফ শিক্ষার প্রথম স্তর তাওবাহ, দ্বিতীয় স্তর সাফা এবং তৃতীয় স্তর হল বেলায়াত। প্রথমোক্তদুটি স্তর পেরিয়ে তৃতীয় স্তরে উন্নীত হতে পারলেই বেলায়াত লাভ হয়। বেলায়াত প্রাপ্ত সূফীদের প্রতি ইলহাম হয়। তাদের প্রতি বিশ্ব পরিচালনার গোপন দায়িত্ব ভার অর্পিত হয়। ফা, দ্বারা 'ফানা ফীল্লাহ'র প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে। ইহা সূফী সাধনার চূড়ান্ত স্তর। এই সর্বোপরিসরে উন্নীত সূফীগণ আল্লাহতে ফানা বা লীন হয়ে যান।[১]

সূফীরা নিজেরাই এবং সূফীতত্ত্বের লেখকগণ সূফীদর্শনের সংজ্ঞা নিরূপণের আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। যেমন,

* শায়খুল ইসলাম যাকারিয়া আনসারী বলেন, "সূফীদর্শন মানুষের আত্মার বিশোধনের শিক্ষা দেয়। তার নৈতিক জীবনকে উন্নত করে এবং স্থায়ী নিয়ামতের অধিকার অর্জনের উদ্দেশ্যে মানুষের ভিতর ও বাহিরের জীবনকে গড়ে তোলে। এর বিষয় বস্তু হল আত্মার পবিত্রতা বিধান এবং তার লক্ষ্য চিরন্তন সুখ শান্তি অর্জন"।

* আলী আর-রুদবারী (Ali-Ar-Rudhbari) বলেন, "সূফীতত্ত্বের মূল হল পার্থিব জগতকে দূরে নিক্ষেপ করে আল্লাহর পছন্দনীয় পূর্ণ মানবের (রাসূলুল্লাহ (সঃ)) পথ অনুসরণ করা"।

* জুনায়দ বাগদাদীর (রাঃ) মতে, "বস্তু জগতের মোহ থেকে আপন প্রবৃত্তিকে প্রভাব মুক্ত রাখা, বিশ্ব প্রকৃতির ছলনা থেকে বিরত থাকা, ইতর চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন, প্রবৃত্তির প্রবঞ্চনাও প্রতারণা থেকে আত্মাকে পূত পবিত্র রাখা মানবিক চরিত্রে বিভূষিত হওয়া এবং সমুদয় সৃষ্টি জগতের মহান স্রষ্টা আল্লাহর অস্তিত্বের সাথে পরিচিত হওয়া এবং তারই মহান অস্তিত্বে নিজের ক্ষুদ্রতম অস্তিত্বকে বিলীন করে দেয়ার নামই সূফীদর্শন"।

১। Sayeed Abdul Hai, Muslim Philosophy, Islamaic Foundation Bangladesh, 1982- p. 142,43.

Dhaka University Institutional Repository

* আবু আল-কাজিনী বলেন, "সূফীদর্শন মনোরম আচরণ ছাড়া অন্য কিছুই নয়"।
* আবূ সাহল সালুকী বলেন, "আপত্তিকর বিষয় থেকে দূরে সরে থাকাই সূফীদর্শন"।
* আবূ মুহাম্মদ আজ জারিরী বলেন, "সদভ্যাস গঠন এবং সমস্ত অনিষ্টকর কামনা থেকে মনকে মুক্ত করাই সূফীদর্শন"।
* মা'রুফ আল কারখীর মতে, "সূফীদর্শন ঐশী সত্তার উপলব্ধি।"
* আল কুশাইরী বলেন, "বাহ্য ও অন্তর জীবনের বিশুদ্ধতাই সূফীদর্শন"
* আবুল হোসাইন আন-নূরী বলেন, "ইন্দ্রিয়জ আত্মার সব প্রবৃত্তির বিসর্জন দেয়াই সূফীদর্শন।"
* মহাত্মা যুন্নুন আল মিসরী (রঃ) (মৃত্যু ২০০ হিঃ/৮১৬ খৃঃ) বলেছেন, "সৃষ্টি জগতের সমূদয় আশা ভরসা পরিবর্জন করে কেবল আল্লাহর উপর নির্ভর করার নামই সূফীদর্শন।"
* সাহল বিন আব্দুলাহ তাসতারী (মৃঃ ২৮৩হিঃ /৮৯৬ খৃঃ) বলেন, "যার অন্তরে সংকোচবোধ ও কুটিলতা নেই, সদা সৎ চিন্তায় বিভোর, আল্লাহর প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে জাগতিক লোভ লালসা থেকে নিরাসক্ত হয়ে পড়েছেন এবং স্বর্ণ ও মুক্তা যার নিকট সমান, সমমর্যাদা ও সমমূল্যের বলে বিবেচিত, তিনিই প্রকৃত পক্ষে সূফী"। তিনি আরো বলেছেন, "যিনি স্বল্প আহার, স্বল্প নিন্দ্রা ও স্বল্প কথায় অভ্যস্ত এবং জাগতিক মোহ থেকে অনাসক্ত, তিনিই সূফী। আর সূফীকে বিশ্বসৃষ্টির আকর্ষণ থেকে বিমুক্ত থাকাই সূফীদর্শন"।[১]

* ইমাম গাযালী বলেছেন, "আল্লাহ ব্যতিত অপর সব কিছু থেকে হৃদয়কে পবিত্র করে আল্লাহর আরাধনায় নিমজ্জিত থাকা এবং সম্পূর্ণরূপে আল্লাহতে নিমগ্ন হওয়ার অপর নামই সূফীদর্শন"।[২]

উপরোক্ত সংজ্ঞাসমূহ থেকে বুঝা যায় যে অন্তরের বিশুদ্ধির মাধ্যমে বাহ্য ও অন্তর জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করে, ঐশী সত্তার উপলব্ধির মধ্য দিয়ে চিরন্তন শান্তি লাভই সূফীদর্শনের শিক্ষা। মোটের উপর মহানবী (সঃ)-এর নির্দেশিত পথে আত্মশুদ্ধি করে ইসলামের বাহ্য ও অন্তর জীবনের (যাহিরী, বাতিনী) প্রেমপূর্ণ

১। সূফীবাদের সংজ্ঞাগুলো উদ্ধৃতঃ মাওলানা আব্দুল রাহীম হাযারী, প্রাগুক্ত, পৃঃ-৫।

২। ইমাম গাযালীর দেয়া সূফীবাদের সংজ্ঞাটি উদ্ধৃতঃ ফকির আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ-২৪।

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে পরম সত্তার পূর্ণ জ্ঞান অর্জন ও তাঁর নৈকট্য লাভ জনিত রহস্যময় উপলব্ধিকেই সূফীদর্শন বলা হয়। সূফীদের সূফীবাদ সম্পর্কিত দৃষ্টি ভঙ্গি বিশ্লেষণ করলে যে সত্য ফুটে উঠে, তা হল,

"প্রথমতঃ আত্মশুদ্ধি ও পবিত্র আত্মা লাভের জন্য হারাম খাদ্য, হারাম কাজ, অন্যায়-অবৈধ, কুকর্ম, কুচিন্তা, কুভাব, অহংবোধ সর্বপ্রকার পান ও কালিমা ত্যাগ করা সূফী জীবনের প্রাথমিক কর্তব্য ও প্রয়োজন। নফসে আম্মারাহ বা আত্মার নিম্ন প্রবৃত্তি সমূহকে 'ফানা' করার কথাও এখানে বলা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ বিশুদ্ধভাবে ও সঠিক নিয়মে শরীআতের বাহ্যিক আরকান আহকাম পালন করতে হবে, যাতে আল্লাহর ভীতি অন্তরে উপস্থিত হয়।

তৃতীয়তঃ শরীআতের অভ্যন্তরীণ বা বাতিনী দিকের প্রতি খেয়াল করে হাকীকত বা মূল সত্য লাভ করার প্রচেষ্টা এবং তাই আল্লাহকে পাওয়ার জন্য পথ প্রদর্শক শিক্ষকের কাছে নিজের আত্মসমর্পন এবং তার প্রদর্শিত ইলমে লাদুনীর জ্ঞান অর্জন করতে সাধনা পথে অগ্রসর হতে হয়।

চতুর্থতঃ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে জীবনের সঠিক দিক বিশেষতঃ ইবাদতের দিকটা যাতে আরো সুন্দর, মনোরম ও মধুর (ইহসানপূর্ণ) হয়, তার জন্য প্রয়াস পাওয়া এবং উভয় দিকের পূর্ণতা লাভের জন্য প্রচেষ্টা করা এ স্তরের উদ্দেশ্য। ভক্তি ও প্রেম ব্যতিত ইবাদতের এ স্বাদ পাওয়া সম্ভব নয়।

পঞ্চমতঃ পরিপূর্ণ আত্মসমর্পনের মাধ্যমে বিলায়াত অর্জন পূর্বক আল্লাহর উপলব্ধিজাত জ্ঞান লাভ করে পরম সত্তায় (যাত) স্থিতি (বাকা) লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করা সূফী সাধনার মূল বিষয় বস্তু"।[১]

তাই দেখা যায় যে সুফীদর্শন একটা সাধারণ মানুষকে পরিপূর্ণ মানবতা দান করে আল্লাহর অনন্ত অসীম জ্ঞানে জ্ঞানী করে তোলে। সূফী দর্শনের শিক্ষা তাই পরিপূর্ণরূপে মানবতারই শিক্ষা, পাশবিক স্তর হতে মানবতার স্তরে উন্নীত হবারই শিক্ষা। তাসাউফ তাই মনুষত্বের চরম শিক্ষা ও দর্শন।

১। ফকির আব্দুর রশিদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫-২৬।

Dhaka University Institutional Repository

সূফী দর্শনের উৎপত্তি বিষয়ক মতবাদ ঃ-

ইসলামের সূফীদর্শনের উৎপত্তি নিয়ে চিন্তাবিদদের মধ্যে ব্যাপক মতবিরোধ রয়েছে। ইসলামী চিন্তাজগতে বিভিন্ন চিন্তাগোষ্ঠীর উৎপত্তির ন্যায় সূফী দর্শনও কুরআনের শিক্ষা থেকে উদ্ভূত হয়েছে। কিন্তু পাশ্চাত্য পন্ডিতদের অনেকেই এটা স্বীকার করতে রাজী নন। তাঁদের অনেকেই প্রমাণ করতে চান যে, ইসলামে সূফীদর্শন বেদান্ত ও বৌদ্ধ দর্শন, খৃষ্টীয় ও নিও প্লেটোনিক দর্শন এবং পারসিক দর্শনের প্রভাবজাত। তাঁদের মধ্যে ভনক্রেমার, ভেজী, এইচ. মার্টেন, ব্রাউন, নিকলসনের নাম উল্লেখযোগ্য।

অন্যদিকে আল কুশাইরী থেকে শুরু করে আল্লামা ইকবাল পর্যন্ত বহু মুসলিম চিন্তাবিদ পবিত্র কুরআনকে সূফীদর্শনের উৎস বলে নির্দেশ করেছেন। তাই দেখা যায়, সূফীদর্শনের উৎপত্তি সম্পর্কে চারটি মতবাদ রয়েছে, যথাঃ বৈদান্তিক ও বৌদ্ধ প্রভাব মতবাদ, খৃষ্টীয় ও নব্য প্লেটোবাদী মতবাদ, পারসিক মতবাদ এবং কুরআনীয় মতবাদ।

(১) <u>বৈদান্তিক ও বৌদ্ধ মতবাদঃ</u> এইচ, মার্টেন ও গোল্ডজিহার প্রমুখ পাশ্চাত্য চিন্তাবিদদের মতে, মুসলিম চিন্তায় সূফীদর্শনের উৎপত্তি ঘটে বেদান্ত দর্শন ও বৌদ্ধ দর্শনের সংস্পর্শে । যেহেতু বেদান্তের মত বৌদ্ধ মতবাদও সূফীতত্ত্বের চাইতে প্রাচীনতর। সে জন্য সূফীরা বৌদ্ধ চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন বলে মনে করা হয়ে থাকে। ভারতীয় দার্শনিকগণ এ জগতকে প্রাতিভাসিক, অবাস্তব, ক্ষণস্থায়ী ও অধ্যাসমূলক বলে মনে করেন। ভারতীয় দর্শনে যে নৈরাজ্যবাদী মনোভাব ও বৈরাগ্যবাদী জীবনাবরণ লক্ষণীয়, তা সেমেটিক মনে আবেদন সৃষ্টি করে এবং এর ফলে বৈরাগ্যবাদ দৃষ্টি ভঙ্গির সৃষ্টি হয়। এ মতবাদ সূফীদের 'ফানা' এবং বৌদ্ধদের 'নির্বাণের' সাদৃশ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।মুসলমানরা সাহিত্য সূত্রে ভারতীয় ধারণাবলীর সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করে। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ভারতীয় সন্ন্যাসীরা মেসোপটেমিয়ায় কিছু অনুসারী সৃষ্টি করে। হার্টম্যানের মতে, "সূফীবাদের উদ্ভব ঘটে সেদিনের বিশ্ববাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল খোরাসানে এবং সেই সূত্রেই ভারতীয় ধারণাবলী ইসলামে প্রবেশ লাভ করে"।[১]

১। আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

সূফীদের পোশাক পরিচ্ছদ ও নিয়মাকানুনের সঙ্গে ভারতীয় অনুশাসনের ও আচরণাদির অনেকটা সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় বলে অধ্যাপক নিকলসন বলেন, "একথা বলা যায় যে সূফীবাদের নৈতিক আত্ম অনুশীলন, বৈরাগ্যবাদী উপাসনা প্রভৃতিতে বৌদ্ধ দর্শনের প্রভূত প্রভাব রয়েছে। তবে দু'য়ের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে"।[১]

ভারতীয় অনুশাসন ও আচরণবাদীর সাথে মুসলিম সূফীদের জীবন পদ্ধতীর কিছুটা সাদৃশ্য রয়েছে বলে এটা প্রমাণ করেনা যে ইসলামে সূফীদর্শনের উদ্ভব ঘটেছে ভারতীয় চিন্তাধারা থেকে। কেননা, সাদৃশ্যের ভিত্তিতে কার্যকারণ নির্ধারণ সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তামূলক । ইসলামে সূফীদর্শনের উদ্ভব ঘটে মুসলমানদের ভারতীয় ভাবধারার সাথে যোগাযোগের বহু পূর্বে। কেননা, সূফীদর্শন ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অংগ। ইসলামের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই সূফীদর্শনের আবির্ভাব। সূফীদর্শন ইসলামের মতই পুরাতন। আর ইসলামের আবির্ভাব কালে ভারতীয়দের সাথে মুসলমানদের যোগাযোগ ঘটেছিল-এ সত্য প্রমাণ করার মত কোন ঐতিহাসিক দলীল নেই। কাজেই বলা যায় যে ভারতীয় ভাবধারা ইসলামে প্রবেশ করে সূফীদর্শনের উদ্ভবের বহু পরে।

সাদৃশ্যের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এ দুটি দর্শনের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান। 'বেদান্ত' দর্শনে 'মায়াবাদ' ও সূফীদের 'জগত' সম্পর্কীয় ধারণা এক নয়। বৈদান্তিকগণ এ জগতকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেন, কিন্তু সূফীরা এ জগতের বাস্তবতা অস্বীকার করেন না। কেননা, এ জগতকে তারা পরম সুন্দরের প্রকাশ বলে মনে করেন। বৈদান্তিকদের নিকট এ জগত অর্থহীন হলেও সূফীদের নিকট এ জগত মূল্যবান। কেননা, এ জীবনের সাধনাই পরজীবনের ভিত্তি রচনা করে।

বৈদান্তিকরা তাত্ত্বিক দিক থেকে জগতের অলীকতা স্বীকার করেন কিন্তু সূফীরা নৈতিক দিক থেকে জগতের অসারতা প্রতিপন্ন করেন।[২] "যে ব্যক্তি খোদাকে পাওয়ার সাধনায় মোটেই অগ্রসর হতে পারল না, প্রবৃত্তির দাস হয়ে জীবন কাটাল, তার জীবন অসার, জগত অলীক কিন্তু সাধকের নিকট নয়"।[৩] সূফী সাধক জীবন জগতের মুরাকাবার মাধ্যমেই খোদার সান্নিধ্য লাভ করে।

১। Nicholson, Mystic of Islam, p-15.

২। ডঃ রশীদুল আলম, মুসলিম দর্শনের ভূমিকা, সাহিত্য কুটির বগুড়া, ১৯৮১ইং, পৃঃ ৩৭৭।

৩। ডঃ রশীদুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃঃ- ৩৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

বৌদ্ধ দর্শন শূন্যবাদ ও আত্মার নঞর্থে বিশ্বাসী। সূফী দর্শন অস্তিত্ববাদ ও আত্মার সদর্থে বিশ্বাসী। সূফীদের 'ফানা' বৌদ্ধদের 'নির্বাণের'১ মত কোন নঞর্থক অবস্থা নয়। 'ফানার' পরে রয়েছে ইতিবাচক 'বাকা' বা আল্লাহতে অবস্থিতি। নির্বাণ ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র বোধকে ধ্বংস করে দিতে চায়। এরপর আর কোন স্তর নেই। 'ফানা' অবস্থায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিতে চায় ঠিকই কিন্তু সেই বিসর্জন শুধু আল্লাহর মধ্যে সমাহিত হয়ে অসীমত্ব অর্জনের লক্ষ্যেই নিবেদিত।

বৌদ্ধ দর্শনে পরমতত্ত্ব বলতে 'শূন্যবাদ'কেই বুঝানো হয়। শূন্য একটা অনির্বচনীয় অবস্থা। বালায়ুরীর ভাষায়, "অস্তি-নাস্তি তদু ভয়ানুভয়ে চতুষ্কোটি বিনি মুক্তির শূন্য রূপম"। অর্থাৎ যা অস্তিও নয়, অস্তি নাস্তি নয়-এমনও নয়। অর্থাৎ এসব অবস্থার অতীতে যে অবস্থা, তাকেই শূন্যরূপ নাম দেয়া হয়েছে।বৌদ্ধদের 'শূন্যবাদ' দার্শনিক চিন্তার শেষ অবস্থা, বৌদ্ধরাও যার সঠিক মুল্যায়ন করতে পেরেছেন বলে মনে হয়না। এদিক দিয়ে সূফীর মাশুক "পরমযাত পাক আল্লাহ চিরঞ্জীবি এবং দৃশ্য অদৃশ্য তাঁর ব্যক্ত রূপ। সব কিছুর মাধ্যমে তিনিই নিজকে প্রকাশ করে নিজেই নিজকে উপলব্ধি করেছেন বা চিনেছেন- এই তাঁর স্বভাব। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ বলেন, "আমি গুপ্ত ভান্ডারে নিহিত ছিলাম, নিজকে প্রকাশ করে চিনবার নিমিত্তে সব কিছুকে সৃষ্টি করলাম"। সূফীর এ জ্ঞান প্রত্যক্ষ এবং তার আল্লাহ তাই প্রকাশ (যাহির) অপ্রকাশ (বাতিন) সবই"।২

এদিক দিয়ে সূফীরা পরম তত্ত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত সত্যে উপনীত হয়েছেন, বৌদ্ধরা সত্য লাভে ব্যর্থ হয়েছেন। এছাড়া সূফীরা একেশ্বর (তাওহীদ) পন্থী। এক আল্লাহ ছাড়া তাঁরা দ্বিতীয় কোন সত্ত্বার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। যদিও সূফী সাধনায় জড়জগত থেকে আধ্যাত্মিক জগতে উত্তরণের প্রয়াস আছে, যাতে গুণ (সিফাত) থেকে সত্তার (যাত) স্বরূপে উপনীত হওয়া যায়। সেজন্যই তাদের এ প্রচেষ্টা। জড়-জগত ও আধ্যাত্মিক জগতকে তারা 'এক' এরই বিবর্তন রূপ বলে মনে করেন।

১। 'নির্বাণ' অর্থ মোক্ষলাভ বা জীবের মুক্তি। বৌদ্ধ সাধনার চূড়ান্ত লক্ষ্য হল নির্বাণ লাভ। বৌদ্ধরা উপনিষদ থেকে তাদের নির্বাণ মতবাদ গ্রহণ করেছেন। সমস্ত কামনা বাসনাকে নির্বাপিত করাই নির্বাণ। মানবের দুঃখ, কষ্ট,রোগ, শোক, জরা প্রভৃতি থেকে মোক্ষলাভ করতে হলে একমাত্র তার দৈহিক ও মানসিক সর্বপ্রকার কামনাকে দূরীভূত করে নিজকে জাগতিক ও বৈষয়িক বন্ধন থেকে মুক্ত করতে হবে এবং ধ্যানের মাধ্যমে অনন্ত শূন্যতার মাঝে আপনাকে বিসর্জন দিতে হবে। একেই নির্বাণ বা প্রকৃত মোক্ষলাভ বলা হয়েছে। আত্মবিলয়ের মধ্যেই বৌদ্ধমতে জীবের মুক্তি। আত্মবিলোপের পর আর কোন স্তর বৌদ্ধ সাধন মতে নেই।

২। ফকির আব্দুর রশিদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০১।

Dhaka University Institutional Repository

"কিন্তু বৌদ্ধগণ বৈদান্তবাদীদের ন্যায় 'সু' ও 'কু' বা সত্য ও মিথ্যা বলে দুই পরাক্রমশালী শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করেন এবং জগতের একটা অংশকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তার ধ্বংস সাধনের মাধ্যমে আপনার নঞর্থক মুক্তি খোঁজেন। এজন্য তারা সংসার ত্যাগ করেন, কঠোর সংযমব্রত পালন করেন এবং কৃচ্ছ্রতা অবলম্বন করেন। অন্যদিকে সূফীরা সংসার জীবন পালনের মাধ্যমে স্বাভাবিক সাধনা সংযম ও কৃচ্ছ্রতা পালনের ভেতর দিয়ে আধ্যাত্মিক জগতের উর্ধ্ব স্তরে উপনীত হন"।[১]

আধ্যাত্মিক সাধক যে কোন শ্রেণীরই হোক না কেন, তারা যে বিলাস ব্যাসনে, আরাম আয়েশের মধ্য দিয়ে দিন কাটাতে পারেন না, তারা যে মহান ব্রত উদযাপনের জন্য সংযম ও কৃচ্ছ্রতা অবলম্বন করেন তা শুধু সূফীদের মধ্যে দেখা যায় না, বৈজ্ঞানিক , দার্শনিক, সমাজ সংস্কারক, এমনকি দেশ প্রেমিক রাষ্ট্র নায়কের মধ্যেও দেখা যায়। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে বেদান্ত দর্শনের মায়ার পেলব কিংবা ভারতীয় যোগী তথা বৌদ্ধ ভিক্ষুকের কৃচ্ছ্রতা ও সংযম মুসলমান মরমীবাদের প্রেরণা নয়। উভয়ের মধ্যে যা সাদৃশ্য তা বাহ্যিক।[২]

সূফীদের 'ফানা' এবং বৌদ্ধদের 'নির্বাণের' সাদৃশ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আলোচ্য মতবাদ। মতবাদ দু'টির মধ্যে বাহ্যিক সাদৃশ্য কিছুটা থাকলেও এদের মাঝে মৌলিক কোন সাদৃশ্য নেই। অধ্যাপক নিকলসনও তা স্বীকার করেছেন, "We can not identify fana with Nirvana unconditionally while Nirvana is purely negative fana is accompanied by baqa, everlasting life in God." অর্থাৎ আমরা বিনা শর্তে ফানাও নির্বাণকে অভেদাত্মক বলে মেনে নিতে পারিনা। নির্বাণ নিছক নেতিবাচক, কিন্তু 'ফানার' পরবর্তী স্তর 'বাকার' (আল্লাহর চিরন্তন সত্তার অবস্থান) সাথে সম্পৃক্ত"।[৩]

উপরোক্ত পর্যালোচনায় এটাই প্রমাণিত হয় যে ইসলামের সূফীদর্শন ভারতীয় আমদানী নয়, ইসলামের আধ্যাত্মিক শিক্ষারই অনিবার্য পরিণতি।

(২) <u>খৃষ্টান ও নিউ প্লেটোনিক প্রভাবঃ</u> অনেক পাশ্চাত্য পন্ডিত মনে করেন যে মুসলমানেরা নিউ প্লেটোবাদী খৃষ্টান ধর্ম প্রচারকদের সংস্পর্শে আসার পর থেকে ইসলামে সূফীদর্শনের সূত্রপাত ঘটে। প্রথম দিকে মুসলমানগণ এমন কিছু খৃষ্টান ধর্ম প্রচারকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন যারা তাদের নিজস্ব ধর্মমত সিরিয়া ও

১। ফকির আব্দুর রশিদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০২।
২। ডঃ রশিদুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৭৮।
৩। R.A. Nichalson, opcit, P. 9.

Dhaka University Institutional Repository

পার্শ্ববর্তী অপরাপর দেশসমূহের জনগণের মধ্যে প্রচার করেছিলেন। এসব নব্য প্লেটোবাদী দার্শনিকগণ যে খৃষ্ট ধর্ম প্রচারে নিয়োজিত ছিলেন তা ছিল গ্রীকদর্শনের আলোকে পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত। নিউ প্লেটোনিক মতবাদের প্রবর্তক ছিলেন দার্শনিক প্লাটিনাম। তিনি ২৪৪ খৃষ্টাব্দে রোম নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন প্লেটোর (খৃঃপূর্ব ৪২৭ অব্দ) ভক্ত। প্লেটো পুরোপুরি একজন নিরস দার্শনিক মাত্র। এই দার্শনিকের ভক্ত দার্শনিক প্লাটিনাম প্লেটোর মতানুবর্তী হয়ে এ ভক্তিমার্গে অগ্রসর হয়ে অনেক বিষয়ে প্লেটোকে অতিক্রম করেছিলেন। এজন্য প্লাটিনামের দর্শনকে 'নিউপ্লেটোনিজম' নামে অভিহিত করা হয়।

পবিত্র তওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল (বাইবেল) ও আল -কুরআন একই সাথে ধর্ম গ্রন্থ ও নীতি শাস্ত্র। কিন্তু প্লেটোর চিন্তাধারা নিছক দর্শন শাস্ত্র। ধর্ম গ্রন্থের আল্লাহ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, গুণসম্পন্ন কিন্তু দর্শনের আল্লাহ এক নির্গুন মহাচেতনা। প্লেটোর এই নির্গুণ চেতনাকে প্লাটিনাম সত্তা থেকে অভিন্নরূপী গুণসম্পন্ন ব্যক্তিত্বে পরিণত করে মানুষের আবহমান কালের চিরন্তন আকাংখার নিবৃত্তি করেন"।১ তিনি দর্শনের মূলভিত্তিকে অক্ষুন্ন রেখে ভক্তি ও প্রেম মার্গে অগ্রসর হন। আর সূফী দর্শনের সাথে নিউ প্লেটোনিজমের সাদৃশ্য এখানেই।

প্লেটোর মতে, দৃশ্যমান জগতের সব কিছুই এক একটা সুক্ষ্ম টাইপ বা আদর্শ যা আধ্যাত্মিক জগতে বিদ্যমান। আজ যে বস্তুর জন্ম বা প্রকাশ হচ্ছে তা সেই আধ্যাত্মিক টাইপগুলোরই মূল প্রকাশ মাত্র। জড় দেহের (জল,বায়ু, অগ্নি ও মৃত্তিকা) মাধ্যমে দৃশ্যমান হয়েছে। আধ্যাত্মিক জগতের প্রতিচ্ছবিই এ দৃশ্যমান জগত। কাজেই এ জগতের নিজস্ব কোন স্থায়িত্ব ও সত্যতা নেই। একমাত্র আধ্যাত্মিক জগতই চিরসত্য, চির শাশ্বত। প্লেটো এ শাশ্বত টাইপ বা মডেলের সাধারণ নামকরণ করেন 'আইডিয়া'।২

কিন্তু প্লেটোর এই নিরস ও প্রাণহীন নিছক দর্শনের উপর প্লাটিনাম সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি । তাই তিনি প্লেটোর দর্শনে ভক্তিকে যোগ করে আধ্যাত্মিক সাধনার সুষ্ঠু ও সুন্দর নিয়মাবলীর নির্দেশ করে যান। তিনি প্লেটোর মতাবলম্বন করেই নির্দেশ করেন যে, "দৃশ্যমান বিশ্বজগত এক শাশ্বত আধ্যাত্মিক জগতেরই বহিঃপ্রকাশ এবং এ জগত পুণরায় নিঃশ্বেষিত হয়ে সেই মূল আধ্যাত্মিক ধারার সাথেই মিশে যাবে। জগতও জাগতিক সকল বস্তুর এই-ই-হল শেষ পরিণতি ও

১। ফকির আব্দুর রশিদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৩।

২। ফকির আব্দুর রশিদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৩।

Dhaka University Institutional Repository

চরম লক্ষ্য। 'প্লাটিনাম আরো বলেন, "বহিঃ প্রকাশের স্তর তিনটিঃ যথা, আত্মাময়জগত, প্রাণীজগত ও বস্তুজগত এবং পরমাত্মার দিক দিয়ে প্রত্যাবর্তনের ও স্তর তিনটি-যেমন, ইন্দ্রিয় অনুভূতি, মার্জিত জ্ঞান ও পরমাত্মায় সমাধি"।[১]

জীবনাচরণের দিক থেকে নব্য প্লেটোবাদী ধর্ম প্রচারকগণ ছিলেন মরমী ভাবাপন্ন। মুসলিম যুগের কয়েক শতক ধরে তাদের বহু সংখ্যক সদস্য আরব ও সিরিয়ার সর্বত্র কর্মরত ছিল। ফলে মুসলমানগণ তাদের সংস্পর্শে আসার কারণেই মুসলমানদের মধ্যে সূফীদর্শন জন্ম লাভ করে। এ জন্য নিকলসন মনে করেন, "ইসলামে মরমীবাদের উৎপত্তি ঘটে এমন এক পরিবেশে যা ছিল গ্রীক দর্শন সম্পৃক্ত"।[২]

কিন্তু ঐতিহাসিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে এ মতবাদ সমর্থন যোগ্য নয়। সূফীভাবের প্রকাশ মূলতঃ মহানবী(সঃ) তাঁর শিষ্য বিশেষ করে আহলে সুফ্‌ফা ও তাবেয়ীনদের মাধ্যমে ঘটেছিল। তাঁরা জাগতিক কর্ম সম্পাদনের পাশাপাশি আধ্যাত্মিক ধ্যান সাধনায় নিমগ্ন থাকতেন। তাছাড়া প্রথম পর্যায়ে সূফীগণ বাহিরের চিন্তার সাথে পরিচিত হবার সুযোগ লাভ করেনি। সুযোগ লাভ করে থাকলেও কুরআনের বাহ্যিক দিকের উপরই তা নিবদ্ধ ছিল বেশী। এ কারণে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, "সূফীদর্শনে নব্য প্লেটোবাদ প্রবেশ লাভের সুযোগ পায়নি। নবম শতাব্দীর পূর্বে সূফীদর্শন জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করেছে"।[৩]

নিজেদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা দ্বারা গঠিত না হলে কোন বিদেশী প্রভাব জনগণের মন ও মানসিকতাকে নতুন কোন ধারণা বা দৃষ্টিভঙ্গির প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করতে পারেনা। ইকবাল তাই বলেছেন, "No idea can seize a peoples soul unless, in some sense it is the peoples own" অর্থাৎ "কোন ধারণাই কোন জাতির মনকে অধিক দিন ধরে রাখতে পারেনা, যদি সে ধারণা তাদের নিজস্ব না হয়"।[৪] কাজেই সূফীবাদ ইসলামের শিক্ষা থেকে উদ্ভূত এবং মুসলিম জাতির চিন্তা ধারার ফল।

(৩) <u>পারসিক প্রভাব মতবাদঃ-</u>

ই.জে.ব্রাউন ও তাঁর অনুসারীদের মতে, ইসলামে সূফী দর্শনের প্রবর্তক হলেন পারসিকগণ। তাঁদের মেতে, মুসলমানদের নিকট পারস্য সাম্রাজ্য পতনের পর

১। ফকির আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৩।

২। Nichalson, opcit, p-15.

৩। ডঃ রশীদুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৭৯।

৪। Iqbal, The development of Metaphysics in Persia, p-76.

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানগণ পারসিকদের সংস্পর্শে আসেন। তখনই ইসলামে সূফী দর্শনের সূত্রপাত ঘটে। একটি অনুন্নত জাতি দ্বারা একটি উন্নততর জাতির পরাভবের ফলে উন্নততর জাতি অর্থাৎ পারসিকদের রাজনৈতিক পরাজয়ে তাদের মধ্যে নৈরাজ্য, কঠোর সংযম ও মরমীবাদের সৃষ্টি করেছিল। পারস্যদেশ যথার্থই সূফীদের দেশ এবং পরবর্তীতে অধিকাংশ সূফীই পারস্যের বুকে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। কাজেই পারসিকগণই সুফীদর্শনের প্রবর্তক।

পারস্যবাসীদের মনের উপর রাজনৈতিক ব্যর্থতা ও সহজাত মানসিক পবিত্রতার প্রভাব মরমী চিন্তা ধারার বিকাশের সহায়ক হয়। সূফীদর্শনের বিস্তার ও উন্নতিতে পারস্যবাসীদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। তবে তারাই সূফীদর্শনের জন্ম দিয়েছেন একথা বলা যায়না। কিন্তু অধ্যাপক নিকলসন প্রশ্ন করেছেন, "If Sufism was nothing but a revelt of the Aryan Spirit, how are we to explain the undoubted fact that some of the leading pioneers of Mohummadan Mysticism were natives of Syria and Egypt and Arabs by race". [১]

পারসিকগণ আর্যজাতি। তাদের প্রবণতা অন্তর্মূখীন। তাই তাদের ধর্মমত, চিন্তাধারা ও আধ্যাত্মিক ভাবধারায় একটা বিশিষ্ট স্বকীয়তা বিদ্যমান। জাতি হিসাবে তাদের বৈশিষ্ট্য অনস্বীকার্য। আরবরা স্রষ্টা ও সৃষ্টি সম্বন্ধে দ্বৈতবাদী। দ্বৈতবাদ অনুযায়ী সৃষ্টি স্রষ্টা থেকে পৃথক এবং স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক প্রভু ও ভৃত্যের সম্বন্ধের ন্যায়। পারস্যবাসীরাও এ দিক দিয়ে একত্ববাদী। তাঁদের মতে, স্রষ্টার মাঝে সৃষ্টির অস্তিত্ব বিদ্যমান।"আরবদের মতে আল্লাহতায়ালা সাত তলা আসমানের উপরে সিংহাসনে বসে এ বিশ্ব শাসন করেন, কিন্তু পারস্যবাসীদের মতে, বিশ্বের সব কিছুর মাঝেই আল্লাহর অস্তিত্ব অনুভূত হয়। আরবগণ প্রত্যক্ষবাদী, পারসিকগণ ভাববাদী, আরবগণ বেশীর ভাগই নৈতিক গুণে উদ্বুদ্ধ, আর পারসিকগণ সাধারণভাবেই দার্শনিক ভাবধারায় বিভূষিত"। [২]

সূফী দর্শনের সাথে পারসিকদের মিল পরিলক্ষিত হলেও পারসিক প্রভাবে সূফীদের উদ্ভব ঘটেছে এর কোন প্রমাণ নেই। পরবর্তী যুগের শ্রেষ্ট সূফী দার্শনিক মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী ও ইবনুল ফরীদ পারসিক ছিলেন না, আরবী ভাষাভাষী ছিলেন,

---

১। Nichalson, opcit p.9.

২। ফকির আব্দুর রশিদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৫।

Dhaka University Institutional Repository

অথচ সূফী দর্শনে তারা শ্রেষ্টত্বের শীর্ষে। ইবনুল আরাবী সূফীদর্শনকে সুসংহত ও সুনিয়ন্ত্রিত করে একে তত্ত্বের পর্যায়ে উন্নীত করেন। কাজেই এ মতবাদের ভিত্তি অত্যন্ত দূর্বল। মূল কথা হল, আরব জাতি পারসিকদের সংস্পর্শে আসার অনেক পূর্বেই সূফীবাদের উদ্ভব ঘটে। মহানবী (সঃ) কে সূফীবাদ বা ইলমে মা'রিফাতের আদি গুরু বলে ধরা হয়। তিনি এবং তাঁর চার খলিফা নিঃসন্দেহে বাইরের প্রভাব মুক্ত ছিলেন। বাইরের প্রভাবমুক্ত ছিলেন মহানবী (সঃ) এর বিশিষ্ট সাহাবা (আহলে সুফফা) ও তাবেয়ীনগণ।

(৪) <u>কুরআনীয় মতবাদঃ</u>

বাইরের কোন চিন্তাধারার প্রভাব সূফীতত্ত্বের জনক নয় উপরোক্ত আলোচনায় আমরা তাই দেখানোর প্রয়াস পেয়েছি। পবিত্র কুরআন ও হাদীসই এর মূল উৎস। মহান আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং কুরআন শরীফের মাধ্যমে এবং মুহাম্মদ (সঃ)-এর মাধ্যমে ইসলামের স্বয়ং সম্পূর্ণ পরিপূর্ণতার রূপ মূর্ত করে তুলেছেন। বাইরের কোন চিন্তাধারা ইসলামকে প্রভাবিত করতে পারেনি। কুরআনের আধ্যাত্মিক শিক্ষাই এর মূলভিত্তি। বাইরের কোন চিন্তাধারার প্রভাবে এর জন্ম হয়নি। কুরআনের আধ্যাত্মিক শিক্ষাই মুসলমানদের জাতীয় জীবনের বিভিন্ন অবস্থার পটভূমিতে সূফীতত্ত্বের মধ্যদিয়ে আত্ম প্রকাশ করেছে। পবিত্র কুরআন শরীফে এক শ্রেণীর আয়াত রয়েছে, যা আধ্যাত্মিক ও মরমীবাদী ভাব বহন করে। এছাড়া নবীকরীম (সঃ)এর বাণী ও কর্মের মাধ্যমে ও তাসাউফের সূত্রপাত ঘটে। যেমন, পবিত্র কুরআনের আয়াত সমূহ,

১. "আমি তোমার নফসের সাথে আছি, কিন্তু তুমি দেখছনা।"
(সুরা যারিয়াত)
২. "তিনি তাদেরকে ভালবাসেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসে।" (৫:৫৪)
৩. "এবং আমি (আল্লাহ) মানুষের প্রাণরগ অপেক্ষা নিকটবর্তী।" ৫০:১৬)
৪. "আল্লাহ ভূলোক, দ্যুলোক ও বিশ্বভুবনের নূর (জ্যোতি)।" (২৪:৩৫)
৫. "তিনি আদি, তিনি অন্ত, তিনি প্রকাশ্য ও গুপ্ত এবং তিনি সর্বজ্ঞাতা"(৫৭:৩)
৬. "তোমরা যেখানেই থাক তিনি (আল্লাহ) তোমাদের সাথে আছেন।" (৫৭:৪)
৭. "দ্যুলোক-ভূলোক ব্যাপী তাঁর পবিত্র সিংহাসন বিরাজমান।" (২:২৫৫)
৮. "যখন আমার বান্দারা (হে মুহাম্মদ) তোমাকে জিজ্ঞেস করবে যে, তোমার আল্লাহ কোথায়? তখন বলবে, আল্লাহ আমার নিকটেই আছেন।"(সুরা বাকারাহ)

Dhaka University Institutional Repository

৯. "আমি স্বীয় চিহ্নসমূহ জগতে ও মনুষ্য শরীরে দেখাবার জন্য প্রকাশ করেছি, উদ্দেশ্য এইযে, সত্যের অবস্থা যেন তাদের নিকট প্রকাশিত হয়।" (হা-মিম-সেজদা)

১০. "(হে, মুহাম্মদ (সঃ)) যখন তুমি শত্রুদের প্রতি ধূলি নিক্ষেপ করেছিলে, তা তুমি করনি, বরং আল্লাহই নিক্ষেপ করেছিলেন।" (সূরা আনফাল)

১১. "নিশ্চয়ই আমি তাদের নিকটবর্তী আছি । কেউ আমাকে আহবান করলে আমি সে আহবানে সাড়া দিয়ে থাকি।" (২ঃ১৮৬)

১২. "পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই । সুতরাং তোমরা যেদিকেই মুখ ফিরাওনা কেন, সেদিকেই আল্লাহর বাস্তব অস্তিত্ব বিদ্যমান। নিশ্চয়ই তিনি সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞানী।" (২ঃ১১৫)

১৩. "অতএব, তোমরা আমাকে স্মরণ কর এবং আমি তোমাদেরকে স্মরণ করি।" (২ঃ১৫২)

পবিত্র কালামে পাকে এমনি আরও বহুবিধ আয়াত রয়েছে যার মধ্যে তাওহীদের মৌলিকরূপসহ মরমীবাদী আয়াত ব্যক্ত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই সেসব তাত্ত্বিক ও মরমী ভাবপূর্ণ বাণীসমূহ মুসলিম মনমানসিকতাকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল এবং সেজন্য অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই ইসলামে সূফী দর্শনের উদ্ভব ঘটে।

পবিত্র কুরআনের পর হাদীসেও সূফী দর্শনের ভিত্তি অনুসৃত হয়। মহানবী (সঃ) এর পবিত্র বাণী ও কর্মের মধ্য দিয়েও তাসাউফের জন্ম হয়। যেমন, নবী করীম (সঃ) এর বাণীঃ-

"যখন আমার বান্দা নফল ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করে, তখন আমি তাকে বন্ধুবলে জানি । যখন আমি তাকে বন্ধু বলে জানি, তখন আমি তার কর্ণ হই যদ্বারা সে শ্রবণ করে, আমি তার চক্ষু হই যদ্বারা সে দর্শন করে, আমি তার হস্ত হই, যদ্বারা সে ধারণ করে; আমি তার পদযুগল হই, যদ্বারা সে হাটে।" (হাদীস -ই-কুদসী) [১]

"যে নিজেকে চিনেছে, সে আল্লাহকে চিনেছে"। (হাদীস)

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মানুষকে তাঁর নিজ সুরাত অনুযায়ী সৃষ্টি করেছেন"। (হাদীস)

"মুমিনের হৃদয় আল্লাহর সিংহাসন"। (হাদীস)

"যা আমি বলেছি, তা শরীআত, যা করেছি তা তরীকত, যা দেখেছি তা হাকীকত এবং যা চিনেছি ও জেনেছি তা মারিফাত"। (হাদীস)

১। হাদীস-ই-কুদসীঃ-হাদীসে কুদসী সেসব হাদীসকে বলা হয় যার মূল কথা ইলহাম বা স্বপ্নযোগে আল্লাহ্ তাআলা নবী করীম (সঃ)-কে অবহিত করেছেন। আর নবী করীম (সঃ) নিজ ভাষায় সে কথা বর্ণনা করেছেন। (মাওলানা আব্দুর রহিম, হাদীস সংকলনের ইতিহাস, পৃঃ ৩০)

Dhaka University Institutional Repository

"মারিফাত ব্যতিত কেউ হাযার বছর ইবাদত করলেও তা আল্লাহর দরবারে গৃহিত (কবুল) হবেনা।" (হাদীস)

"আসমান ও যমীন আমাকে ধারণ করতে পারেনা, কিন্তু মুমিনের হৃদয়ে আমার স্থান হয়।" (হাদীস-ই-কুদসী)

"মানুষ আমার রহস্য এবং আমি মানুষের রহস্য।" (হাদীস-ই-কুদসী)

"আমি ছিলাম গুপ্ত ভান্ডারে নিহিত এবং আমি প্রকাশ হতে ইচ্ছে করলাম, সেজন্যই আমি (আল্লাহ) এসব সৃষ্টি করলাম ও প্রকাশ করলাম।" (হাদীস-ই-কুদসী)

কুরআন ও হাদীসের উপরোক্ত বাণী দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে সূফীতত্ত্বের উৎস কুরআন ও হাদীস। পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে এবং নবী করীম (সঃ) এর বাণী, কার্যাবলী ও ইশারা ইঙ্গিতই ইসলামের মরমীদর্শন সূফীতত্ত্বের জন্ম দিয়েছে। পরবর্তীকালে এটাই সূফীদর্শনে পরিণতি লাভ করে।

মহানবী (সঃ)-এর জীবদ্দশায় কিছু লোক ছিলেন যারা পবিত্র কুরআন ও হাদীসের এসব বাণীর নিগূঢ় অর্থ অনুসন্ধানে রত ছিলেন। আবার কিছু লোক এসব বাণীর বাহ্য অর্থ নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন। "পরবর্তীকালে গূঢ় অর্থ অনুসন্ধানকারীরাই প্রণয়ন করলেন এক মরমীবাদী জীবন ধারা এবং তাদেরকে অভিহিত করা হল প্রথমে জুহ্হাদ (ধর্মপ্রাণমানুষ), এরপর উব্বাদ (খোদাভক্ত মানুষ) এবং সবশেষে 'সূফী' বলে"।১ এ মতটি পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা। কারণ, সূফী দর্শনে বিদেশী প্রভাবের আভাস লক্ষ্য করা যায়। আলোচিত প্রত্যেকটি মতই পুরোপুরি নাহলেও আংশিকভাবে সত্য। বস্তুতঃ সূফী দর্শন এমন একটি স্বাভাবিক ব্যাপার, যা বাহ্য শক্তির প্রভাবে অভ্যন্তরীণ অবস্থা ও পরিবেশে বিকাশ লাভ করে। সূফী দর্শনের উন্মেষ ও বিকাশের পূর্ণাঙ্গ বর্ণনায় এসব তথ্য ও ঘটনায় কিছুটা হলেও গুরুত্বের দাবী রাখে। কারণ, সূফী দর্শনের উদ্ভবের জন্য এসবের কোন একটিকেই সম্পূর্ণ ভাবে বা পৃথকভাবে চিহ্নিত করা যায়না। অভ্যন্তরীণ দিকে সমসাময়িক সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা এবং বাহ্যিক দিকে বর্ণিত কিছু বিদেশী প্রভাব যৌথভাবে মরমী ভাবধারা বিকাশের পক্ষে সহায়ক ছিল।

সূফী দর্শনের উৎপত্তির কারণ ঃ

ইকবালের ভাষায়, "সমকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতা, ইসলামের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের মধ্যে ধর্মীয় আলোচনা, যুক্তিবাদী ভাবধারার কারণে ধর্মীয় প্রেরণার

১। আমিনুল ইসলাম (রূপান্তর ও সম্পাদনা), প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নমনীয় ভাব, সম্পদের দ্রুত বৃদ্ধির ফলশ্রুতিতে উচ্চতর মহলের নৈতিক ও ধর্মীয় জীবনে ঔদাসীন্য, ইসলামী বুদ্ধিবাদে সংশয়াত্মক ভাবধারা, খৃষ্টান সন্ন্যাসীদের মধ্যে শান্তজীবনের অনুপস্থিতি এসবই সমষ্টিগত ভাবে কাজ করেছিল ভক্তিবাদী ভাবধারাকে এধরনের অস্থিরতার দৃশ্যপট থেকে ক্রমবর্ধমান অনুধ্যানিক জীবনের আনন্দময় শান্তিতে ঠেলে দিতে"।[১]

আল্লামা ইকবাল তাঁর 'The development of Metaphysics in Parsia' গ্রন্থে উদার মন নিয়ে সূফীদর্শনের বিকাশের পেছনের কারণ গুলি বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর গ্রন্থে অষ্টম শতাব্দীর শেষের ভাগ এবং নবম শতাব্দীর প্রথমার্ধের রাজনৈতিক ও অস্থিরতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থাসমূহ যা সূফীবাদের কুরআনিক প্রেরণা ও সম্ভাবনাকে বিকশিত করে তুলেছিল তার একটি চিত্র তুলে ধরেছেন এভাবে,

"এসময়ের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে কমবেশী রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও চাঞ্চল্য স্বাভাবিক ভাবেই মুসলিম মানসে পার্থিব জীবন সম্পর্কে নিরতিশয় উদ্বেগ ও গভীর নৈরাশ্য সৃষ্টি করেছিল। ৮ম শতাব্দীর শেষ ভাগে উমাইয়া বংশের পতনের পর ইসমাইলীয়া, বাতিনীয়া, কারামতিয়া, শী'আ, প্রভৃতি সম্প্রদায় ধর্মীয় আবরণে মূলতঃ রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য জোর প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। খলিফা হারুন -অর-রশীদের ইন্তিকালের পর তাঁর পুত্র মামুন-অর-রশীদ ও আমিনের মধ্যে রাজনৈতিক প্রাধান্য লাভের জন্য এক অশুভ আত্মঘাতী ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মামুনের রাজত্বকালে 'শহুদিয়া' দ্বন্দ্ব (Shuhudiyya controversy) রাজনৈতিক অস্থিরতাকে তীব্রতর করে তোলে। এদ্বন্দ্ব 'সাফীরিয়া' 'সামারিয়া' প্রভৃতি স্বতন্ত্র পারসিক সম্প্রদায়ের বিকাশকে ত্বরান্বিত করেছিল। এছাড়াও অন্যান্য রাজনৈতিক কলহ শান্তিপ্রিয় মুসলমানদেরকে অনিশ্চিত ও ক্ষণভঙ্গুর জীবনের ধ্যান-ধারণায় সূফীবাদের শান্তিময় জীবনে টেনে এনেছিল।

মু'তাযিলাদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁদের চিন্তাপদ্ধতির মধ্যে সংশয়াত্মক প্রবণতার (Sceptical tendencies) বীজ রোপন করেছিল। বাশার ইবনে বোর্দ ও আবু আল আলাল মারীর কবিতায় এ প্রবণতা বাণীরূপ লাভ করে। বুদ্ধিবাদের মধ্যে নিহিত এ সংশয়াত্মক প্রবণতা জ্ঞানের এক নিশ্চিত উৎস অতীন্দ্রিয় অনুভূতির প্রয়োজনীয়তা বোধে পরিণতি লাভ করেছিল। আল কুশাইরী ও হযরত আল হুজভিরী প্রমূখ কতিপয় খ্যাতনামা সূফীর লেখায় এ আধ্যাত্মিক প্রবণতা মূর্ত হয়ে উঠেছিল। এ সংশয়াত্মক প্রবণতা সূফীবাদের মধ্যে এসে আধ্যাত্মিক পরিণতি লাভ করেছিল।

১। উক্তিটি উদ্ধৃতঃ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

আল মামুনের শাসনামলে (৮১৩-৮৩৩ খৃঃ) বিভিন্ন প্রতিনিধির ধর্মীয় কোন্দল ও ঝগড়া ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রকে সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলেছিল। অনিন্দ্য সুন্দর ধর্মের জগতে নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিতে প্রকৃত ধর্ম প্রাণ ব্যক্তিবর্গ ধর্মীয় অনাসৃষ্টির উর্ধ্বে উঠে আধ্যাত্মিক জগতের প্রতি ঝুঁকে পড়েছিল। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই এসময় সূফীদের বিকাশ ঘটে।

হানাফী, শাফী, মালেকী ও হাম্বলী মাজহাবের আবেগবর্জিত পরহেজগারী আবেগধর্মী আন্তরিক শুদ্ধি ও পবিত্রতার দিকে অনিবার্যভাবে ঝুঁকে পড়েছিল।

আব্বাসীয় রাজত্বের (৭৫০-১২৫৮খৃঃ) প্রাথমিক পর্যায়ে বুদ্ধিবাদী প্রবণতার প্রসারের ফলে ধর্মীয় তেজ ও অনুশীলনে ভাটা পড়ে, অন্যদিকে জনসাধারণের হাতে বিশেষতঃ সমাজের উচ্চশ্রেণীর হাতে অতুলনীয় বিত্তবৈভব থাকায় ধর্মীয় ঔদাসীন্য ও নৈতিক অবনতি দেখা দেয়। সমাজের এই ধর্মীয় অধোঃগতি ধর্ম প্রাণ মুসলমানদের মনে ধর্মের অন্তরে আশ্রয় খুঁজতে প্রেরণা দান করে''।[১]

তৎকালীন এ দুরবস্থা ইসলামের সর্বজনীন জীবন দর্শনের অন্তরের দিকে নজর করতে কুরআনের আধ্যাত্মিক শিক্ষাকে চরম পরিণতির দিকে ঠেলে দিতে সাহায্য করেছিল। কুরআনের গূঢ়ার্থপূর্ণ আয়াতসমূহ সন্ন্যাসবাদী ও ভক্তিবাদী ভাবধারা বিকাশের পক্ষে সহায়ক ছিল এবং পরবর্তী কালে সেগুলোই অনুধ্যায়মূলক ও সর্বেশ্বরবাদীরূপ পরিগ্রহ করে। মহানবী (সঃ)-এর জীবদ্দশায় কিছু লোক ছিলেন যারা আল্লাহ ও তাঁর নবীর প্রেমে নিজেদের সপে দেন। ইসলামের আদি পর্বে সন্ন্যাসবাদী ও ভাববাদী ভাবধারা উদ্ভবের পেছনে ছিলেন এসব ব্যক্তি।

মূলতঃ ''সূফীদর্শনের বিকাশ ঘটে সমকালীন প্রয়োজন থেকে। যে মাটিতে সূফীবাদের পুষ্টি ও বিকাশ তার নিজস্ব প্রকৃতি এবং সেখানকার জনগণের মেজাজ ও মানসিকতাই ইসলামে সূফীবাদের উৎপত্তির জন্য দায়ী। তবে এর অগ্রগতির পেছনে যেসব বাহ্য প্রভাব কার্যকর ছিল সেগুলোকেও উপেক্ষা করা যায়না। সূফীদর্শনের যে বীজ কুরআন ও হাদীসের শিক্ষায় নিহিত ছিল, তা অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক প্রভাব দ্বারা সমানভাবে পরিপুষ্ট হয়''।[২]

১। Allama Iqbal, opcit, p-79.

২। আমিনুল ইসলাম (রূপান্তর ও সম্পাদনা), প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

সূফীতত্ত্বের ক্রম বিকাশের ধারাঃ-

ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থাৎ মহানবী (সঃ) -এর সময় ' সূফী ' শব্দটি প্রচলিত ছিলনা । তবে সূফী সুলভ আচরণ মহানবী (সঃ)-এর জীবনে পালিত হয়েছে। "নবী করীম (সঃ) -এর ইনতিকালের দুশত বৎসরের মধ্যে সূফীতত্ত্ব প্রচলিত হয়"। [১] সূফী শব্দটি খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কুফার জাবির বিন হাইয়ান নামক একজন রাসায়নিক পেশাধারী সাধক এবং আবু হাশিম নামক একজন সাধকের নামে সর্ব প্রথম ব্যবহৃত হয়। প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে সমগ্র ইরাকে মুসলমান সাধকদের নামের সঙ্গে সূফী শব্দ ব্যবহৃত হতে থাকে এবং পরবর্তী দুইশত বৎসরের মধ্যে সমগ্র মুসলিম জাহানের সাধকদের নামের সঙ্গে 'সূফী' শব্দ ব্যবহৃত হতে থাকে। আজ পর্যন্তও সূফী শব্দটি মুসলমান সাধকদের নামের সঙ্গে ব্যবহৃত হচ্ছে।"[২]

'সূফী' শব্দের উৎপত্তি বা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সূফীতত্ত্বেরও উদ্ভব হয়েছে বলে অনেকেই ধারণা করে থাকেন। এ ধারণা সঠিক নয়। হিজরী দ্বিতীয় শতকের শেষের দিকে যদিও মুসলিম বিশ্বে 'সূফী' শব্দটি প্রচলিত হয়ে আসছে কিন্তু তার পূর্বেও অর্থাৎ নবী করীম (সঃ) তাঁর সাহাবা, তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীনদের জীবনেও সূফীদর্শনের জীবনাচরণ প্রচলিত হয়েছে।[৩] যদিও তখন তাঁরা সূফী নামে পরিচিত ছিলেননা। "প্রথমদিকের সূফীরা পরিচিত ছিলেন 'উব্বাদ' (খোদাভক্ত মানুষ) 'যুহ্হাদ' (ধর্মপ্রাণমানুষ), মুকাররাবিন (খোদার বন্ধু), 'সাবেরীন' (ধৈর্যশীল) এবং আবরার (পূর্ণবান মানুষ) বলে"।[৪]

ইসলামের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই সূফীদর্শনের আগমন। কাজেই "সূফীদর্শন ইসলামের অপরিহার্য ও অবিচ্ছেদ্য অংগ। এটা ইসলামের মতই পুরাতন"।[৫] নবী করীম (সঃ) হতেই এর উৎপত্তি ও সূচনা। পবিত্র কুরআনের মরমী ভাবধারার আয়াত সমূহ তাঁর নিকট অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এর সূত্রপাত। পবিত্র কুরআনের আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ বহু আয়াত, নবী করীম (সঃ) -এর বহুবাণী এবং তাঁর সূফীসুলভ আচরণ ও মাঝেমাঝে ধ্যানমগ্ন, আত্মসমাহিত অবস্থায় এটাই প্রমাণিত হয়েছে, সূফী দর্শনের আবির্ভাব ইসলামের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই ঘটেছে এবং নবী করীম (সঃ) এর আদি গুরু। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেনঃ-

"সাবধান, আল্লাহ সবকিছু ব্যাপিয়া আছেন" (আলকুরআন)

"আল্লাহ মানুষের প্রাণরগ অপেক্ষা নিকটবর্তী," (৫০-১৬)

১। মোঃ সোলায়মান আলী সরকার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩।

২। আব্দুল করিম, মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, বাংলা একাডেমী,১৯৯৪ইং, পৃঃ ১৮২।

৩। মাওলানা আব্দুর রাহীম হাযারী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০।

৪। আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭২।

৫। Dr. Sayed Muzaffar Uddin Nadvi, Muslim thought and its sources, p. 79.

Dhaka University Institutional Repository

"তিনি (আল্লাহ্) আদি, তিনি অন্ত, তিনি দৃশ্য, তিনি অদৃশ্য এবং তিনি সর্বজ্ঞাতা।" (৫৩ঃ৩)

নবী করীম (সঃ) বলেছেন, "যেব্যক্তি নিজেকে চিনেছে সে ব্যক্তি তার প্রতিপালককে চিনেছে।"

" আমি ছিলাম গুপ্তধন এবং আমি আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা করলাম, তাই আমি গড়ে তুললাম এ সৃষ্টি যাতে তারা আমাকে জানতে পারে।"

"যে ব্যক্তির মধ্যে কোন প্রেম নেই সে মুমিন নয়।"

নবী করীম (সঃ) দীর্ঘ দিন হেরা পর্বতের গুহায় আরাধনা করতেন,অধিকাংশ সময় ধ্যানমগ্ন অবস্থায় আল্লাহর মুশাহাদায় রত থাকতেন এবং নামায আদায়কালে এমন তন্ময় হয়ে যেতেন যে, তখন তাঁকে চেনাই কঠিন হত।[১]

নবী করিম (সঃ)-এর সূফী-সুলভ আমল, আখলাক তাঁর সাহাবীরাও অনুসরণ করতেন। সাহাবাগণ বিশেষতঃ আহলে সুফফাগণ নবী করীম (সঃ)-এর সবচেয়ে কাছাকাছি থাকতেন এবং সদা সর্বদা তাঁর জীবনাদর্শ নিজেদের জীবনে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করতেন।

খুলাফায়ে রাশেদার চার খলিফা(৬৩২-৬৬১খৃঃ)[২] নবী করীম (সঃ) ও ইসলামের স্বার্থে সবকিছু ত্যাগ করে হযরতের কাছেই সর্বদা ছায়ার মত থাকতেন। "তাদের জীবনাদর্শ ও চলাফেরা, উঠা-বসা, ইবাদত-বন্দেগীর মধ্যে হযরতের তাকওয়াহ, পরহেজগারী, আল্লাহর প্রেম ও ভীতি এবং সূফীসুলভ অন্যান্য নিয়ম পদ্ধতি অপূর্ব ভাবে বিকাশ লাভ করেছিল"।[৩] তবে তাঁদের মধ্যে হযরত

১। নবী করীম (সঃ) কে নামাযরত অবস্থা দেখে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, "হযরত যখন নামাজে দাঁড়াতেন, তখন তাঁকে আমরা হঠাৎ করে চিনতে পারতাম না। তাঁর মুখাবয়বের মধ্যে এমন একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যেত যে, মনে হত তিনি অন্য জগতের লোক এবং পার্শ্ববর্তী লোকদের কে চেনেননা। এছাড়া তিনি যখন নামায আদায় করতেন, তখন নিকটবর্তী তাঁর শরীরের মধ্যে একটি বিস্ময়কর শব্দ শুনতেন। ডেকচিতে গোস্ত রান্না করার সময় ডগবগ করে যে শব্দ হয়, অনেকটা তদ্রুপ"। এমনি আরো অনেক হাদীস রয়েছে।

২। খুলাফায়ে রাশিদার চার খলিফা বলতে বুঝায়, হযরত আবুবকর (রাঃ),হযরত উমর (রাঃ), হযরত উসমান (রাঃ) এবং হযরত আলী (রাঃ) কে। নবী করীম (সঃ)-এর প্রথম শ্রেণীর সাহাবী ছিলেন এঁরা। নবী করীমের (সঃ) ইন্তিকালের পর তাঁরা পর্যায় ক্রমে (৬৩২-৬৬২খৃঃ) মুসলিম জাহানের খিলাফত লাভ করেন। তাঁদের খিলাফত কালছিল প্রায় ত্রিশ বৎসর। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে তাঁরা খিলাফত পরিচালনা করেন বলে তাদের শাসনকালকে 'খুলাফায়ে রাশিদুন' বা খিলাফতের সোনালী যুগ বলা হয়।

৩। ফকির আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

আবুবকর (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ)-এর সর্বোচ্চে স্থান ছিল বলে অধিকাংশ সূফীদের বিশ্বাস। হাদীসে বলা হয়েছে "আমি (নবী) জ্ঞানের সুরক্ষিত নগরী এবং আলী (রাঃ) তার দরজা" । "আলী আমার, আমি আলীর (রাঃ)"। "আল্লাহ ব্যতিত অন্য কাউকে যদি আমি বন্ধু বলে গ্রহণ করতাম, তাহলে আবু বকর (রাঃ) কে গ্রহণ করতাম।"

"জগতের সমস্ত সূফীয়া-এ কেরামই এই মহামনীষীদ্বয়ের পদবীর সিলসিলার মাধ্যমে আবির্ভূত হয়েছেন। ---------- হযরত আবুবকর (রাঃ) হতে কমপক্ষে দুটি ও হযরত আলী (রঃ) থেকে তিন শতাধিক সূফী তরীকা প্রকাশ পেয়েছে।[১] ডঃ এম, এ রহিম তাই অধ্যাপক ম্যাসিগনোঁ [Massignon] এর বরাত দিয়ে বলেছেন, "সূফীবাদ বা মরমীবাদ আন্দোলন এসেছে আদি মুসলমানদের অতিরিক্ত কঠোর সংযমের প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকার সূত্রে। এর উৎপত্তি ঘটেছে কোরআন থেকে এবং রাসুলুল্লাহ (সাঃ) -এর অভ্যাস বা আচার-আচরণ থেকে। যদিও ইসলামকে অপেক্ষাকৃত কমই কৃচ্ছ্রতাপরায়ণরূপে ধরা হয়; তথাপী মুসলমান আদি পুরুষগণের মধ্যে অনেকে ছিলেন যারা গভীর নিষ্ঠা ও সাধারণভাবে জীবন যাপন করতেন। তাদের নিকট ইসলাম ছিল আত্মার সংযম কেবল বাহ্যিক কতকগুলো ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের সমষ্টি মাত্র"।[২]

"হযরত ওসমান (রাঃ)-এর শাহাদাত বরণ করার পর মুসলিম জাহানের রাজনৈতিক আকাশে নেমে আসে কালমেঘের ঘনঘটা। এর পরিণতিতে দুঃখজনভাবে শাহাদাত বরণ করতে হয় হযরত আলী (রাঃ)কে। তাঁর শাহাদাতের মধ্যদিয়ে বিধ্বস্ত হয় আদি ও সত্য খেলাফত। তার ফলে যে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হয় , মদীনায় হত্যা ও লুণ্ঠণের পর যে ভীতির সঞ্চার হয় আর দামেস্কের অধিকতর অসচ্চরিত্র শাসনকর্তাদের আমলে যে বর্বরতা সমাজ জীবনে নেমে আসে, তা বহু নিষ্ঠাবান মুসলমানকে একান্তে ইবাদত বন্দেগীতে মশগুল হতে বাধ্য করে। তাদের অধিকাংশই ছিলেন তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীন। ক্রমান্বয়ে এ গোষ্ঠী বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং সমাজেও তাঁরা অপরিসীম শ্রদ্ধার আসন দখল করেন। তাঁরা ছিলেন দুনিয়ার সকল প্রকার লোভ লালসার উর্ধ্বে। সকলক্ষেত্রেই তাঁরা ছিলেন আল্লাহর অনুগ্রহ ও সাহায্য প্রার্থী। এসব আধ্যাত্মিক পুরুষগণ বৈদেশিক কোন চিন্তাধারার সাথে পরিচিত ছিলেন না, এবং পরিচিত হওয়ার

১। ফকির আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৬।

২। ডঃ এম,এ,রহিম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২ ইং, পৃঃ ৮২।

Dhaka University Institutional Repository

সুযোগও লাভ করেননি। তারা বৈদেশিক প্রভাবে প্রভাবাম্বিত ও ছিলেন না । তাঁরা ছিলেন আল্লাহর ইবাদতে নিবেদিত প্রাণ। এখান থেকে ইসলামের অতীন্দ্রিয়বাদ স্বাভাবিক পথে অগ্রসর হতে থাকে। সর্ব বিষয়ে তাঁরা যে মূলতঃ সূফী ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে তাদের 'সূফী' বলা হত কিনা তা বড় কথা নয়"।[১]

আগেই বলা হয়েছে যে 'সূফী' শব্দটি উদ্ভব হয়েছিল হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে এবং সর্বসাধারণে তা প্রচলিত হয়। ইসলামী জগতে সাধারণত প্রথম সূফী হিসাবে মনে করা হয় ইমাম হাসান আল বসরী (রঃ) কে। আর সূফী দর্শনের দ্বিতীয় স্তর শুরু হয় এখান থেকেই। "তিনি মদীনায় জন্ম গ্রহণ করেন এবং বসরায় জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি ছিলেন হযরত আলী (রাঃ)-এর মুরীদ ও প্রধান খলিফা। তাঁর মা ছিলেন মহানবী (সাঃ)-এর বিবি উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমার দাসী। ইনি উম্মে সালমা (রাঃ) ও হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর স্তন্য পান করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। তিনি ১৩০ জন সাহাবার সাহচর্য লাভ করেছিলেন"।[২] তিনি একাধারে দার্শনিক, ইমাম ও মরমী (Mystic) সাধু পুরুষ ছিলেন। তিনি হিজরী ১১০/ ৭২০ খৃষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।

কেউ কেউ আবার (জামি ও তাঁর অনুসারীগণ) আবুল হাশিমকে প্রথম সূফী বলে অভিহিত করেছেন। আব্দুল রাহীম হাযারী ও এমতের সমর্থক। তিনি বলেছেন, "মুসলিম বিশ্বে যিনি সর্বপ্রথম সূফী নামে অভিহিত হন তিনি হলেন সূফী আবুল হাশিম। তিনিই সর্বাগ্রে তাসাউফ বা সূফীবাদের উপর একখানি পুস্তিকা রচনা করেন। ১৬২ হিযরীতে তাঁর মৃত্যু হয়। সম্ভবত তিনি নিরহংকার জনিত পশমী পোশাক পরিধান করতেন বলেই লোকেরা তাঁকে সূফী নামে অভিহিত করেছিলেন।"[৩]

Sayed Abdul Hai- বলেন, "The name ' sufi' was first applied to Abu-Hashim (d./62 A.H), an Arab of kufa. He flowed the simplicity of the prophets life and was very deeply influenced by the conceptions of sin, transitoriness of the Earthly life and the day of judgment,"[৪]

১। Sayed Abdul Hai, opit, p.137-40.

২। ফকির আব্দুল রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৯।

৩। মাওলানা আব্দুর রাহীম হাযারী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬।

৪। Sayed Abdul Hai, opcit, p.137.

Dhaka University Institutional Repository

কেউ কেউ আবার জাবির বিন হাইয়ানকে (মৃঃ ১৬৮) প্রথম সূফী বলে মনে করেন। অবশ্য যাকেই প্রথম 'সূফী' বলা হউক না কেন, হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ ভাগে সূফী নামটি সাধারণের মধ্যে বিস্তার লাভ করে। এ সময় কুরআনের শিক্ষায় গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে একদল মুসলমান পরহেজগারী ও তাক্‌ওয়ার মধ্যে নিজেদের মশগুল রাখেন তারা হলেন, ইবরাহীম ইবন আদহাম (মৃত্যুঃ ১৬১ হিজরী), দাউদ আততায়ী (মৃত্যুঃ ১৬৫ হিজরী), ফাজিল ইবন ইয়াজ (মৃত্যুঃ ১৮৮ হিজরী),মারুফ আল-কারখী (মৃত্যুঃ ২০০ হিজরী),হারিস আল মুসাহিবী (মৃত্যুঃ ২৪৪ হিজরী),আব্দুল ওয়াহেদ বিন যায়েদ এবং হযরত রাবিয়া আল বসরী (মৃত্যু ১৮৫ হিজরী) প্রমূখ। অধ্যাপক গীব বলেন, "প্রাথমিক পর্যায়ে সূফীদর্শন আল্লাহর ভীতি ও শেষ বিচার দিনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু কালক্রমে এধারণার পরিবর্তন আসে এবং প্রেমের মধ্যদিয়ে প্রিয়তম আল্লাহর সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের ভিত্তিরূপে পরিগণিত হয়। বসরায় সাধ্বী রমণী রাবেয়া ছিলেন এর প্রথম প্রসিদ্ধ পথিকৃতা। তিনি বলতেন, "আল্লাহর প্রেমে আমাকে এতবেশী নিমগ্ন করেছে যে, আর কারো কোন প্রেম বা ঘৃণাই আমার অন্তরে নেই"।[১]

'সূফী' নামটি এ সময়ের পূর্বে ছিল না, তবে তা ইসলামের মধ্যেই নিহিত ছিল। নবী করীম (সঃ), সাহাবাগণ ও তাবেয়ীনরা মনেপ্রাণে ও কার্যাবলীতে ছিলেন আল্লাহতে উৎসর্গীত প্রাণ (সূফী)। তাদের 'সূফী' বলা হতনা। সাহাবী ও তাবেয়ীন নামে তারা সমধিক পরিচিত ও সম্মানিত হতেন।"[২]

সূফীদর্শনের বির্বতনের আরেক পর্যায় শুরু হয় যুন্নুন মিসরীর সঙ্গে (মৃত্যু ২৪৫ হিজরী)। তিনি সূফীতত্ত্বকে মতবাদ হিসাবে নিয়ন্ত্রণ ও রূপদান করেন। তিনি ছিলেন গভীর পান্ডিত্যের অধিকারী একজন সূফী ও দার্শনিক। তাঁর মতে, আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান লাভের উপায় হল তন্ময়তা (হাল)। তিনি বলেন, "সেই ব্যক্তি খোদাকে সম্যকরূপে জানেন যিনি খোদার মধ্যে সর্বাধিক সমাহিত"। তিনি হাল ও মাকাম সম্পর্কীয় মতবাদ প্রবর্তন করেন। তারপর জুনায়দ বাগদাদী (মৃত্যু ২৯৭ হিজরী) তার মতবাদ লিপিবদ্ধ ও সুসংহত করেন এবং তাঁর শিষ্য শিবলী (মৃত্যু ৩৩৪ হিজরী) এর আরও পরিবর্ধন করেন। "এ সকল সূফী আল্লাহর সাথে আত্মার মিলনের উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করলেও তারা সর্বখোদাবাদী (Pantheism) ছিলেন না"।[৩]

১। H.A. Gibb, Mohamedanism, p. 103.

২। Sayed Abdul Hai, opit, p.138.

৩। Sayed Abdul Hai, opit, p.138.

Dhaka University Institutional Repository

এরপর হযরত বায়জীদ বিস্তামী (মৃত্যু ২৭১ হিঃ) ও হুসাইন বিন মনসুর হাল্লাজ (মৃত্যু ৩৯৮ হিঃ) সূফীদর্শনকে সর্বখোদাবাদের দিকে নিয়ে যান। বায়জীদ বিস্তামী সূফী দর্শনে 'ফানা' (আত্মবিনাশন) মতবাদ প্রবর্তিত করেন। তাঁর মতে, আল্লাহতে আত্মসমাহিত হওয়াই নৈয়ামিক পরিণতি। তিনি বলেন, ''যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ নিজেকে আল্লাহর মধ্যে সমাহিত না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে ঐশীজ্ঞান লাভ করতে পারবেনা''। তিনি তাসাউফ ও নিজের হাল সম্পর্কিত কতিপয় পুস্তক রচনা করেন।

সূফীদের মতে, আত্মবিনাশন ও আত্মবিলোপ (Self annihilation) সর্বখোদাবাদে পরিণতি লাভ করে। মনসুর হাল্লাজের মতে, মানুষ মূলতঃ ঐশী। কেননা, আল্লাহ মানুষকে তার নিজের প্রতিবিম্বে সৃষ্টি করেছেন। তাই আল্লাহর সত্তায় অধিষ্ঠিত 'বাকা' অবস্থায় মনসুর হাল্লাজ বলেছিলেন,"আমিই পরম সত্য" (আনাল হক)। বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনসুরের এ ঘোষণা ছিল মানুষকে আল্লাহর মর্যাদা দানের শামিল। এজন্যই হাল্লাজকে কঠোর শাস্তি দেয়া হয়েছিল তাঁর ধর্ম বিরুদ্ধ মতের জন্য। মনসুর হাল্লাজের ভুল ছিল তাঁর মুহূর্তিক অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করা। সূফীদর্শন মাঝে মাঝে প্রাধান্য লাভ করলেও এটা সর্বজনীন হয়ে উঠতে পারেনি। কারণ, হাকীকতের এ স্তর লাভ করা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না, আর হাকীকতের গুপ্ত রহস্য সর্বসাধারণ্যে প্রকাশ করা বৈধ নয়।

আবু নসর আল-সারাজ (মৃত্যু ৩৭৮ হিঃ) 'কিতাবুল লুমা' তে এবং আল কুশাইরী (মৃত্যু ৪৩৭ হিঃ) 'রিসালাতে' সূফীদর্শনগুলি লিখে গেছেন। তাঁদের ভাষায় সাধারণ মুসলমানেরা সূফী দর্শনকে সুনজরে দেখতে পারেনি। রক্ষণশীল মুসলমানেরা সূফীদেরকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখেছে। কুশাইরীর ভাষায় জানা যায় যে, ''বাগদাদের রুয়াইম (মৃত্যু ৩০৩ হিঃ) বলেছেন,সকল লোকই ধর্মের বাইরের রূপ আকড়ে থাকে। কিন্তু এ দলটি (সূফী) আকড়ে আছে আসল হাকীকতকে নিয়ে। সকল মানুষ ধর্মীয় আইনের বাইরের দিক মেনে চলাকেই তাদের কর্তব্য মনে করে। সূফীরা ধর্মপরায়ণতা ও নিরবচ্ছিন্ন আন্তরিকতা অর্জনের চেষ্টাকে তাঁদের কর্তব্য মনে করে"।[১]

ইসলামে সূফীদর্শনের মধ্যে যে সুসম্বদ্ধ, নিয়মকার্য ও সৌন্দর্য দেখা যায় তার জন্য কৃতিত্বের দাবীদার ইমাম গাযালী। পৃথিবীর কর্মক্ষেত্রে তিনি ঠিক সময়েই আবির্ভূত

১। ইসলাম ও আধুনিক চিন্তাধারা, পৃঃ ২০৭।

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছিলেন। "তাঁর প্রচেষ্টায় সূফী দর্শনের ও রক্ষণশীল মতবাদের সমন্বয় ঘটে এবং সূফীদর্শন সাধারণ্যে স্বীকৃতি লাভ করে"।[১] তাঁর সমসাময়িক সূফীরা হলেন আল কুশাইরী (মৃত্যু ১০৪৫ খৃঃ) ; আব্দুল কাদির জীঁলানী (মৃত্যুঃ ১১৬৬ খৃঃ) ; শিহাবুদ্দীন সোহ্‌রাওয়ার্দী আলমাকতুল (মৃত্যুঃ ৯২২ খৃঃ), ফরীদ উদ্দীন আত্তার (মৃত্যুঃ ১২২৯ খৃঃ) প্রমুখ।

ফরীদ উদ্দীন আত্তার 'মুনকাতুত তায়ির' নামক কাব্য গ্রন্থে রূপকের ভেতর দিয়ে মানবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন পথে সাতটি উপত্যকার কথা উল্লেখ করেছেন। যথা- সন্ধান, জ্ঞান, প্রেম, নির্লিপ্ততা, একত্ব, বিস্ময় ও আত্মবিলোপন। তাই জালালুদ্দীন রুমী বলেছেন, "আত্তার তাঁর আত্মসাধনার সাতটি রাজ্য পরিভ্রমণ করেছেন। আর আমি এখনও আঁধার গলিতে ঘুরে মরছি।" তিনি আরো বলেছেন, "আত্তার সূফী শিক্ষার প্রাণ কেন্দ্র এবং সানারী তাঁর দুটি চোখ।"[২]

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে স্পেন ও পারস্যে সূফী দর্শনের ক্রমবিকাশের ধারা পরিলক্ষিত হয়। স্পেনের আরবী ভাষা-ভাষী সর্বশ্রেষ্ঠ সূফীদের মধ্যে মহিউদ্দিন ইবনুল আরাবী (মৃত্যু ৬৩৮ হিঃ) প্রথম সূফী। তিনি সর্বখোদাবাদকে সুশৃংখল ধারায় প্রকাশ করেন। হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে এ মতবাদের প্রবণতা দেখা দিলেও ইবনুল আরাবীই পূর্ণাঙ্গ সর্বখোদাবাদী মতবাদের জন্মদান করেন। এ দর্শনের বুনিয়াদী নীতি হল খোদা সকল সত্তার ঐক্য।

তাঁর মতবাদ 'ওয়াহদাতুল ওজুদ' নামে পরিচিত। জালালউদ্দিন রুমীসহ তাঁর পরবর্তী সকল সূফীই কোন না কোন ভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। পারস্যে জালাল উদ্দীন রুমী (১২০২-১২৭০ খৃঃ) সূফী দর্শনের সুবর্ণ যুগের পত্তন করেন----।

পরবর্তী সূফী শায়খ ফখরুদ্দীন ইরাকী, (মৃত্যু-১২৮৯ খৃঃ) ; সাদুদ্দীন মুহাম্মদ শাবিস্তারী (মৃত্যুঃ ১২৫০-১৩২০ খৃঃ), আলকাশানী (মৃত্যুঃ ৭৩০ হিঃ); আব্দুল করীম জীলী (মৃত্যুঃ ৮১১হিঃ) ; নূরুদ্দীন আব্দুর রহমান জামী (মৃত্যুঃ ১৪৯২ খৃঃ); শেখ সা'দী (১১৭৫-১২৯২ খৃঃ); শায়খ সদরুদ্দীন কোনাবী (মৃত্যুঃ ১২৭৩খৃঃ); ইবনুল ফরীদ প্রমূখ সূফীদের উপর ইবনুল আরাবীর প্রভাব কমবেশী আছে"।[৩]

১। অধ্যাপক মুহাম্মদ দরবেশ আলী খান অনুদিত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৬৯।

২। মাওলানা আব্দুর রাহীম হাযারী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭।

৩। Sayed Abdul Hai, opit, p.140; ফকির আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৮-৬২।

Dhaka University Institutional Repository

"এ যুগে ভারতীয় উপমহাদেশে সূফীদের মধ্যে খাজা মঈনউদ্দিন চিশতী (মৃত্যুঃ ১২৩৪ খৃঃ) ছিলেন অগ্রগণ্য। সে যুগের অন্যান্য সূফী হলেন বখতিয়ার কাকী (মৃত্যুঃ ১২৩৬ খৃঃ) ; ফরিদউদ্দীন শাকরগঞ্জ (মৃত্যুঃ ১২৫৬ খৃঃ) ও নিজামুদ্দীন আওলিয়া (মৃত্যুঃ ১২৩৪ খৃঃ)।

ইবনুল আরাবীর 'ওয়াজুদীয়া' দৃষ্টিকোণ (Standpoint] কে চ্যালেঞ্জ করেন রুকনুদ্দীন আলাউদ্দৌলা। তাঁর মতে, "বাহ্য জগত ঐশীসত্তা থেকে নিঃসৃত নয়; এটা তার প্রতিচ্ছবি মাত্র"। এ গোষ্ঠী 'শুহুদিয়া' গোষ্ঠী নামে পরিচিত। বাহাউদ্দিন (মৃত্যুঃ ১৩৮৮ খৃঃ) এ গোষ্ঠীর অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখেন এবং সপ্তদশ শতাব্দী থেকে 'শুহুদিয়া' চিন্তাধারা বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। ভারতীয় উপমহাদেশে প্রখ্যাত সূফী সাধক শেখ আহমদ সারহিন্দী (মৃত্যুঃ ১৬২৪) যিনি মোজাদ্দেদ আলফেসানী নামে খ্যাত এ চিন্তাধারাকে পুনরুজ্জীবিত করেন।"১ যার প্রবাহমান ধারা আজও বিদ্যমান।

১। Sayed Abdul Hai, opit, p.140-41.

Dhaka University Institutional Repository

সূফী তত্ত্বের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি

মানবাত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন সাধন সূফী সাধনার লক্ষ্য। আর পরম সত্তাকে জানার ও চেনার আকাংখা মানুষের চিরন্তন। মানুষ তার মনের আকাংখা চরিতার্থ করার মানসে তার হৃদয়ের মধ্যে সেই পরম প্রিয়তমের সন্ধান লাভ করে যার সাথে নিবিড় যোগসূত্রে সে মিলিত হয়। তার এই পরম সত্তা আল্লাহ প্রেমময়। তিনিই একমাত্র সত্তা, জগত তাঁর পরম সুন্দরের বহিঃ প্রকাশ। জগতের যাবতীয় বস্তু আল্লাহ হতে নিঃসৃত। সমস্ত বস্তুতে তাঁর মহিমা বিচ্ছুরিত। এজন্য আল্লাহ পরম দয়ালু। তিনি সকল প্রেম ও সমস্ত জ্ঞানের আঁধার। তাঁর সাথে মানুষের সম্পর্ক প্রেমের। প্রেমের মাধ্যমে মানুষ তার অন্তরের অন্তঃস্থলে তার প্রেমাস্পদের উপলব্ধি করে, যিনি তাঁর মাহবুবের অন্তরের আহবানে সাড়া দিয়ে থাকেন এবং তিনি মানুষের হৃদয়ের আবেদন চরিতার্থ করতে সক্ষম। সূফীদর্শন আল্লাহ ও মানুষের মধ্যকার এ শূন্যতা পূর্ণ করে দেয়।

এজন্য সূফীরা আল্লাহর ধ্যান ও প্রেমের মধ্যে এমন মগ্ন হয়ে পড়েন যে পার্থিব বস্তুর প্রতি তাঁদের সকল মোহ বিলুপ্ত হয়। তারা ধ্যানের মাধ্যমে এক আকস্মিক আবেগ মুহূর্তে পরম সত্য ও সুন্দরকে নিবিড় ভাবে উপলব্ধি করেন। আল্লাহর জন্য সূফী যে প্রেমের আবেগ আনন্দ অনুভব করেন, তার সঙ্গে মিশে থাকে বিরহের অর্থাৎ স্বতন্ত্র বা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার বেদনা। কেননা, মানুষ কোথেকে এসেছে, কেন এসেছে আবার কোথায় তার শেষ আবাস স্থল-এ সব প্রশ্ন মানবমনে স্বাভাবিকভাবে দেখা দেয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ পাকের সুস্পষ্ট ঘোষণা হল, "হে মানুষ, আমি তোমাদেরকে একটা মাত্র পুরুষ (আদম) ও একটি মাত্র স্ত্রী (হাওয়া) (আঃ) থেকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তোমাদেরকে বিভিন্ন দল ও উপদলে বিভক্ত করেছি যেন তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার"।[১] "আমি জ্বীন ও মানব জাতিকে শুধু আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।"[২] "আমরা আল্লাহর নিকট থেকে নিঃসৃত হয়েছি এবং তারই কাছে প্রত্যাগমন করব"।[৩]

এছাড়া হাদীসে কুদসীতে বলা হয়েছে, "আমি (আল্লাহ্) গুপ্তভান্ডারে নিহিত ছিলাম। নিজকে প্রকাশ করার জন্য আমি স্বেচ্ছায় সব কিছু সৃষ্টি করলাম এবং প্রকাশ হলাম।"

১। আল কুরআন, সূরা-৪৯, আয়াত ১৩।

২। আল কুরআন, সূরা-৫১, আয়াত ৫৬।

৩। আল কুরআন, সূরা- ,আয়াত- ।

Dhaka University Institutional Repository

সব কিছুর মূলেই যে আল্লাহ্ এবং এ বিশ্ব জগত যে তাঁরই প্রকাশ, সেকথাই মূর্ত হয়ে উঠে উল্লেখিত আয়াতগুলোতে। সূফী দর্শনের মূল সুরই হল পরম সত্তা আল্লাহ্। একমাত্র আল্লাহই এক ও অদ্বিতীয় সত্তা। যা কিছু দৃশ্যমান ও প্রকাশমান, সবই তাঁর বিকশিত রূপমাত্র। এ বিশ্ব সংসার সেই পরম সুন্দরের প্রকাশ। সবকিছু তাঁর থেকেই নিঃসৃত হয়েছে এবং জগতের সকল কিছুতে তাঁরই মহিমা, তাঁরই গুণ ও সৌন্দর্য বিচ্ছুরিত। এ মহা সত্যটি যখন একজন মানুষের গভীর উপলব্ধিতে আসে তখন তিনি তাঁর প্রাণের কোণে এক অজানা শূন্যতা উপলব্ধি করেন। সে শূন্যতা তাঁকে নিয়ে যায় গভীরে, যেখানে সে দেখতে পায় কেবল ব্যথা ও হাহাকার। জীবনের প্রতিটি হিয়ায় হিয়ায়, জগতের সকল সৃষ্টির মাঝে তিনি দেখতে পান এক পরম সত্তার সৌন্দর্য ও মহিমা। সেই সৌন্দর্য ও মহিমাই তাঁকে জানিয়ে দেয় অনন্তের সাথে তার আত্মীয়তা রয়েছে। এ জন্য পরমাত্মার সাথে মিলনের জন্য মানবাত্মা ব্যাকুল হয়ে উঠে। এয়াকুব আলী চৌধুরী এমনই এক ভাব ফুটিয়ে তুলে ধরেছেন তাঁর লেখায়। ''আমার প্রাণের কোণে এ শূন্যতা কেন? মর্মতলে তপ্ত ব্যথা পুঞ্জায়িত কেন? আমার হৃদয়ে সকল আনন্দ স্তব্ধ করিয়া রহিয়া রহিয়া এ হাহাকার কেন? আমি জানিনা,আমি বুঝি না, একি? কিসের ব্যথা? কেন এ ব্যর্থতাবোধ? কর্মের মধ্যে ডুবিয়া থাকি, হাসির মধ্যে মঝিয়া যাই, কিন্তু শূন্যতা ত দূর হয়না; হৃদয়ের কোন নিভৃত কোণ শূন্য হইয়া পড়িয়া আছে, কিছুতেই তাহা পূর্ণ হয়না। কে আমাকে থাকিয়া থাকিয়া ডাকিয়া যায়। সুখের সৌধ ভেদিয়া কাহার স্বর শূনা যায়। কাহার মহাধ্বনী সকল ধ্বনী স্তব্ধ করিয়া প্রাণের মধ্যে বাজিয়া উঠে। আমার মন প্রাণ উদাস আকুল চঞ্চল হইয়া পড়ে।

প্রভাতের মৃদু মলয়ে আমার মর্মতলে কে স্নেহ স্পর্শ বুলাইয়া দেয়? উষার সুরভি শ্বাসে জীবনের আহবান আনে? আকাশ বাতাস, নিত্য নবীন, জীবন গানে পূর্ণ করিয়া জীবন ধারা নবীন বেগে বহাইয়া দেয়? আমি অবাক হইয়া ভাবি, আমি ব্যাকুল হইয়া দেখি, আধারে এ আলোর মেলা মরণ-জীবনের খেলা। আমি মহিমা দেখিয়া চাহিয়া রই। আমার নয়ন ভরিয়া সলিল আসে, হৃদয় আমার নিবেদনের বেগে কম্পিত হয়।

সায়াহ্নে কার শান্ত শোভায় হৃদয় মন ভরিয়া যায়? কে শ্রমের মাঝে শান্তি আনে? ভীষন্নতায় মধু বহায়? কে আমাকে হিল্লোলে হিল্লোলে ডাকিয়া যায়? বৃক্ষের পত্রে পত্রে, সোনার ধানে দুলিয়া দুলিয়া খেলিয়া যায়? আমি ছুটিয়া যাই, আবেগে বাহু বাড়াইয়া আমার সমস্ত প্রাণ উদাস আকুল চঞ্চল হইয়া উঠে। থামাও, তোমার কলগান থামাইয়া দাও। তোমার আনন্দ মেলা মিটাইয়া দাও, সন্ধার মৌন অন্ধকারে বিশ্বের বিরাট ব্যথা আমার মনের সঙ্গে মিলাইয়া লই। দিনান্তের ম্লান আভায়, এছায়া ও মলিনতায়, এই মৌন স্বচ্ছ অন্ধকার বিশ্বে বিষন্ন মুখে কিসের

Dhaka University Institutional Repository

ব্যথা মুর্ত হইয়া প্রকাশ পায়। আমার সমস্ত আয়োজন ব্যর্থ হইয়া পড়ে। হৃদয় হাহাকার করে উঠে, মনে হয় কিছুই হয় নাই, কিছুই বলা হয় নাই। মিথ্যা আমার দিনের আলো মিথ্যা, আমার কর্ম কোলাহল মিথ্যা, আমার উল্লাস আবেগ মিথ্যা কোথায় আমার পরমাত্মীয় পড়িয়া আছে, জীবনের সর্বস্ব কোথায় ফেলিয়া আসিয়াছি, তাহারই সন্ধান চাই, তাহারই মিলন চাই, নাহিলে সবই বৃথা ও ব্যর্থতাময়, আমার সবই শূন্য ও অন্ধকার।

আমি মৌনতার মাঝে মজিতে চাই, আমি অন্ধকারে ডুবিতে চাই। অসীমে আমি মিশিতে চাই, গভীর নিশার অন্ধকারে অসীমের কি প্রকাশ দেখি। বিরাটের কি মহাআভাস বিশ্ব ভরিয়া ভাসিয়া আসে। অন্ধকারে দিগন্ত নাই, বিশ্বব্যোমের বিভেদ নাই, আকোশের অন্ত নাই, শূন্যের সীমা নাই। অসীমের সহিত সীমার সমাহারে এই শূন্যতাময় স্তব্ধ গভীর মহাকালে এমন মৌন মুগ্ধ রুদ্ধ হইয়া বিশ্ব কাহার ধারণা করে। ধ্বনীর পর ধ্বনী রুদ্ধ করিয়া বিশ্বময় কাহার চরনোপান্তে উত্থিত হয়? আমি ধ্যানের মধ্যে ডুবিয়া যাইব, আমি ধ্বনীর সঙ্গে মিশিয়া যাইব, আমি অনন্তে উত্থিত হইব।

আমার অনন্তের সহিত আত্মীয়তা আছে, মধ্যদিনের রুদ্রালোকে এই কথাই আমি স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাই। সংসার রূপ রসের পসরা মেলিয়া প্রকাশ পায়, শব্দ ছন্দের বিচিত্র মন্ত্র পড়িয়া মায়ালোক রচনা করে; এই চঞ্চল জনস্রোত, অপার কর্মস্রোত, কর্মের কোলাহল, শব্দের কলকল, অবিরাম ঝন ঝন, দ্বন্দ্ব ও উপার্জন, ইহারই মধ্যে মন উদাস ও বিষন্ন হইয়া উঠে, বিশ্ব ব্যাপিয়া ক্লান্তি ও শূন্যতা আশ্চর্য রূপে প্রকাশ পায়, আমি মানুষের নয়নে বদনে শ্রান্তির মিলন ছায়া দেখি, রৌদ্র ঝলসিত আ কাশতলে শ্মশানের তপ্ত নিঃশ্বাস দেখি, আমার প্রাণ শিহরিয়া উঠে, বিপুল ব্যথায় হৃদয় আমার বিচলিত হয়। শূন্য-এ অসীম শূন্য সমস্তই মায়া ও ছায়া। মিথ্যা এ আয়োজন, মিথ্যার প্রলোভন। ছায়ায় মায়ায় পড়িয়া আছি। একা আমি নিতান্তই একা, আমার চতুস্পার্শে সিন্ধু সলিল অনন্তে উচ্ছ্বসিত হইতেছে, তাহার মাঝে বিন্দুর মত আমি পড়িয়া আছি। অনন্তে আমার যাত্রা ভুলিয়া কোথায় বসিয়া আছি, শব্দহীন কোন সীমাহীন অমৃত লোকে আমার ঘর বিঘোরে কোথায় ভুলিয়া আছি।

দাও,দাও, শব্দ ছন্দ স্তব্ধ করিয়া দাও, সীমার রেখা অন্ধকারে মিশাইয়া দাও, আমি নামাজ পড়িয়া অনন্তের সন্ধান লই। রূপের অতীতে, ধ্বনীর অতীতে, সীমাহীন, গভীর শান্তিলোকে উত্তীর্ণ হই, প্রাণের অনন্ত তৃষ্ণা মিটাইয়া লই" ।[১]

১। এয়াকুব আলী চৌধুরী, নামাজ, বাংলা সাহিত্য (সংকলন) গদ্য ও পদ্য, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড, ঢাকা, আগস্ট, ১৯৯৩ ইং।

Dhaka University Institutional Repository

যাহোক সূফী দর্শনে জীবনের মূল উদ্দেশ্য হল ব্যক্তি আত্মাকে সার্বিক আত্মায় মিশিয়ে ফেলা। আত্মসত্তার চেতনার বিলোপ এবং ঐশীসত্তায় অব্যাহত অস্তিত্ব সূফীদের লক্ষ্য। কিন্তু প্রশ্ন জাগে এই আত্মা কি, কি তার স্বরূপ ? আত্মার স্বরূপ প্রসঙ্গে তিনটি প্রধান মতবাদ রয়েছে। যেমন "প্রথম মতটি অনুসারে আত্মা এমন একটি আধ্যাত্মিক বাস্তবসত্তা, যা দেহকে প্রাণবন্ত করে এবং যা দেহ বিনাশের সঙ্গে বিনষ্ট হয়না। দেহের মধ্যে আত্মার প্রবেশ এর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নের সাথে এক বড় অন্তরায় এবং এজন্যই তা সব সময় নিজকে এ বন্ধন থেকে মুক্ত করতে চায়।

দ্বিতীয় মত অনুসারে, আত্মা এমন একটি ধারণা, যাকে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতায় উপস্থাপিত করা যায় না। এটি এমন একটি জিনিস যা অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয়। তবে নৈতিক ও ধর্মীয় জীবনের ঘটনাবলী এ ধরনের ধারণাকে আবশ্যক করে তুলে।

তৃতীয় মতটি, এ ধরনের কোন আধ্যাত্মিক আত্মসত্তা এর অস্তিত্ব ও বাস্তবতায় বিশ্বাস করেনা, বরং আত্মাকে জটিল মস্তিষ্ক প্রক্রিয়ার একটি উপবস্তু (Epiphenomenon), উপসৃষ্টি (by-Product) বলে মনে করে।"১

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,"আমি আমার রূহকে তার মধ্যে (আদমের কলবে) ফুকেঁ দিয়েছি।"২

"(হে নবী) বলুন - রূহ আমার প্রভূর আদেশ স্বরূপ " ।৩

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, রূহ এক যাত নিঃসৃত অবিনশ্বর শক্তি, এক রহস্যময় গুপ্তধন, যা মানুষকে আল্লাহ পাক দান করেছেন।

আবার একথাও বলা হয় যে, "দেহ একটি মাংস পিন্ড এবং এই পিন্ডের মধ্যেই রয়েছে কলব বা মন। মনে রয়েছে কল্পনা (প্রজ্ঞা) এবং সেই কল্পনায়ই আবার রয়েছে চিদাত্মা। চিদাত্মায় রয়েছে গুপ্তজ্ঞান এবং এই গুপ্ত জ্ঞানেই রয়েছে আত্মসত্তা বা আমি (আনা)। এই আমি বা অহং নিম্নতম পর্যায়ের প্রাতিভাস (Appearance)

১। প্রাগুক্ত,আমিনুল ইসলাম (রূপান্তর ও সম্পাদনায়), পৃঃ ১০২।

২। আল কুরআন, সূরা-১৫, আয়াত ২৯।

৩। আল কুরআন, সূরা-১৭, আয়াত-৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

নয়। এটি আত্মসচেতন বাস্তব সত্তারই একটি চেতনা"।[১] এখানে বিষয়ী (Subject) এবং বিষয় (Object) এর কোনো দ্বৈততা নেই। এ 'আমি'র পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটেছে পূর্ণমানুষে অর্থাৎ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) -এর মধ্যে। এ আত্মার কতগুলো পর্যায় রয়েছে যেমনঃ

রূহ-ই-নামা (উত্তীদাত্মা)

রূহ-ই-মুতাহাররিকা (প্রেষনাত্মা)

রূহ-ই- মাতিকা (বৌদ্ধিকাত্মা)

এবং রূহ-ই-কুদসিয়া (পবিত্রাত্মা)

শেষোক্ত রূহ-ই-কুদসিয়াকেই বর্ণনা করা হয়েছে প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত (ওহী) চিদাত্মা বলে। অতীতে সেকি ছিল এবং ভবিষ্যতে কি হবে, তা সে জানে এবং তা আল্লাহর ক্রিয়াপরতারই ফল।

আত্মা হল আল্লাহর নিকট থেকে আগত একটি শক্তি বিশেষ । আল্লাহর জ্ঞানে আত্মার কিছু আকার বিদ্যমান আছে এবং এ ধরনের একটি আকারের সঙ্গে একটি গুণের সংযোগই আত্মা। এসব আকারের উপর আল্লাহ তাঁর গুণাবলী প্রদান করেন এবং তখনই সেসব গুণ বাস্তব রূপ লাভ করে। আল্লাহ যখন তাঁর গুণাবলীর সঙ্গে আকার সমূহকে যুক্ত করেন তখনই সৃষ্টি হয় বস্তু। আল্লাহর জ্ঞানে যেসব আকার রয়েছে সেগুলো চিরন্তন এবং এগুলোই সকল অস্তিত্বের কারণ। দেহের সঙ্গে আত্মার সংযোগের ফলেই সৃষ্ট হয় মন (কলব) ও আত্মসত্তা (নফস) । বস্তুজগত এ দুয়ের সংযোগের ফল"।[২]

মানুষের মধ্যে বিদ্যমান 'রূহ' ও 'নফস' নামে যে দুটি সূক্ষ্ম শক্তি বিদ্যমান রয়েছে উভয়কেই আত্মা বলা হয়, 'নফস' নিম্ন স্তরের আত্মা (প্রবৃত্তি) এবং রূহ হল উর্ধ্ব স্তরের প্রাণপ্রবাহ। 'রূহ' গুপ্ত, 'নফস' প্রকাশ্য। 'রূহ' হচ্ছে হাকীকী শক্তিসম্পন্ন, পক্ষান্তরে 'নফস' হচ্ছে মালিকী শক্তির প্রকাশ।

কলব (মন) আত্মার দিকে এবং নফস তার প্রবণতা অনুযায়ী উচ্চতর কিংবা নিম্নতর প্রবৃত্তির দিকে অগ্রসর হয়। নফসের কাজ হল বুঝা ও উপলব্ধি করা। এ নফসের আবার কয়েকটি পর্যায় রয়েছে। যেমন- নফস-এ-আম্মারা অর্থাৎ এমন নফস যা অন্যায় ও অশুভপ্রবন। এটাই মানুষকে অমঙ্গলের দিকে পরিচালিত করে এবং পূর্ণতার পথ থেকে সরিয়ে রাখে। মানুষের মধ্যকার নফস-এ আম্মারার গুণ, কাম, ক্রোধ, মদ, মোহ প্রভৃতি রিপুকে দূর্বল করে একের পর এক স্তর অতিক্রম

১। আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮২।

২। আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

করে উচ্চমার্গে উত্তরণ লাভ করাই হল সূফীদের লক্ষ্য। দ্বিতীয়টিকে বলা হয় নফস-ই-রাহমানী বা উচ্চতর আত্মা, যা নিম্নতম প্রবণতা ও প্রবৃত্তি সমূহকেও দমনের মাধ্যমে পূর্ণতা অর্জনের চেষ্টা করে। তৃতীয়টিকে বলা হয়, নফ্স-ই-মূলহিমা (প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত আত্মা), যা নিজের উপর নিজে কল্যাণ বর্ষন করে। এবং চতুর্থটিকে বলা হয় নফ্স-ই-মুতমাঈন্না অর্থাৎ সেই নফস, যা আল্লাহতে স্থায়ী অস্তিত্ব লাভ করেছে। এটাই নফ্সের সর্বোচ্চ বিশুদ্ধ স্তর এবং এখানে আত্মা আল্লাহর সঙ্গে যুক্ত হয় এবং তাঁকে ছাড়া থাকতে পারেনা। তাই পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেছেন, "আমি তোমাদের মাঝেই আছি, তোমরা কি দেখতে পাওনা?"১ হযরত আলী (রাঃ) তাই বলেছেন, "যে তার স্বীয় নফ্সকে চিনতে পেরেছে সে তার প্রতিপালক আল্লাহকে চিনতে পেরেছে।"২

এতএব, আত্মা জ্ঞানই মানুষকে পারমার্থিক জ্ঞানের দিকে পরিচালিত করে। তাই নফ্সকে বাদ দিতে বলা হয়নি, বরং নফ্সকে চিনে ইবাদত করার কথা বলা হয়েছে।

সূফী পথ পরিক্রমাঃ-

সূফীগণ আত্মার উন্নয়ন ও বিকাশে সবচেয়ে বেশী জোর দিয়ে থাকেন। তাঁদের মতে আত্মার উৎপত্তি ঘটেছে একস্বর্গীয় আদি নিবাস থেকে। ভাগ্যচক্রে তা সেখান থেকে অধঃপতিত হয়েছে । সুতরাং আদি পবিত্রতা পুনরুদ্ধার করতে হলে তাকে অবশ্যই বেশ কয়েকটি পর্ব অতিক্রম করতে হবে। আল্লাহর দর্শন লাভ ও তাঁর মধ্যে লীন হয়ে যাওয়াই সূফী জীবনের পরম লক্ষ্য। কিন্তু এ লক্ষ্যে উপনীত হতে হলে তাকে অনেক ত্যাগ-তিতীক্ষা, কষ্ট-ক্লেশ অতিক্রম করতে হয় বিনয়াবনত চিত্তে। সূফী দর্শনের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় তাকে শরী'আত, তরীকত, মারিফাত, হাকীকত ও ওয়াহ্দানিয়াত এ পাঁচটি মঞ্জিল অতিক্রম করতে হয়। এ সকল মঞ্জিল অতিক্রমের মধ্যদিয়ে সূফীর আত্মার বিকাশ সাধিত হয় এবং সূফী জীবনের পরম চাওয়াকে পেয়ে থাকেন।

১। আল কুরআন, সূরা-৫১, আয়াত ২১।

২। "মান-আরাফা নাফসাহু-ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু", ইহা হযরত আলী (রাঃ)এর উক্তি। কিন্তু অনেকেই ইহাকে হাদীস বলেও উল্লেখ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

(১) <u>শরী'আতঃ</u> শরী'আত সূফীর যাত্রাপথের প্রথম স্তর। কতিপয় নির্দিষ্ট আচার অনুষ্ঠানের কঠোর ও বিশ্বস্ত অনুশীলন যেমনঃ কালিমা, নামায,রোযা, হজ্জ্ব ও যাকাত নিয়ে শরী'আত গঠিত। শরী'আত শব্দটি 'শার'আ' শব্দ থেকে উদ্ভূত। "শার'আ' শব্দের আভিধানিক অর্থ সহজ সরল পথ, প্রধান সড়ক, জনপথ প্রভৃতি। আর 'শরী'আত' শব্দটি 'প্রকান্ড নদী প্রবাহিত, জলস্রোত', বৃহত্তম জনসড়ক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।"[১]

ইসলামের পারিভাষিক অর্থে "কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা এবং কিয়াস দ্বারা গৃহীত ইসলামের জীবন বিধান বা জীবন ব্যবস্থার নামই শরী'আত"। আল্লাহ প্রদত্ত যেসব বিধি বিধান নবী করীম (সঃ)-এর মাধ্যমে মানবজাতির প্রতি নির্দেশ ও নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে, একেই ইসলামের পরিভাষায় শরী'আত বলা হয়। ইসলামের এই নির্দিষ্ট জীবন বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করা প্রত্যেক মুসলিম নরনারীর জন্যই ফরয বা অবশ্য কর্তব্য। কেননা, আল্লাহপাক ঘোষণা করেছেন, "ইসলামের জীবন ব্যবস্থা ব্যতীত অন্য কোন জীবন ব্যবস্থাই আল্লাহর নিকট গৃহীত নয়"।[২]

আধ্যাত্মিক জীবনের রূপায়ণের জন্য শরী'আতের বিধি বিধানের অনুশীলনের মাধ্যমে সূফীকে ভবিষ্যতের কঠোর ব্রত পালনের জন্য প্রস্তুতি নিতে হয়। ঈমান, নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত শরী'আতের এই পাঁচটি বিধান পালন করা শরী'আতপন্থীদের জন্য অবশ্য কর্তব্য। তবে যাকাত ও হজ্জ ধনীর জন্য অপরিহার্য, সকলের জন্য নয়। শরী'আতের নির্দেশাবলীকে দুভাগে ভাগ করা হয়। (ক) হক্কুল্লাহ, (খ) হক্কুলইবাদ।

(ক) <u>হক্কুল্লাহ ঃ</u> অর্থাৎ আল্লাহর হক বা প্রাপ্য। আল্লাহর প্রাপ্য সম্পর্কীয় দায়িত্ব পালনের নাম হক্কুল্লাহ। যেমন, কলেমা, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি আল্লাহর প্রাপ্য।

ঈমান শব্দের আভিধানিক অর্থ বিশ্বাস করা অর্থাৎ পরজগতের অদৃশ্য বিষয়সমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। এর মূল তত্ত্ব নিহিত রয়েছে কালেমা তায়্যিবার ভেতর। যেমন- "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" অর্থাৎ "এক আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় কোন উপাস্য নেই, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর রাসুল।" এ পবিত্র বাক্যের মর্মানুযায়ী ইহলোক ও পরলোকে বিশ্বাস স্থাপন করাকে বুঝায়। এই পবিত্র বাক্য স্বীকার করলে শরী'আতের বিধান অনুযায়ী সে মুসলমান বলে

১। মাওলানা আব্দুর রহীম হাযারী, সূফীতত্ত্বের আত্মকথা, নবরাগ প্রকাশনী, ডেমরা, ঢাকা, ১৯৮৮ ইং, পৃঃ ২০৪।

২। আল কুরআন, সূরা-৩, আয়াত-৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

বিবেচিত হবে। ঈমান অর্থ সাধারণভাবে সাতটি বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন। যেমন ,"আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস, আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস, ফেরেস্তাদের প্রতি বিশ্বাস, শেষ বিচার দিবসের প্রতি বিশ্বাস, তকদীরের ভাল-মন্দ উভয়ের প্রতি বিশ্বাস এবং মৃত্যুর পর পুনর্জীবনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন" ।[১] এছাড়াও প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ যথানিয়মে আদায় করা, রমজান মাসে রোযা রাখা, যাকাত প্রদান করা এবং বিত্তবানদের পক্ষে জীবনে অন্ততঃ একবার হজ্জ পালন করা ।২

"ঈমানের পরিপূর্ণতা লাভ হয় তিনটি শর্তে, যথা- (ক) কালেমায়ে তায়্যিবাহ্‌র প্রতি মৌখিক সাক্ষ্যদান বা স্বীকারোক্তি করা; (খ) এর মৌখিক স্বীকারোক্তি অনুযায়ী আন্তরিকভাবেও বিশ্বাস করা এবং (গ) বিশ্বাস অনুযায়ী তা কার্যে পরিণত করাও ঈমানের অন্তর্ভূক্ত। এই অর্থেই নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত প্রভৃতির কার্য সম্পাদন করা ফরয, বিশ্বাস অনুযায়ী তা কার্যে পরিণত করাই পরিপূর্ণ ঈমান" ।[৩]

(খ) হক্কুল ইবাদ ঃ অর্থ বান্দার হক বা প্রাপ্য। হক্কুল ইবাদ বলতে বুঝায় জাগতিক দায়িত্ববোধের প্রতি আত্মসচেতনতাবোধ। অর্থাৎ শরী'আতে আল্লাহ ব্যতিত সৃষ্টির অন্যান্য সকলের উপর যে অধিকার, কর্তব্য ও দায়িত্ব বর্তমান তাকে হক্কুল ইবাদ বলা হয়। যেমন- পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, আন্তর্জাতিক সমূদয় সমস্যা সমাধানের নামই হক্কুল ইবাদ। মানুষের ব্যক্তিগত অধিকার, সামাজিক অধিকার, রাষ্ট্রীয় অধিকার এমনকি অন্যান্য সম্পদ ও প্রাণীকুলের অধিকার সংরক্ষণ, এদের ভোগ ব্যবহার, বিধি-নিষেধ সম্পর্কিত দায়-দায়িত্ব পালন হক্কুল ইবাদের অন্তর্ভূক্ত।

১। সাধারণভাবে যে সাতটি বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করাকে ঈমান বলা হয় তাকে এক কথায় 'ঈমান-ই-মুফাসসাল' বলা হয়। যেমন্, "আমানতু বিল্লাহি, ওয়া মালায়িকাতিহি, ওয়াকুতুবিহি, ওয়ারাসুলিহি, ওয়াল-ইয়াওমিল আখিরি, ওয়াল কাদরি ওখায়রিহি ওয়া শাররিহি মিনাল্লাহি তায়ালা ওয়াল বা'ছি বা'দাল মাউত।"

২। ইসলাম কতগুলো মৌলনীতি ও আচার অনুষ্ঠানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এগুলোর মধ্যে কালিমা, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। যেমন মহানবী (সঃ) বলেছেন- "পাঁচটি মৌলিক বিষয়ের উপর ইসলামের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। এই বলে সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ব্যতিত অন্য কোন উপাস্য নেই; মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর রাসূল" নামায আদায় করা, রমযান মাসে রোযা পালন করা, বার্ষিক উদ্ধৃত আয় হতে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে আল্লাহর পথে যাকাত প্রদান করা এবং হজ্জ পালন করা"। এগুলো আল্লাহর হক। আল্লাহর হক পরিহার করা মহাপাপ। এ পাপ ক্ষমা করা না করা সম্পূর্ণ আল্লাহর এখতিয়ারাধীন। তিনি ইচ্ছা করলে ক্ষমাও করতে পারেন আবার ক্ষমা নাও করতে পারেন।

৩। মাওলানা আব্দুর রাহীম দ্বয়াযী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০৮।

Dhaka University Institutional Repository

শরী'আতের আলোকে দৈনন্দিন কার্যাবলীকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন- (১) আইনসঙ্গত (মাশরু) এবং (২) আইনবিরোধী (গায়রে মাশরু)। আইনসঙ্গত কার্যাবলী- (১) ফরয, (২) ওয়াজিব, (৩) সুন্নাত, (৪) মুস্তাহাব, (৫) নফল এবং (৬) মুবাহ। আইনবিরোধী কার্যাবলী দু'ভাগে বিভক্ত- (১) হারাম, (২) মাকরূহ।

(১) ফরয ঃ এর অর্থ অবশ্য পালনীয়। এটা আল্লাহর আদেশ। তা প্রতিটি মুসলমানকে অবশ্যই পালন করতে হবে। এর অস্বীকারকারী কাফির বলে গণ্য হবে এবং কঠিন শাস্তি ভোগ করবে। পাঁচ ওয়াক্ত নামায, রমযান মাসের রোযা, ধনীর জন্য যাকাত ও হজ্জ ফরয। ফরয দু'ভাগে বিভক্ত- (১) ফরযে আইন, যা সবার জন্য অবশ্য পালনীয়, (২) ফরযে কিফায়া- যা সমাজের তরফ থেকে কতিপয় লোক আদায় করলে চলে। কিন্তু তা কেউ পালন না করলে সকলেই তার জন্য দায়ী ও শাস্তি পাবে। যেমন, জানাযার নামায, তাবলীগ।

(২) ওয়াজিব ঃ গুরুত্বের দিক দিয়ে ফরযের পরেই ওয়াজিব অবশ্য পালনীয়। ওয়াজিব পরিত্যাগকারী কবীরাহ গুনাহগার। যেমন- দুই ঈদের নামায, পরিবারের ভরণ-পোষণ।

(৩) সুন্নাত ঃ ওয়াজিবের পরই সুন্নাতের স্থান। নবী (সঃ) নিজ জীবনে যা পালন করেছেন, যা করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং যা অনুমোদন করেছেন তা-ই- সুন্নাত-ই-রাসূলুল্লাহ নামে পরিচিত। সুন্নাত দু'প্রকার- যেমন, (ক) সুন্নাতে মুয়াক্কাদা- নবী (সঃ) যা নিয়মিত ভাবে করেছেন তাই সুন্নাতে মুয়াক্কাদা নামে পরিচিত। যেমন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সুন্নাত নামায, তারাবিহ্‌র বিশ রাকআত নামায।

(খ) সুন্নাতে গায়রে মুয়াক্কাদাঃ- মহানবী (সাঃ) মাঝে মাঝে যা করেছেন, মাঝে মাঝে করেননি তা সুন্নাতে গায়রে মুয়াক্কাদা নামে পরিচিত।

(৪) মুস্তাহাবঃ যে কাজ নবী করীম (সঃ) নিজে করেছেন অন্যকে তা পালনে বাধ্য করেননি তা-ই মুস্তাহাব। মুস্তাহাব পালনে পূণ্য আছে, পরিত্যাগে কোন পাপ নেই।

(৫) নফল ঃ ঐচ্ছিক ইবাদতকে নফল বলা হয়েছে। নফল ইবাদতে সওয়াব আছে কিন্তু পরিত্যাগে দোষ নেই।

(৬) মুবাহ ঃ শরীআত যে সকল কাজকে অনুমোদন করেনি কিংবা নিষেধও করেনি এরূপ কাজকে মুস্তাহাব বলা হয়। এতে পাপ বা পূণ্য কিছুই নেই।

Dhaka University Institutional Repository

আইন বিরোধী কার্যাবলীঃ

(১) হারাম ঃ শরী'আত সুস্পষ্টভাবে যে কার্যাবলীকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছে, তা হারাম। হারাম কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য পবিত্র কুরআন সোচ্চার কণ্ঠে আহবান জানিয়েছে। হারাম কাজ আল্লাহ্‌র নিকট নিন্দনীয় এবং কঠিনতম শাস্তি পাবার যোগ্য। নর হত্যা, ব্যভিচার, সুদ গ্রহণ, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা প্রভৃতি হারাম।

(২) মাকরূহ ঃ শরী'আত যা অনুমোদন করেনি সেগুলো মাকরূহ বলে পরিচিত। এটা করলে পাপ নাকরলে পূণ্য। মাকরূহ দু'প্রকার মাকরূহ তাহরীমী যা হারামের কাছাকাছি এবং মাকরূহ তানজীহী যা করলে সগীরাহ গুনাহ হয়।

ইসলামী শরী'আতের যাবতীয় বিধি নিষেধ বিষয়াদির নির্বাচন পদ্ধতিকে বলা হয় ফিক্‌হ শাস্ত্র। ফিক্‌হ শাস্ত্রের রায় বা বিচার বিশ্লেষণের উৎসমূল কুরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াস ও ইজতিহাদ বা স্বনির্ভর ব্যক্তি গবেষণা। ইসলামের ফিক্‌হ শাস্ত্রবিদগণ নিজ নিজ ইজতিহাদ দ্বারা চার প্রকার ঐক্যমতে পৌঁছেছেন। যেমন, হানাফী [১], শাফী, [২] মালিকী [৩] এবং হাম্বলী" ।[৪]

১। হানাফী মাযহাবঃ ইমাম হযরত আবু হানিফা নোমান বিন সাবিত (রঃ) (৬৯৯-৭৬৭ খৃঃ) এ মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি কুফায় জন্ম গ্রহণ করেন এবং বাগদাদে ইন্তিকাল করেন। এ মাযহাব সর্বাপেক্ষা যুক্তিসিদ্ধ, সুসঙ্গত ও বিচারের কষ্টিপাথরে যাচাইকৃত। তিনি কুরআন, কিয়াসকে তাঁর মাযহাবে সর্বাপেক্ষা বেশী গুরুত্ব দান করেন। এজন্য এ মাযহাব সর্বাপেক্ষা ও সর্বাধিক জনপ্রিয়।

২। শাফী মাজহাবঃ হযরত আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইদ্রিস শাফেয়ী (রঃ) (৭৬৭-৮১৯ খৃঃ) ছিলেন এ মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা । তিনি ফিলিস্তিনে জন্মগ্রহণ করেন এবং মিসরে মাযহাব প্রচার করেন। তিনি হযরত মালিক বিন আনাস (রঃ)-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এ মাযহাব মূলতঃ হাদীস ভিত্তিক।

৩। মালিকী মাযহাবঃ এ মাযহাব প্রতিষ্ঠা করেন ইমাম মালিক বিন আনাস (রঃ) (৭১২-৭৯৫ খৃঃ) । তিনি মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং মদীনাতেই ইন্তিকাল করেন। তিনি হাদীস ও সামাজিক প্রথার মাধ্যমে তাঁর মাযহাব প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি 'কিতাবুলমুয়াত্তা' নামে একটি হাদীস গ্রন্থ সংকলন করেন- যা মুসলিম আইনের প্রাচীনতম নির্ভর যোগ্য হাদীস গ্রন্থ।

৪। হাম্বলী মাযহাবঃ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রঃ) (৭০০-৮৫৫ খৃঃ) এ মাযহাব প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন ইমাম শাফেয়ীর (রঃ) শিষ্য। তিনি ছিলেন হাদীসের গোঁড়া সমর্থক। তিনি কুরআন ও হাদীসের আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

ফিক্‌হ শাস্ত্রবিদগণ তাদের মীমাংসিত বিষয় গুলোকে তিন শ্রেণীতে বিন্যস্ত করেছেন। "(ক) ইবাদত, এটা কেবল আল্লাহর হক বা প্রাপ্য বিষয়াদি। যাকে ফিক্‌হ শাস্ত্রের ভাষায় হক্কুল্লাহ নামে অভিহিত করা হয়েছে। (খ) মুয়ামালাত মু'আশিরাত, এটা জাগতিক লেনদেন, কাজ কারবার, আচার-আচরণ ও সামাজিক বন্ধনকে বুঝায়।(গ) উকূবাত, এটা মানব জীবনের ন্যায় নীতি, বিধি বিধান, আইন কানুন, বিচার, ব্যবস্থা, প্রতিকার প্রতিশোধ মূলক ব্যবস্থাকে বুঝায়"।[১]

অতএব দেখা যায় যে মহান আল্লাহ নবী করীম (সঃ)-এর মাধ্যমে বিশ্ব মানবের সঠিক পথ পরিক্রমার যে নির্দেশ দান করেছেন তাই শরী'আত নামে পরিচিত। মানুষের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ সাধন করাই শরী'আতের লক্ষ্য। শরী'আতের বিধি বিধান পালনের মধ্যদিয়ে সূফী তাঁর প্রবৃত্তিসমূহকে নিয়ন্ত্রিত করেন, দেহকে আত্মার অধীনে আনেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ পাকের ঘোষণা-"আর যে ব্যক্তি তাঁর সন্দর্শন কামনা করে সে যেন এই এক ও অদ্বিতীয় প্রভূর অর্চনায় আর কাউকে শরীক না করে"।[২]

"আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার আত্মা কানে কানে যা বলে তা আমি জ্ঞাত আছি, তার কাঁধের শিরা অপেক্ষাও আমি তার নিকটবর্তী"।[৩]

"তুমি কি উপলব্ধি করছনা যে আকাশ এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে, আল্লাহ তাঁর সম্বন্ধে জ্ঞাত? নির্জনে তিন ব্যক্তি বাক্যালাপ করেনা, আল্লাহ চতুর্থজন, পাঁচ জনও করেনা, তিনি ষষ্ট জন, তার বেশী কিংবা কমও করেনা। কারণ, সর্বত্রই তিনি তাঁদের সঙ্গী"। [৪]

"হেবিশ্বাসী গণ, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য কর, আর তোমাদের চালক ও নেতাদের ।"[৫]

১। মাওলানা আব্দুর রাহীম হাযারী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১০।

২। আল কুরআন, সূরা-১৮, আয়াত ১১০।

৩। আল কুরআন, সূরা-৫০, আয়াত ১৫।

৪। আল কুরআন, সূরা-৫৮, আয়াত ৮।

৫। আল কুরআন, সূরা-৪, আয়াত ৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

(খ) **তরীকতঃ** শরী'আতের বিধান অনুযায়ী সূফীর পথ পরিক্রমণ বা পরিভ্রমণকে তরীকত বলে। তরীকত সূফী সাধনার দ্বিতীয় স্তর। এ স্তরে সাধককে বিশেষ নিয়ম কানুনের মধ্য দিয়ে চলতে হয়। বাহ্যিকভাবে শরী'আতের ইবাদতের বিধান সমূহ অনুশীলন করার পর তা বিশেষ কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ ও আধ্যাত্মিক আলোক দ্বারা সুসম্পন্ন করার প্রচেষ্টা করা হয় তরীকতের মাধ্যমে।[১] 'তরীকত' শব্দটি 'তরীক' শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। তরীক শব্দের আভিধানিক অর্থ পথ বা পথচলা। আর তরীকত' অর্থ পথচলার নিয়মকানুন। শরী'আত থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার পর তরীকতের যে পথ ধরে মারিফাত, হাকীকত ও ওয়াহ্‌দানিয়াতের লক্ষ্য বিন্দুতে পৌঁছা যায়, তাকেই তরীকত বলা হয়। শরী'আত থেকে মারিফাতে উত্তীর্ণ হতে হলে যে পথ অনুসরণ করতে হয়, সেই অনুসৃত পথের নামই তরীকত।[২]

খোদায়ী বিধান বা পথ ধরে একত্ববাদের দিকে অগ্রসর হওয়াই তরীকত। তরীকত সূফীর কর্মক্রিয়া বা সাধনার সাথে সম্পৃক্ত। যেমন নবী করীম (সঃ) বলেছেন, "আত্তারিকাতু আফওয়ালিহী।" অর্থাৎ আমি যা করেছি তাই তরীকত"। নবী করীম (সঃ) -এর কর্মকেই তাহলে তরীকত রূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে"।[৩] সূফীদর্শনে 'তরীকত' শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেন, "আমি তোমাদের জন্য একটি শরীয়াত বা জীবন বিধান ও অন্যটি মিনহাজ বা খাস পথ প্রদান করেছি।"[৪] মিনহাজ শব্দটিই 'তরীকত' সম্পর্কিত বিশেষ পথ বা পথ পরিভ্রমণের নির্দেশক। 'মিনহাজ' শব্দ তরীকত' হাকীকত, মারিফাত ও ওয়াহদানিয়াতের সম্মিলিত রূপ।

"শরী'আতপন্থী যখন শরী'আতের যাবতীয় অনুশাসন মেনে চলতে বাধ্য হন এবং শরী'আতের নির্দেশাবলী জীবনে বাস্তবায়িত হয়ে উঠে। তৎসঙ্গে শরী'আতের উদ্দেশ্যাবলীও যদি জীবনে প্রতিফলিত হয়ে উঠে তখনই তার জন্য শরী'আতের শিক্ষা থেকে তরীকতে দীক্ষা নেবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। শরী'আত থেকে তরীকতে ব্রত হবার বা দীক্ষা নেবার সাধনাকেই বলা হয় বেলায়াতে খাসসা। বেলায়তে খাসসার প্রথম ধাপই হল তরীকতের শিক্ষা।"[৫] তরীকতের স্তরে এসে সূফীকে পীর বা শায়খের নিকট হতে আত্মিক নির্দেশ বা তাওয়াজ্জুহ গ্রহণ করতে হয়। এসব শর্ত পালনের পর পীর তাকে সূফী সিলিসিলা বা শৃংখলার অন্তর্ভূক্ত করেন। তখন তাকে বিনা বিতর্কে, বিনা দ্বিধায় পীরের নির্দেশ মেনে চলতে হয়। একে বলা হয়, ফানা ফীশ্ শায়খ বা শায়খের মধ্যে আত্মবিলোপ।

১। ফকির আব্দুর রশিদ, সূফীদর্শন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০ ইং, পৃঃ ১৪৮।
২। মাওলানা আব্দুর রাহীম হাযারী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১০।
৩। ফকির আব্দুর রশিদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৮।
৪। আল কুরআন, সূরা-৫, আয়াত ৪৮।
৫। মাওলানা আব্দুর রাহীম হাযারী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০৫।

Dhaka University Institutional Repository

পীরের দেয়া শর্ত পালনে সক্ষম মুরীদকেই পীর সাহেব তরীকতের গোপন রহস্যভেদ সম্পর্কে অবহিত করতে থাকেন এবং তরীকতে উত্তীর্ণ প্রার্থীকে তিনি খিলাফত দান করে থাকেন। যার ফলে ভক্তের অন্তরে ঐশীপ্রেমের উদ্রেগ হতে থাকে এবং পর্যায়ক্রমে তরীকতের উচ্চমার্গে পৌছা যায়। তরীকত আলমে মালাকুতের অন্তর্ভূক্ত। 'আলমে মালাকুত' বলা হয় খোদায়ী জগত, ফেরেস্তা জগত এবং আত্ম জগতকে। এটা অশরীরী আত্মজগত। এ আত্মজগতে প্রবেশ করতে হলে মানুষের দৈহিক স্বভাব পরিহার করে আত্মজগতের স্বভাব ও প্রভাব দ্বারা স্বভাবিত ও প্রভাবিত হতে হয়। এজন্যই আলমে মালাকুতে প্রবেশ করতে হলে মানব চরিত্রের কতকগুলো মন্দ স্বভাব পরিহার করতে হয় এবং তদস্থলে ভাল গুণদ্বারা বিভুষিত হতে হয়। এরই নাম তরীকত সাধনা। পরিবর্জনীয় মন্দস্বভাব গুলো হল, "কাম, ক্রোধ, মিথ্যা, হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ-লালসা, আত্মঅহংকার, আত্মগৌরব, পরনিন্দা, পরস্ত্রীকাতরতা, জাগতিক ধন-সম্পদ, ঐশ্বর্য্য, বিলাসিতা, ভালবাসা, কৃপণতা, লোক দেখানো উপাসনা, নিষিদ্ধ কার্যকলাপ, ভোগবিলাস, ব্যক্তি স্বার্থে উদ্বুদ্ধ হওয়া ও প্রাধান্য দেয়া, পরস্বার্থে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা, প্রতারণা, পণ্যদ্রব্যে ভেজাল মেশানো, ওজনে কম দেয়া, ওজনে বেশী নেয়া, অস্বাভাবিক মুনাফার আশায় পণ্যদ্রব্য গুদামজাতকরণ, মিথ্যা দালালী, রাহাজানী, ছিনতাই, নারীধর্ষণ, নারীঅপহরণ, নরহত্যা, বালক-বালিকা অপহরণ, লাওয়াতাত, ব্যভিচার, মদ্যপান প্রভৃতি যাবতীয় সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্মবিরোধী কার্যকলাপ চিরতরে পরিহার করা তরীকাতপন্থীদের জন্য অবশ্য কর্তব্য"।[১]

তরীকত সাধনায় নিম্নবর্ণিত সৎগুণাবলী অর্জন করতে হয়। যথা, "আত্মসংযম, ধৈর্য্যধারণ, কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ, পরলৌকিক ভয়ভীতি বা আল্লাহ ভীতি, সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রতি আত্মতুষ্টি প্রকাশ, বৈরাগ্য মনোভাব নিয়ে উদাসীন অবস্থায় জাগতিক জীবন যাপন করা এবং আল্লাহ ও পরজগতের প্রতি মনসংযোগ স্থাপন করা, প্রতিকাজে আল্লাহ নির্ভর হয়ে চলা, দারিদ্রকে ভাল জানা এবং ঐশ্বর্য্য কে ঘৃণা করা ও মন্দ জানা, আল্লাহর একত্ববাদে আত্মবিশ্বাস স্থাপন এবং আল্লাহর দাসত্বে আত্মসমর্পণ করা, মনের বিশুদ্ধতা বজায় রাখা, সর্বকষ্টে অনাবিল হৃদয়ের পরিচয় দেয়া, আল্লাহর গভীরতম প্রেমে আবদ্ধ হওয়া এবং তাঁর দর্শন লাভের বাসনায় অধীর ও অস্থির অবস্থায় জীবন যাপন করা, নির্জনে আল্লাহর ধ্যান-ধারণায় তন্ময় থাকা,অবৈধ কাজকর্ম থেকে বিরত থাকা। নিরর্থক কাজকর্ম ও কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা, স্বল্পে তুষ্ট থাকা, কুরআন হাদীসের বার্তা অনুযায়ী অদৃশ্য বিষয়ে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় স্থাপন করা, সর্বক্ষণ আল্লাহর স্মরণে নিমগ্ন থাকা, সত্যের উপর দৃঢ়তা অবলম্বন এবং যাহিরী ও বাতিনী জ্ঞানার্জনে লিপ্ত থাকা,

---

১। মাওলানা আব্দুর রাহীম হাযারী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১৩-১৪।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহর দাসত্বে লিপ্ত থাকার মন-মানসিকতা সৃষ্টি করা, আপন স্বার্থ বিলিয়ে দিয়ে পরস্বার্থে উদ্বুদ্ধ ও তৎপর হওয়া, আল্লাহ পাকের দর্শন লাভের বাসনায় এবং পরম সত্য ও সত্তার বাস্তব জ্ঞান লাভের আশায় আত্মবিভোর থাকা, শরী'আতের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকা, নিষিদ্ধ পানাহার ও ভোগ বিলাস পরিহার করে চলা, মিথ্যা ও প্রতারণা বর্জন করা, প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে চলা, কম কথা, কম খাওয়া, কম ঘুমে অভ্যস্ত হওয়া।" ১

এসব নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের উপর নির্ভর করছে আত্মিক বা আধ্যাত্মিক উন্নতি। আত্মকর্ম সাধনের উপরই নির্ভর করছে তরীকতের সফলতা এবং সৎগুণাবলী অর্জনের উপরই নির্ভর করছে 'আলমে মালাকুতে' প্রবেশ করার ক্ষমতা। শরী'আতে নামাযের তেরটি আরকান ও আহকামের ন্যায় তরীকতেও মাশায়িখগণ তেরটি জিনিসের উপর ফরযের ন্যায় জোর দিয়ে থাকেন। যেমন, তরীকতের সাতটি আরকান, (১) আল্লাহকে জানার মত সময়োপযোগী জ্ঞান অর্জন করতে হবে,(২) দুনিয়ার লোভ লালসা ত্যাগ করতে হবে, (৩) দুঃখ দৈন্যে ধৈর্য ধারণ করা, (৪) আল্লাহর নিয়ামতের শুকর, (৫) হৃদয়ে আল্লাহর ভয় রাখা, (৬) আল্লাহর স্মরণে সর্বক্ষণ তন্ময় থাকা এবং (৭) মুরাকাবার মাধ্যমে স্রষ্টা ও সৃষ্টির ধ্যান-ধারনায় তন্ময় থাকা। তরিকতের ছয় আহকাম, (১) আল্লাহর মারিফাত লাভ বা তৎসম্পর্কীয় পরিত্রাণ লাভ, (২) দানশীলতা বা বদান্যতা প্রদর্শন, (৩) সত্যবাদী হওয়া, (৪) তকদীরের উপর অটল ঈমান, (৫) আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীলতা এবং (৬) পাশব প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম বা জিহাদ। এছাড়াও কম কথা, কম ঘুম ও কম খাবারে অভ্যস্ত হওয়াও অত্যাবশ্যক। নির্জনবাসও প্রয়োজন।

নৈতিক চরিত্রের উন্নতি সাধনের মাধ্যমে আত্মিক পবিত্রতা অর্জন করাই তরীকতের মুখ্য উদ্দেশ্য। মানব দেহে বিজড়িত কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি রিপুগুলো নির্মূল করাই তরীকতের উদ্দেশ্য। অতএব, যে মানবাত্মা জাগতিক প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে আত্মপ্রভাবে প্রভাবান্বিত হতে পারে এরূপ মানবাত্মাই আত্মজগতে প্রবেশ করতে সক্ষম । এ অর্থেই তরীকত সাধনায় রয়েছে আত্মোন্নতির শর্তাবলী ও নিয়ম পদ্ধতি।

(৩) **মা'রিফাতঃ** আল্লাহর পরিচিতি জ্ঞান তথা আল্লাহর পরিচয় জানাকে মা'রিফাত বলে। সূফী সাধনার তৃতীয় স্তর মা'রিফাত। 'মা'রিফাত' শব্দটি উরফুন শব্দ থেকে এসেছে । আর 'উরফুন' শব্দের আভিধানিক অর্থ-চেনা জানা, কোন

১। ফকির আব্দুর রশিদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫০-৫১; মাওলানা আব্দুর রাহীম হাযারী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১৪।

Dhaka University Institutional Repository

বিষয় সম্পর্কে পরিজ্ঞাত হওয়া ও পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করা, কোন কিছুর প্রকৃতি ও সত্তা সম্পর্কে অবগত হওয়া, পরিচয় লাভ করা, কোন কিছুর সম্যক জ্ঞান লাভ করা ইত্যাদি। 'মা'রিফাত' শব্দের পারিভাষিক অর্থ "জানাশুনা ও নিজের অভিজ্ঞতা দ্বারা যে বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ হয়, তাকে 'মা'রিফাত' বলা হয়।

তাসাউফ শাস্ত্রমতে 'মা'রিফাত' শব্দের বিশদব্যাখ্যা হল, বিশ্ব সৃষ্টির পরমসত্তা মহান আল্লাহ ও তাঁর সুবিশাল সৃষ্টি জগত এবং আপন সত্তাকে জানার নামই মা'রিফাত। নিজ ও নিরাঞ্জনকে জানার নামই মা'রিফাত। যেমন, "নবী করীম (সঃ) বলেছেন, মান আরাফা নাফ্সাহু ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু। "যে তার নিজকে জানতে পেরেছে, সে তার নিরাঞ্জনকে জানতে পেরেছে।" সুতরাং "কোন বিষয়বস্তু সম্পর্কে পরিজ্ঞাত হওয়া অথবা লক্ষ্য বস্তুর লব্ধ জ্ঞানকেই বলা হয় মা'রিফাত"।[১] অন্যকথায়, "যারা মানব প্রকৃতির স্বজ্ঞিক (Intuitive) দিকটির ওপর জোর দেন এবং মানুষকে অনুধ্যানমূলক জীবন যাপনের পরামর্শ দেন। এ এমন জীবন যার মাধ্যমে স্বর্গীয়প্রেম ইবাদতকারীর আত্মায় প্রবেশ করে। এই স্বজ্ঞাপ্রসূত ও অপরোক্ষ গূঢ়জ্ঞানকেই বলা হয় মা'রিফাত বা যথার্থ জ্ঞান"।[২] মা'রিফাত অনুশীলনে এমন এক স্বজ্ঞাত অভিজ্ঞতার ওপর জোর দেয়া হয়, যাতে যুক্তির ভূমিকা খুবই গৌণ। "মা'রিফাত মানেই ঐশী আলোকে আলোকিত মন নিয়ে আল্লাহর স্বজ্ঞাত ও ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ অনুধ্যান। এখানে ব্যক্তির স্বতন্ত্র সত্তা বিলুপ্ত হয় এবং মানুষের মধ্যে স্বর্গীয় গুণাবলীর অভ্যুদয় ঘটে। এই ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ ও সমাধিভাবাপন্ন অনুশীলনকে ভবিষ্যত মুক্তির নিছক একটি উপায় বলেই নয়, বরং আল্লাহর সঙ্গে আত্মার মিলন এবং আল্লাহর প্রতি প্রেম সৃষ্টির লক্ষ্যে আত্মপরিস্করনের একটি উপায় বলে বিবেচনা করা হয়"।[৩]

মা'রিফাতের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে হলে চারটি স্তর অতিক্রম করতে হয়। যেমন, "(১) ঈমান, অদৃশ্য বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন; (২) তলব, অদৃশ্য বিষয় বস্তুর অনুসন্ধান কার্যে লিপ্ত হওয়া; (৩) ইরফান, অদৃশ্য বিষয় বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা বা পরিজ্ঞাত হওয়া এবং (৪) ফানাফীল্লাহ, অদৃশ্য বস্তুতে উপনীত ও উন্নীত হওয়া। অর্থাৎ প্রেমাস্পদের জ্যোতির্ময় সত্তার আলোকে নিজের ক্ষুদ্রতম সত্তাকে আলোকিত করে তোলা"।[৪]

১। মাওলানা আব্দুর রাহীম হাযারী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২৩।

২। আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮৫।

৩। আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮৫।

৪। মাওলানা আব্দুর রাহীম হাযারী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২০।

Dhaka University Institutional Repository

অদৃশ্য বস্তুর ধ্যান ধারণায় রতাবস্থায় সাধনা করতে করতে সূফীর হৃদয়ে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয়, যা তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা সৃষ্টি জগতের পরমসত্তা আল্লাহর সিফাতকে প্রত্যক্ষভাবেই অনুভব ও উপলব্ধি করা যায়। নির্ভুল উপলব্ধির নামই ইরফান বা আত্মোপলব্ধিজ্ঞান। এক কথায় পরম সত্তার লব্ধ জ্ঞানকেই বলা হয় ইরফান। সূফীগণ সাধনা বলে যখন জ্ঞানের পরম সীমায় উন্নীত হন তখনই তারা মহাজ্ঞানী আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রদত্ত জ্ঞান প্রভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেন। আপন অস্তিত্বের ক্ষুদ্রতম জ্ঞান সত্তা মহা অস্তিত্বের জ্ঞানসত্তায় মিশে গেলে দ্বি-সত্তায় কোন রকম ব্যবধান দেখতে পান না"।[১] এমনিভাবে আরিফ মারিফাত জগতের অনন্ত অসীম রহস্যাবৃত্ত কারণসমূহ ধীরে ধীরে জানতে পারেন। মা'রিফাতে উত্তীর্ণ হতে পারলে আত্মদর্শন লাভ হয় এবং আত্মতত্ত্বের মাধ্যমেই পরম সত্তার পরিচিতি পাওয়া যায়। আত্মা আলম-এ আমরের অন্তর্গত এবং দেহ আলম-এ ফানার অন্তর্গত। দেহ পাঁচটি মৌল উপাদানে গঠিত, যেমন- আগুন, পানি, বায়ু মাটি ও নূর। পঞ্চভূতের এ দেহকে জানতে পারলে যাত পাক আল্লাহকেও জানা যায়। তাই নবী (সঃ) বলেছেন, "আমি (আল্লাহ) মানুষের গুপ্তভেদ এবং মানুষ আমার গুপ্তভেদ।" (হাদীস-ই-কুদসী)

আল্লাহ পাক বলেছেন, "তোমরা যেখানেই থাক, তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন"।[২] " আমি তোমার নফসের সাথে মিশে রয়েছি, অনন্তর তুমি আমাকে দেখছনা"[৩]

কাজেই নফসের সন্ধান করলে এবং পঞ্চ নফসকে পূর্ণভাবে বিশ্লেষণ করলেই আল্লাহকে পাওয়া যাবে। "নফসে আম্মারাহ, নফসে লাওয়ামাহ, নফসে মুলহিমাহ, নফসে মুতমাঈন্নাহ, নফসে রাহমানি এ পঞ্চ নফসের সমন্বিত রূপের মধ্যেই সেই পরম যাত পাক আল্লাহর স্বরূপ বিদ্যমান"।[৪] পরমসত্তা সম্পর্কে জানতে হলে প্রথমে তাঁর গুণের পরিচয় লাভ করা প্রয়োজন। কেননা, আল্লাহর গুণাবলী সমগ্র পৃথিবীতে মানব শরীরে ও আত্মায় বিশেষ নিদর্শন হিসাবে কাজ করছে। এসম্পর্কে আল্লাহপাক বলেন, "আমি আমার চিহ্নসমূহ সমুদয় সৃষ্টি জগতে বিশেষভাবে তোমাদের দেহে প্রকাশ করে রেখেছি। যাতে পরম সত্য তোমাদের নিকট উদ্ভাসিত হয়ে উঠে, আমিই একমাত্র পরম সত্য"।[৫]

১। মাওলানা আব্দুর রাহীম হায়াতী, প্রাগুক্ত,পৃঃ ২২১।

২। আল কুরআন, সূরা-৫৭, আয়াত ৪।

৩। আল কুরআন, সূরা-৫১, আয়াত ২১।

৪। ফকির আব্দুর রশিদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৫।

৫। আল কুরআন, সূরা-৪১ -আয়াত৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

সৃষ্টি জগতে স্রষ্টার যেসব বিশেষণ জড়িয়ে আছে তা সাত ভাগে বিভক্ত, যথাঃ

"(১) হাইউন (চিরঞ্জীবী),

(২) কাদরুন (পরম শক্তি),

(৩) ইরাদাহ (ইচ্ছা শক্তি),

(৪) ইলমুন(পরম জ্ঞান),

(৫) কালামুন (কথন শক্তি),

(৬) সীমউন (শ্রবন শক্তি) এবং

(৭) বাসরুন(দর্শন শক্তি)"[১]

এ সাতটি বিশেষণেরই অন্তর্ভুক্ত সৃষ্টি জগত। এদের উৎস মূল যাতে কাদেমী থেকে। এজন্য বস্তুজগত আধ্যাত্মিক জগতেরই প্রাতিভাস। আল্লাহ আধ্যাত্মিক জগতের পরম সত্তা। তার বাহ্যিক গুণাবলীর বিকাশ কেবল সৃষ্টি জগতের মধ্য দিয়েই বিকশিত। পরমাত্মা তিনি স্বয়ং আর গুণাবলী তাঁর দেহ বিশেষ।

এ অর্থে খাজা মঈন উদ্দীন চিশতী ও মাওলানা জালাল উদ্দীন রুমীর বরাত দিয়ে ফকির আব্দুর রশিদ ও মাওলানা আব্দুর রাহীম হাযারী নিজ নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন- "আমি যখন তাঁর যাত ও সিফাতকে পৃথক ভাবে দেখেছিলাম তখন আমি যাই দেখেছি আল্লাহ ভিন্ন অন্য কিছুই দেখিনি"। (দেওয়ান-হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী)।[২] "মানুষ খোদা নন- খোদা মানুষ থেকে পৃথকও নন" (রুমী)।[৩]

সৃষ্টির মধ্য দিয়ে, সিফাতের মধ্যদিয়ে সূফীরা এমনিভাবেই আল্লাহর যাতকে উপলব্ধি করেন। এ যাতের সান্নিধ্য লাভের জন্য মুরাকাবা ও মুশাহাদার মাধ্যমে পাঁচটি স্তর অতিক্রম করতে হয়। যেমন- মাকামে নাসিরা, মাকামে মাহমুদা, মাকামে কাবা কাউসায়ন, মাকামে আউআদনা ও মাকামে উরাউল উরা"।[৪]

সাধক ধ্যানসাধনার মাধ্যমে কাবা কাউসায়ন এর স্তরে উপনীত হয়ে থাকেন এবং ঐশীপ্রেমে অনুরাগী অন্তর্চক্ষু দ্বারা আউআদনার স্তরে উপনীত হয়ে পরম সত্তার দীদার লাভ করে তাওহীদের সাগরে নিজকে হারিয়ে ফেলেন। তাই মাওলানা রুমী

১। মাওলানা আব্দুর রাহীম হাযারী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২৪।

২। খাজা মইনুদ্দীন চিশতী (রঃ) তাঁর দেওয়ানে উল্লেখ করেছেন-
"সিফাত ও যাত চুঁ আজ হাম খোদা নামি বেনাম;
বাহার চেমি নাতারম জাজ খোদা নামি বেনাম"

৩। মাওলানা জালালউদ্দীন রুমীর উক্তিটি নিম্নরূপ
"মরদানে দাগর খোদানা নাবাশদ
ওয়ালেকেন আজ খোদা জুদা নাবাশদ"

৪। মাওলানা আব্দুর রাহীম হাযারী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২৫।

Dhaka University Institutional Repository

(রঃ) বলেছেন, "তাওহীদের সাগরে যদি নিজকে ফানা করে ডুব দিতে পার, তবেই তুমি তোমার প্রেমাস্পদকে চিরদিনের মত পাবে।"১ এটা ঐশীপ্রেমের স্তর। এখানে ফানা ফীল্লাহ্ ছাড়া সিদ্ধিলাভ সম্ভব নয়।ঐশীপ্রেমের চরমে উন্নীত ব্যক্তি নবী করীম (সঃ)-এর জ্যোতির্ময় সত্তার মাধ্যমে নূরে তাজাল্লীর আলোকোজ্জ্বল দীপ্তিচ্ছটায় বিমুগ্ধ ও বিভোর হয়ে যান। তিনি রাসূলের মাঝে আত্মবিলোপনের মাধ্যমে আল্লাহতে মৌন হয়ে যাওয়ার প্রতি ধাবিত হয়ে পড়েন।

সূফী দর্শন মতে খোদা আপনাতে আপনিই বিকশিত ও পূর্ণ। বিশ্ব দর্পণে তারই প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত। তাওহীদ সামগ্রীক অস্তিত্বের একক ফল। বহুত্ব এক নিবিড় ঐক্যে তারই এককরূপ প্রকাশ করেছে। কিন্তু উরুজ বা আরোহের জগতে তিনি চিরঞ্জীবী, চিরস্থায়ী এবং নুজুল বা অবরোহের জগতে তিনি বিভিন্ন বিশেষণে বিশেষায়িত ও বিকশিত। তাঁর বিকাশ পদ্ধতিঃ আহাদিয়াত থেকে বিমিশ্ররূপ ওয়াহাদাত বা হাকীকতে মুহাম্মদ যা নূরে মুহাম্মদ -এর প্রকাশ ঘটেছে। তিনিত্ব থেকে ওয়াহিদিয়াত (আরিফ বিল্লাহ্ ফানাফীররাসুলের মাধ্যমে ফানা ফিল্লাহর প্রতি ধাবিত হয়ে পড়েন। এ স্তরে আরিফ রিসালাত ও বিলায়াত- এর বাস্তব স্বরূপ সম্পর্কিত উপলব্ধি করতে সক্ষম হন।) বা আমিত্বের বিকাশ লাভ ঘটেছে। তিনিত্ব থেকে শহুদ, নুর, ইলম ও ওজুদ এর বিকাশ ঘটছে। নুর, ইলম ও ওজুদ শহুদরূপে আপনা আপনি বিকশিত। সৃষ্টির মধ্যদিয়ে তাঁর সিফাত প্রকাশ পাচেছ"।২ চিত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ করলে আল্লাহর বিকাশ পদ্ধতিটি নিম্নরূপ দাঁড়ায়ঃ

<u>আহাদিয়াত</u>	<u>ওয়াহাদাত</u>	<u>ওয়াহিদিয়াত</u>
একত্ব	হাকীকতে মুহাম্মদ বা নূরে মুহাম্মদ বা <u>তিনিত্ব</u>	আমিত্ব

শাহুদ   নুর   ইলম   ওজুদ ৩

১। মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমীর (রঃ) উক্তি উদ্ধৃতঃ মাওলানা আব্দুর রাহীম হাযারী ও ফকির আব্দুর রশিদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ যথাক্রমে- ২২৫/১৫৭।

২। মাওলানা আব্দুর রাহীম হাযারী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২৬।

৩। ফকির আব্দুল রশিদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

সৃষ্টি রহস্যের সম্যক অবগতি ছাড়া 'আলমে খালক' বা সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে কখনও অবগতি লাভ করা যায় না । অথচ মা'রিফাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য তা জানা অপরিহার্য। মা'রিফাতের রাজ্যে যিনি বিচরণ করেন ও মা'রিফাতের পরিচয় লাভ করেন তিনিই সত্যিকার আরিফ। এ স্তরে সূফী বাহ্যিক জ্ঞানও স্বজ্ঞার মাধ্যমে সৃষ্টির উদ্দেশ্য, সৃষ্টির প্রক্রিয়া ও নিয়ম, সৃষ্টির প্রারম্ভ ও শেষ প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। আদি, অন্ত, প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্যের নিগূঢ়রহস্য সম্পর্কে জ্ঞাত হন। উলুহিয়াত (প্রভুত্ব) , রুবুবিয়াত (অসীমত্ত্ব) এবং আবদিয়াত বা দাসত্ব দ্বারা সৃষ্টির রহস্যভেদ বুঝতে সক্ষম হন। চেনা-অচেনা, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল প্রকার রহস্য ভেদ সম্পর্কে বুঝতে সক্ষম হন। মানবাত্মা এরূপ নয়টি স্তর অতিক্রম করে পরিপূর্ণ মানবরূপ পরিগ্রহ করে। নুযুলের বা অবরোহের প্রথম নয়টি স্তর, (১) যাতে কাদীমের (পরম আদি সত্তার)জগত, (২) জড়জগত (জামাদাত), (৩) উদ্ভীদ জগত (নাবাতাত), (৪) জীবজন্তুর (আলমে হায়ওয়ানাত) জগত, (৫) নুৎফা বা বীর্য জগত, (৬) রক্তজমাট (আলফা), (৭) অপরিপক্ক আকৃতি (মুদগা), (৮) পরিপূর্ণ আকৃতি (দায়রা), (৯) বাল্যের পরিণতি কাল (তিফল)

নূজুলের (অবরোহ) ২য় নয়টি স্তর, (১) আহাদিয়াত, (২) ওয়াহদাত, (৩) ওয়াহিদিয়াত, (৪) আলমে মিসাল , (৫) আলমে আরওয়াহ, (৬) আলমে হিসাসা, (৭) আলমে জিস্‌ম, (৮) আলমে হাইওয়ান এবং (৯) আলমে ইনসান।" [১]

স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে এমনই এক ঘনিষ্টতম সম্পর্ক রয়েছে যা সাধারণ জ্ঞানের বহির্ভূত। স্রষ্টা তাঁর ইচ্ছাশক্তি দ্বারা আহমদ সত্তা নূরে মুহাম্মদের উপর ভিত্তি করে কেবল 'কুন' অনুজ্ঞাসুচক শব্দ দ্বারা নিখিলবিশ্ব সৃষ্টির বিকাশ ঘটিয়েছেন। আহাদ ও আহমদের মধ্যবর্তী অনুরাগ সত্তাই সৃষ্টির উৎস মূল। আদিতে আল্লাহ একাকী নিঃসংগ অবস্থায় উলুহিয়াতে বিরাজ করছিলেন। আপনসত্তার পরিচিতিকল্পে সৃষ্টি প্রবাহের মধ্য দিয়ে নিজকে বিকশিত করলেন। মানবই স্রষ্টার স্বার্থক সৃষ্টি।

মানবজীবনে তক্‌দীর বা নিয়তির ভাল মন্দ দু'ভাবে ঘটে। তক্‌দীরে হাকীকত, যা মানব স্বাধীনতার উর্ধ্বে। আর তক্‌দীরে মালিকী যা মানব ইচ্ছার আওতাধীন। এ দু'পর্যায়ে সমুদয় কার্য সংঘটিত হয় । নবজাতকের অন্ধত্ব বা তদ্রূপ ভাগ্য লিপির জন্য দায়ীকে? এ প্রকার তকদীর স্রষ্টার প্রকৃতিগত তত্ত্ব ও তথ্যে পরিপূর্ণ। মা'রিফাতে উত্তীর্ণ ও উন্নীত আরিফই এসব রহস্যভেদ বুঝতে সক্ষম।

১। মাওলানা আব্দুর রাহীম হাযারী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২৬-২৭।

Dhaka University Institutional Repository

পরজগতের রহস্যভেদ তথা আলমে বরযখ, আলমে আখিরাত, হাশর (বিচারদিবস), কিয়ামত, জান্নাত, জাহান্নাম প্রভৃতির রহস্যভেদ কেবল আরিফগণই জানতে সক্ষম। বস্তুজগতের চেয়ে আত্মজগত আরও বেশী রহস্য জনক। সূফীগণ সজ্ঞার মাধ্যমে, জ্ঞানের মাধ্যমে তা জানতে পারেন। নবী করীম (সঃ) তাই বলেছেন, " আলমা'রিফাতু ইরফানিহি" অর্থাৎ " মারফত -তা-যা আমি জেনেছি ও চিনেছি।"

মা'রিফাতে উন্নীত আরিফগণ এভাবে স্রষ্টা ও সৃষ্টির সকল রহস্যভেদ জানতে পারেন এবং তা প্রত্যক্ষদর্শীর ন্যায় দর্শন করে থাকেন।

হাকীকত ঃ-

সত্য উপলব্ধি করার নামই হাকীকত। পরম সত্য বা সত্তাকেই হক বা হাকীকত বলা হয়। 'হাকীকত' শব্দটি এসেছে 'হাকীকুন' শব্দ থেকে। আর 'হাক্কুন' শব্দ থেকে এসেছে হাকীকুন। যার শাব্দিক অর্থ- বাস্তব, ধ্রুব সত্য, পরম সত্তা, সার বিষয়বস্তু প্রভৃতি। 'হাকীকুন' শব্দের আভিধানিক অর্থ, পরম সত্য বিষয়, যে পরম সত্যে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় তাকেই হাকীকত বলা হয়।

"এ নশ্বর স্থূল বিশ্বের অন্তরালে যে অবিনশ্বর সত্তা বিদ্যমান রয়েছে, সেই পরম প্রেমাস্পদ আল্লাহতে অভিনিবেশিত, স্থাপিত বা প্রতিষ্ঠিত হবার প্রক্রিয়াকেই হাকীকত বলা হয়।" [১] অর্থাৎ নিখিল সৃষ্টির অন্তরালে যে পরম সত্য বা সত্তা লুকিয়ে আছে সেই পরম সত্তায় উন্নীত হওয়াই হাকীকত। তরীকতের অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার নামই হাকীকত।

সাধক এ-স্তরে উত্তীর্ণ হতে পারলে পরম সত্যের সন্ধান ও স্বরূপ লাভ করতে পারেন এবং পরম সত্য বা সত্তার স্বরূপ অবলোকন করতে পারেন তথা আত্মোপলব্ধি করতে সক্ষম হন। এই পরম প্রেমাস্পদের ভালবাসায় নিজের অস্তিত্ব বোধ পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেন, আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়ে আপন সত্তাকে পর্যন্ত পরম সত্তায় হারিয়ে ফেলেন। ইহা ফানা ফীল্লাহর স্তর। খোদাপ্রেমিক সাধকের অবস্থান জাগতিক প্রেম-প্রীতি, মান-সম্মান, লোভ-লালসার উর্ধ্বস্থিত বলেই তাঁরা হাকীকতের সাথে সম্পৃক্ত। আল্লাহ পাকের গোপন প্রেমে যে প্রেমিক মত্ত, তারই অবস্থান হাকীকতে। পাঁচ প্রকার অনুসন্ধান পদ্ধতির মাধ্যমে এ পরম সত্যের উপলব্ধি জ্ঞান লাভ হয়। যেমন, (১) বুদ্ধি ,(২) অভিজ্ঞতা, (৩) বিচার বিশ্লেষণ,(৪) বিবর্তনমূখী মতবাদ এবং (৫) প্রজ্ঞাবাদ।

১। মাওলানা আব্দুর রাহীম হাযারী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২৮।

Dhaka University Institutional Repository

সালিক বা আরিফগণ শরী'আতগত জ্ঞান, তরীকতগত অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান এবং মা'রিফাতের পরিচিতিগত জ্ঞানের সমন্বয়ে আধ্যাত্মিক বিবর্তনের মধ্যদিয়ে সজ্ঞা তথা অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন মৌলজ্ঞান লাভ করে থাকেন। সত্যোপলব্ধির এসব মাধ্যম গুলোকে তাসাউফের পরিভাষায় 'কাশ্ফ' নামে অভিহিত করা হয়"।[১] মুলতঃ হাকীকত 'আলম-ই-লাহুতের' অন্তর্গত। সৃষ্টির আদিতে এই স্তর প্রথম আবির্ভূত হয়। এটা আল্লাহকে উপলব্ধির স্তর। এ স্তরে সাধক ফানা ফীর রাসূল এর মধ্য দিয়ে ফানা ফীল্লাহর স্তরে প্রবেশ করেন। --- হাকীকতের এ স্তরে সাধক তার নিজস্ব স্বকীয়তা, নিজ বৈশিষ্ট্য, স্বীয় জ্ঞান, বুদ্ধি, চিন্তা ও অনুভূতি, পৃথক অস্তিত্ববোধ সব কিছুই হারিয়ে ফেলেন এবং আল্লাহর সত্তায় 'ফানা' (লীন) হয়ে যান।"[২]

এ অবস্থায় মানুষ আল্লাহর রঙে রঞ্জিত হয়। এ স্তরে সাধকের হৃদয়ে কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকেনা। এরূপ সাধনাসিদ্ধ আত্মার প্রতি আল্লাহর নির্দেশ ঘোষিত হয়েছে, "হে পরিতুষ্ট আত্মা। তুমি প্রসন্ন ও সন্তোষপ্রাপ্ত অবস্থায় তোমার প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন কর। অতঃপর আমার সেবকগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হও এবং স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ কর।"[৩]

হাকীকত অর্জনকারী সাধক 'ইনসান-ই-কামিল' (পূর্ণাঙ্গ মানব) মর্যাদায় ভূষিত হন। নবী করীম (সঃ) বলেছেন, "আল হাকিকাতু আহওয়ালিহি" অর্থাৎ 'হাকিকত আমার হাল বা মহাভাবের অবস্থা সমূহ'। হযরত শাহ বু-আলী কলন্দর বলেছেন, "হে সাধক, যতদিন পর্যন্ত তোমার তুমিত্ববোধ বাকী থাকবে, ততদিন পর্যন্ত তুমি তাঁর পরম বন্ধুতে পরিণত হতে পারবে না, আর যখন তোমার তুমিত্ব বোধের বিলুপ্তি ঘটবে, তখনই তুমি আল্লাহর পরম বন্ধুতে পরিণত হতে পারবে"। হাকীকত স্তরে উত্তীর্ণ ব্যক্তিকে মরার আগেই মরতে হয়, [মূতূ কাবলা আন্‌তামূতূ (হাদীস)]। মোট কথা, পরম সত্তার অস্তিত্ব বোধ ছাড়া অন্য কোন অস্তিত্ব বোধ হৃদয়ে পোষণ না করার নামই 'হাকীকত'।

১। মাওলানা আব্দুর রাহীম হাযারী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২৯।

২। ফকির আব্দুর রশিদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬২।

৩। আল কুরআন, সূরা-৮৯, আয়াত ২৭-৩০।

Dhaka University Institutional Repository

ওয়াহ্‌দানিয়াত ঃ

'ওয়াহিদুন' শব্দ থেকে 'ওয়াহ্‌দানিয়াত' শব্দের উদ্ভব। 'ওয়াহিদ' শব্দের অর্থ এক। আর ওয়াহ্‌দানিয়াত শব্দের অর্থ একত্ব, যার দ্বিত্ব নেই।[১] যা আদি, যা মৌলিক ও অবিভাজ্য, যা সর্ব স্থানে সব কিছুতে সমভাবে বিরাজমান ও স্থিতিবান, যা সবকিছুর মূল্য নির্ধারক ও পরিমাপক, যা আপনা আপনিই মূল্যায়িত এবং আপনা আপনিই বিকশিত অর্থাৎ সয়ম্ভূ।[২] এরূপ একত্বের গুণে গুণান্বিত কেবল সয়ম্ভূ আল্লাহ। আল্লাহর একত্ব অনাদি, অনন্ত, অবিভাজ্য, তার মৌল সত্তা অবিমিশ্র, যে সত্তাতে কোন মিশ্রণ নেই।

'ওয়াহ্‌দানিয়াত' সূফী পথপরিক্রমার সর্বশেষ বা চূড়ান্ত স্তর। এ স্তরে মহান আল্লাহ ছাড়া আর কিছুই নেই। এ স্তরে এসে সাধক তাঁর অস্তিত্ব বোধকে একত্ববোধের মধ্যে হারিয়ে ফেলেন। সকল পথপরিক্রমা পেরিয়ে তিনি এ উদ্দিষ্টে এসে উপনীত হন। এটাই তার পথ চলার অভীষ্ট লক্ষ্য। ওয়াহ্‌দানিয়াত 'আলম-ই-হাহুতের' অন্তর্ভুক্ত । যা হল আল্লাহর নির্গুণ অবস্থা। এখানে তাঁর কোন গুণ নেই। শুধু তিনি চিরজীবি হয়ে প্রকৃতি শূন্য অবস্থায় বিরাজ করছেন। তার এ মৌলসত্তা সৃষ্টি, প্রকৃতি, গুণ ও অবরোহ শূন্য। এ হলো স্রষ্টার আদিও সর্বশেষ অবস্থা। আদিতে একমাত্র তিনিই ছিলেন আর কেউ ছিলনা। পূণরায় সব কিছু ধ্বংস করে কেবল তিনিই থাকবেন আর কিছুই থাকবেনা। এ স্তরে সাধক তার সবকিছুকে এমনকি নিজকে পর্যন্ত ধ্বংস (ফানা) করে আল্লাহর যাতে স্থিতি লাভ করেন। এখানকার চেতনা আল্লাহর চেতনা, এখানকার চৈতন্য স্বরূপ তা আল্লাহরই স্বরূপ, এখানকার জীবন আল্লাহরই জীবন। এ অবস্থাকে সাধকের 'বাকা' (আল্লাহতে স্থিতিলাভ) বলা হয়। এ সম্পর্কে হাদীস-ই-কুদ্‌সীতে বলা হয়েছে, ''যখন আমার বান্দা নফল ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করে তখন আমি তাঁকে বন্ধু বলে জানি। তখন আমি তাকে এমনভাবে বন্ধু হিসাবে জানি যে, আমি তার কর্ণ হই যদ্বারা সে শ্রবণ করে, আমি তাঁর চক্ষু হই যদ্বারা সে দর্শন করে, আমি তাঁর হস্ত হই যদ্বারা সে ধরে এবং আমি তার পদযুগল হই যদ্বারা সে চলে।" এ অবস্থা সম্পর্কে মাওলানা রুমী বলেন, ''তুমি যদি নিজকে বিলীন করে দিয়ে আল্লাহর তাওহীদে অবস্থান করতে পার, তাহলে তুমি তাঁর পরম বন্ধুরূপে তারই সত্তায় অবস্থান করতে পারবে। এ স্তরে উত্তীর্ণ সাধক অমরত্ব লাভ করেন। এ অর্থেই হাদীসে বলা হয়েছে, ''আল্লাহর ওলীদের জন্য মৃত্যু নেই"। এস্তরে উন্নীত মানব হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, ''এই কুরআন শ্রুত আর আমি এর সবাক জীবন্ত কুরআন।"

১। মাওলানা আব্দুর রাহীম হাযারী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩০।

২। ফকির আব্দুর রশিদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

বায়জিদ বিস্তামী বলেছেন, "সমুদয় প্রশংসা আমারই জন্য, আর আমি কতইনা গৌরবের অধিকারী।" হযরত আবু বকর শিবলী বলতেন, "আমি ছাড়া দ্বিতীয় কেউ নেই"।[১]

সূফীতত্ত্বের মূলনীতি ঃ-

আল্লাহর সান্নিধ্যে থেকে তাঁর দর্শন লাভ করাই সূফীদর্শনের মূল লক্ষ্য। পরম সত্তা আল্লাহর সাথে মিলনে পরম পাওয়ার যে চরম পরিতৃপ্তি তাই সূফী সাধককে ক্ষণস্থায়ী পার্থিব প্রলোভন এবং আপাত মধুর ইন্দ্রিয়াসক্তি হতে মুক্তকরে তাকে পরিপূর্ণ মনুষত্ত্বের (ইনসান-ই-কামিল) সাধনায় সার্থক করে তোলে। আর-এ মূলনীতিগুলো সূফীদের সাধনায় সাহায্য করে থাকে। যেমন,

তাওবাহ্ বা অনুতাপ-অনুশোচনা ঃ- অনুতাপ অনুশোচনা, পাপ কাজ পরিত্যাগ করা এবং পাপ কাজে আর লিপ্ত না হওয়া বা অগ্রসর না হওয়ার প্রতিজ্ঞাই 'তাওবাহ'। "ঔদাসীন্যের মোহ নিদ্রা হতে আত্মার জাগরণই তওবাহ্।"[২] আধ্যাত্মিক সাধনার প্রাথমিক স্তরে বিচরণকারী ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে তওবাহ্ হল কৃত পাপের জন্য অনুশোচনা। কিন্তু যারা এ পথে বেশ কিছু দূরে অগ্রসর হয়েছে তাদের জন্য তওবাহ হল আল্লাহকে ভূলে যাওয়ার জন্য অনুশোচনা। এ অর্থে-তওবাহ হল প্রেমাস্পদ আল্লাহ ছাড়া অন্যসকল বস্তু থেকে নিজেকে ফিরিয়ে আনা। মোট কথা, অতীত জীবনের যাবতীয় পাপ অপসারন করে অনুতপ্ত হওয়া এবং ভবিষ্যত জীবনে পাপ না করার কৃত সংকল্পে অটুট থাকার নামই তাওবাহ বা অনুশোচনা। তাওবাহ্ আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে একটি বড় সহায়ক। তাওবাহ্ করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আল্লাহ স্বয়ং মানব জাতিকে নির্দেশ দিয়েছেন, "হে বিশ্বাসীগণ। তোমরা আল্লাহর দরবারে খাঁটিভাবে তাওবাহ কর"।[৩] রাসুলুল্লাহ(সঃ) দৈনিক ৭০ বার তওবাহ্ করতেন। তওবাহ্ দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতির ধাপ ক্রমান্বয়ে অতিক্রান্ত হতে থাকে।

তাওয়াক্কুল-(আল্লাহ নির্ভরশীলতা) ঃ জীবনের সর্বাবস্থায়, সর্বকাজে, সর্ব বিষয় আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতার নামই তাওয়াক্কুল । তাওয়াক্কুল একমাত্র একত্ব বাদের ধারণা হতে আসে। সর্ব শক্তিমান আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন প্রাকৃতিক শক্তির উপর নির্ভর না করাই প্রকৃত তাওয়াক্কুল। পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর উপর নির্ভর করে

১। মাওলানা আব্দুর রাহীম হাযারী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩২।

২। ডঃ রশিদুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৭১।

৩। আল কুরআন, সূরা-৬৬, আয়াত ৮।

Dhaka University Institutional Repository

আত্মশক্তির পূর্ণ বিকাশসাধন করাই সূফীসাধকের লক্ষ্য। তাওয়াক্কুল সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন, "একমাত্র আল্লাহর উপরই প্রত্যেক খোদা বিশ্বাসীর আত্মনির্ভর হওয়া কর্তব্য।"[১] নবী করীম (সঃ) বলেছেন, "তুমি যখন কিছু কামনা করবে, তখন তা একমাত্র আল্লাহর নিকটই কামনা করবে। আর তুমি যখন কোন সাহায্য প্রার্থনা করবে, তখনও তুমি তা আল্লাহর নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করবে"।[২]

পরিবর্জনঃ সূফীগণ পার্থিব সুখ ও বিলাসিতা পরিহার করে আল্লাহর প্রেমে বিভোর থাকেন। পাপ থেকে মুক্তি লাভ করতে হলে পার্থিব জিনিসের প্রতি কম আকৃষ্ট হওয়া উচিত। দারিদ্র সম্পর্কে সূফীদের ধারণা বলতে সম্পদের প্রকৃত অভাব নয় বরং সম্পদের বাসনার অভাবকে বুঝায়। "শূন্য হৃদয় ও শূন্য হাত' এই হল তাদের লক্ষ্য। প্রকৃত দরিদ্র ব্যক্তির একটিই বাসনা এবং সেটি হল আল্লাহর প্রেম ও জ্ঞান। পার্থিব কিংবা পারলৌকিক কোন জিনিসের প্রতিই তার কোন মোহ থাকে না।"[৩] আব্দুল মজিদ নিজামুদ্দীন আওলিয়ার বরাত দিয়ে বলেছেন, "স্বল্প আহার, স্বল্প কথা, স্বল্প মেলামেশা, ও স্বল্প নিদ্রায় মধ্যেই রয়েছে মানুষের পূর্ণতা।"[৪]

তাপসী রাবিয়াহ বসরী বলতেন, "সর্বোত্তম কার্য যা মানুষকে আল্লাহর নিকট পৌঁছায় তাহল সে আল্লাহ ব্যতিত ইহজগত বা পরজগতের কোন বস্তুর প্রতি তোয়াক্কা রাখবে না।"[৫]

আত্ম সমর্পণঃ নিজেকে আল্লাহর কাছে পরিপূর্ণভাবে সমর্পণই হল ইসলামের মর্ম কথা। মুসলিম জীবনের ইহকাল ও পরকালের সবকিছু আল্লাহরই জন্য সমর্পিত। যেমন, আল্লাহ বলেছেন, "(বলুন) আমার উপাসনা, আরাধনা, উৎসর্গ অনুধ্যান, আমার জীবন ও মরণ , সমস্তই বিশ্ব নিয়ন্তা আল্লাহরই জন্য।"[৬]

১। আল কুরআন, সূরা-১৪, আয়াত ১২।

২। হাদীসটি উদ্ধৃতঃ মাওলানা আব্দুর রাহীম হাযারী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪৬।

৩। আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮৭।

৪। Abdul Majid, B.A. Taswof -E-Islam- " Mans perfection consists in having a little of food, a little of talk, a little a of association with people and a little of sleep."

৫। " The best thing that leads man on to God is that he must not care for anything of this world or of the next other than God." (Muslim thought and its source, p-92.)

৬। আল কুরআন, সূরা-৬, আয়াত ৬২।

Dhaka University Institutional Repository

এ বাণীর আলোকে সূফীরা আত্মসমর্পণের নীতি মেনে চলেন। তাঁরা আধ্যাত্মিক পথ পরিক্রমার প্রারম্ভে পীর বা উস্তাদের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। ওস্তাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও অনুগত না হলে সাধকের পক্ষে ইলমে মা'রিফাত অর্জন সম্ভব হয়না। এজন্য মুরীদকে মুর্শিদের প্রতি আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ও আত্মসমর্পনের শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। এজন্য আল্লাহ পাক বলেছেন, "হে বিশ্বাসীগণ। তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য কর, আর তোমাদের চালক ও নেতাদের।"[১]

<u>সবর বা ধৈর্যশীলতাঃ-</u> আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের পথে বহু রকম দুঃখ - কষ্ট ও বাধা-বিপত্তি রয়েছে। এসব দুঃখ-কষ্ট, বাধা-বিপত্তি এড়িয়ে-ধৈর্যের পরিচয় দেয়াকেই বলা হয় সবর' বা ধৈর্য্যশীলতা। ধৈর্য্যধারণের পেছনে অপরিসীম কল্যাণ রয়েছে। তাই জীবনের প্রতিটি ঘাত প্রতিঘাতে ধৈর্যের পরিচয় দেয়া মোমিনের অবশ্য কর্তব্য। এসম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন, "হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্য শীলদের সাথে আছেন। ---- আর আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিঞ্চিত ভয়-দ্বারা, ক্ষুধা দ্বারা, ধনপ্রাণ ও শস্যের স্বল্পতা দ্বারা আর সুসংবাদ জানিয়ে দিন এমন ধৈর্যশীলদেরকে, যখন তাদের উপর মুছিবত আসে, তখন বলে, আমরা ত আল্লাহরই আয়ত্বে,আর আমরা সকলে আল্লাহর সমীপে প্রত্যাবর্তন কারী"।[২] এ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, "মুমিনদের কতইনা সৌভাগ্য ভাল মন্দ সর্বাবস্থায়ই তাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে। কেননা, আল্লাহ বিশ্বাসীগণ সুখের সময় যেমন আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তেমনি দুঃখের সময় ও তারা ধৈর্য্য ধারণ করে থাকে। উভয় অবস্থায়ই তাদের জন্য পূণ্য রয়েছে। তাই ভাল-মন্দ সর্বাবস্থাই তাদের পক্ষে কল্যাণকর"।

<u>ইখলাস (পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতা)ঃ-</u> 'আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে বিশুদ্ধ মনে নিষ্ঠার সাথে কোন কিছু করাকেই ইখলাস বা হৃদয়ের পবিত্রতা বা পরিশুদ্ধিতা বলে। আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি লাভের একক বাসনা ব্যতিত দ্বিতীয় কোন কামনা-বাসনা মিশ্রিত না হওয়াকেই ইখলাস বলে। সূফীগণ হৃদয়ের পবিত্রতা ও সরলতা রক্ষা করে চলেন। কেননা, এক মাত্র পূত -পবিত্র অন্তঃকরণে আল্লাহর নূর প্রতিবিম্বিত হয়। সন্দেহজনক কার্যাদি পরিত্যাগ করা, বিবেক বিরোধী কাজ বর্জন করা এবং যে কাজ আল্লাহ হতে দূরে নিয়ে যায় তা পরিবর্জন

১। আল কুরআন, সূরা- ৪, আয়াত ৫৯।

২। আল কুরআন, সূরা-২, আয়াত ১৫৩-১৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

করা পবিত্রতা অর্জনের সহায়ক। যেমন- আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয় সেই ব্যক্তিই সাফল্য অর্জন করেছে, যে তার আত্মার পবিত্রতা লাভ করতে পেরেছে আর সেই ব্যক্তিই তার প্রতিপালকের নাম সদা স্মরণ করেছে, বাস্তবে সেই ব্যক্তিই প্রকৃত নামায সমাধা করেছে।"[১]

অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন, "যে ব্যক্তি তার আত্মাকে বিশুদ্ধ রেখেছে, সেই তার জীবনকে সার্থক করে তুলেছে। আর যে ব্যক্তি তার আত্মাকে কলুষিত করে ফেলেছে, সে তার জীবন ধ্বংস করে দিয়েছে।" [২]

ইশ্‌ক (আল্লাহ প্রেম) ঃ- আল্লাহ প্রেমই সূফীদর্শনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সূফীদের আত্মা সর্বদা আল্লাহর তত্ত্ব ও চিন্তায় নিমগ্ন থাকে। পার্থিব কোন বিষয়ই তাঁকে খোদার চিন্তা থেকে বিরত রাখতে পারেনা। এজন্য সূফীদর্শন প্রেম ধর্ম নামে পরিচিত। একজন মরমী কবির ভাষায় তা ফুটে উঠেছে এভাবে,

" ভাল যদি বাসতে হয় তাকে ভাল বাস
সেজন প্রেমময়,
তাঁর সাথে তোর কিনা চলে
কোনটা বা না হয়।"[৩]

আল্লাহ ও মানুষের প্রেমের সম্পর্ক সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে মাওলানা রুমী (রাঃ)-এর পংক্তিতে এভাবে,

" ক্রুশ ও খৃষ্টান জগত তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম
তিনি ক্রুশের উপর নন।
পূজার মন্ডপ, প্রাচীন বৌদ্ধ মঠে গমন করলাম
সেখানেও তাঁর সাক্ষাত মিলল না
হিরাত ও কান্দাহারের পর্বত অনুসন্ধান করলাম
তিনি সেই পর্বত উপত্যকার মধ্যে নেই।
আমি আমার অন্তঃকরণের দিকে দৃষ্টি পাত করলাম,
তাঁকে সেখানে দেখতে পেলাম -তিনি অন্য কোন খানে নেই।"[৪]

১। আল কুরআন, সূরা-৮৭, আয়াত১৪-১৫।

২। আল কুরআন, সূরা-৯১, আয়াত ৯-১০।

৩। ডঃ রশীদুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৭৩।

৪। Davis, Headlands-" Persian Mystics. Rumi.

Dhaka University Institutional Repository

যিকরঃ আল্লাহ্ পাকের নাম বা পবিত্র কুরআনের কোন কোন অংশ বারংবার উচ্চারণ করাকেই যিকর বলা হয়। আল্লাহতে লীন হয়ে যাবার উদগ্র বাসনায় সাধকগণ যিকরের আশ্রয় গ্রহণ করেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেছেন, "তোমরা আমাকে স্মরণকর আমিও তোমাদের স্মরণ করব"।[১] "হে বিশ্বাসী গণ। যত বেশী পার আল্লাহর যিকর কর, আর সকাল ও সন্ধ্যায় তার মহিমা কীর্তন কর।"[২]

পবিত্র এ কালামে পাকের উপর সূফী সাধকগণ বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে যিক্‌রের আশ্রয় নেন। যিক্‌র দুই প্রকার হতে পারে। যিক্‌রে জলী ও যিক্‌রে খফী। প্রথম প্রকারের যিক্‌র অনুশীলন করা হয় সরবে। আর দ্বিতীয় প্রকারের যিক্‌র বিশেষত অনুশীলন করা হয় নীরবে। দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ যিক্‌রে খফীর মর্যাদা বেশী।
'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও 'আল্লাহু আকবার' এদুটি আয়াতই সাধারণতঃ যিক্‌রের মাধ্যমে পাঠ করা হয়। আল্লাহতে লীন হতে হলে সাধককে চার প্রকার যিকরের মাধ্যমে অগ্রসর হতে হয়।

(১) যিক্‌রে লিসানী অর্থাৎ মুখ ও জিহবার দ্বারা আল্লাহর বিশেষ নাম উচ্চারণ ও আয়াত বিশেষ বার বার পাঠ করা।
(২) যিক্‌রে কলবী অর্থাৎ কলব বা অন্তঃকরণ দ্বারা আল্লাহর নাম উচ্চরণ করা।
(৩) যিক্‌রে আনফাসী বা শ্বাসপ্রশ্বাসের যিক্‌র। এ পন্থায় আল্লাহর নাম যিক্‌র করার নিয়ম। এ যিক্‌রের মাহাত্ম অত্যন্ত বেশী।
(৪) যিকরে আয়নী বা চোখের যিক্‌র। এটাই হচ্ছে চরমতম ও উচ্চতম পর্যায়ের যিক্‌র। এ যিক্‌র সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেছেন, "তুমি যেদিকেই তাকাও, আল্লাহর মুখ সেদিকেই বর্তমান।"[৩] স্বীয়সত্তা ভুলে গিয়ে আল্লাহতে লীন হয়ে যাওয়াই যিক্‌রের মূল উদ্দেশ্য।

আধ্যাত্মিক জ্ঞানঃ- আল্লাহর জ্ঞানই সূফীদর্শনের লক্ষ্য। আল্লাহকে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করা যায়না। কারণ, তিনি অজড়ীয়। আবার বুদ্ধি দ্বারাও তাকে জানা যায়না। কারণ, তিনি অচিন্তণীয়। আল্লাহর জ্ঞান শুধুমাত্র প্রত্যাদেশ বা স্বর্গীয়

১। আল কুরআন, সূরা-২, আয়াত ১৫২।
২। আল কুরআন, সূরা-৩৩, আয়াত ৪১-৪২।
৩। আল কুরআন, সূরা-২, আয়াত ১১৫।

Dhaka University Institutional Repository

সাহায্যের মাধ্যমেই অর্জন করা যায়। এর জন্য প্রয়োজন ধ্যান, প্রেম পবিত্রতার সাথে বুদ্ধি ও আত্মাকে পরিপূর্ণভাবে প্রস্তুত করা। তিন প্রকার ইলম দ্বারা সাধকগণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করে থাকেন। যেমন,

(১) ইলমুল ইয়াকিন বা অনুমানলব্ধ জ্ঞান। এ জ্ঞানের ক্ষেত্রে সাধক বুদ্ধির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ জ্ঞান বুদ্ধি নির্ভর।

(২) আয়নুল ইয়াকিন বা প্রত্যক্ষজাত জ্ঞান। এ জ্ঞানের সাহায্যে তিনি তন্ময়াবস্থায় আধ্যাত্মিক গোপনীয় বিষয়সমুহ অবগত হয়ে থাকেন।

(৩) হাক্কুল ইয়াকিন বা উপলব্ধিজাত জ্ঞান। এ জ্ঞানের সাহায্যে সূফী-সাধক পরম সত্তার সাথে মিলন অনুভব করেন। পবিত্র কুরআনে সত্য জ্ঞান লাভের এ তিনটি পথ প্রদর্শিত হয়েছে।[১]

কৃতজ্ঞতা (শুকরিয়া) ঃ- মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি জগতের অসংখ্য নিয়ামত উপভোগ করছে। এ দানের বিনিময়ে আল্লাহ্র দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার নামই শুকর। সকল অবস্থায় আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা সূফী সাধকদের অন্যতম মূলনীতি। আল্লাহ পাক স্বয়ং বলেছেন, "তোমরা আমার নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, তাহলে আমি তোমাদের নিয়ামত-আরও বাড়িয়ে দেব।" (আলকুরআন)

কাশফ (অতীন্দ্রিয় অনুভূতি)ঃ সূফীদের মতে, কাশফ বা স্বজ্ঞা অতীন্দ্রিয় অনুভূতির মাধ্যমেই আল্লাহকে জানতে পারা যায়। কাশফ এমন এক ধরনের অন্তর্দৃষ্টি, যার সাহায্যে সাধক ভূত ভবিষ্যত জগতের দৃশ্য, অদৃশ্য, আত্মা, আল্লাহর যাত ও সিফাতকে জানতে পারেন। কাশফ দু'ধরনের হতে পারে। (১) কাশফে কাউনী যার সাহায্যে সাধক ভবিষ্যত কালের বা দূরবর্তী স্থানের, দৃশ্য বা অদৃশ্য বিষয়সমূহের জ্ঞান লাভ করতে পারেন। (২) কাশফে ইলাহী-যাত, সিফাত, শিক্ষা নির্দেশনা সম্পর্কীয় যে জ্ঞান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হয়, তাকে কাশফ-এ-ইলাহী বলে। প্রজ্ঞা ও ইন্দ্রিয়ানুভূতি নয়- একমাত্র কাশফই সূফীকে আল্লাহর বাস্তব জ্ঞান দিতে সক্ষম। সূফীদের মতে, কাশফের জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান।

সামা (সঙ্গীত) ঃ- আল্লাহর প্রেম মূলক সঙ্গীতকে 'সামা' বলা হয়। হামদ-ই-বারি তাআলা, নাত-ই-রাসুলুল্লাহ, গযল মুর্শিদী, মা'রিফাতি, কাওয়ালী, আধ্যাত্মিক সঙ্গীত, দেশ প্রেমমূলক সঙ্গীত, এ সবই এ পর্যায়ের সঙ্গীত। এসব সঙ্গীত শ্রবণ করা মুবাহ ও সদ্ভাব বর্ধক পর্যায়ের। এছাড়া অন্যান্য গানবাদ্য হারাম। সূফীদের

১। আল কুরআন, সূরা-১০২, আয়াত ৫-৭।

Dhaka University Institutional Repository

সবাই সঙ্গীত প্রিয় নয়। সঙ্গীত প্রিয় সূফীরা মনে করেন, সঙ্গীতের মুর্ছনা অন্তরের আধ্যাত্মিক অনুভূতি জাগিয়ে তোলে এবং মনকে আল্লাহর ধ্যানে নিবিষ্ট করতে সাহায্য করে। তবে এই সামা বা সঙ্গীত শ্রবণের জন্য হযরত খাজা নিজামুদ্দিন চিশতী (রঃ) চারটি শর্তারোপ করেছেন। যেমন,

"(১) মুসামি বা বক্তাকে পূর্ণবয়স্ক পুরুষ হতে হবে। স্ত্রীলোক বা বালক হলে চলবে না।
(২) মসমু বা সামা আল্লাহর মহব্বত বর্ধিত করার উদ্দেশ্য হতে হবে।
(৩) মুসতামে বা শ্রবণকারীকে ফাসিক বা নফসানী খাহেস ওয়ালা হলে হবে না।
(৪) আলাতে সামা বা বাদ্য থাকা চলবে না"।[১]

উপরন্তু মহাসত্য লাভের জন্য সূফীগণ যে সকল স্তর অতিক্রম করেন তা হল ঃ-
(১)[৫৫] জিহাদ বা ধর্মযুদ্ধ, সুফীদের জিহাদ কোন বহিশত্রুর বিরুদ্ধে নয়, বরং নিজের আত্মার বিরুদ্ধে।
(২) খলওয়া ও উজলা, এ স্তরে সূফীরা-নির্জনে বাসকরে মন্দকাজ থেকে বিরত থাকেন।
(৩) তাকওয়া, আল্লাহর ভয়ে ভীত হওয়া।
(৪) ওয়ারা অর্থাৎ অপ্রয়োজনীয় কাজ বা পেশা থেকে বিরত থাকা।
(৫) জিহাদ, আইনানুগ সুখ ভোগ থেকে বিরত থাকা।
(৬) সমত বা নিরবতা পালন করা।
(৭) খউফ বা ভয়, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় পাছে কোন মন্দ কাজ করতে পারে তার ভয় করা।
(৮) বরা বা আশা অর্থাৎ সাধনার ফলে ভবিষ্যতে অভিলাষ পূর্ণ হওয়ার আশা।
(৯) হুজন, কৃত পাপের জন্য অনুতপ্ত হওয়া।
(১০) জো ওয়াক আল শাহওয়া বা ক্ষুধায় ধৈর্য ধারণ করা এবং ক্ষুধার অস্তিত্ব অস্বীকার করা।
(১১) খুশুঅ তওয়াজু ,ভীত থাকা বা বিনয়াবনত থাকা
(১২) মোখালিফাত আল নফস ও যিকর উয়োবিহা, নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করা এবং কু-প্রবৃত্তির সম্বন্ধে সজাগ থাকা বিশেষতঃ হাসদ বা পরশ্রীকাতরতা এবং গীবত বা পর নিন্দা করার বিরুদ্ধে সজাগ থাকা।
(১৩) কণা বা আত্ম তৃপ্তি।
(১৪) একিন বা দৃঢ় বিশ্বাস।
(১৫) মুরাকাবা, মুশাহাদা।

১। ফকির আব্দুর রশিদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ-১৭০।

Dhaka University Institutional Repository

(১৬) রিযা বা পরিতৃপ্তি।

(১৭) উবেদিয়া বা শুধু আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকার চিন্তা করা।

(১৮) ইরাদা বা নিজের কোন ইচ্ছা না রাখা। আল্লাহর ইচ্ছামত কাজ করা।

(১৯) ইসতিকামা বা সততা। এই অবস্থায় শুধু আল্লাহর ধ্যান বা সেবা করার জন্য প্রস্তুত থাকা।

(২০) ইখলাস বা শুধু আল্লাহর বাধ্যানুগত থেকে আল্লাহর ধ্যান করা।

(২১) সিদক বা চিন্তায় ও কাজে সত্যবাদিতা

(২২) হায়া বা লজ্জা (২৩) হুরিয়া বা মহানুভবতা, অর্থাৎ নিজের ভাল কামনা না করে পরের ভাল কামনা করা।

(২৪) ফতোয়া বা নিজ বিপদের ঝুঁকি নিয়েও পরের উপকার করা।

(২৫) ফিরাস বা অন্তর্দৃষ্টি (২৬) খুলুক বা নৈতিক চরিত্র।

(২৭) জুদ, সখা বা বদান্যতা।

(২৮) গয়ারা বা আল্লাহর কাজ করার জন্য হিংসুক হওয়া অর্থাৎ আল্লাহর কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজকে হিংসা করা।

(২৯) ভিলায়া বা আল্লাহর নিরাপত্তায় থাকা

(৩০) দোয়া বা সর্বদা আল্লাহর ইবাদতে থাকা।

(৩২) তাসাউফ বা পবিত্রতা

(৩৩) আদব বা ভদ্র ব্যবহার।

(৩৪) সফর বা ভ্রমণ।

(৩৫) সোহবাত বা সাহচর্য।

(৩৬) তওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী

(৩৭) মহৎ মৃত্যু (৩৮) মারিফাত বা প্রকৃত জ্ঞান বা মহাজ্ঞান লাভ।

(৩৯) মুহাব্বা বা মানুষের জন্য আল্লাহর ভালবাসা।

(৪০) শওক বা আল্লাহর সাহায্যের জন্য আকুল আকাংখা।" [১]

ফানা ও বাকাঃ-

ফানাঃ 'ফানা' অর্থ আত্মচেতনার অবলুপ্তি বা আত্ম বিনাশ। আর এই আত্ম বিনাশ মানে আত্মার ধ্বংস নয়। কারণ, আত্মা অমর, শাশ্বত ও চিরন্তন।[৫] আত্মগরিমা, আত্ম অহংকার , হিংসা-বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, রিয়া, লোভ-লালসা, কামনা, নিন্দা দুনিয়ার ভাল বাসা প্রভৃতি আত্মকেন্দ্রিক চিন্তা, গুণ ও কার্যাবলীকে পরিত্যাগ করা, মানবিক গুণ ও আত্মবোধকে ধ্বংস করা এবং তৎপরিবর্তে আল্লাহর গুণাবলী লাভ

১। আব্দুল করিম, মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪ ইং, পৃঃ ১৮৩-৮৫; গোলাম সাকলায়েন, বাংলাদেশের সূফী সাধক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮ ইং, পৃঃ ১৪-১৫।

Dhaka University Institutional Repository

করা, যার অর্থ আল্লাহর সিফাতের মধ্যে মানবিক সিফাতকে বিলীন করে দেয়া এবং সর্বশেষে আল্লাহর অসীম যাত্তের মধ্যে বান্দার সসীম সত্তাকে লীন করে দিয়ে নিজ অস্তিত্ববোধকে ভূলে যাওয়াকে 'ফানা' বলে অভিহিত করা যায়"।[১]

আল্লাহ সদা বিরাজমান এমন এক পরমসত্তা যাকে ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির সাহায্যে চেনা যায়না। কারণ, তিনি অপার্থিব, ইন্দ্রিয়াতীত ও অচিন্তনীয়। মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ, মানুষ এ জ্ঞান সীমার বাইরে বিচরণ করতে পারেনা। তাই নূর, প্রত্যাদেশ ও আত্মিক উৎকর্ষতা দ্বারাই আল্লাহকে জানা যায়। আল্লাহকে জানতে হলে প্রথমে নিজকেই জানতে হয়। সূফীরা বলেন, "নিজের মনকে দেখ, তোমার মধ্যেই আল্লাহ বিরাজমান"। "যে নিজেকে জানে সে আল্লাহকেও জানে"। হৃদয় একটি আয়নার মতই, আল্লাহর মহিমা সেখানে প্রতিফলিত হয়। সূফীরা বলেন- আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জনের জন্য আত্মাকে সব রকম প্রবৃত্তি প্রসূত প্রতিবন্ধক থেকে মুক্ত করতে হবে। পরম সত্তা আল্লাহকে উপলব্ধির জন্য অর্ন্তদৃষ্টিকে উন্মুক্ত করতে হবে। নিরলস ধ্যান কিংবা প্রত্যক্ষ যোগাযোগের মাধ্যমে আল্লাহকে জানা যায়। তন্ময়াবস্থায় তিনি তাঁর চারপাশের সবকিছুতেই আল্লাহকে প্রত্যক্ষ করেন। আল্লাহকে তিনি দেখেন সরাসরিভাবে, বিশেষ কোন বস্তুর মাধ্যমে নয়। ফলে আল্লাহর সাথে হৃদয়ের সংযোগ স্থাপিত হয় এবং আল্লাহর সাথে একীভূত হয়। এই বিস্তৃতি ও আত্মচেতনার অবলুপ্তিকেই বলা হয় 'ফানা' বা আত্ম বিনাশন।
"জাগতিক মোহ ও আকাংখা হতে মুক্তি লাভ করে আত্মার যে নৈতিক রূপান্তর তা-ই-'ফানা'। এ পর্যায়ে মন সবকিছুকেই বিস্মৃত হয়ে আল্লাহর ধ্যানে আত্ম সমাহিত হয়"।[২]

এই ফানা বা আত্মবিলোপন লাভ করতে হলে চারটি স্তর পাড়ি দিতে হয়। যেমনঃ- (১) ফানাফীন নাফ্স বা ফানাফীল ওজুদঃ (২) ফানাফীশ শায়খ, (৩) ফানা ফীর রাসূল এবং (৪) ফানা ফীল্লাহ।

১। <u>ফানা ফীন নাফস বা ফানাফীল ওজুদঃ</u> নফসে আম্মারাহ, কু প্রবৃত্তি, দৈহিক জাগতিক সর্বপ্রকার ইচ্ছা, কামনা ও আকর্ষণ তথা অহংসম্পর্কিত সকল কিছুপরিবর্তন করে ঐশী গুণাবলী লাভ করাই এ স্তরের কাজ।

১। ফকির আব্দুর রশিদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭১।

২। বিস্তারিত আলোচনা জন্য দেখা যেতে পারে আমিনুল ইসলাম রচিত মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি, পৃঃ ১৮৯ ; অধ্যাপক কে. আলী, মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস, পৃঃ ১৬৮-৮৯; আব্দুর রশিদ ফকির, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭১-৭২; Sayed Abdul Hai, opcit, p.147-48.

Dhaka University Institutional Repository

২। **ফানা ফীশ শায়খঃ** এ স্তরে সাধক সূফী তার পীর বা শায়খের নিকট সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেন। শায়খের সর্বপ্রকার গুণাবলী লাভ করা এবং নিজস্ব ইচ্ছা ও কামনা শায়খের ইচ্ছায় পরিণত করাই এ স্তরের উদ্দেশ্য।

৩। **ফানা ফীর রাসূলঃ** এ স্তরে সালিক নবী করীম (সঃ) -এর সর্ব প্রকার গুণাবলী লাভ ও তার মহব্বত লাভ করার জন্য সাধনা শুরু করেন। ধ্যানের মাধ্যমে তিনি এ সময় রাসূল (সঃ) এর নূর -ই-মুহাম্মদীর সাক্ষাত লাভ করেন এবং নিজের অস্তিত্বকে রাসূল (সাঃ) এর অস্তিত্বে বিলীন করে দিয়ে ফানা ফীর রাসূল লাভ করেন।

৪। **ফানা ফীল্লাহঃ** ফানা ফীর রাসূল লাভ করার পর সূফী নূর-ই- মুহাম্মদীর মাধ্যমে নূর-ই-তাজাল্লী লাভ করেন। নুর-ই-তাজাল্লীর দীদারের মাধ্যমে সাধক ধ্যানের উচ্চতম পর্যায়ে উপনীত হন এবং ব্যক্তিগত আত্মচেতনাকে বিলীন করে যাতের অসীম চেতনায় উন্নীত হন এবং সাধকের ব্যক্তিগত চৈতন্য আল্লাহর মুরাকাবা ও প্রেমে সমাহিত হয়। একেই ফানা ফীল্লাহ বলে।

'ফানার' স্তরগুলি নৈতিক ও গভীর আধ্যাত্মিক মুল্যবোধের দ্বারা প্রদীপ্ত। এ স্তরে আত্মবিনাশনের মাধ্যমে আল্লাহ প্রাপ্তি ঘটে। ফানার এই চারটি স্তরই নঞর্থক (Negative)। হিন্দু দর্শনের 'সমাধি' লাভ ও বৌদ্ধদের 'নির্বাণ' লাভ 'ফানার' এই স্তরেই ঘটে থাকে কিন্তু সূফীদর্শনে 'ফানা' ফীল্লাহর পরের সদর্থক (Positive) স্তর হল বাকা বিল্লাহ। ফানা ফীল্লাহর উপরে 'ফানাউল ফানা' নামে আর একটি মাকাম আছে। ফানার মাধ্যমে সূফী যে নিজের ও সমুদয় সৃষ্টির অস্তিত্বকে হারিয়ে ফেলেন, এস্তরে সে চিন্তা বা বোধও লোপ পায়। ফানার এই স্তর সমূহ অতিক্রম করতে পারলেই সাধক আল্লাহর বন্ধু বা ওলী আল্লাহ পদবাচ্য হন।

বাক্কাঃ পরম ঐশী সত্তা আল্লাহতে স্থিতি লাভ করার নাম 'বাকা' বা বাকা বিল্লাহ। 'ফানার' যেখানে শেষ সেখানেই 'বাকার' শুরু। ফানা হল বিশোধনমূলক জীবনের সর্বশেষ পর্যায় আর বাকা হল স্বর্গীয়ভাবে অনুপ্রাণিত জীবনের শুরু। ফানা ফীল্লাহতে ধ্বংস, বাক্কা বিল্লাহতে পুনর্জীবন লাভ। ফানা ফীল্লাহ অবস্থায় সাধক যখন স্বীয় অস্তিত্ব বোধ হারিয়ে ফেলেন, তখন সেখানে স্বয়ং আল্লাহই বিরাজ করেন, আপনাতে আপনি অস্তিত্ববোধ বিধ্বস্ত হলেই সেখানে যাত পাক বিকশিত হয়ে উঠেন। অন্য কথায় সসীম আত্মা অসীম যাতের অসীমত্ব লাভ করে।

Dhaka University Institutional Repository

এজন্যই শাহ বু-আলী কলন্দর (রঃ) বলেন, "যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার তুমিত্ব জীবিত থাকবে, ততক্ষণ তুমি মাশুক আল্লাহকে পাবেনা। যখন তোমায় তুমিত্ব থাকবেনা, তখন তোমার আল্লাহ প্রাপ্তি ঘটবে"।[১]

ফানা পর্যন্ত সূফীর দ্বৈতভাব বজায় থাকবে, 'আমি' ও 'তুমি' এই দুই এর চিন্তা স্বাভাবিক ভাবেই থাকে। কিন্তু বাকা বিল্লাহ লাভ করলে দুই এর ভাব আর থাকেনা। এখানে যাতের মধ্যে সিফাত মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। যাতের মধ্যে সিফাত থাকে বটে, কিন্তু গুপ্ত অবস্থায় এবং পৃথক বৈশিষ্ট হারিয়ে জীবন্ত পরমাত্মার প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে পরমাত্মার লা-মাকান লাভ করে যাতেরই মধ্যে আত্মবিসর্জন করে এবং যাতের অসীমত্বের মধ্যে অসীম গুণ ও সত্তা লাভ করে অসীমরূপ ধারণ করে। এক কথায়, অন্তরে সসীম থাকেনা, একমাত্র অসীমই থাকে। এস্তর সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ ব্যতীত সকল কিছুই ধ্বংস প্রাপ্ত হবে"। 'বাকা বিল্লাহ' এমন এক অবস্থা যেখানে আলম-ই-নাসূত (জড়জগত) বা আলম-ই-লাহুতের কোন বোধ নেই। আধ্যাত্মিক জগত বা অন্য কোন জগতও নেই। এখানে কোন অস্তিত্ব অনস্তিত্ব নেই। এ জগতের কোন উপরও নেই নীচও নেই। এ জগত বে-নিশান ও বে-মিছাল (উপমাহীন)। একমাত্র অসীমই এ অসীম জগতের মর্ম বুঝে। সাধকের সাধ্য-সাধনা, ধ্যান-ধারণা, মুরাকাবা-মুশাহাদার সাহায্যে স্বীয় আমিত্ব অসীম সত্তা আল্লাহর আমিত্বের সাথে মিশে যাওয়ায় সাধক এক অভিনব জীবন লাভ করেন। 'বাকা' প্রাপ্ত হলে তখন আল্লাহর অনুভূতিই সাধকের অনুভূতি, আল্লাহর অসীম চেতনাবোধই তার মহাচৈতন্য। এ সময় তার অস্তিত্ব আল্লাহর অসীম অস্তিত্বের সাথে একাত্ব ও একক অবস্থায় অনুভব করেন। এখানে দুই-এর কোন রূপ, চিন্তা বা বোধ নেই। এ স্তর সম্পর্কেই আল্লাহ পাক হাদীস-ই-কুদসিতে বলেন, "যখন আমার দাস নফল ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করে, তখন আমি তাকে বন্ধু জানি। যখন আমি তাকে বন্ধু জানি এমতাবস্থায় যে, আমি তার কর্ণ হই, যদ্বারা সে শ্রবণকরে, আমি তার চক্ষু হই, যদ্বারা সে দর্শন করে, আমি তার হস্ত হই, যদ্বারা সে ধারণ করে, আমি তার পদযুগল হই, যদ্বারা সে হেটে বেড়ায়।" এ স্তরে সাধকের স্বীয় অস্তিত্ব আল্লাহর অস্তিত্বে স্থিতিলাভ করে এবং তাঁর সত্তা ও গুণ তখন স্বয়ং আল্লাহই হয়ে যায়। "আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়া, আল্লাহতেই বিলীন হওয়া এবং তাঁতেই পূণর্জীবন লাভ করা আত্মার আসল উদ্দেশ্য। বাকা বিল্লাহতে সূফীর এই পূণর্জীবন লাভ হয়। এ সময় আল্লাহই সাধকের মাধ্যমে স্বীয় কর্ম সম্পাদন করেন"।[২] এ স্তরে তাই

১। শাহ-বু-আলী কলন্দরের সেই বিখ্যাত উক্তিটি ছিল নিম্নরূপ, "তা তুয়ী ইয়ারে গরদাদ ইয়ারে তু-তুঁ-নাবাশী ইয়াতে বাশদ ইয়ারে তু।"

২। ফকির আব্দুর রশিদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণ মানুষের কথা, কাজ ও হাব-ভাবের সাথে সুফী-সাধকদের কথা, কাজ ও হাব-ভাবের পার্থক্য ও ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। এই স্তরে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর মুখ থেকে বের হয়েছিল, "আমিই মহাকাল এবং যে আমাকে দেখল সে হককেই (পরম সত্য) দেখল।"

বাক্কার ব্যাখ্যায় আবু নসর আস সারাজের বরাত দিয়ে সায়িদ আব্দুল হাই বলেছেন- "Baqa does not mean infussion of the Divine essence into human nature or identification of the human nature with the Divine essence rather it means the transition from human qualities to the Divine quaslities by which the individual loses his own will and enters into the will of God.The will of the individual is also givan by God and this he understands that he should be entirely devated to God. Moreover, the Qualities of humanity is not the humanity itself, as such the sufi connot lose his humanity and be invested with the attributes of God. Rather the human attributes can only be changed by the radiance of Divine light shed upon man, the attributes of humanity, not being its essence, cannot be one with God, but the essence alone can be united with God. " ১
এ স্তরে হযরত আলী (রঃ) এর মুখ নিঃসৃতবাণী,"এই কুরআন নির্বাক এবং আমি সবাক (জীবন্ত) কুরআন"।

এ স্তরে উপনীত হয়েই মনসুর হাল্লাজ উক্তি করেছিলেন, "আনাল হক" অর্থাৎ আমিই হক বা সৃষ্টিশীল পরম সত্য আল্লাহ। তাঁর মতে, "আল্লাহ তাঁর নূর থেকে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তাই মানুষ মাত্রই স্বর্গীয়। মানুষ আল্লাহর চিরন্তন প্রেমের প্রতিচ্ছবি, যার মাধ্যমে দর্পনের মত আল্লাহ নিজেকে দেখেন। মানুষের মধ্যেই আল্লাহর অভিব্যক্তি চূড়ান্তরূপ লাভ করে, মানুষ তাঁর সৃষ্ট জীব। এজন্যই আল্লাহ ফেরেস্তাদেরকে আদমকে সালাম করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন"।২ এ ধারণা মানুষের মাঝে খোদায়ীত্ব আরোপের নামান্তর ছিল। এজন্য প্রচলিত ধর্ম মতের বিরুদ্ধাচরণের জন্য তিনি শাস্তি ভোগ করেন। দীর্ঘ সাত বছর সাত মাস বন্দী অবস্থায় বিচারের পর তাঁকে ৯২২ খৃঃ প্রাণদন্ড দেয়া হয়। দন্ডের প্রাক্কালে তিনি প্রার্থনায় বললেন, "আল্লাহ তোমার ধর্মের উৎসাহে, তোমার প্রসন্নতা লাভের উদ্দেশ্যে যে সকল দাস আমাকে হত্যা করার জন্য এখানে সমবেত হয়েছে, তাদের তুমি দয়া কর, করুণা কর । কারণ, আমার কাছে যা প্রকাশ করেছ, তা যদি তুমি তাদের কাছে ব্যক্ত করতে, তবে তারা যা করছে তা করতে পারতনা। যা তুমি

১। Sayed Abdul Hai, opcit, p. 148.

২। Sayed Abdul Hai, opcit, p.149.

Dhaka University Institutional Repository

তাদের কাছে অব্যক্ত রেখেছ তা যদি আমার কাছে গোপন রাখতে তবে আমাকে আজ এই দুঃখ ভোগ করতে হতনা। সমস্ত প্রশংসা তোমার। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক"।[১]

পরবর্তী কালের সূফীগণ মনসুরের এ মতবাদের স্বপক্ষে বিভিন্ন যুক্তি দাঁড় করেছেন। যেমন, একদলের অভিমত হল, তাঁর ধারণা বা উক্তি যথার্থ ছিল ; কিন্তু তিনি নিয়মের বিরোধীতা করেছেন। 'মানুষমাত্রই সৃজনশীল সত্য' কথাটি ফাঁস করে তিনি আল্লাহর গোপনীয়তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। কারণ, এধরনের গূঢ়সত্যের পরিবেশন শুধু কতিপয় নির্ধারিত ব্যক্তির বেলায়ই প্রযোজ্য।

দ্বিতীয় আরেক দলের মতে, মনসুর তাঁর ব্যক্তিগত চেতনা বিলুপ্তির পর যখন আল্লাহর সাথে তিনি সর্বোতভাবে একাত্মবোধ করছিলেন তখন এক ভাবোচ্ছ্বাস পূর্ণ তন্ময়াবস্থায় একথা ঘোষণা করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি আল্লাহর সাথে একাত্ম হননি, একাত্ম হয়েছিলেন আল্লাহর একটি গুণের সাথে।

তৃতীয় আরেকটি দলের মতে, তন্ময়তার চরম মুহূর্তে হাল্লাজ সৃষ্টি ও স্রষ্টার মাঝে কোন পার্থক্য লক্ষ্য করতে পারেননি, যিনি 'আনাল হক' বলেছিলেন, তিনি আসলে হাল্লাজ নন বরং অবচেতন হাল্লাজের মধ্য দিয়ে আল্লাহ নিজেই এ কথা বলেছেন"।[২]

এমতটি অনেক সূফীই গ্রহণ করেছেন। এ সম্পর্কে সায়িদ আব্দুল হাই জালালুদ্দীন রুমীর ভাষ্যের উল্লেখ করে বলেছেন, "The some light shines in myriad forms through the whole univers, The one essence, manifesting itself from age to age through prophets and saints who are it witness to mankind, ramains always the same."

অর্থাৎ "একই আলো সারা বিশ্বে অসংখ্যরূপে আভা বিস্তার করছে। সে একই নির্যাস (essence) যুগে যুগে নবী পয়গম্বরদের মাধ্যমে মানবতার কাছে নিজেকে অভিব্যক্ত করছে, তা সব সময় এক ও অপরিবর্তনীয়ই আছে"।[৩]

১। আ.ন.ম, বজলুর রশীদ, আমাদের সূফী সাধক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৭৭ ইং, পৃঃ ১৪১।

২। আমিনুল ইসলাম (রূপান্তর ও সম্পাদনা), প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯১ ; Sayed Abdul Hai, opcit, p. 149-50.

৩। মনসুর হাল্লাজের মতবাদের সমর্থণে আরো উক্তি পাওয়া যায় বিভিন্ন সূফীদের উক্তিতে। যেমন, নবী (সঃ) বলেছিলেন, "আমিই মহাকাল, যে আমাকে দেখল সে হক (পরম সত্যকেই) দেখল।

Dhaka University Institutional Repository

বাকা বিল্লাহই সাধকের সর্বশেষ স্তর। এই স্তরে সূফী-সাধক আল্লাহর চিরন্তন, শাশ্বত ও অসীম সত্তায় স্থায়ীভাবে স্থিতি লাভ করেন। সাধক এ স্তরে কুতুব, গাউস, আরিফবিল্লাহ প্রভৃতি লকবের অধিকারী হন। এ সময় জীবন ও মৃত্যু তার ইচ্ছাধীন হয়ে যায়। এ স্তরে তিনি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহময় হয়ে যান। মূলতঃ বাকাবিল্লাহ আল্লাহতে সাধকের চিরন্তন স্থিতি লাভেরই নামান্তর। এস্তরে সাধক মুশাহাদায় ও সাধারণ অবস্থায়, নিদ্রা ও জাগরণে সর্বাবস্থায়ই একমাত্র আল্লাহকে প্রত্যক্ষ করেন, উপলব্ধি করেন। প্রকৃত পক্ষে বাকাবিল্লাহ আল্লাহরই স্তর।

সূফী অভিজ্ঞতার বৈশিষ্ট্যঃ-

সূফীদের জ্ঞান বিদ্যার আলোকে বলা যায় যে নিরস যুক্তির চুলচেরা বিশ্লেষণধর্মী জ্ঞানের প্রতি সূফীদের আকর্ষণ নেই এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞানেও তারা পরিতুষ্ট নয়। তাঁরা চান হৃদয়ের অনুভূতির নিবিড়তায় পরম সত্তার সান্নিধ্য ও তাঁর সাথে মিলনের আনন্দধারা। সেজন্যই সূফীদের আল্লাহ সম্পর্কিত জ্ঞান ইন্দ্রিয় প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতা প্রসূত নয়। কারণ, "আল্লাহকে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করা যায়না, কারণ, তিনি অজাতীয়, আবার যুক্তি দ্বারাও তাকে জানা যায়না, কারণ, তিনি অচিন্তনীয়"।[১]

সূফীদের এ জ্ঞান স্বতন্ত্র জ্ঞান। এটা তাঁদের হৃদয়ের উপলব্ধি জ্ঞান, 'কাশফের' জ্ঞান। লক্ষ্যণীয় যে, "জ্ঞানের এই সর্বশেষ চরম পর্যায়ে শুধু আল্লাহর জ্ঞানই বিদ্যমান থাকে। সে জ্ঞান সকল ধারণা, সকল অনুভূতি ও সকল বোধের অতীত। অসীম ও অনন্ত এ জ্ঞান শূন্যময়। সমস্ত সৃষ্টির এই হলো সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্মতম আদি, অদৃশ্য অচিন্তনীয় ও চিরগুণী রূপ।"[২]

সূফী অভিজ্ঞতার উচ্চ পর্যায়সমূহ বিশ্লেষণ করা সুকঠিন ব্যাপার। তবু কেউ কেউ এ অভিজ্ঞতার বৈশিষ্টগুলো ধরার চেষ্টা করেছেন। ডঃ মুহাম্মদ ইকবাল এ সম্পর্কিত কতগুলো বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছেন। যথা

"আমি তুমি হলাম, তুমি আমি হলে আমি দেহ এবং তুমি প্রাণ, এরপর যেন কেউ বলতে না পারেযে, আমি একজন এবং তুমি আরেকজন।"

"আল্লাহ আল্লাহ জপতে জপতে মানুষই আল্লাহময় হয়ে যায়, একথা কি করে সাধারণ লোক বিশ্বাস করে?" (জালালুদ্দীন রুমী)

"তুমি যদি আল্লাহর মুখ দর্শন করতে চাও, আমার চেহারার দিকে তাকাও। আমিই তার দর্পণ সে আমা হতে পৃথক নয়।"(খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী)

'এই কুরআন নির্বাক, আমি সবাক বা জীবন্তকুরআন'(হযরত আলী(রঃ)

" সমস্ত প্রশংসা আমার, আমি কি গৌরবের অধিকারী"(বায়জীদ বিস্তামী)

"আমিই বলি আর আমিই শ্রবণ করি। এ পৃথিবীতে আমি ছাড়া দ্বিতীয় আর কউ নেই।" (আবু বকর শিবলী (রঃ))

১। আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮৮।

২। ফকির আব্দুর রশিদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমতঃ প্রথম দর্শনীয় ব্যাপার হল, এ অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষতা। এদিক দিয়ে জ্ঞানের মাধ্যম হিসাবে অন্যান্য অভিজ্ঞতার সঙ্গে অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার কোন পার্থক্য নেই। বস্তুতঃ সকল অভিজ্ঞতাই প্রত্যক্ষ। বহির্জগতের জ্ঞানের যেমন আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতাগুলো ইন্দ্রিয় নির্ভর বিশ্লেষণসাপেক্ষ, আল্লাহ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের জন্যও তেমনি অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা প্রয়োজন। অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষতার অর্থ হল অন্যান্য বস্তুকে আমরা যেমন জানি, আল্লাহকেও তেমনি জানি। আল্লাহ্ কোন গাণিতিক সত্তা বা পরস্পর সংযুক্ত কোন মৌলিক বস্তু কিংবা অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ ধারণা নয়।

দ্বিতীয়তঃ দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল, অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা অবিভাজ্য সমগ্রতা। কারণ, এ অভিজ্ঞতার মধ্যে এমনি এক ঐক্যের সূত্র বিদ্যমান, যে তার সমগ্রতা নিয়ে ব্যক্ত হয়। আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতায় কর্তা ও কর্মের মধ্যে পার্থক্য অনুভব করি। কিন্তু সূফী অভিজ্ঞতায় জ্ঞাতা (Subject) এবং জ্ঞেয়ের (Object) এর পার্থক্য অনুভূত হয় না। ইকবালের ভাষায় "The mystic state brings us into contact with total passage of reality in which all the diverse stimulimerge into one another and from a single unanalysable unity in which the ordinary distincion of subject and object does not exist."[১]

তৃতীয়তঃ সূফীর নিকট তন্ময়াবস্থার চূড়ান্ত মুহূর্তের জন্য ব্যক্তিগত সমস্ত অভিজ্ঞতা অতীত এক অতুলনীয় অন্যসত্তার ঘনিষ্ট সঙ্গ লাভ ঘটে। এ সময় সূফীর ব্যক্তিগত সমস্ত সত্তা অবলুপ্ত হয়ে যায়। অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে এ অভিজ্ঞতা আত্মগত নয় বরং বিষয়নিষ্ঠ। এ অভিজ্ঞতাকে আত্মগতবলে উড়িয়ে দেওয়ার কোন যৌক্তিকতা নেই। কারণ, এটা আত্মগত হলে আমরা আমাদের সত্তা সম্পর্কে অবহিত হতে পারতাম না। ইকবাল বলেন, "আমরা আমাদের সত্তা সম্পর্কে সচেতন, অন্তর্দর্শন ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির মাধ্যমে জানতে পারি। কিন্তু অপরের মন বা সত্তাকে জানার স্বতন্ত্র কোন ইন্দ্রিয় নেই কিন্তু আমরা নিজেদের দৈহিক সঞ্চালনের ভিত্তিতে অন্যের সচেতন সত্তার অস্তিত্বের অনুমান করি। অধ্যাপক রয়সি (Royce) বলেন যে, "আমাদের সঙ্গীরা আমাদের ইশারা ইঙ্গিতের সাড়া দেন বলে তারা আমাদের নিকট বাস্তব বলে প্রতীয়মান হয়।" পবিত্র কুরআনেও অনুরূপ অভিমত রয়েছে ঃ "অতএব, তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব"।[২] "এবং তোমার প্রভু বললেন, "আমাকে

১। Allama Iqbal, The Reconstruction of Religious thought in Islam, p.19.

২। আল কুরআন, সূরা-২, আয়াত ১৫২।

Dhaka University Institutional Repository

ডাক এবং আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেই।"[১] "এবং - যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্নকরে, তখন আমি তাদের নিকটবর্তী হই এবং আমার কাছে যে কাতর ভাবে প্রার্থনা করে , তার প্রার্থনার জবাব আমি দান করি" ।[২]

কাজেই দেখা যায় যে তন্মায়বস্থায় আমাদের অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষতা তুলনাহীন নয়। আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতার সাথে এর কিছুটা সামঞ্জস্য রয়েছে এবং সম্ভবতঃ এটা সাধারণ অভিজ্ঞতারই সমগোত্র।

চতুর্থতঃ সূফী অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ (Direct) বলে এটা যোগাযোগ রহিত। মননের চেয়ে অনুভূতির সঙ্গেই তন্ময়াবস্থার মিল বেশী। সূফী বা পয়গাম্বর এ অভিজ্ঞতার বাক্য দ্বারা প্রকাশ করতে পারেন বটে কিন্তু সেই অনুভূত অবস্থাকে অন্যের নিকট অবিকল প্রবিষ্ট করাতে পারেন না। পবিত্র কুরআনেও এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, "নক্ষত্র যখন অস্তমিত হয় তখন তার শপথ, তোমাদের সহচর ভূল করেন না বা বিপদগামী হননা, অথবা নিছক ভাবাবেগ থেকে তিনি কথা বলেননা। তাঁর কাছে কুরআন আল্লাহর দেওয়া ওহী ছাড়া কিছু নয়। শক্তিশালী একজন তাঁকে এটা শিক্ষা দিলেন এবং প্রজ্ঞাদান করলেন। দিগ্বলয়ের সর্বোচ্চ অংশে তিনি ভারসাম্য রক্ষা করে দাঁড়ালেন। তারপর তিনি নিকটবর্তী হলেন এবং এগিয়ে আসলেন এবং দুই ধনুক পরিমাণ দূরত্বের মধ্যে অথবা আরো কাছে রইলেন। তারপর আল্লাহর বান্দার কাছে সে প্রত্যাদেশ প্রকাশ করলেন, তিনি যা দেখলেন, তা তার অন্তর অবিশ্বাস করলনা। তিনি যা দেখলেন তা নিয়ে কি তোমরা তাঁর সঙ্গে তর্ক করবে? যে সিদরা বৃক্ষ সীমানা চিহ্নিত করছে, তাঁর কাছে বিশ্রাম উদ্যান অবস্থিত, এই সিদরাবৃক্ষ তাঁর আবরণ দ্বারা আবৃত ছিল, তাঁর চোখ অন্যদিকে ফেরেনি বা বিভ্রান্ত হয়ে এদিক ওদিক বিচরণ করেনি ; কারণ, তিনি আল্লাহর শ্রেষ্টতম নিদর্শন দেখতে পেয়েছিলেন।"[৩]

"আল্লাহ মানুষের সঙ্গে কেবল স্বপ্নে অথবা পর্দার আড়াল থেকে কথা বলেন না; তিনি দূত প্রেরণ করেন ; দূত আল্লাহর আদেশমত তাঁর প্রত্যাদেশ প্রচার করেন। কারণ, তিনি মহাজ্ঞানী" ।[৪]

১। আল কুরআন, সূরা ৪০, আয়াত ৬০।

২। আল কুরআন, সূরা ২, আয়াত ১৮২।

৩। আল কুরআন, সূরা ৫৩, আয়াত ১-১৮।

৪। আল কুরআন, সূরা-৪২, আয়াত ৫২।

Dhaka University Institutional Repository

এ অভিজ্ঞতা হল অব্যক্ত অনুভূতির ব্যাপার। বুদ্ধিগত বিচারের সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ নেই। অন্য সকল অনুভূতির মত অতীন্দ্রিয়ের অনুভূতিরও একটা জ্ঞানাত্মক উপাদান আছে। এ অনুভূতির প্রকৃতি হল এটা ধারণার মধ্যে ব্যক্ত হতে চায়। তাই এ অনুভূতি শেষ হয় সীমানার বাইরে, বিষয়ের চেতনায়। হকিং বলেন, "Feeling is outward pushing, as idea is outward reporting and no feeling is so blind as to have no idia of its own object."[১]

৫মতঃ "সূফী অভিজ্ঞতায় চিরন্তনতার (Eternity) এক নিবিড় অনুভূতি জন্মে, তা ক্রমিক সময়ের (Serial time) অবাস্তবতার ধারণা দিলেও ক্রমিক সময়ের সাথে তার বিচ্ছেদ ঘটেনা। অনন্যতার দিক দিয়েও সূফীর তন্ময়তা সাধারণ অভিজ্ঞতার সাথে সম্পর্ক শূন্য নয়। কারণ, সূফীদের অতীন্দ্রিয় ভাব শীঘ্রই কেটে যায় ; দীর্ঘসময় তা স্থায়ী হয়না। সাধক আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসেন। পরমসত্তার সাথে মিলনের তন্ময়তা ক্ষণস্থায়ী হলেও সূফীর চেতনার উপর তার গভীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়"।[২]

৬ষ্ঠতঃ "সূফী অভিজ্ঞতার চরম পর্যায়ে এমন এক নিত্যকার অনুভূতি সে লাভ করে যা সেই নিত্য জগতের (বাস্তবের) ও পরম যাতের চরম নিত্যজ্ঞান, যে জ্ঞান সত্তা ও গুণের মধ্যকার প্রভেদ অপসৃত করে দেয় এবং সেই জন্য ক্রমিক সময়ের মধ্যে থেকেও জ্ঞাত। ক্রমিক সময়কে নিত্যতার ঐক্যসূত্রে গ্রথিত বা একক সময়ের নিত্যতার বর্তমান রূপ প্রত্যক্ষ করে। তখন সূফী সাধক প্রত্যক্ষ করেন আপাতঃ দৃষ্টিতে বিক্ষিপ্ত ক্রমিক ও খন্ড কালের রহস্যপূর্ণ একক ও নিত্যরূপ সীমিত জগতের ও খন্ড সৃষ্টির এক শাশ্বত চিরন্তনী অখন্ড এক রূপ ও তার মধ্যকার ঐক্যময় নিত্যতা, যে নিত্যতা অখন্ডতায়, আল্লাহর অনন্ত অসীমরূপ সৌন্দর্যের মধ্যে অন্তর্লীন হয়ে একক, নির্গুণ ও অব্যক্ত সত্তারূপে স্থান, কাল ও আপেক্ষিকতার অতীতে মহাশূন্যে অনন্ত শাশ্বত অনাদী, চিরন্তন মহাচৈতন্যময় শূন্যরূপে বিরাজমান।

এ অভিজ্ঞতা লাভের পর সাধক সাধারণ মানুষ হিসাবে বিবেচিত হলেও অনন্তকালের জন্য তার কাছে খন্ড ও অখন্ডের, রূপ ও অরূপের, বস্তুজগত ও আধ্যাত্মিক জগতের ব্যবধান তিরোহিত হয়ে যায় এবং তিনি তখন 'বাকা' (One with Allah) প্রাপ্ত হন। সূফীর এই চরমতম অভিজ্ঞতা যা তিনি সাধারণকে অবহিত করতে পারেন না, শুধু সূফীই সূফীর মর্ম বুঝতে সমর্থ"।[৩]

১। Dr. Iqbal ,opcit, p, 21.

২। ডঃ মুহাম্মদ ইকবাল সূফীর এই পাঁচটি অভিজ্ঞতার বিস্তারিত আলোচনা করেছেন তাঁর গ্রন্থ The Rceonstruction of Relegious thought in Islam এর অন্তর্গত Knowledge and Religious Experience নিবন্ধে।

৩। ফকির আব্দুর রশিদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ৭৯-৮০।

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং দেখা যায় যে পরমসত্তাকে চেনা বা জানার বিভিন্ন পথ রয়েছে। বহিঃ প্রত্যক্ষের সাহায্যে সাধারণ মানুষ বাহ্য জগত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। এ ধরণের জ্ঞান পঞ্চেন্দ্রিয় বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে থাকে। পবিত্র কুরআনের মতে, হৃদয় একটা জ্ঞান লাভের শক্তি। হৃদয়ের মাধ্যমে যে জ্ঞান লাভ করা যায় তা বহিঃ প্রত্যক্ষের মাধ্যমে পাওয়া যায় না। এজন্য প্রবৃত্তির অবিলতা ও জঞ্জাল থেকে হৃদয়কে মুক্ত রাখা আবশ্যক। তাই সূফীরা হৃদয়ের পবিত্রতার উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেন।

অতএব, "সূফী অভিজ্ঞতা কোন অসাধারণ বা অলৌকিক অভিজ্ঞতা নয়। ইন্দ্রিয়ের সুস্থতা যেমন বহিঃপ্রত্যক্ষের জন্য প্রয়োজন, মস্তিষ্কের সুস্থতা যেমন চিন্তার জন্য প্রয়োজন, অতিন্দ্রিয় অনুভূতি বা কাশ্‌ফের জন্য তেমনি হৃদয়ের সুস্থতা অপরিহার্য। প্রবৃত্তির উদ্দাম অবিলতা হতে হৃদয়কে মুক্ত করতে পারলে এবং হৃদয়ের শক্তির অনুশীলন করলে সাধারণ লোক সূফীর উপলব্ধি লাভ করতে পারে। মানুষের জ্ঞানের পরিকল্পনায় ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞার যেমন এক একটা সুনির্দিষ্ট ভূমিকা রয়েছে, কলব বা হৃদয়ের তেমনি সুনির্দিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞা, হৃদয় এই তিনের ক্রিয়ার সীমানা রয়েছে। সীমানার বাইরে গেলে তারা অচল। তবে এদের মধ্যে বিরোধ নেই"।[১]

<u>সূফী সাধক ও রক্ষণশীল মুসলমান ঃ</u>

সূফীদর্শন ইসলামেরই অপরিহার্য ও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এটা ইসলামের বাতিনী (অপ্রকাশ্য) দিক। এজন্য এটা ইসলামের মতই পুরাতন। প্রাথমিক পর্যায়ে সূফী দর্শন রক্ষণশীল ইসলাম থেকে আলাদা ছিল না বরং তা রক্ষণশীল বিশ্বাস ও আচরণের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। পরবর্তীকালে সূফীরা কুরআনের কিছু কিছু আয়াতের উপর বিশেষভাবে জোর দেন এবং এগুলোর ব্যাখ্যা ও ভাষ্য দিতে গিয়ে অপর এমন কিছু আয়াত উপেক্ষা করেছিলেন, সাধারণ মুসলমানেরা সেগুলোকে সমান গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করত।

১। সূফী দর্শনের অধিকাংশ সমালোচক পাঁচটি বৈশিষ্টের কথা উল্লেখ করেছেন কিন্তু ফকির আব্দুর রশিদ উক্ত পাঁচটি ছাড়াও আরেকটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ তিনি মোট ছয়টি বৈশিষ্ট বর্ণনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "সূফী দর্শন সমালোচকদের বিশ্লেষণধর্মী ও সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে সূফী অভিজ্ঞতার ষষ্ঠতম বৈশিষ্ট্যের কথা ধরা পড়েনি। অথবা অতিশয় দূর্জ্ঞেয়, রহস্যপূর্ণ ও অব্যক্ত সত্যের স্বরূপকে সাধারণ জ্ঞানের পরিধি বহির্ভূত মনে করে তা এ বৈশিষ্টকে এড়িয়ে গেছেন। কিন্তু তাসাউফের সর্বশেষ পর্যায় বাক্কা বিল্লাহ যা পৃথিবীর অন্যান্য মিষ্টিক অনুভূতি থেকে ইসলামী সূফী অভিজ্ঞতাকে বিশিষ্টতার মর্যাদায় গৌরবান্বিত করেছে। ষষ্ঠতম বৈশিষ্টকে বাদ দিয়ে, সূফী অভিজ্ঞতার সেই সঠিক মূল্যায়ন করতে গিয়ে সত্যের অপলাপ করা হয়।"

Dhaka University Institutional Repository

"সূফীদের আত্ম অস্বীকৃতি ও নিষ্ক্রিয়তার মনোভাব ইসলামের প্রকৃত মর্মবাণীর বিরোধী ছিল। কারণ, ইসলাম এ জগতকে বাস্তব বলে মনে করে এবং মানুষকে কর্মতৎপর হতে শিখায়। স্বয়ং মহানবী (সঃ) অলস ও নিষ্ক্রিয় মনোভাবের কঠোর নিন্দা করেন। পরবর্তী পর্যায়ে বহু বিদেশী প্রভাবে সূফীদর্শন একটি অনুধ্যানিক (Speculative) ও দার্শনিক মতবাদে বিকাশ লাভ করে। ফলে তা রক্ষণশীল ইসলাম থেকে বহু দূরে বিচ্যুৎ হয়ে যায়"।[১] এভাবে ইসলামের এক একটা দিকের প্রতি অতিমাত্রায় গুরুত্বারোপ করার ফলে সূফী দর্শন ও রক্ষণশীল ইসলামের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। পার্থক্যগুলো হলঃ-

<u>প্রথমতঃ</u> রক্ষণশীল মুসলমানগণ কালেমা তায়্যিবাহ "লাইলা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ" বলতে বুঝেন- "আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর রাসূল"। লাইলাহা ইল্লাল্লাহ এর তাৎপর্য বলতে রক্ষণশীল মুসলমানরা বুঝে থাকেন যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহ উপাসনার যোগ্য নয়। পক্ষান্তরে সূফীরা এর গূঢ় অর্থ আবিষ্কার করে বলেন, লাইলাহা ইল্লাল্লাহ -এর তাৎপর্য হল আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন সত্তা নেই।

<u>দ্বিতীয়তঃ</u> রক্ষণশীল মুসলমানেরা কুরআনের শাব্দিক অর্থের উপর গুরুত্বারোপ করে থাকেন। কিন্তু সূফীরা কুরআনের আয়াতসমূহের বাহ্যিক, গূঢ় দ্বি-বিধ তাৎপর্যের কথা উল্লেখ করেন এবং কুরআনের অভ্যন্তরীণ অর্থই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলে থাকেন।

<u>তৃতীয়তঃ</u> ইসলাম আকল, নাকল, ও কাশ্‌ফের উপর সমান গুরুত্ব প্রদান করে এবং মানুষের জ্ঞানের এ তিনটি উৎস নির্দেশ করে। কিন্তু রক্ষণশীল মুসলমানেরা নাকলের (সামাজিক প্রথা) উপর অত্যধিক গুরুত্বারোপ করে, আকলকে (প্রজ্ঞা) অল্পই গুরুত্ব দেয় এবং কাশ্‌ফের প্রয়োজনীয়তা একেবারেই স্বীকার করেননা। কিন্তু সূফীরা কাশফের উপর অত্যধিক গুরুত্বারোপ করেন।

<u>চতুর্থতঃ</u> রক্ষণশীল মুসলমানেরা আল্লাহর ভয়ে তাঁদের ইবাদত বন্দেগী করেন। তাঁদের মতে, আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী। তিনি পাপীকে শাস্তি দেন এবং পূণ্যবানদের পুরস্কৃত করেন। কাজেই তারা বেহেস্তের লোভে এবং দোজখের ভয়ে আল্লাহর ইবাদত করে থাকেন। তাঁদের মতে, আল্লাহ ও মানুষের মধ্যে সম্পর্ক হল প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক। কিন্তু সূফীরা আল্লাহর সাথে বহুবিধ সম্পর্ক কল্পনা করেন। তন্মধ্যে আশিক সম্পর্কই প্রধান। তারা আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ ও প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর ইবাদত করে থাকেন। বেহেস্তের লোভ কিংবা জাহান্নামের ভয় তাকে বিচলিত করতে পারে না।

১। ডঃ রশীদুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৬৩; আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চমতঃ "রক্ষণশীল মুসলমানরা শরী'আতের বিধান পালনে কোন প্রকার শৈথিল্য আনয়নকে মহাপাপ বলে গণ্য করেন। সাধারণতঃ সূফীরাও এ ব্যাপারে একই মতাদর্শী। কিন্তু এক ধরনের সূফী যারা আল্লাহর প্রেমে এতই মশগুল হয়ে গেছেন যে, তাদের বাহ্য জ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সে সকল সাধকের প্রতি শরী'আতের বিধান প্রযোজ্য নয়"।[১]

ষষ্ঠতঃ রক্ষণশীল মুসলমানরা ধর্মীয় নীতিসমূহ বিনা বিচারে গ্রহণ করেন এবং ধর্মীয় নিয়মকানুন প্রতিপালন করেন। তাঁদের এরূপ ধর্মাচরণে একীন বিল গায়ব (অদেখা ও অন্ধবিশ্বাস) কাজ করে থাকে। পক্ষান্তরে সূফীরা ধর্মীয় নীতি ও নিয়মকানুন বিচার সহকারে পালন করেন এবং আইনুল ইয়াকিনের (প্রত্যক্ষ জ্ঞান জনিত বিশ্বাস) দ্বারা ইবাদতের প্রকৃত মর্ম উদঘাটন করত প্রেম সহযোগে তা সম্পাদন করেন"।[২]

সপ্তমতঃ "সূফীদের বিশ্বাস, আধ্যাত্মিক পথ পরিক্রমার জন্য আধ্যাত্মিক আলোকে আলোকিত শায়খ বা পীরের তত্ত্বাবধান প্রয়োজন। কিন্তু রক্ষণশীল মুসলমানেরা মনে করেন যে, ধর্মীয় বিধি বিধান পালনের মাধ্যমেই মুসলমান পূর্ণতা লাভ করতে পারে। এ ব্যাপারে কোন শায়খ বা পীরের প্রয়োজন নেই"।[৩]

অষ্টমতঃ "রক্ষণশীলদের মতে, মানুষ সাধনায় যতই পূর্ণতা লাভ করুক না কেন - তারা আল্লাহর সাথে মিশে যেতে পারেনা। কেননা, মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি। মানুষ ও আল্লাহর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বর্তমান। সূফীদের মতে, আল্লাহর সাথে মিলনই মানব জীবনের পরম সার্থকতা, মানবজীবনের পরিপূর্ণতা। কেননা, মানুষের আত্মা আল্লাহ হতে নিঃসৃত হয়েছে।"[৪]

নবমতঃ "রক্ষণশীল মতানুসারে মৃত্যুর পর আত্মা পরিপূর্ণ স্বকীয়তা বজায় রাখবে এবং পাপ, পূণ্যের হিসাব অনুসারে শাস্তি ও পুরস্কার লাভ করবে। কিন্তু সূফী মতানুসারে পূর্ণ মানবের আত্মা সম্পূর্ণ ভাবে বিশ্ব আত্মা আল্লাহর মধ্যে বিলুপ্ত বা সমাহিত হয়ে অমরত্ব লাভ করবে"।[৫]

১। Saiyed Abdul Hai, opcit, p.174.

" According to orthodox Islam, the Muslims are under compulsion to observe the religious duties pres cribed by the shariat. Orthodex Islam Never permits the avoidence of religius duties such as obligotory prayer, fasting etc. But sum of the sufis put less stress on prescribed religious duties.

২। ফকির আব্দুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৮।

৩। Saiyed Abdul Hai, opcit, p. 173-74.

৪। Sayed Abdul Hai, opcit, p.174.

৫। Sayed Abdul Hai, opcit, p.174.

Dhaka University Institutional Repository

দশমতঃ "সূফীগণ আধ্যাত্মিক পূর্ণতা লাভের জন্য কতকগুলি স্তর অতিক্রম করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এ স্তরগুলো একের পর এক পার হয়ে সর্বোচ্চ স্তরে আরোহণপূর্বক আল্লাহর মিলনরূপ আধ্যাত্মিক অনুভূতি ঘটে। কিন্তু রক্ষণশীল মুসলিম সমাজ এ সব স্তর সম্পর্কে অবহিত নন"।[১]

১১শতমঃ "রক্ষণশীল সমাজ ঈমানের স্তর সম্পর্কে অনভিজ্ঞ এবং এ জন্য ঈমানের স্তর অস্বীকার করেন; কিন্তু সূফীদের মতে ঈমানের কতিপয় স্তর আছে। এর সর্বশেষ স্তর লাভ করলেই মুমিন, সিদ্দিক বা ইনসান-ই-কামিল হওয়া যায়"।[২]

১২শতমঃ রক্ষণশীল মুসলিম সমাজ সর্ব প্রকার সঙ্গীতকে হারাম ও নাজায়েয মনে করেন এবং অধিকাংশ সূফী ধর্ম সঙ্গীতকে জায়েয মনে করেন।

১৩শতমঃ "রক্ষণশীল মুসলিমগণ কবর, হাশর, বরযখ প্রভৃতি কতিপয় দৈহিক অবস্থান্তর ব্যতিত আত্মার ক্রমবিবর্তন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন। পক্ষান্তরে সূফীগণ আত্মার ক্রমবিবর্তন এবং এই ক্রম বিবর্তনের মাধ্যমেই আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসী"।[৩]

১৪শতমঃ রক্ষণশীল মুসলিমগণ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনকে দুটি বিপরীত মুখী জগত বলে মনে করেন। আর সূফীগণ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জগতকে এক ও অভিন্ন একইসূত্রে দেখতে পান।

সূফী সমাজ ও রক্ষণশীল মুসলিম সমাজের মতবাদের পার্থক্য দেখে বুঝা যায় যে, এসব পার্থক্য প্রকৃত পক্ষে বাতিনী দিকের বিশ্বাস অবিশ্বাস নিয়ে বর্তমান। সূফীরা যাহিরী বাতিনী উভয় দিকের সমন্বয় পন্থী, কিন্তু রক্ষণশীল মুসলমাগণ মাত্র যাহিরী দিকের প্রবক্তা।

সূফী তরীকাহ্ সমূহঃ

সূফীদের আধ্যাত্মিক অনুশীলনকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে বিভিন্ন তরীকাহ্‌র উদ্ভব ঘটে। আর এসব তরীকাহ্‌র উদ্ভাবক ছিলেন আধ্যাত্মিক সাধক বিখ্যাত সূফী-পীরগণ। এ সব তরীকাহ্ বিভিন্ন পীর পরম্পরায় হযরত আলী (রাঃ) কিংবা হযরত আবুবকর (রাঃ) এর মাধ্যমে নবী করীম (সঃ) পর্যন্ত তরীকাহ্‌র সম্পর্ক অনুসৃত হয়। এসব তরীকাহ্ নবী করীম (সঃ) কে প্রথম ও শ্রেষ্ঠ পীর বলে অভিহিত করে এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উৎস বলে মনে করে।

১। ডঃ রশিদুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৬৫।

২। ফকির আব্দুর রশিদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৯।

৩। ফকির আব্দুর রশিদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

প্রায় তিন শতাধিক সূফী তরীকাহ্‌র সন্ধান পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কাদ্‌রিয়া, চিশতিয়া, নকশবন্দিয়া, মুজাদ্দিদিয়া, কলন্দরিয়া, আদহামিয়া, সোহরাওয়ার্দীয়া, মাদারিয়া তরীকাহগুলির জনপ্রিয়তা সর্বাধিক এবং ইসলামী জীবন ব্যবস্থা, শরা শরীয়ত, সুন্নাহ ও ফিকাহ্‌র উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত।

তরীকাহ-ই-কাদ্‌রিয়াঃ

এই তরীকাহ্‌র প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হযরত গাউসুল আজম মহীউদ্দিন শেখ সৈয়দ আব্দুল কাদের জীলানী (রঃ) (১০৭৮-১১৬৬ খৃঃ)। তিনি পারস্যের গীলান বা জীলান প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা সৈয়দ আবু সালেহ ছিলেন একজন ওলী-এ-কামেল। স্থানীয় বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি আঠার বছর বয়সে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য বাগদাদ গমন করেন। সেখানে তিনি কুরআন, তাফসীর, ফিকহ, মানতিক, তাসাউফ প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা লাভ করেন।

"তিনি বাগদাদের তদানীন্তন বিখ্যাত সূফী আবুল খায়র মুহাম্মদ বিন মুসলিম দরবেশের নিকট (মৃত্যুঃ ১১৩১ খৃঃ) তাসাউফের শিক্ষা লাভ করেন, অতঃপর বাগদাদের হাম্বলী মাদ্রাসার অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং উক্ত মাদ্রাসার অধ্যক্ষ কাজী আবু সা'দ মুবারাক আল মুখাররমীর নিকট থেকে খিরকা বা সূফীদের বিশিষ্ট পরিধান লাভ করেন"।[১] "তিনি ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ একজন বাগ্মী, পবিত্র চেতা মহাপুরুষ ও অসাধারণ শক্তিশালী সূফী-সাধক" তিনি বহু ইহুদী ও খৃষ্টানকে ইসলামে দীক্ষিত করেন"।[২]

তিনি অনেক ধর্মীয় গ্রন্থ রচনা করেন। এদের মধ্যে (১) আল গুনইয়া লি-তালিবি - তরীক আল হক, (২) আল ফতহুর রব্বানী, (৩) ফুতুহুল গায়ব, (৪) জলাউল খাতির, (৫) হিজব-বাশায়েরুল খয়রাত, (৬) রাহমাতুল আসরার ইত্যাদি বিশেষ প্রসিদ্ধ। এ কিতাবগুলিতে হযরত আব্দুল কাদের জীলানী আইনবিদ হিসাবে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ১১৩৪ খৃঃ তিনি বাগদাদের হাম্বলী মাদ্রাসার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি এ মাদ্রাসায় (৩৩ বছর ধরে) অধ্যাপনা করেন। "তিনি একটি খানকাহ্‌রও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। মাদ্রাসা ও খানকাহ্ উভয়ই ১২৫৮ খ্রষ্টাব্দে মোঙ্গলগণ কর্তৃক বাগদাদ ধ্বংস হওয়ার সময় বিনষ্ট হয়"।[৩]

১। আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯০।

২। Saiyed Abdul Hai, opcit, p-166.

৩। আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯১।

Dhaka University Institutional Repository

<u>তরীকাহ-ই-কাদরিয়ার তা'লীমঃ</u> এ তীরকাহর খাস তা'লীম হল কালিমা লাইলাহা ইল্লাল্লাহর ১২টি হরফ। "এই ১২টি হরফের মধ্যে দুনিয়ার সমস্ত রহস্য লুকায়িত। এ বিশ্ব জগতের মূলকারণ ও উৎস এ বার হরফ। তাওহীদের প্রকৃত রূপও এ কালিমা। এ বার হরফের মধ্যে কোন নোক্তা নেই। নোক্তা শূন্য হরফের সাহায্যে কলেমার সৃষ্টি কেন হল-তা গভীর রহস্যময়তার অন্ধকারে নিমজ্জিত। এ কালেমাকে চিনলে-জানলে ও সঠিকভাবে তাহকীক করে পড়লে তার কাছে সকল রহস্যের দ্বার উন্মোচিত হয়ে যায়"।[১]

কালেমা প্রধানত ঃ দু'ভাগে বিভক্ত। এর এক ভাগ 'ফানা' যাকে নুজুল বা অবরোহ বলা হয়। আর একভাগকে 'বাকা', যাকে উরুজ বা আরোহ বলা হয়। কালেমার প্রথম অংশ - 'লাইলাহা'কে নফী আর দ্বিতীয় অংশ-'ইল্লাল্লাহ' কে ইসবাত বলা হয়। 'লাইলাহা' বলে শ্বাস গ্রহণ এবং ইল্লাল্লাহ বলে শ্বাস ত্যাগ করাই হচ্ছে নফী ইসবাতের যিক্‌র। এ তরীকাহ্‌পন্থী সূফীগণ একক কিংবা সম্মিলিত ভাবে জোরে (জলী) অথবা নিম্নস্বরে (খফী) যিক্‌র করে থাকেন।

পাঁচ ওয়াক্ত নামায শেষে কিছু নির্ধারিত ওজিফা, বিশেষ সময়ে বিশেষ নিয়মে দুরূদ শরীফ পাঠ করা এবং মুরাকাবা-মুশাহাদায় ধ্যানমগ্ন অবস্থায় থাকার পদ্ধতি বাতলে থাকেন। এ তরীকাহতে চিল্লাকুশীর রেওয়ায়েজ রয়েছে এবং উপ-তরীকা জুনায়েদিয়ার মতে সামার প্রচলন রয়েছে।

হযরত আব্দুল কাদের জীলানী (রঃ) -এর বক্তৃতা, উপদেশ, প্রার্থনা এবং রচনা, প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আল গুনিয়া লি তালিবি তারীক আল হক' এ সংরক্ষিত হয়েছে। "এ গ্রন্থে এমন কিছু নাই যা চরম গোঁড়াপন্থীরও শ্রদ্ধা লাভ করেনা। এ গ্রন্থ সংকলনের বিষয়বস্তু কুরআন ও হাদীসের শিক্ষায় সাথে সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং এতে যে সমূদয় ধর্মীয় অনুশীলনের বিষয় অনুমোদিত হয়েছে তা যে কোনরূপ আপত্তির উর্ধ্বে।"[২]

'আল ফুয়ুদাত আল রব্বানীয়া' গ্রন্থে দেখা যায় যে, কোন লোক কাদ্‌রিয়া তরীকাহ্‌ গ্রহণ করতে চাইলে তাঁকে সিয়াম পালনে এবং রাতে আল্লাহর উপাসনায় মশগুল থাকতে আদেশ দেওয়া আছে। "এই অবস্থায় তাকে চল্লিশ দিন থাকতে হয়। এই সময় যদি কেউ এসে তাকে বলে 'আমি আল্লাহ'। তার উত্তর দিতে হবে যে, 'না' তুমি আল্লাহর মধ্যে। যদি শিক্ষানবীশের প্রমাণের জন্যই এই মূর্তি এসে

১। ফকির আব্দুর রশিদ, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৯৫।

২। A.J.Arberry, Sufism, london, 1950, p-75.

Dhaka University Institutional Repository

থাকে তাহলে তা অদৃশ্য হয়ে যাবে, আর যদি অদৃশ্য না হয় তা হলে বুঝতে হবে যে, তার শিক্ষা নবীশকাল শেষ হয়েছে এবং তিনি কাদ্‌রিয়া তরীকাহ্‌তে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করেছেন"।[১]

কাদরিয়া তরীকাহ্‌ ও তার শাখা-প্রশাখা বাংলাদেশ, ইরাক, ইরান, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ভারত, চীন, ইন্দোনেশিয়া, আরব, মরক্কো, মিশর প্রভৃতি দেশে বিদ্যমান রয়েছে।

তরীকাহ্‌ -ই-চিশ্‌তিয়াঃ

চিশতিয়া তরীকাহ্‌র প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন- এ নিয়ে পন্ডিতগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। কারো কারো মতে, হযরত আলী (রাঃ) এর নবম অধঃস্তন পুরুষ আবু ইসহাক এ তরীকাহ্‌র প্রতিষ্ঠা করেন। আবু ইসহাক এশিয়া মাইনর থেকে হিজরত করে খোরাসানের চিশ্‌ত নামক গ্রামে বসবাস করেন। অন্য পন্ডিতদের মতে, বান্দা নওয়াজ কর্তৃক এ তরীকাহ্‌ প্রতিষ্ঠিত হয়। আবার কারো কারো মতে, চিশ্‌তের খাজা আহমদ আবদাল (মৃত্যুঃ ৯৬৫-৬৬ খৃ) এ তীরকাহ্‌র প্রতিষ্ঠা করেন।[২]

প্রকৃত পক্ষে খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তি (রঃ) ছিলেন এ তরীকাহ্‌র প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ১১৪২ খৃষ্টাব্দে সিবানে জন্মলাভ করেন। ১৪ বছর বয়সে তিনি পিতৃহারা হন। অতপর খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তী খোরাসানের কয়েকটি শহর ঘুরে বাগদাদ এসে উপস্থিত হন। এ সময় তিনি কয়েকজন বিখ্যাত সূফী যেমন- নাজমুদ্দীন কুবরা, শাহাবউদ্দীন সোহরাওয়ার্দী এবং আউহাদুদ্দীন কিরমানের সঙ্গে পরিচিত ও সান্নিধ্য লাভ করেন। ১১৯২ খৃঃ সুলতান মুহাম্মদ ঘোরী 'তরাঈনের যুদ্ধে' জয় লাভ করে দিল্লী অধিকার করেন এবং ভারত উপমহাদেশে স্থায়ী মুসলিম সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। খাজা মঈন উদ্দীন চিশ্‌তী ভারতে আগমন করেন ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আজমীরে গমন করেন। সেখানে খানকাহ্‌ স্থাপন করে বাকী জীবন কাটিয়ে ইসলাম প্রচারের কার্যে কাটিয়ে দেন। ১২৩৬ খৃষ্টাব্দে তিনি সেখানেই ইন্তিকাল করেন। ইন্তিকালের পর আজমীরে তাঁর দরগাহ্‌ তীর্থ ক্ষেত্রে পরিণত হয়।

১। আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯১-৯২।

২। আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর ইন্তিকালের পর ভারতের বিভিন্ন স্থানে চিশ্‌তিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত পীর দরবেশগণ ইসলাম প্রচার করেন। পরবর্তী কালে অর্থাৎ মোগলযুগে দিল্লী চিশ্‌তিয়াপন্থীদের কেন্দ্রে পরিণত হয়। "The rise of Fathpur-Sikri on the ridge of the sikri hills as a great sufic centre in northern India and is establishment as the new Mughal capital was direct result of the Spiritual eminence of shaikh Salim bin Bahaudddin chishti shaikh salim's ancestors were descendants of Baba Farid.

In 1524/25 Shaikh Salim began to pilgrimage to Mecca. He remained abroad for thirteen years visiting Iraq, Syria, Turkey and Iran taking care to reach Mecca in time to perform the annual pilgrimage. Returing to Sikri in 1537-38 he again began living on the uninhabited ridge later to become the site of Mughal Capital. His fame as a hajji, in conjunction with his intens self mortification and meditation, resulted in sikri becoming a centre for sufis, Alims and the poors.

In 1554/55 Shaikh salim made another hajj and again was abroad for some years in 1563/64 he again returned to the sikri ridge, this time constructing a KHANQUH there"১

তরীকাহ্ -ই- চিশতিয়ার সাধনাঃ

"খামসা আনাসীর (পঞ্চভূত); আগুন, পানি, মাটি, বাতাস এবং নূর এর তা'লীম চিশতিয়া তরীকাহ্‌র খাস তা'লীম। "নবী করীম (সঃ) এর শিক্ষানুযায়ী হযরত আলী (রাঃ) এর মাধ্যমে এ তা'লীম হযরত হাসান বসরী (রঃ) লাভ করেন এবং সিনায়-সিনায় -এ তা'লীম হযরত ওসমান হারুনী(রঃ) পর্যন্ত চলে আসে। এ পর্যন্ত এ তা'লীম সুসংবদ্ধ ও সুশৃংখলভাবে লিখিত ছিলনা। হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী এ তা'লীম সুশৃংখলভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে লিপিবদ্ধ করেন এবং অন্যান্য নিয়মপদ্ধতি সুনিয়ন্ত্রিত করেন।"২

এ তরীকাহ্ মতে, পঞ্চভূত হচ্ছে জগতের মূল। এটাকে 'মান আরাফা নাফসাহু'র তা'লীমও বলা হয়। এ তা'লীম লাভ না করা পর্যন্ত কেউ চিশতিয়া তরীকাহ্‌র পীর হওয়ার উপযুক্ত হননা। এ তরীকাহ্‌তেও নোক্তা বিহীন বার হরফ বিশিষ্ট কালিমার যিক্‌র করা হয়। এ তরীকাহ্ মতে যিক্‌রের নিয়ম হল, তাহাজ্জুদ নামাযের শেষে চার জানু হয়ে বসে অতীত পাপের কথা স্মরণ করে ১১ বার 'ইস্তিগফার' পাঠ করতে হয়। অতঃপর দশবার দুরূদ শরীফ, অতঃপর বার তসবীহের যিক্‌র, যেমন, 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' দু'শতবার, 'ইল্লাল্লাহ' চারশতবার, 'আল্লাহু' 'আল্লাহু' ছয়শতবার, 'আল্লাহ' একশতবার"।৩

১। Sayed Athar Abbas rezvi, A History of Sufism in India, Vol. II, New Delthi, 1983-p.p. 279-80.

২। ফকির আব্দুর রশিদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯০।

৩। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য তাসাউফের বিভিন্ন বই পুস্তক দেখা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

এ তরীকাহ মতে, লাইলাহা ইল্লাল্লাহর যিক্‌রে 'আল্লাহ' বলে নিঃশ্বাস গ্রহণ, হু' বলে নিঃশ্বাস ত্যাগ অথবা লাইলাহা বলে নিশ্বাস গ্রহণ এবং ইল্লাল্লাহ বলে শ্বাস ত্যাগ করার নিয়ম আছে। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ শেষে ওজিফা ও মুরাকাবা মুশাহাদার উপর জোর দেয়া হয়।

এ তরীকাহতে 'সামা' 'ধর্মসঙ্গীত' ও 'চিল্লাকুশী' করার নিয়ম আছে। আফিম, ভাঙ্গ, তামাক, মাদকদ্রব্য ইত্যাদি চিশতিয়া সূফীদের জন্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, বার্মা, চীন ও মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশে এ তরীকাহ বিস্তার লাভ করে।

<u>তরীকাহ্-ই-নক্‌শ্ বন্দিয়া</u>

তরীকাহ্-ই-নক্‌শ্ বন্দিয়ার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন খাজা মুহাম্মদ বাহাউদ্দীন মুহাম্মদ নক্‌শবন্দ আল বুখারী (রঃ)। তিনি ৭০৮/৭১৮ হিজরীতে মধ্য এশিয়ার বুখারায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন মুহাম্মদ বুখারী। পিতার মৃত্যুর পর তিনি আঠার বছর বয়সে গৃহ ত্যাগ করে সম্মায় বিদ্যা শিক্ষা লাভ করেন এবং সেখানে মুহাম্মদ বাবা আল সাম্মাসীর নিকট আধ্যাত্মিক সাধনার দীক্ষা গ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে আল সাম্মাসী বাহাউদ্দিন বুখারীকে খলীফা নিযুক্ত করেন। 'পীররূপে' পরিগণিত হবার পর তিনি যে দিকে দৃষ্টি ফেরাতেন, সেদিকেই 'আল্লাহ', নামের নক্‌শা অঙ্কিত হয়ে যেত। এজন্য তাঁকে নক্‌শবন্দ এবং তার প্রতিষ্ঠিত তরীকাহ 'নক্‌শবন্দিয়া' নামে অভিহিত করা হয়েছে"।[১]

<u>এ তরীকাহর তা'লীমঃ</u> নক্‌শবন্দিয়ার প্রধান সাধনা হল ছয় লতিফা, যেমন- কলব, রূহ, নফস, সীর, খফী ও আখফা এবং আরবায়ে আনাসীর, যেমন, অগ্নি, পানি, মাটি ও বায়ু এর ভিন্ন ভিন্ন মুরাকাবা। এছাড়া হাযরাতুল খামস্যর মুরাকাবা ও এ তরীকাহর তা'লীম - (১) সায়ের ইলাল্লাহ, (২) সায়ের ফিল্লাহ, (৩) সায়ের আনিল্লাহ, (৪) আলম-ই-মিসাল এবং (৫) আলম-ই-শাহাদতকে 'হাযরাতুল খামস' বলা হয়।

এই গোপন তা'লীম নবী করীম (সঃ) থেকে হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ)-এর মাধ্যমে পীর পরম্পরায় হযরত বাহাউদ্দিন নক্‌শবন্দ পর্যন্ত সিনায় সিনায় এসে পৌঁছেছে। এসব তা'লীম লিপিবদ্ধাকারে ছিলনা। হযরত বাহাউদ্দিন তা সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে লিপিবদ্ধ করেন।

১। আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯২।

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নস্বরে যিক্‌র করার পক্ষপাতি এ তরীকাহ্‌তে আটটি জিনিসের উপর বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়। যথা,

"(১) নজর বর কদম (পীরের অনুসরণ করা),

(২) সফরদার ওয়াতন (দেহরাজ্যে পরিভ্রমণ করা) ;

(৩) খিলাওয়াত দ্বার আঞ্জুমান (চুপি চুপি বাক্যালাপ) ;

(৪) ইয়াদ কারদান (সার্বক্ষণিক যিক্‌রে মশগুল থাকা) ;

(৫) বাযগাস্ত (আল্লাহর প্রতি ধাবিত হওয়া) ;

(৬) নেগাদাস্ত (আল্লাহতে অন্তর্দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা) এবং

(৭) ইয়াদ দাস্ত বা খোদাগোযাস্ত (নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়ে আল্লাহকে চিরজাগ্রত রাখা)"।[১]

তরীকাহ্‌-ই- মুজাদ্দিদিয়াঃ

এ তরীকাহর প্রতিষ্ঠাতা হলেন- হযরত শেখ আহমদ ফারুকী সির হিন্দী মুজাদ্দিদ আলফে সানী (রঃ) (১৫৬১-১৬২৪ খৃঃ)। তিনি হিজরী দ্বিতীয় সহস্রের প্রারম্ভে তাঁর সংস্কার কাজ শুরু করেছিলেন বলে তাঁকে মুজাদ্দিদ আলফে সানী বা 'দ্বিতীয় সহস্রের সংস্কারক' বলা হয়। তিনি সম্রাট আকবরের শাসনামলে অনৈসলামিক কার্যকলাপ ও তার দ্বীন-ই-ইলাহীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে ছিলেন। তিনি ভারত বর্ষের সিরহিন্দ নামক স্থানে জন্ম লাভ করেন। তাঁর পিতা হযরত মাখদূম আব্দুল আহাদ একজন ওলী-এ-কামিল লোক ছিলেন। স্বীয় পিতার নিকট তিনি প্রথম মা'রিফাতের সবক গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি খাজা বাকী বিল্লাহ নকশ্‌বন্দ (রঃ) এর নিকট মুরীদ হন এবং অচিরেই খিলাফত লাভ করেন। তিনি ভারত বর্ষে, শিরক, বিদ'আত, কুফর প্রভৃতিরও মূলোচ্ছেদ করে প্রকৃত ইসলামী জীবন ধারার বীজ পুনরায় রোপন করেন। তিনি স্বীয় পীর ও মুর্শিদ কর্তৃক প্রদত্ত নকশবন্দিয়া তরীকাহর মধ্যে কিছু নতুন নিয়ম প্রক্রিয়া, মাকাম ও জজবার সংযোজন করেন"।[২] ১৬২৪ খৃঃ তিনি সিরহিন্দে ইন্তিকাল করেন।

এ তরীকাহর তা'লীমঃ নকশ্‌ বন্দিয়ার মত মুজাদ্দিদিয়া তরীকাহর মুল তা'লীম হল লাতায়িফে সিত্তা, আনাসীরে আরবা', হাযরাতুল আনাসীর ও হাযরাতুল খামসের মুরাকাবা। "তবে তিনি হাযরাতুল খামসকে নতুন নিয়মে লিপিবদ্ধ করেন। যেমন নকশ্‌বন্দিয়া তরীকাহ্‌ মতে, সায়ির ইলাল্লাহকে বেলায়েতে সুগরা এবং সায়ির ফীল্লাহকে বেলায়াতে কুবরা নামকরণ করেন। আহাদিয়াতের তরফে

১। মাওলানা আব্দুর রাহীম হাযারী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮৩।

২। ফকির আব্দুর রশিদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০১।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি পূর্বেকার স্তর থেকে ১৬/১৭ টি স্তরের উর্ধ্বস্থিত স্তর বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বেলায়াতে উলিয়া বা উর্ধ্বস্থিত বেলায়াতকে নবুয়াতের পর্যায়ভূক্ত মাকাম বলে মন্তব্য করেছেন''।[১]

এ তরীকাহ্‌র সমর্থক সূফীগণ যিক্‌রে খফীর পক্ষপাতী। ঐশী প্রেমমূলক 'সামা' সঙ্গীত এতে নিষিদ্ধ। তবে বাদ্যহীন হাম্‌দ নাতকে সমর্থন করা হয়েছে।

<u>তরীকাহ্‌-ই-সোহরাওয়ার্দীয়াঃ</u> শেখ নজীব উদ্দিন আব্দুল কাদির সোহরাওয়ার্দী এই তরীকাহ্‌র প্রতিষ্ঠাতা। তিনি জিবালের সোহ্‌রাওয়ার্দী নগরে ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজামিয়া কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং হাদীস শাস্ত্রে বিশেষ বুৎপত্তি অর্জন করেন। তারপরে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শাহাবউদ্দীন উমর বিন আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী এ তরীকাহ্‌র বিশেষ উৎকর্ষ সাধন করেন। অনেক দূর দূরান্তর থেকে শ্রোতারা তাঁর আলোচনা শোনার জন্য তাঁর খানকাহ্‌তে আগমন করত। মুসলমান শাসকগণও তাঁকে অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতেন। ১২৩১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হজ্জ পালন করতে গিয়ে হযরত কবি ওমর বিন আল ফরীদের সংস্পর্শে আসেন। তিনি 'আওয়ারিফুল মা'আরিফ' নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের রচয়িতা। "সোহরাওয়ার্দীয়া তরীকাহ্‌ মূলতঃ কাদ্‌রিয়া তরীকাহ্‌ থেকে উদ্ভূত একটি উপ-তরীকাহ্‌। এ তরীকাহ্‌র তা'লীম অনেকটা কাদরিয়া তরীকাহ্‌র মতই''।[২]

<u>তরীকাহ্‌-ই মাদারিয়াঃ</u> বদীউদ্দীন শাহ মাদার এ তরীকাহ্‌র প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তাঁর পিতা আবূ ইসহাক-শামী সিরিয়ার অধিবাসী ছিলেন। তিনি ১৩১৫ খৃঃ সিরিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪৩৬ খৃঃ কানপুর জেলার মকনপুরে ইন্তিকাল করেন।

বদীউদ্দীন শাহমাদার পাক-ভারত-বাংলা উপ-মহাদেশে গুজরাট-আজমীর, কণৌজ, জৌনপুর, লক্ষৌ, কানপুর প্রভৃতি অনেক জায়গা সফর করেন। উত্তর বঙ্গে মাদারের 'বাঁশ তোলা' অনুষ্ঠান ঘটা করে পালন করা হয়। তিনি বাংলাদেশে এসেছিলেন কিনা সঠিক বলার উপায় নেই। তবে ডঃ এনামুল হকের বরাত দিয়ে আব্দুল করিম বলেছেন, "ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর, চট্টগ্রাম জেলার মাদার বাড়ী এবং মাদারশা ইত্যাদি এলাকাগুলি বদীউদ্দীন শাহ মাদারের নাম বা মাদারিয়া তরীকাহ্‌র স্মৃতি বহন করছে''।[৩] বিভিন্ন দরগাহের পুকুরের মাছ বা কচ্ছপ মাদারী রূপে এখনও লোকের সম্মান পেয়ে থাকে।

১। মাওলানা আব্দুর রাহীম হাযারী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮৬।
২। মাওলানা আব্দুর রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮৭।
৩। আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

তরীকাহ্-ই-শত্তারিয়াঃ- লোদী সুলতানদের আমলে শাহ আব্দুল্লাহ (মৃঃ ১৪৮৫ খৃঃ) এই তরীকাহ্ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ তরীকাহ্র মূলনীতি গুলো হল,

(১) "ফানাবাদ বা আত্ম বিলোপন নয়, বরং আত্মসচেতন ও আত্ম স্বীকৃতির উপরই রয়েছে আল্লাহ্ প্রাপ্তির সম্ভাবনা।

(২) মুরাকাবা বা ধ্যানে কখনও দিব্যজ্ঞান লাভ হয় না এবং তা দ্বারা সত্যে উপনীত হওয়া যায়না।

(৩) অস্তিত্ববোধ লাভ করার পর তওহীদের একত্বাধীন নেতৃত্বে বাস করাই প্রকৃত সূফী ধর্ম ও সূফী কর্ম।

(৪) তাসফিয়া-ই-নফ্স তথা পাশব প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে আত্মশুদ্ধি বা আত্মসংযমের প্রয়োজনীয়তা নিরর্থক।

(৫) একত্ববাদের ধর্ম ইসলাম। ইসলাম কখনও দ্বৈতবাদ স্বীকার করে না।"[১]

তরীকাহ্-ই-কলন্দরিয়াঃ "ভ্রাম্যমান ফকীরদেরকে 'কলন্দর' বলা হয়। ইরানে কলন্দরিয়া তরীকাহ্র জন্ম হয়। কিন্তু অন্যান্য তরীকাহ্র মত এ তরীকাহ্র কোন বিশেষ নীতি ছিল কিনা তা জানা যায়না। স্পেনের জনৈক ইউসুফ বা পারস্যের শেখ জামাল উদ্দীনকে কলন্দরিয়া তরীকাহ্র প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। তাদের নির্দিষ্ট কোন আবাস স্থল ছিলনা। কোন বিশেষ বিধিবদ্ধ নীতি ছিল না, ধর্মীয় আইন বা সমাজের সঙ্গেও কোন বিশেষ সংশ্রব ছিলনা। কলন্দররা মুসলিম বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই ছিল এবং বাংলা- পাক- ভারতেও তাদের অস্তিত্ব ছিল"।[২]

তরীকাহ্-ই-মৌলাবিয়াঃ হযরত মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমী (১২০৭-১২৭৩) ছিলেন এ তরীকাহ্র প্রতিষ্ঠাতা। তুরস্কে এ তরীকাহ্র উৎপত্তি ঘটে এবং উসমানীয় খলীফাদের আমলে এ তরীকাহ্ সর্বশেষ শক্তিশালী তরীকাহ্ হিসাবে পরিগণিত হয়। এ তরীকাহ্তে সামাকে বেশী জোর দেয়া হয়। যিকর ও সামার সাথে নৃত্যের তালে তালে এ তরীকাহ্র অনুসারীরা জজবার হালত লাভ করেন।

তরীকাহ্-ই-ওয়ায়সিয়াঃ হযরত ওয়ায়েস আল কুরনী (রঃ) এ তরীকাহ্ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বাতিনী পন্থায় নবী করীম (সঃ) থেকে তাওয়াজ্জুহ্ ও ইলম-ই-লাদুনী লাভ করেন। তিনি নবী করীম (সঃ) এর গায়ের জুব্বা লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত তরীকাহ্ শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল।

১। মাওলানা আব্দুর রহীম হাযারী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮৯।

২। আব্দুর করিম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৩-৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

<u>তরীকাহ্-ই-সেনুসিয়াঃ</u> শেখ মুহাম্মদ ইবনে আলী আল সানুসী(রঃ) (মৃঃ ১৮৩৭ খৃ) ছিলেন সেনুসিয়া তরীকাহ্র প্রতিষ্ঠাতা। এ তরীকাহ্পন্থীগণ ছিলেন মালিকী মাজহাবের অনুসারী। নৈতিক চরিত্র গঠন ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলই এ তরীকাহ্র অভীষ্ট লক্ষ্য।

<u>তরীকাহ্-ই-হাতিমিয়াঃ</u> এ তরীকাহ্র প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মহীউদ্দিন ইবনুল আরাবী (১১৬৫-১২৪০খৃঃ)। এ তরীকাহ্র মতবাদকে সর্বেশ্বরবাদ বলা হয় ঠিকই কিন্তু তা মূলতঃ পাশ্চাত্য দর্শনের ন্যায় সর্বেশ্বরবাদ নয়। এটা কাদ্রিয়া তরীকাহ্র একটি শাখা।

<u>তরীকাহ্-ই-আদহামিয়াঃ</u> হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম বলখী (রঃ)(মৃঃ ৭৭৬-৭৮৩হিঃ)-এ তরীকাহ্র প্রতিষ্ঠাতা। এটি চিশ্তিয়া তরীকাহ্র একটি শাখা। সিরিয়া, তুর্কিস্তান, সমর কন্দ ও বুখারায় এ তরীকাহ্র প্রভাব ছিল। ভারত, বাংলাদেশ পর্যন্ত এ তরীকাহ্ বিস্তার লাভ করেছিল ।

<u>সূফী দর্শনের গুরুত্ব ঃ</u>

ইসলাম শুধুমাত্র একটি তথাকথিত অনুষ্ঠানসর্বস্ব ধর্মমাত্র নয়। এটা মানব জীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন ও জীবন ব্যবস্থা এবং সর্বজনীন ধর্ম। ইসলামের মূল লক্ষ্য হল মানুষের সমগ্র সত্তার বিকাশ সাধন। দেহসর্বস্ব নয়, দেহ ছাড়াও মানুষের আরও একটি রূপ আছে তা হল আত্মা। দেহ ও আত্মার সমন্বয়কে বলা হয় মানুষ। মৃত্যুর পর দেহ ক্ষিতি (খাক), অপ (আব), তেজ (আতস) ও মরুৎ (হাওয়া) এ চতুর্ভূতে মিলিত হয়, আর আত্মা বিশ্ব আত্মায় বিরাজ করে। দেহবিহীন আত্মা আমরা উপলব্ধি করতে পারিনা । কাজেই আত্মা ও দেহ এ দুয়ের মিলিত রূপই মানুষ। আর মানুষের সামগ্রিক দিকের উন্নয়নই ইসলামের লক্ষ্য। সূফী দর্শন এই আত্মিক দিকের পরিণতি।

"মানুষ যে জড় পদার্থের বিবর্তন নয় কিংবা দেহ বিলোপেই যে মানুষের অস্তিত্বের বিলোপ ঘটবেনা- এ জীবন এক মহাজীবনের পর্ব-সূফীদর্শনের এ প্রতিপাদ্য, বিষয়গুলো মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেছে। জীবনের এক চিরন্তন দিক উন্মোচন করে সূফী মতবাদ মানুষের নিত্য সত্তার অধিকার দিয়েছে স্রষ্টা ও সৃষ্টি, দেহ ও আত্মা, পার্থিব ও অপার্থিব জীবনের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে জীবনের মূল্য বোধকে উন্নীত করেছে" ।[১]

১। ডঃ রশিদুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

সূফী দর্শন মানুষের হৃদয়ের পবিত্রতার উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে থাকে। কারণ, হৃদয় হল আল্লাহ্ ও মানুষের মিলন কেন্দ্র। কেননা, আল্লাহ্ পাক বলেছেন, "কাদ আফলাহা মান যাক্কাহা ওয়া কাদ খাবা মান দাস্সাহা।" অর্থাৎ "নিশ্চয়ই ঐ ব্যক্তি পরিত্রাণ পেয়েছে যে তার আত্মিক পবিত্রতা অর্জন করতে পেরেছে। আর সেই ধ্বংস হয়েছে যে তার আত্মিক পবিত্রতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছে।"[১] সুতরাং সূফী দর্শন ধর্মের নিরস রীতি নীতির মধ্যে প্রেমরস প্রবাহিত করে আল্লাহ ও মানুষকে বাধনে বেধেছে।

"সূফীরা উদার নীতির ধারক বাহক। সকল মুসলমান তথা সকল সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে তারা উদারতার মাধ্যমে মিলন সেতু রচনার প্রয়াসী। মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে , গোত্রে গোত্রে, বর্ণে বর্ণে দেশকাল পাত্রের মধ্যে তারা সর্ব প্রকার বিভেদ ও হানাহানির উর্ধ্বে"।[২] সূফীরাই তাই প্রকৃত মনুষ্যত্বের উদগাতা। তাদের মতে, "ধর্মে ধর্মে কোন মৌলিক প্রভেদ নেই। কারণ, সব ধর্ম একই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত । সুতরাং কোন ব্যক্তি কোন ধর্মাবলম্বী, কিংবা কোন ব্যক্তি কি কি আচার-অনুষ্ঠান পালন করল তা মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। ইবাদতের শেষ ও চূড়ান্ত লক্ষ্য আল্লাহ এবং বিভিন্ন ধর্ম বিভিন্ন উপায়ে একই আল্লাহকে পেতে চায়। আল্লাহ সর্বত্র ও সব ধর্মে উপস্থিত এবং তিনি কোন গোষ্ঠী বা জাতি বিশেষের একচেটিয়া সম্পদ নন"।[৩] হয়ত এদিকে ইংগিত করেই কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন,

> "মানুষে মানুষে জাতি জাতিতে অন্ধকারের এ বিভেদ জ্ঞান
> অভেদ আহাদ মন্ত্রে টুটিবে সকলে হইবে এক সমান"।[৪]

সূফী দর্শন ধর্মের গোঁড়ামী ও যুক্তি প্রবণতার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। রক্ষণশীল মুসলিম সম্প্রদায় যখন কেবল কুরআন ও হাদীসের আক্ষরিক ব্যাখ্যা প্রদান করেছে তখন অন্যদিকে মুক্তবুদ্ধি মুতাযিলা সম্প্রদায় প্রজ্ঞার সাহায্যে ধর্মীয় সমস্যার সমাধান দিয়েছেন। তবে তাঁদের কোন দলই সত্য লাভ করতে সমর্থ হয়নি। সূফীগণ উভয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে জীবনের এক নব দিগন্তের নির্দেশ দান করে।

যুগে যুগে যখন মানুষ জড়বাদ ও বুদ্ধিবাদের আবর্তে পড়ে জীবনের উচ্চতর মূল্যবোধ সম্পর্কে দিশেহারা হয়েছে, মুসলমানদের জীবনে যখন পার্থিবতা প্রাধান্য পেয়েছে এবং শক্তির মদমত্তায় নিমগ্ন সেই সঙ্কটময় মুহূর্তে সূফীরা তাদের

---

১. আল কুরআন, সুরা৮৭ আয়াত- ১৪-১৫
২। ডঃ রশিদুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৮৯।
৩। রফিকা আক্তার রশিদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬২।
৪। কাজী নজরুল ইসলাম, ইসলামী কবিতা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, কভার পৃষ্ঠা।

Dhaka University Institutional Repository

শুনিয়েছে আশার বাণী ও দিয়েছে অভয়। জড়বাদ মানুষের যে অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছে, বুদ্ধিবাদ সে শূন্যতা ভরে দিতে পারেনি, সূফীবাদ দৈহিক ও আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের মধ্যে সেতু নির্মাণ করে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়েছে।

বৈজ্ঞানিক সাধনার ইতিহাসে আজ মানুষ দৃপ্তকণ্ঠে তার বিজয় বার্তা ঘোষণা করেছে। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে -সর্বত্র তাঁর বিজয় নিশান উড়ছে। মানুষ আজ গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে নির্ভিক গতিবেগে ছুটে চলছে, জীবনের সকল প্রতিকূল পরিবেশে আজ সে অকুতোভয়। বিছানায় দেহ এলিয়ে দিয়ে সুইচ টিপে সে যোগাযোগ রাখছে বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে, অতল সিন্ধু তন্ন তন্ন করে পেয়েছে মণি মানিক্য। আবার মানুষ জরাকে জয় করে পেয়েছে স্বাস্থ্য , মরুভূমি কর্ষণ করে পেয়েছে শস্য সম্ভার, গুহাবাসী নিরাশ্রয় বনি আদম আজ আকাশচুম্বী অট্টালিকার প্রতিষ্ঠাতা। এসব হল মানব জীবনের বৈজ্ঞানিক সাফল্য। তাই প্রশ্ন উঠে আধুনিক বস্তুতান্ত্রিক কমপিউটার জীবন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সূফী দর্শন মানানসই কিনা?

বিজ্ঞানের এসব বিস্ময়কর আবিস্কার মানুষের দৈনন্দিন জীবনে একান্ত প্রয়োজন হলেও বিজ্ঞানের এ বিজয় গৌরব মানুষকে প্রকৃত সুখ ও শান্তি দিতে ব্যর্থ হয়েছে। মানুষ হয়েছে জড়বাদী, বস্তুতান্ত্রিক। কিন্তু দৈহিক আকাংখার পরিতৃপ্তি জীবনের পূর্ণতার পরিচায়ক নয়। "জীবনের পূর্ণাঙ্গ মূল্যবোধের সাথে জড়িত রয়েছে মানুষের দৈহিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ। জীবনের পরিপূর্ণ উপলব্ধির জন্য দেহের অনুশীলনের সাথে মন ও আত্মার অনুশীলনও অপরিহার্য"।[১] সূফীবাদ মানুষের আধ্যাত্মিক স্বরূপের নির্দেশ দান করে তার জীবনকে পরিপূর্ণ করে শূন্যতা হতে রক্ষা করে। কাজেই বলা যায় যে, সূফীবাদ বস্তুতান্ত্রিক জীবন ব্যবস্থার মধ্যে পূর্ণতা আনয়নের জন্য একান্ত আবশ্যক।

জীবন জগতের সুষ্ঠ উপলব্ধিতে সূফী দর্শনের কোন কার্যকারিতা আছে কিনা ? এক্ষেত্রেও সূফীদর্শনের গুরুত্ব অপরিহার্য। সূফী চিন্তাধারা কিভাবে বিজ্ঞান ও শিল্প অধ্যুষিত জীবন দর্শনকে পরিপুষ্ট করতে পারে সে সম্পর্কে ডঃ রশীদুল আলম যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন- এখানে তার সার নির্যাস তুলে ধরা হল,

প্রথমতঃ প্রাণীতত্ত্বের দিক দিয়ে মানুষ দৈহিক সত্তা, কতকগুলি শরীর বৃত্তীয় নিয়মাধীনে তার দেহ চালিত হয়। মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ হতে মানুষ চিন্তা অনুভূতি ইচ্ছা সম্পন্ন হয় । তাই মানুষ কেবল দৈহিক ও মানসিক সুখেই তৃপ্ত থাকতে চায়না। সে চায় অন্তরের গভীরে পরম প্রিয়জনের সান্নিধ্যে সব কিছুই উজাড় করে

১। ডঃ রশিদুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৯০।

Dhaka University Institutional Repository

ঢেলে দিতে। সুতরাং মানুষের জীবন বোধকে পরিপূর্ণ করতে, তার স্বভাবের পূর্ণ বিকাশের জন্য দেহের সাথে মনের, মনের সাথে আত্মার যোগাযোগ স্থাপন অপরিহার্য। সূফী দর্শন মানুষের স্বভাবের পূর্ণ চিত্র বিশ্লেষণ করে মানুষকে আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করে।

দ্বিতীয়তঃ মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে পার্থিব আবেদনের মত অপার্থিব বিষয়ের আবেদনও তার জীবনে কম নয়। কাব্য, শিল্পকলা, ধর্ম ইত্যাদির উৎস ইন্দ্রিয়ানুভূতি নয়, এদের জন্ম হৃদয়ের সুক্ষ অনুভূতি থেকে। কোন জাতির অভ্যুত্থানের সময় সে জাতি দেশ বিজয়, দেশ রক্ষা ও অভ্যন্তরীণ শৃংখলা নিয়ে মেতে থাকে। আবার সমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সে জাতি সর্বশক্তি নিয়োগ করে সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম, সর্বপ্রকার সুক্ষ্ম ও কোমল বৃত্তির অনুশীলনে। এতে বুঝা যায়, মানুষ একদিকে জড় উদ্ভিদ প্রাণী জগতে সমগোত্রীয়, অন্য দিকে সে আত্মিক শক্তিতে মহীয়ান ও গরীয়ান।

তৃতীয়তঃ বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টি ভঙ্গি মানুষের হৃদয়ে উপলব্ধি ও সংশয় এনেছে। তার সুস্থ চিন্তাকে করেছে আচ্ছন্ন এবং তার অস্তিত্বের সীমাহীন সম্ভাবনা খর্ব করেছে। মানুষ পথহারা পথিকের মত দৈহিক আবেদন চরিতার্থ করতে উঠে পড়ে লেগেছে। সূফীদর্শন মানুষের বিভ্রান্তিকর পরিবেশে পূর্ণ জীবনবোধের চিত্র সামনে ধরে মানুষের হারানো সম্পদ ফিরিয়ে দিতে পারে।

চতুর্থতঃ জড়বাদের ঘেরাটোপে পড়ে আজ মানুষের মন মোহগ্রস্ত ও বিভ্রান্ত। বিভ্রান্ত মানুষ আজ দেহের তাড়নায় দিক বিদিক জ্ঞানশূন্য। জড়বাদের প্রভাব আজ মানুষের সত্য সুন্দর কল্যাণের আদর্শের মূলে কুঠারাঘাত হানছে। জড়বাদের এ আসুরিক শক্তির কবল থেকে সূফী দর্শন মানুষকে ফিরিয়ে দিতে পারে তার হৃদয়স্পন্দন,আন্তর্জাতিক অশান্তির আগুন নিভিয়ে দিতে পারে শান্তির আবেহায়াত।

পঞ্চমতঃ পাশ্চাত্যের অভিজ্ঞতা ভিত্তিক বুদ্ধিবাদ ও প্রাচ্যের আধ্যাত্মবাদ যেদিন মানব দর্শনকে নবরূপে রূপায়িত করবে, সেদিন বুদ্ধিবাদ ও সূফী দর্শনের সমন্বয় সাধিত হবে। সেদিন জীবনের পরিপূর্ণ রূপ মানুষের সামনে উদ্ভাসিত হবে। সেদিন দেশ কাল পাত্রের ভেদ ঘুচে যাবে ও অভেদ ধর্ম জাতি গড়ে উঠবে। আজিকার দিশেহারা মানব জাতির সম্মুখে সূফী দর্শন এক বলিষ্ঠ জীবন প্রত্যয় নিয়ে হাজির হয়, প্রীতি প্রেমের পূর্ণবাধনে সব দুর্গতি নাশ করতে মানব জাতিকে আহবান জানায়"।[১]

১। ডঃ রশিদুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৯০-৯১।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

সূফী সাধকগণের অবদান

(১৭৫৭ - ১৮৫৭)

Dhaka University Institutional Repository

হযরত পীর ফতেহ আলী (রঃ)

(জন্মঃ ১০৯০ বাং/১৬৮৩ইং - মৃঃ ১১৮৩ বাং/১৭৭৬ইং)

হযরত পীর ফতেহ আলী[১] (রঃ) ১০৯০ বাংলা/১৬৮৩ইং সনে জন্মগ্রহণ করেন । ভারত বর্ষের অম্বারা (?) নামক স্থানে মুহাম্মদ হুসাইন শাহ্ নামক জনৈক সাধক বাস করতেন । তাঁর দ্বিতীয় পত্নীর নাম ছিল বিবি হামযা । হযরত পীর ফতেহ আলী (রঃ) ছিলেন এই পত্নীর সন্তান । শৈশবে তিনি হাই মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেন । অতঃপর একাধিক কামিল মুরশিদ-এর কাছে মা'রিফাত তত্ত্বে বুৎপত্তি অর্জন করেন । তিনি আল্লাহ তা'আলার যিকর-এ মশগুল থাকতেন । এক পর্যায়ে তিনি গৃহ ত্যাগ করে সুদূর চীন দেশে গমন করেন । চীনে আঠার বছর অতিবাহিত করে আজমীর শরীফে ফিরে আসেন । আজমীর শরীফে কিছুকাল অবস্থান করার পর বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন । বাংলার অনেক স্থান ভ্রমণ করার পর অবশেষে ১১৬৫ বাংলা/১৭৫৮ইং সনে বগুড়ার করতোয়া নদীর তীরবর্তী নবাব বাজারে খানকাহ্ স্থাপন করেন । তিনি অতি সরল প্রকৃতির ওলী আল্লাহ ও প্রখ্যাত 'আলিম ছিলেন । তিনি উর্দু, ফারসী ও আরবী ভাষায় সুপন্ডিত ছিলেন । পীর ফতেহ আলী (রঃ) সদা সর্বদা আল্লাহ প্রেমে মগ্ন থাকতেন । তাঁর কার্যকলাপ থেকেই তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায় । তাঁর খানকাহ্ থেকে মাত্র কয়েক হাত দূরে কালী মন্দির ছিল । অথচ এই মযজুব অলী কালী মন্দির ও পূজা-অর্চনার বিরুদ্ধে কখনও কোন আপত্তি উত্থাপন করেননি । হিন্দু নর-নারীর কার্যকলাপে কখনও বাধার সৃষ্টি করেননি । বরং দেব-মন্দিরের পাশে খানকাহ্ স্থাপন করে নিজ ধর্মের মহিমা প্রকাশে তৎপর ছিলেন ।

মাওলানা পীর ফতেহ আলী (রঃ) ১১৮৩ বাংলা ১৭৭৬ইং সনে ৯৩ বছর বয়সে নিজ খানকাহতে ইনতিকাল করেন এবং বগুড়ার করতোয়া নদীর তীরবর্তী নবাব বাজারে তাঁকে সমাহিত করা হয় ।[২]

সায়্যিদ শাহ্ আবুল হাসান যাকির আলী

(১৬৯৯-১৭৭৮)

সায়্যিদ শাহ আবুল হাসান যাকির আলী গাওছুল আজম শায়খ আবদুল কাদির জীলানী (রঃ)-এর বংশধর ছিলেন ।[৩] তাঁর পিতার নাম সায়্যিদ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ । প্রচলিত প্রথানুসারে যাহিরী ও বাতিনী ইলম শিক্ষার জন্য বিখ্যাত 'আলিম এবং ওলীয়ে কামিল-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে থাকলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি হযরত গাওছুল আজম এর রূহানী ফয়েয থেকে শিক্ষা লাভ করেছিলেন । ফলে, অতি অল্প বয়সে তিনি উভয় বিদ্যায় কামালিয়াত হাসিল করেন এবং বাগদাদে তা'লীম ও তালকীনের কাজে রত হন । অতঃপর ১১৮০হিঃ/১৭৬৬ইং হযরত শায়খ আবদুল কাদির জীলানী

১। কলিকাতার মানিকতলায় সমাহিত শাহ্ সূফী ফতেহ আলী এবং বগুড়ায় করতোয়া নদীর তীরবর্তী নবাব বাজারে সমাহিত হযরত পীর ফতেহ আলী উভয়ে স্বতন্ত্র ব্যক্তি ছিলেন ।

২। গোলাম সাকলায়েন, বাংলাদেশের সূফী সাধক, পৃঃ ৫৯-৬০ ।

৩। মাওলানা এম, উবাইদুল হক, বাংলাদেশের পীর-আউলিয়াগণ, পৃঃ ৯৮; মাওলানা নুরুর রহমান, তাযকেরাতুল আওলিয়া, খন্ড-৬, পৃঃ ২৪৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

(রঃ) এর নির্দেশক্রমে বাংলাদেশের লোকদেরকে হিদায়াত করার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে বীরভূম শহরে এসে উপনীত হন এবং ইসলাম প্রচারে রত হন ।

১১৯২হিঃ/১৭৭৮ইং ভারতের বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটে ইন্তিকাল করেন এবং মঙ্গলকোটেই সমাহিত হন ।[১]

শাহ্ নূরী (রঃ)
(মৃত্যুঃ ১৭৮৬ইং)

বিশিষ্ট বুযুর্গ হযরত শাহ্ নূরী (রঃ) ঢাকার বড় মগবাজার দায়েরার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন । তাঁর মূল বাসস্থান ঢাকা নিউমার্কেটের পূর্বদিকে বাবুপুরা মহল্লায় ছিল । এই মহল্লাটি বাদশাহ্ আলমগীরের আমলে (১৬৫৮-১৭০৭) অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ ছিল । শাহ্ নূরীর পিতার নাম ছিল মাওলানা শায়খ আবদুল্লাহ্ মুজাদ্দিদী ও দাদার নাম শায়খ গুলাম মুহাম্মদ মুজাদ্দিদী । গুলাম মুহাম্মদ একজন 'আলিম ও বিজ্ঞলোক ছিলেন । তিনি মুজাদ্দিদ-ই-আলফ-ই-সানি শায়খ আহম্মদ সিরহিন্দী (মৃত্যুঃ ১৬২৫খৃঃ)-এর মুরীদ ছিলেন ।[২] শাহ্ নূরীর পিতা আবদুল্লাহ একজন বড় 'আলিম ও শরী'আতের একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন ।[৩] তিনি পিতার মুরীদ ও খলীফা ছিলেন। ঢাকার লালবাগ কিল্লাহর পশ্চিমে ১৭০৪ সালে প্রতিষ্ঠিত খান মুহাম্মদ মৃধার মসজিদস্থ মাদ্রাসার শিক্ষক তৎকালীন উপমহাদেশ বিখ্যাত আলিম মাওলানা আসাদুল্লাহ জাহাঙ্গীর ও মাওলানা লুৎফুল্লাহ মেহেরপুরী ছিলেন তাঁরই অন্যতম শাগরিদ । তাঁরা দুজনই বাবুপুরার অধিবাসী ছিলেন এবং এখানকার 'সালিক' অর্থাৎ আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শক ছিলেন । তাঁরা এই খানকাহ্‌র মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের প্রচলিত বিষয়াদি শিক্ষা দিতেন । শাগরিদদের মধ্যে যাদেরকে আধ্যাত্মিক শিক্ষা গ্রহণোপযোগী মনে করতেন তাদেরকে সেই দীক্ষাও দিতেন । তাঁরা নকশবন্দিয়া ও মুজাদ্দিদিয়া তরীকাহ্য় শাগরিদদের দীক্ষা দিতেন । শায়খ গুলাম মুহাম্মদ ও শায়খ আব্দুল্লাহ বাবুপুরা মসজিদ সংলগ্ন দক্ষিণ পশ্চিম কবরস্থানে সমাহিত হন ।[৪] এই মসজিদটি শাহ্ নূরীর বোন মরিয়ম সালিহা (মৃঃ ১৭০৬) ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে নির্মাণ করেন[৫] এবং ঐ বছরেই তিনি (সালিহা) পরলোক গমন করেন । বাবুপুরা খানকায় প্রতি বছর শাহ্ নূরীর পীর রাজশাহী নিবাসী খালীকুর রহমান বাধু দেওয়ানের উরস পালন করা হয় । মিঞা সাহেব ময়দানের দায়েরা ও আযীমপুর দায়েরার বহু পূর্বেই এই খানকাহ্‌টি প্রতিষ্ঠিত হয় ।

বাবুপুরার খানকাহ্ সম্ভবত ঢাকা শহরের প্রাচীনতম খানকাহ্ । শাহ্ নূরীর পূর্ব পুরুষ যাহাউদ্দীনসহ শাহ্ নূরী সহপাঠিদের সাথে তাঁর পিতার নিকট বাবুপুরা খানকাহ্‌র মাদ্রাসায় প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। অতঃপর যৌবন কালে ১১২০হিঃ/১৭০৮খৃঃ মগবাজার থেকে রোজ প্রায় চার মাইল পথ পায়ে

১। মাওলানা নূরুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫১; মাওলানা এম, ওবাইদুল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০২ ।
২। শাহ্ সায়্যিদ আহমদ উল্লাহ, আইনুল জারিয়াহ্, পৃঃ ৭৮-৭৯; ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, 'ঢাকার কয়েকজন সূফী', পৃঃ ২৭৩ ।
৩। হাকীম হাবীবুর রহমান, আসুদেগান-এ-ঢাকা, পৃঃ ৭২-৭৩; ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭৩ ।
৪। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭৩ ।
৫। নাজির হোসেন, কিংবদন্তীর ঢাকা, পৃঃ ৩২ ।

Dhaka University Institutional Repository

হেঁটে শায়েস্তা খাঁ প্রতিষ্ঠিত পাথরতলী[১] মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করতেন।[২] পাথরতলী মাদ্রাসায় তিনি হাসান সাগানী লাহোরী রচিত হাদীস গ্রন্থ 'মাশরিকুল আনওয়ার' ও 'শরহে মাতালি' (যুক্তিবিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থ) সহ অন্যান্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছিলেন।[৩] ঢাকায় শিক্ষাশেষে তিনি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদের মতিঝিল মাদ্রাসায় পড়তে যান। সেখানে তিনি খালীকুর রহমান ওরফে বাঘু দেওয়ানের আধ্যাত্মিক শিক্ষার খ্যাতি শুনে রাজশাহীর ভেন্নাবাড়ীয়ায় (বিনোদপুর) তাঁর নিকট গিয়ে বায়'আত প্রার্থী হন। বাঘু দেওয়ানের পিতা শায়খ বদরুদ্দীন মুর্শিদাবাদ জেলার পূর্বাঞ্চলস্থ পুখারিয়া নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। তিনি রাজশাহী শহর থেকে পঁচিশ মাইল দূরবর্তী বাঘা নামক গ্রামে বিয়ে করেন। খালীকুর রহমান তাঁর মামার বাড়ীতে থেকেই বাঘা মাদ্রাসায় প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। অতঃপর ভাগলপুরে শিক্ষা লাভ করেন। শিক্ষা শেষে মেদিনীপুরের মীর সায়্যিদ বদীউদ্দীনের মুরীদ হন। আধ্যাত্মিক দীক্ষা গ্রহণের পর তিনি বাঘায় ফিরে এসে মাওলানা হামীদ দানিশমান্দের মাযারের নিকটস্থ মসজিদে কিছুকাল অবস্থান করেন। বাঘায় অধিবাসী ছিলেন বলেই বোধ হয় তাঁকে 'বাঘু দেওয়ান' নামে অভিহিত করা হয়েছে।

এখান থেকে চার মাইল দূরে মুমিনপুরে কিছুদিন সপরিবার অবস্থান করার পর তিনি ভেন্নাবাড়ীয়ায় (বর্তমান বিনোদপুরে) স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন।[৪] জীবনের শেষ তেইশ বছর তিনি ভেন্নাবাড়ীয়ায় আধ্যাত্মিক সাধনায় ও ভক্তদের শিক্ষা-দীক্ষাদানে জীবন অতিবাহিত করেন।[৫] তিনি একজন কামিল বুযুর্গ ছিলেন। কাদ্‌রিয়া, নাক্‌শবন্দিয়া...

বাঘু দেওয়ান প্রচলিত শিক্ষা সমাপ্তির পর শাহ্ নূরীকে আধ্যাত্মিক সাধনায় আত্মনিয়োগ করার পরামর্শ দেন। তদনুসারে শাহ্ নূরী শিক্ষা শেষে বাঘু দেওয়ানের মুরীদ হন।[৭] এবং কয়েক বছর ভেন্নাবাড়ীয়ায় তাঁর নিকট আধ্যাত্মিক সাধনা করেন। অবশেষে পীরের নির্দেশে পিতার জীবদ্দশায় ঢাকায় ফিরে আসেন। বিরাশি বৎসর বয়সে ২৯ জিলকদ, ১১৬৫ হিঃ/অক্টোবর, ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে রাজশাহীর ভেন্নাবাড়ীয়ায় (বর্তমান বিনোদপুর) বাঘুদেওয়ান ইন্তিকাল করেন এবং এখানেই সমাধিস্থ হন। শাহ্ নূরী মুর্শিদের কবর যিয়ারত করার জন্য কয়েকবার রাজশাহীর ভেন্নাবাড়ীয়ায় গমন করেন।[৮]

শাহ্ নূরী পীরের দীক্ষা গ্রহণ শেষে কখন ঢাকায় ফিরে আসেন তার সঠিক তারিখ অদ্যাবধি জানা যায়নি। তবে এতটুকু জানা যায় যে, মুর্শিদের মৃত্যুর (১৭৫২ খৃঃ) দেড় বছর পূর্বে তিনি ঢাকায় ফিরেছিলেন। তাই

১। পাথরতলী মাদ্রাসা বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে মিটফোর্ড এলাকায় অবস্থিত। এটি নবাব শায়েস্তা খাঁ (১৬৬৪-৮৮) নির্মিত শায়েস্তা মসজিদের আওতাধীন ছিল।

২। হাকীম হাবিবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৫।

৩। শাহ্ নূরী, কিবরীত-এ-আহমার, পৃঃ ১৭৪।

৪। শাহ্ নূরী, কিবরীত-এ-আহমার, (অপ্রকাশিত) পৃঃ ১৭৪; ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭৫।

৫। শাহ্ নূরী, কিবরীত-এ-আহমার, (অপ্রকাশিত) পৃঃ ১৭৪; ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭৬।

৬। হাকীম হাবিবুর রহমান, পৃঃ ১১৭; ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭৬।

৭। মুন্সী রহমান আলী, তাওয়ারীখ-ই-ঢাকা, পৃঃ ১৩৩।

৮। হাকীম হাবিবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৫-১১৬।

Dhaka University Institutional Repository

অনুমান করা যায় যে, ১৭৫০ সালের কোন এক মাসে তিনি ঢাকা ফিরেছিলেন । শাহ্ নূরীর ঢাকায় প্রত্যাবর্তনের পরেই সূফী দায়িম আজীমপুরে আস্তানা স্থাপন করেন ।[১] সূফী দায়িমের সাথে আধ্যাত্মিক ব্যাপারে শাহ্ নূরীর মনোমালিন্য ঘটায় তিনি পিতার নির্দেশে বাবুপুরা ত্যাগ করে বড় মগবাজার শাহ্ শুকরের মসজিদে (১৬৭০ খৃঃ) আস্তানা স্থাপন করেন । তিনিই মগবাজার দায়েরার প্রতিষ্ঠাতা । মগবাজারে তাঁর আগমনের ফলে অনাবাদ এ জায়গাটি আবাদ হয়ে উঠে । তথাকার মসজিদটি পুনঃনির্মিত হয় এবং তথায় লোকালয় গড়ে উঠে । লোকেরা তাঁর নিকট দীক্ষা নিতে থাকেন ।[২]

তদানীন্তন ঢাকার নায়েব নাজিম জাসারত খাঁ (মৃঃ ১৭৮৯ খৃঃ) শাহ্ নূরীর মুরীদ ছিলেন ।[৩] শাহ্ নূরী একজন বড় 'আলিম ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে বড় সাধক ছিলেন । তিনি ফার্সী গদ্য ও পদ্য উভয়েই অনায়াসে লিখতে পারতেন । তাঁর হাতের লেখাও সুন্দর ছিল । তিনি আধ্যাত্মিক বিষয়ে এবং তাঁর পীর, পীর ভাই, ও পীরের খলীফাদের জীবন-চরিত বর্ণনা করে ফার্সীতে 'কিবরিত-এ-আহমার' নামক একটি গদ্য গ্রন্থ রচনা করেন। কিবরীতে-এ-আহমার -এর ভাষ্যনুযায়ী তিনি ১৭৬৪ খৃঃ-এ গ্রন্থ রচনার সিদ্ধান্ত নেন এবং ১৭৭৫ খৃঃ সমাপ্ত করেন । তাঁর অবর্তমানে তাঁর অল্পবয়স্ক পুত্র শাহ্ মুহাম্মদীকে পথনির্দেশ দানের উদ্দেশ্যেই তিনি গ্রন্থটি রচনা করেন । ১৫২ পৃষ্ঠার ৯১/২"×৭" সাইজের পান্ডুলিপিটি অপ্রকাশিত অবস্থায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে । এ গ্রন্থ পাঠে শাহ্ নূরীর ফার্সী জ্ঞানের পারদর্শিতা সম্পর্কে অনুমান করা যায় ।[৪]

শাহ্ নূরী ১২০০ হিজরীর ২৭শে রবীউল আউয়াল মুতাবিক ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ইনতিকাল করেন এবং মগবাজার দায়েরায় সমাধিস্থ হন ।[৫] কিন্তু 'তাওয়ারীখে-এ-ঢাকা' গ্রন্থে তাঁর মৃত্যু তারিখ জনৈক কবি এভাবে বর্ণনা করেছেনঃ ''অত্যন্ত অনুতাপের বিষয় যে, শাহ্ নূরী এ নশ্বর রাজ্য ত্যাগ করেছেন । হে প্রভু! তাঁর উপর রহমতের বারি বর্ষণ কর । তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে ঘোষক অদৃশ্য থেকে ঘোষণা করেছেন ১১৮৮হিজরী তাঁর আত্মার বিশ্রামাগার বেহেস্তের উদ্যানে পরিনত হোক'' ।[৬] প্রতি বছর তাঁর ওফাত দিবস উদযাপিত হয় । তাঁর বহু কারামতের কথা শোনা যায় । তিনি ঢাকার খাজা আবদুল্লাহর খুবই প্রিয় পাত্র ছিলেন । খাজা আবদুল্লাহর কবর মগবাজার দায়েরায় শাহ্ নূরীর কবরের ডান পার্শ্বে অবস্থিত। তাঁর পুত্র খাজা আহসান উল্লাহ শাহ্ নূরীর মুরীদ ছিলেন ।

শাহ্ নূরীর চার পুত্র ছিল । তিন পুত্র ছোট বেলায় মারা যায় । তাঁদের কবর শাহ্ নূরীর কবরের পার্শ্বেই অবস্থিত । চতুর্থ পুত্র শাহ্ মুহাম্মদী শাহ্ নূরীর মুর্শিদ বাঘু দেওয়ানের স্থলাভিষিক্ত হন । অল্প বয়সেই তিনি পিতৃহারা হন । শাহ্ নূরীর মুর্শিদ বাঘু দেওয়ানের স্থলাভিষিক্ত হন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র মিঞা মুহাম্মদী । মিঞা মুহাম্মদী নামের সংগে সঙ্গতি রেখেই শাহ্ নূরী তাঁর চতুর্থ পুত্রের নাম

১। সায়্যিদ শাহ্ আহমাদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৯; ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭৪ ।

২। হাকিম হাবিবুর রহমান, প্রাগুক্ত পৃঃ ১১৬-৭; ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, পৃঃ ২৭৪ ।

৩। Syed Mohammad Taifoor, Glimp ses of old Dhaka, 1985. p.234; ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭৪।

৪। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭৫।

৫। হাকিম হাবিবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৬-৭।

৬। صد حیف که شبه نوری از ملک فنا بگذشت ـ بر تربت او یارب باران کرم بادا .
از رحلت او هاتف از غیب چنین گفته ـ آرام که روحش گلزار ارم بادا ـ ۱۱۸۸
মুনশী রহমান আলী তায়েশ, তাওয়ারী-এ-ঢাকা, পৃঃ ১৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

রাখেন মুহাম্মদী । কিন্তু তাঁর আসল নাম ছিল আবুল ওফা মাহদী। শাহ্ মুহাম্মদী তাঁর মুরীদদেরকে যে পীর-মুরীদ পরিচয়পত্র (সাজারা) দিতেন, তাতে তিনি তাঁর নাম 'আবুল ওফা' -ই লিখতেন ।[১] কিন্তু জনসমাজে তিনি 'শাহ্ মুহাম্মদী' নামেই পরিচিত ছিলেন ।[২] শাহ্ মুহাম্মদী একজন যবরদস্ত আলিম ছিলেন । এজন্য বাদশাহ্ আলমগীরের দরবারে তাঁর খুবই সুখ্যাতি ছিল । কথিত আছে যে, ফতোয়া-এ আলমগিরিতে শাহ্ মুহাম্মদীর স্বাক্ষর ছিল ।[৩] তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞানে বড় সাধক ছিলেন। তিনি ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় জ্ঞানে সমৃদ্ধ ছিলেন । ধন ও ঐশ্বর্য থাকা সত্ত্বেও তিনি ফকীরের ন্যায় সাধারণ জীবন যাপন করতেন । ঢাকা শহরের ধনী-গরীব, আমীর-রঈস এমনকি তৎকালীন ঢাকার নওয়াবরাও তাঁর ভক্ত ছিলেন । তাঁর রঈস ভক্তদের অনেকেই ছিলেন শী'আপন্থী। সে কারণে তাঁর খান্দানে কিছুটা শী'আ রীতিনীতি প্রবেশ করেছিল ।[৪]

তিনি আল্লাহ ভীরু ও শরী'আতের একনিষ্ঠ কামিল লোক ছিলেন । তিনি কখনও অজু ছাড়া থাকতেন না, তাঁর মজলিশে কেউ অজু ছাড়া যেত না । তিনি সারা বছর রোযা রাখতেন ।

অনেক 'আলিম, পন্ডিত ব্যক্তি, হাফিজ ও বুযুর্গ সব সময় তাঁর কাছে থাকতেন । তাঁদের প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা ঘর ছিল । লংগরখানা থেকে দিনের খাবার প্রত্যেকের ঘরে ঘরে পৌছে দেয়া হত । রাত্রি বেলায় তিনি সকলের সঙ্গে একত্রে দস্তরখানায় বসে খেতেন । লংগরখানায় উন্নতমানের খাবার প্রস্তুত করা হত । সকলকেই তা খাওয়ানো হত । কিন্তু তিনি নিজে ডাল-রুটি ছাড়া অন্য কিছুই খেতেন না । তিনি আমীর বেশে ফকীরী জীবন যাপন করে গেছেন । দান-খয়রাতের প্রতিও তিনি অত্যন্ত উদার ছিলেন । অসংখ্য গরীব মিস্কীন তাঁর কাছে লালিত-পালিত হত । তিনি মুসাফিরদের খুবই সম্মান করতেন ।[৫] তাঁর দরবারে ভক্ত ও জনসাধারণের পক্ষ থেকে অনেক হাদিয়া তুহফা আসত । তাঁর থেকে অনেক অলৌকিক কীর্তিকলাপও সংগঠিত হয় ।

শাহ্ মুহাম্মদী ১২৪১ হিঃ/১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ঢাকায় ইন্তিকাল করেন । তাঁর কবর পিতা শাহ্ নূরীর কবরের দক্ষিণ পার্শ্বে ভিন্ন দেয়ালে ঘেরা ছিল । বর্তমানে দেয়ালটি ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে ।

শাহ্ মুহাম্মদীর দুই পুত্র ছিল ঃ শাহ্ গুলাম হামিদ ও শাহ্ গুলাম হামীদ । শাহ্ মুহাম্মদীর মৃত্যুর পর শাহ্ গুলাম হামীদ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন । শাহ্ গুলাম হামিদ পিতার জীবদ্দশায়ই হজ্জ সম্পন্ন করে দেশে ফেরার পথে মারা যান । শাহ্ গুলাম হামিদ মিঞা সাহেব ময়দানের তদানীন্তন গদ্দীনশীন শাহ্ বদীউদ্দীনের মেয়েকে বিয়ে করেন । শাহ্ গুলাম হামীদের পর তারপুত্র শাহ্ শামসুদ্দীন সাজ্জাদানশীন হন । তিনি আজীমপুর দায়েরার সূফী মনীরুল্লাহর সহোদরা বোনকে বিয়ে করেন । শাহ্ শামসুদ্দীনের দুই পুত্র ছিল ঃ শাহ্ ফখরুদ্দীন ও শাহ্ গুলাম নূরী । শাহ্ ফখরুদ্দীন বাবুপুরায় তাঁর পূর্বসূরী শাহ্ গুলাম মুহাম্মদের মাযারের নিকটই অবস্থান করতেন । তিনি বাবুপুরা খানকাহর গদ্দীনশীন ছিলেন । শাহ্ ফখরুদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শাহ্ বাহাউদ্দীন বাবুপুরায় সাজ্জাদানশীন

১। হাকিম হাবিবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৭; ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭৬ ।
২। হাকিম হাবিবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৯; ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭৬।
৩। নাজির হোসেন, কিংবদন্তীর ঢাকা, পৃঃ ৬৪।
৪। সৈয়দ শাহ্ আহমদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৮-৭৯; ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭৫।
৫। তাওয়ারীখ-এ-ঢাকা পৃঃ ১৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

হন । তিনি বাবুপুরা মাযারের সন্নিকটস্থ বসবাস করতেন । তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র হাস্তাবুদ্দীন গদীনশীন হন । তিনিই বাবুপুরা খানকাহর বর্তমান সাজ্জাদানশীন । শাহ্ শামসুদ্দীনের মৃত্যুর পর ছোট পুত্র শাহ্ গুলাম নূরী মগবাজার দায়েরায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন । ১৯৫১ সালে তিনি হজ্জব্রত পালন করেন ।[১] তাঁর মৃত্যুর পর মগবাজার দায়েরায় তাঁর পুত্র শাহ আবদুল্লাহ স্থলাভিষিক্ত হন । বর্তমানে তিনিই মগবাজার দায়েরার গদীনশীন ।

মগবাজার দায়েরার প্রতিষ্ঠাতা শাহ্ নূরীর বংশ তালিকা ঃ

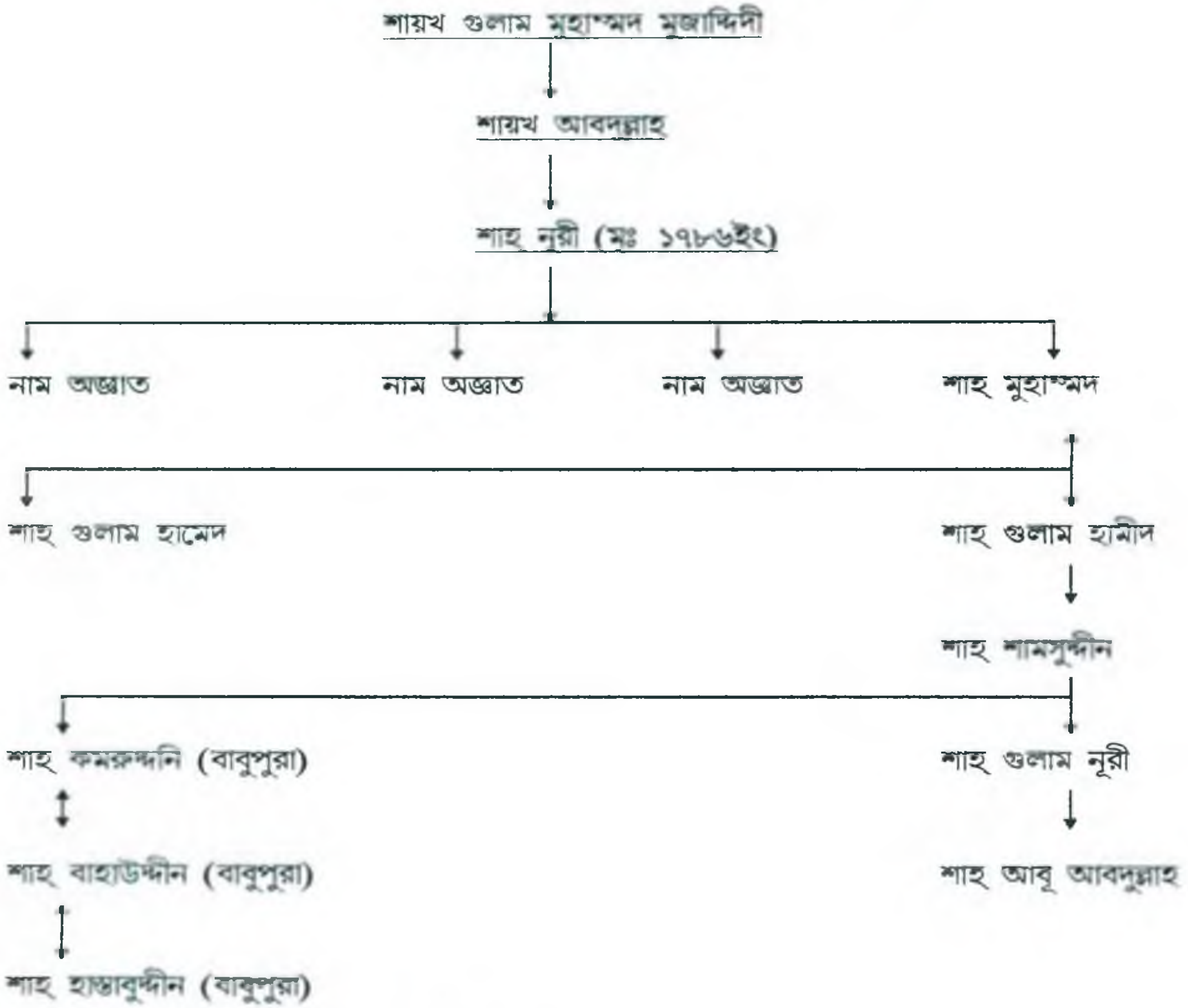

মগবাজার দায়েরায় গদীনশীনদের তালিকা ঃ

১। শাহ্ নূরী (মৃঃ ১৭৮৬)
২। শাহ্ মুহাম্মদ (মৃ ১৮৩৫)
৩। শাহ্ গুলাম হামীদ
৪। শাহ্ শামসুদ্দীন
৫। শাহ্ গুলাম নূরী
৬। শাহ্ আবু আবদুল্লাহ ।[২]

১। সৈয়দ শাহ্ আহমদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮০।
২। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

শাহ্ সূফী সায়্যিদ মুহাম্মাদ দায়িম (রঃ)

(মৃত্যুঃ- ১২১৪ হিঃ/১৭৯৯ খৃঃ)

ঢাকার আজীমপুর দায়রা শরীফের প্রতিষ্ঠাতা হযরত শাহ্ সূফী সায়্যিদ মুহাম্মদ দায়িম (রঃ) হিজরী দ্বাদশ শতাব্দী/ খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত ধুম রেল ষ্টেশনের নিকটস্থ বইয়ারা নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন।[১] তাঁর জন্মের সাল তারিখ সম্পর্কে সঠিক কিছুজানা যায়নি। তাঁর পূর্ব পুরুষ ছিলেন এদেশে ইসলাম প্রচার ও হিদায়াতের জন্য আগত প্রসিদ্ধ বার আওলিয়ার অন্যতম সূফী সাধক হযরত শাহ্ সূফী সায়্যিদ মুহাম্মদ বখ্‌তিয়ার মাহীসাওয়ার। তিনি আনুমানিক পাঁচশ বছর পূর্বে বাগদাদ থেকে চট্টগ্রাম আগমন করেন।[২] দ্বাদশ শতাব্দীতে বাগদাদ থেকে মৎসপৃষ্ঠে আরোহণ করে তরঙ্গময় উত্তাল সমুদ্র অতিক্রম করে এদেশে আগমন করেছিলেন বলে তিনি মাহীসওয়ার উপাধিতে আখ্যাত।[৩] এদেশে আগমনের পর চট্টগ্রামের কালুরঘাট ব্রীজের নিকটস্থ তৎকালীন হালদা নদী মতান্তরে ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ সংলগ্ন নদীর তীরে প্রথমে অবস্থান গ্রহণ করেন।[৪]

হযরত শাহ্ সূফী সায়্যিদ বখতিয়ার মাহীসাওয়ার চট্টগ্রামে বিয়ে করেন। তিনি ছিলেন হযরত আলী (রাঃ) এর বংশধর এবং তাঁর স্ত্রী ছিলেন হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) এর উত্তরসূরী। এখানে তাঁর দুটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। একজনের নাম সায়্যিদ হায়া শাহ্ অন্যজনের নাম সায়্যিদ জাঁহা শাহ্। সায়্যিদ জাঁহা শাহ ছিলেন দুনিয়ামুখী। তিনি পূর্বএশীয় দ্বীপপুঞ্জের দিকে হিজরত করে চলে যান এবং মালয়ে ইন্তিকাল করেন ও তথায় সমাহিত হন। তার বংশধরগণ মালয়েই বসবাস করেছেন। পক্ষান্তরে হায়া শাহ্ ছিলেন আল্লাহভক্ত এবং ওলীর পর্যায়ভুক্ত।

হযরত বখ্‌তিয়ার মাহীসাওয়ার (রঃ) তাঁর অন্যপুত্র সায়্যিদ হায়া শাহ্‌কে চট্টগ্রামে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে সস্ত্রীক বাগদাদ প্রত্যাবর্তণ করেন। সূফী মুহাম্মদ দায়িম ছিলেন হযরত সায়্যিদ মুহাম্মদ হায়া শাহ্-এরই বংশধর।[৫] হযরত শাহ্ সূফী সায়্যিদ বখতিয়ার মাহীসাওয়ার পর্যন্ত শাহ্ দায়িমের (রঃ) বংশ ছিলছিলা বা নছবনামা নিম্নরূপ ঃ-

শাহ্ সায়্যিদ হায়া শাহ্ (রঃ)

↕

শাহ্ সায়্যিদ পীর মুকাররম (রঃ)

১। শাহ্ সূফী সায়্যিদ আহমদ উল্লাহ- আজীমপুর দায়রা শরীফ, প্রথম প্রকাশ ১৯৭০ ইং, প্রকাশক- সায়্যিদ শাহ্ আসিম বিল্লাহ, ৪৪নং আজিমপুর রোড, ঢাকা, পৃঃ ৪; ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, ঢাকার কয়েকজন মুসলিম সুধী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, জুন ১৯৯১, পৃঃ ২৮৮।

২। হাকীম হাবীবুর রহমান, আসুদেগান-এ-ঢাকা, ঢাকা- ১৯৪৬, পৃঃ ৯৭।

৩। শাহ্ সূফী সায়্যিদ আহমদ উল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩।

৪। শাহ্ সূফী সায়্যিদ আহমদ উল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩।

৫। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮৮; মাওলানা নূরুর রহমান, তাযকেরাতুল আওলিয়া, খন্ড-৬, পৃঃ ১৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

শাহ্ সায়্যিদ ওয়ালা মুহাম্মদ (রঃ)

↕

শাহ্ সায়্যিদ সূফী মুহাম্মদ (রঃ)

↕

শাহ্ সায়্যিদ আমীনউল্লাহ্ (রঃ)

↕

শাহ্ সূফী সায়্যিদ মুহাম্মদ দায়িম (রঃ)

হযরত শাহ্ সূফী সায়্যিদ মুহাম্মদ দায়িম (রঃ) ইব্‌নে হযরত শাহ্ সায়্যিদ আমীন উল্লাহ (রঃ) ইবনে শাহ্ সায়্যিদ সূফী মুহাম্মদ (রঃ) ইব্‌নে শাহ্ সায়্যিদ ওয়ালী মুহাম্মদ ইব্‌নে শাহ্ সায়্যিদ পীর মুকাররম ইবনে শাহ্ সায়্যিদ হায়া শাহ্ ইব্‌নে হযরত শাহ্ সায়্যিদ মুহাম্মদ বখতিয়ার মাহিসাওয়ার (রঃ)।[১]

বখতিয়ার বংশে অনেক 'আলিম, জ্ঞানী ও আল্লাহভীরু লোক জন্মগ্রহন করে।[২] খ্যাতি ও মর্যাদার দিক দিয়ে বাগদাদ থেকে আগত সন্দ্বীপের আলফা হোসাইনী পরিবারের পরেই ছিল এ খান্দানের স্থান। আত্মীয়তা সূত্রে আলফা হোসাইনীর পরিবারের সাথে এ খান্দানের সম্পর্ক স্থাপিত হয়।[৩]

হযরত শাহ্ সূফী সায়্যিদ বখতিয়ার মাহীসাওয়ার (রঃ)-এর বংশধরগণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে বসবাস করেছেন। সূফী দায়িমের (রঃ) পিতা হযরত শাহ্ সায়্যিদ আমীন উল্লাহ ফেনী ও চট্টগ্রাম জেলার মধ্যবর্তী ধূম রেলষ্টেশনের নিকট খইয়াছরা নামক স্থানে বসবাস করতেন। এখানেই সূফী দায়িম জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তিনি পিতৃহারা হন।[৪]

হযরত শাহ্ সূফী সায়্যিদ দায়িম (রঃ) কিশোর বয়সেই প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন এবং বিভিন্ন ওলামায়ে কিরামের নিকট অধ্যয়নপূর্বক হাদীস ও ফিক্‌হ বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেন।[৫] সূফী দায়িম ছোট বেলায় চট্টগ্রাম শহরের লালদীঘির পূর্ব পার্শ্বে অবস্থানরত শাহ্ সূফী আমানত (রঃ) (মৃঃ ১৭৭৩)-এর খ্যাতি শুনতে পান। শাহ্ আমানত ছিলেন ঢাকার মিঞা সাহেব ময়দানস্থ খানকাহর শাহ্ আব্দুর রহীম শহীদের (মৃঃ ১৭৪৫) খলিফা।[৬] শাহ্ আমানতের কামালিয়াতের সুখ্যাতি শুনে আসরারে এলাহীর মারিফাতের জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে সূফী দায়িম তাঁর নিকট উপস্থিত হন। তাঁর নিকট কিছুকাল অতিবাহিত করার পর সূফী দায়িম তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করার

১। হাকীম হাবীবুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৮; মাওলানা নূরুল রহমান, পৃঃ ১৩৭।

২। খান বাহাদুর হামীদুল্লাহ, আহাদীসুল খাওয়ানীন, কলিকাতা, ১৮৭১, পৃঃ ১১১।

৩। খান বাহাদুর হামীদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১২।

৪। শাহ্ সূফী সায়্যিদ আহমদ উল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪।

৫। শাহ্ সূফী সায়্যিদ আহমদ উল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬।

৬। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

সৌভাগ্য অর্জন করেন।[১] অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি আধ্যাত্মিক (মা'রিফাত) ক্ষেত্রে উচ্চস্তরে আরোহণ করেন এবং শাহ্ আমানত এর নিকট থেকে খিলাফত লাভ করেন। কিন্তু অপরিণত বয়সে তাঁর নিকট থেকে একটি কারামত প্রকাশ পাওয়ায় শাহ্ আমানত তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হন। ফলে পীর সাহেব তাঁর সমুদয় সম্পদ (মা'রিফাতের শিক্ষা) কেঁড়ে নেন। অবশেষে বহু অনুনয় বিনয় করে সূফী দায়িম স্বীয় পীরের নিকট ক্ষমা লাভে সক্ষম হন। কিন্তু শাহ্ আমানত কিছুতেই তাঁর প্রতি প্রসন্ন হলেন না।

সূফী দায়িম অল্প বয়স্ক ছিলেন। তাই তিনি শাহ্ আমানতের বাস গৃহের অন্দর মহলেও যাতায়াত করতেন। শাহ্ আমানতের স্ত্রীর মুখে শাহ্ আব্দুর রহীম শহীদ ও তদীয় স্থলাভিষিক্ত শাহ্ নাজমুদ্দীনের প্রশংসা শুনেছিলেন। তাই তিনি পূর্ব থেকেই ঢাকার লক্ষ্মীবাজারস্থ মিঞা সাহেব ময়দানের খানকাহ্য় আসার জন্য উদগ্রীব ছিলেন। শাহ্ আমানত (রঃ) তদীয় শিষ্য সূফী দায়িমকে ক্ষমা করার পর অধিকতর আধ্যাত্মিক দীক্ষা লাভের জন্য তাঁকে নিজ মুর্শিদ শাহ্ আব্দুর রহীম শহীদের (মৃঃ ১৭৪৫) স্থলাভিষিক্ত গদীনশীন (ভাতিজা) শাহ্ নাজমুদ্দীনের নিকট ঢাকায় পাঠিয়ে দেন। সূফী দায়িম কালবিলম্ব না করে তদানীন্তন গদীনশীন শাহ্ নাজমুদ্দীনের খানকাহ্য় উপস্থিত হন।[২]

শাহ্ সূফী দায়িম (রঃ) তাঁর সাহচর্যে প্রায় চার বৎসর কাটান এবং অধিকতর আধ্যাত্মিক দীক্ষা লাভ করেন। তবুও তাঁর আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভের তৃষ্ণা নির্বাপিত হয়নি। তাঁর আগ্রহ দেখে শাহ্ নাজমুদ্দীন তাঁকে পাটনার শাহ্ সূফী মুন'য়িম (মৃঃ ১৭৭১) -এর নিকট পাঠান। তিনি নৌকা যোগে পাটনার শাহ্ সূফী মুনয়িমের (মৃঃ ১৭৭১) নিকট উপস্থিত হন এবং তাঁর নিকট কামালিয়াত হাসিল করেন [৩] এবং 'আবুল উলাইয়্যা' [৪] তরীকায়ও বায়'আত করার অনুমতি লাভ করেন। শাহ্ মুন'য়িমের নির্দেশে তিনি ফুলওয়ারী (পাটনা) শরীফের শাহ্ নি'য়ামতুল্লাহর নিকটও দীক্ষিত হন। পাটনা ত্যাগ করার সময় শাহ্ নিয়ামতুল্লাহ তাকে পুনরায় শাহ্ আমানতের নিকট গিয়ে আরো অনুগ্রহ লাভের নির্দেশ দিয়েছিলেন।[৪ক]

পাটনার শিক্ষা শেষে শাহ্ দায়িম মিয়া সাহেব ময়দানের খানকাহ্য় ফিরে আসেন। শাহ্ নাজমুদ্দীন তাঁকে তাঁর পূর্বকার মুরশিদ শাহ্ আমানতের সাথে দেখা করার নির্দেশ দেন।[৫] স্বীয় পীরের নির্দেশে হযরত শাহ্ মুহাম্মদ দায়িম (রঃ) পাটনা থেকে চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। চট্টগ্রামে পৌঁছেই কালবিলম্ব না করে হযরত শাহ্ আমানতুল্লাহ (রঃ) -এর খিদমতে হাজির হন। সেখানে তিনি কিছুদিন অতিবাহিত করার পর পীরের অনুমতিক্রমে ঢাকা অভিমুখে রওয়ানা হন[৬] এবং মিয়া সাহেবের ময়দানে ফিরে আসেন। শাহ্ নাজমুদ্দিনের নির্দেশে আজীমপুরে খানকাহ্ প্রতিষ্ঠা করেন এবং আজীমপুরের পরিসীমার মধ্যেই কালাতিপাত করেন।[৭] বলা হয় ঢাকায় এসে প্রথমতঃ তিনি ঢাকার লালবাগ কেল্লার পশ্চিমে অবস্থিত আমলীগোলাস্থ ঐতিহাসিক খান মুহাম্মদ মৃধার মসজিদে (১৭০৪)

১। শাহ্ সূফী সায়্যিদ আহমদ উল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬।
২। সায়্যিদ শাহ্ আহমদ উল্লাহ, আইনুন জারিয়াহ, বাংলা বাজার, ঢাকা ১৯৬৪ইং ;পৃঃ ২৩।
৩। শাহ্ সূফী সায়্যিদ আহমদউল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭-৮।
৪। আবুল উলাইয়্যা হল নকশবন্দিয়া তরীকার একটি শাখা।
৪ক ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮৯।
৫। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯০।
৬। শাহ্ সূফী সায়্যিদ আহমদউল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯।
৭। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত পৃঃ ২৯০।

Dhaka University Institutional Repository

ধ্যানরত হন। অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর বুযুর্গীর খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাই, দলে দলে লোক তাঁর কাছে ভীড় জমাতে থাকে। বহু অন্ধ, খঞ্জ, বোবা, বধির ও আতুর তাঁর দো'আর বরকতে আরোগ্য লাভ করে[১] । কিছুদিন পর সেখান থেকে আজীমপুর গোরস্থানের পশ্চিমে শাহ্ ফয়জুল্লাহ প্রতিষ্ঠিত (১৭৪৭ খৃঃ) দ্বিতল মসজিদে ইতিকাফ-রত হন।[১ক] ক্রমে লোকের ভীড় বেড়ে যাওয়ায় সূফী দায়িম (রঃ) অকস্মাৎ এক রাতে আজীমপুরের গভীর জংগলে আত্মগোপন পূর্বক আস্তানা স্থাপন করেন। বর্তমান গদিঘরটি তাঁর সেই আস্তানার উপরই স্থাপিত। এখানে দু'তিন দিন উপবাসে কাটাবার পর তাঁর খাদিম কচুপাতা সিদ্ধকরে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত করলে তিনি বললেন, আর অল্পকাল সবর করলে কখনও তোমার পাক করার প্রয়োজন হতনা। যাক্ শাহ্ মুন'য়িম (রঃ) এর শর্ত স্মরণ করে তিনি লঙ্গরখানা চালু করার উদ্দেশ্যে তা থেকে নিজে কিছু আহার করলেন এবং খাদিমকে খেতে দিলেন। এভাবে নিবিষ্ট চিত্তে আল্লাহর ধ্যানে সময় অতিবাহিত করতে লাগলেন।[২]

মোগল সুবাদার আজীমুশ্শান (১৬৯৭-১৭০৩)-এর নামানুসারেই আজীমপুর এলাকাটি উক্ত নামে অভিহিত হয়।[৩] আজীমুশ্শান ও বাংলার দেওয়ান মুর্শিদ কুলি খানের পারস্পরিক কলহের ফলে তারা উভয়েই ঢাকা ছাড়তে বাধ্য হন।

আজীমুশ্শান তাঁর সদর দফতর পাটনায় নিয়ে যান এবং মুর্শিদকুলী খাঁ তাঁর রাজস্ব দফতর মুর্শিদাবাদে স্থানান্তর করেন (১৭০৪)। ১৭১৩ সালে বাংলার রাজধানীও ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে চলে যায়। ফলে ঢাকার শান শওকতের অবনতি ঘটে। আজীমুশ্শানের কর্মচারী বৃন্দ আজীমপুর এলাকায় থাকতেন। তাঁর চলে যাওয়া ও রাজধানী পরিবর্তনের ফলে এলাকাটি ক্রমাগত জংগলে পরিনত হয়।[৪] কথিত আছে যে, এলাকায় শিয়াল এমনকি বাঘও থাকত।[৫] সেই ভীতপ্রদ পরিবেশেই শাহ্ সূফী দায়িম একজন খাদিমকে নিয়ে আজীমপুরের জংগলময় স্থানে আল্লাহর ধ্যানে রত হন।

কিন্তু বেশীদিন তিনি আত্মগোপন করে থাকতে পারলেন না। একদা শহর থেকে জনৈক কাঠুরিয়া জঙ্গল হতে কাঠ সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে উক্ত এলাকায় এসে তাদেরকে ধ্যানরত অবস্থায় দেখে শহরবাসীদের তাদের সম্পর্কে অবহিত করে। ফলে লোকেরা তাদের জন্য জংগল সাফ করে একটি আটচালা ঘর নির্মাণ করে দেন।[৬] অতঃপর বিভিন্ন স্তরের লোকেরা শিক্ষা-দীক্ষা হাসিলের উদ্দেশ্যে সূফী দায়িমের নিকট যাতায়াত করতে থাকে, তাঁর সাহচর্যে উপকৃত হতে থাকে এবং ক্রমাগত তাঁর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। শাহ দায়িম খানকাহ্‌র পার্শ্বে ১১৯৩ হিঃ/ ১৭৭৬ খৃঃ একটি মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন যা ১১৯৩হিঃ/১৭৭৬খৃঃ সমাপ্ত হয়।[৭] অতঃপর তিনি বিয়ে শাদী করে তরীকত প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন।

১। মাওলানা নুরুর রহমান, তাযকেরাতুল আওলিয়া, খন্ড-৬, পৃঃ ১৪০।
১ক। শাহ্ সূফী সায়্যিদ আহমদউল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০।
২। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯০।
৩। সায়্যিদ আহমদউল্লাহ, আইনুন জারিয়াহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৫।
৪। হাকীম হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৬।
৫। শাহ্ সূফী সায়্যিদ আহমদউল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০।
৬। শাহ্ লতীফুল্লাহ, মুখদা-এ-ফজলে হক, ঢাকা, ১৯৩৩ ইং, পৃঃ ৪।
৭। শাহ্ সূফী সায়্যিদ আহমদউল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১।

Dhaka University Institutional Repository

সূফী দায়িম (রঃ) তাঁর খাদিম মারী শাহ্‌কে উক্ত মসজিদে আযান দেয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। এভাবে ক্রমান্বয়ে বিপুল সংখ্যক মানুষের উপস্থিতি ও তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয় আজীমপুর খানকাহ্ শরীফ। এখানে তিনি এক লঙ্গরখানার প্রচলন করেন।[১] উল্লেখ্য দু' দিন অনাহারে থাকার পর হযরত দায়িমের শিষ্য মারীশাহ্ কিছু শাক সংগ্রহ করে তা দিয়েই প্রথম লঙ্গরখানার প্রচলন করেন।[২]

শাহ্ মুহাম্মদ দায়িম পাটনার শাহ্ মুন'য়িম ও শাহ্ নি'য়ামতুল্লাহর নিকট থেকে দীক্ষা লাভ করে কখন ঢাকায় ফিরেছিলেন বা চট্টগ্রামের শাহ্ আমানতের সাথে পুনরায় দেখা করে কখন ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন, আর কখন আজীমপুরের খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এসবের সঠিক সন তারিখ নির্ণয় করা সম্ভব না হলেও আনুমানিক বলা যায় যে, হিজরী ১১৮০-৮২ / ১৭৬৬-৬৮ খৃঃ মতান্তরে ১৭৭১ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই ঢাকায় আগমন করেন[৩]। কেননা, ১৭৭১ সালে শাহ্ মুনয়িম ইন্‌তিকাল করেন। ১৭৭৩ সালে শাহ্ আমানতুল্লাহ পরলোক গমন করেন। তাই বলা যায়, শাহ্ দায়িম এ সময়ের পূর্বেই দ্বিতীয়বার তাঁর সাহচর্য লাভ করে ঢাকায় ফিরে এসেছিলেন। শাহ্ দায়িম ১৭৭৬ সালে আজীমপুর মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং এর পূর্বেই তথায় খানকাহ্ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাই বলা যায় যে, আঠার শতকের ষাটের দশকে অথবা সত্তর দশকের গোড়াতেই তিনি আজীমপুরে খানকাহ্ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[৪]

হযরত শাহ্ সূফী মুহাম্মদ দায়িম (রঃ) ঢাকায় আগমনের পর ঢাকায় এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যার সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। তাঁর ঔরসে দু' ছেলে ও এক মেয়ে জন্মগ্রহণ করেন।[৫]

শাহ্ মুহাম্মদ দায়িম শরী'আতের একনিষ্ঠ অনুসারী ও কামিল লোক ছিলেন। আল্লাহ প্রেমিক, আত্মীয়-স্বজন ও খাদিমদের সাথে তিনি অমায়িক ব্যবহার করতেন। তিনি চার শ্রেণীর লোকদের অত্যধিক ভালবাসতেন। প্রথমতঃ হাফিজ ও ক্বারী, দ্বিতীয়তঃ 'আলিম ও জ্ঞান সাধকগণ, তৃতীয়তঃ হাজী তথা মদীনা মুনাওয়ারার যিয়ারতকারী এবং চতুর্থতঃ ফকীর দরবেশ।[৬] তাঁর সময়ে আজীমপুর খানকাহ্য় শরী'আত শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে 'আলিম-ফাজিল' নিযুক্ত ছিলেন। বহু শিক্ষার্থী খানকাহ্ মাদ্রাসায় পড়াশোনা করত। খানকাহ্ থেকে বিনামূল্যে খোরপোশ দেয়া হত।[৭] মুসাফির, হাফিজ ও ক্বারীদের বিনামূল্যে আহার পরিবেশন করা হত। গরীব দুঃখীদের জন্য লঙ্গরখানা ছিল। লঙ্গরখানার পরিচালক সূফী দায়িমের মুরীদ ছিলেন। তিনি একজন কোমলমতি বুযুর্গ ছিলেন। সূফী দায়িমের অবর্তমানেও তিনি সেখানকার সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর কবর আজীমপুর গোরস্থান গেটের পশ্চিম দিকে শাহ্ ফয়জুল্লাহর মসজিদ বরাবর পূর্বদিকে একটি কক্ষে অবস্থিত।[৮]

১। শাহ্ সূফী সায়্যিদ আহমদউল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১।
২। শাহ্ সূফী সায়্যিদ আহমদউল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২।
৩। শাহ্ সূফী সায়্যিদ আহমদউল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০।
৪। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯০।
৫। শাহ্ সূফী সায়্যিদ আহমদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪।
৬। শাহ্ সূফী সায়্যিদ আহমদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩।
৭। হাকীম হাবিবুর রহমান, আসুদেগান-এ- ঢাকা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৮।
৮। আইনুন জারিয়াহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৬-৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

শাহ্ দায়িমের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল তিনি কখনও সংগীত শ্রবণ করতেন না। তাঁর দায়রা শরীফ আল্লাহ ও রাসূলের বাণী চর্চায় মুখরিত থাকত। তাঁর খলীফাদের নিকট তাঁর পুত্ররাও শিক্ষা লাভ করেছিলেন। রওশন আলী নামক ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর একজন কর্মচারী নিত্য সূফী দায়িমের সাহচর্যে থাকতেন। তিনি শুধু সূফী দায়িমের মুরীদই ছিলেননা, খলীফাও ছিলেন। সূফী দায়িম তাঁর একমাত্র কন্যাকে তাঁর সাথে বিয়ে দেন। সূফী দায়িমের ইন্তিকালের পর তাঁর ওছিয়ত অনুসারে এই জামাতার নিকটই তাঁর পুত্রদ্বয় শাহ্ আহমদুল্লাহ ও শাহ্ নকীতুল্লাহর শিক্ষা-দীক্ষা সম্পন্ন হয়।[১]

সূফী রওশন আলী ভারতবর্ষের কোন্ এলাকার লোক ছিলেন তা আজও জানা সম্ভব হয়নি। কারও মতে, তিনি দিল্লী সম্রাটের শাহী দরবারে কর্মরত একজন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। আবার কারও মতে, তিনি তৎকালীন দিল্লী সম্রাটের উযিরে আজম ছিলেন। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ঢাকার আজীমপুর দায়রা শরীফে আগমন করেন বলে ধারণা করা হয়। তখন দিল্লীর সিংহাসনে আওরঙ্গজেবের বংশধর দ্বিতীয় শাহ্ আলম (আলী গরহর ১৭৫৯-১৮০৬ খৃঃ) অধিষ্ঠিত ছিলেন।[২]

শাহ্ মুহাম্মদ রওশন আলী কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। পরে তিনি এক বুযুর্গের স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হয়ে স্বীয় পদে ইস্তফা প্রদান করে ঢাকায় আগমন করেন। শাহ্ দায়িমের নিকট কঠোর সাধনার পরে স্বীয় রোগ মুক্তির পর তিনি আজীমপুর দায়রা শরীফে হযরত দায়িম কর্তৃক মুহাফিজ নিযুক্ত হয়ে 'শাহ্ সূফী' খেতাবপ্রাপ্ত হন এবং দায়িমের নিকট বায়'আত গ্রহণ করেন। পরিশেষে সূফী দায়িমের (রঃ) অনুরোধে তাঁর একমাত্র কন্যাকে বিয়ে করেন।[৩]

শাহ্ দায়িমের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রদ্বয় যথাক্রমে শাহ্ আহমদুল্লাহ ও শাহ্ নকীতুল্লাহর বয়স ছিল যথাক্রমে ১৪ বছর ও ৯ বছর। জামাতা রওশন আলী ছিলেন তাঁর একান্ত আপনজন। সূফী দায়িমের নির্দেশেই তাঁর জীবদ্দশায় এই জামাতার জন্য আজীমপুর ছোট দায়রা সৃষ্টি করা হয়।[৪] সূফী রওশন আলী ছিলেন তাঁর প্রথম গদীনশীন। ১২৩৮ হিজরীর ৯ই রবীউল আওয়াল মাসে তিনি পরলোক গমন করেন এবং শ্বশুর তথা মুর্শিদের কোব্বায় সমাধিস্থ হন। দূর-দূরান্তের অনেক লোক তাঁর নিকট আধ্যাত্মিক শিক্ষায় ধন্য হয়। শাহ্ নকীতুল্লাহ, সূফী যাকি উদ্দীন, শাহ্ গুলাম হোসেন বারবুবী, সূফী দেলওয়ার 'আলী কাশ্মীরী, মৌলবী শাহ্ ফয়েযউল্লাহ, মৌলবী শাহ্ 'আলী আফযাল ও মৌলবী শাহ্ মাহফুজ 'আলী (রঃ) প্রমুখ তাঁর অন্যতম প্রসিদ্ধ খলীফা ছিলেন।[৫]

সূফী রওশন আলীর (রঃ) ইন্তিকালের পর ছোট দায়রার গদ্দীনশীন হন শাহ্ আহমদুল্লাহর পুত্র শাহ্ ওজীহউল্লাহ। তিনি ২৭শে জামাদিউল আউয়াল ১২১৮ হিজরী /সেপ্টেম্বর ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মৃত্যু তারিখ ও স্থান নিয়ে মতভেদ রয়েছে। হাকীম হাবীবুর রহমানের মতে, তিনি মক্কা শরীফে ১০ই মুহাররম ১২৮২ হিঃ/ ৫ই

১। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯২।

২। শাহ্ সূফী সায়্যিদ আহমদউল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪।

৩। শাহ্ সূফী সায়্যিদ আহমদউল্লাহ, প্রগুক্ত, পৃঃ ৩৪।

৪। হাকীম হাবীবুর রহমান, আসুদেগান-এ ঢাকা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৮-১০০।

৫। শাহ্ সূফী সায়্যিদ আহমদউল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

জুন ১৮৬৫ খৃঃ ইন্তিকাল করেন।[১] মাহমুদ আযাদ তাঁর কবিতায়,মাওলানা আজীরুদ্দিন 'রিয়াজুল নূর' পুস্তিকায় তার মৃত্যু তারিখ ১২৭৮ হিজরী / ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ উল্লেখ করেছেন। আজীরুদ্দিন, মাহমুদ আযাদ ও মুন্‌শী রহমান আলী তায়েশ সূফী শাহ্ ওলীউল্লাহর মৃত্যু মক্কাতেই হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন।[২]

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে যে, তিনি মক্কায় হজ্ব করতে গিয়ে আর দেশে ফিরেননি। তিনি মক্কায় ইন্তিকাল করেননি, বরং তরীকত প্রচারের জন্য তিনি বার্মার বর্তমান মায়ানমারের রেংগুন (বর্তমান ইয়াংগুন) চলে যান এবং তথায় ১৩৪০হিঃ / ১৯২১ খৃঃ ইন্তিকাল করেন এবং তথায় সমাধিস্থ হন।[৩]

শাহ্ ওজীহউল্লাহ মুজাদ্দিদিয়া তরীকাহ্‌র অনুসারী ছিলেন। 'ওয়াহদাতুল ওহুদ' স ম্পর্কে তিনি একটি পুস্তিকা রচনা করেন। তিনি দায়েরার বাইরেও গমন করতেন। এ জন্য বড় দায়েরায় তাঁর উরস হয়না। তাঁর পুত্র সায়্যিদ আশিকুল্লাহ নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেন।[৪] ১২ই রজব ১২১৪ হিজরী তারিখে হযরত শাহ্ দায়িম (রঃ) স্বীয় মুরশিদ- এর উরস উপলক্ষ্যে এক মাহফিলের আয়োজন করেন।[৫]

১৫ই রজব শুক্রবার জুম'আর নামাজের পর উপস্থিত সকলকে বাতিনী তাওয়াজ্জুহ্ দান করতঃ তিনি স্বীয় পুত্র সৈয়দ আহমদ উল্লাহকে সকলের উপস্থিতিতে খিলাফত দান করেন এবং খাস তাওয়াজ্জুহর মাধ্যমে তাকে শরী'আতী জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান দান করেন।[৬]

১২১৪ হিজরীর ১৮ হতে ২৭ শে রজবের মধ্যে হযরত শাহ্ দায়িম স্বীয় পরিবারভুক্ত সকলের যাবতীয় দেনা-পাওনা শরী'আ মুতাবিক আদায় ও বন্টণ করেন এবং দায়রা শরীফের খানকাহ্‌তে বসবাসকারীদের আয়ের সুবন্দোবস্ত করে নগদ অর্থ, খাদ্য সামগ্রী, তৈজষপত্র এবং আবাসিক গৃহ ও ইমারত ইত্যাদি লিখিতভাবে ভিন্ন ভিন্ন নামে বন্টন করে দিয়ে উহাতে দস্তখত দান করেন[৭] এবং ১২১৪ হিজরীর ১লা শাবান/ ১৭৯৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর রবিবার খানকাহ্ শরীফে ইন্তিকাল করেন। তাঁর কবর গম্বুজের মধ্যে অবস্থিত। মৃত্যুর সময় তিনি এক কন্যা ও দুই পুত্র রেখে যান। প্রত্যেক বছর খানকাহর গদীনশীন মৃত্যুদিবসে উরস করে থাকেন। উরসে কোন গান বাজনা হয়না। কেবল কুর'আন তিলাওয়াত, মিলাদ মাহফিল ও কাংগালী ভোজ হয়ে থাকে।[৮] হযরত শাহ্ দায়িমের (রঃ) খলীফাগণ এবং দায়েরা শরীফ হতে পরবর্তী পর্যায়ে খিলাফত প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে কতিপয় বিশিষ্ট্য বুযুর্গ হলেন ঃ-

---

১। হাকীম হাবীবুর রহমান, আসুদেগান-এ ঢাকা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০১।

২। মাহমুদ আযাদ, দীওয়ান-এ-আযাদ, আজীমাবাদ ১৩০৭/১৮৮৯, পৃঃ ৯৬; আজীরুদ্দিন, রিয়াজুল নূর , কানপুর, নিযামী প্রেস ১২৯৯/১৮৭৫, পৃঃ ৩৫; রহমান আলী তায়েশ মুন্‌শী, তাওয়ারীখ-এ-ঢাকা, আরা, ১৯১০, পৃঃ ১৭৮।

৩। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯৩।

৪। হাকীম হাবিবুর রহমান, আসুদেগান-এ- ঢাকা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০১।

৫। শাহ্ সূফী সায়্যিদ আহমদউল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২।

৬। শাহ্ সূফী সায়্যিদ আহমদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩।

৭। আসুদেগান-এ - ঢাকা, হাকীম হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০১।

৮। হাকীম হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত শাহ্ সূফী দায়িমের (রঃ) ইন্তিকালের পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহ্ সূফী আহমদ উল্লাহ গদীনশীন হন। সূফী দায়েম জীবদ্দশায়ই তাঁকে ভাবী স্থলাভিষিক্ত করে যান। বহু লোক তাঁর নিকট দীক্ষাপ্রাপ্ত হন। তিনি ১২৩০ হিজরীতে/১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ৩০ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

অতঃপর তাঁর ছোট ভাই শাহ্ লকীতুল্লাহ সাজ্জাদানশীন হন। সুদীর্ঘ ২২ বছর তিনি চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও নোয়াখালীর অসংখ্য লোককে আধ্যাত্মিক জ্ঞান দান করেন।[১] ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে হজ্জ করার দশ বছর পর ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে ৪৫ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। তিনি পিতা ও পিতামহের পার্শ্বে গম্বুজের মধ্যে সমাহিত হন। তিনি ছিলেন ছোট দায়েরার প্রতিষ্ঠাতা সূফী রওশন আলীর খলীফা।[২]

সূফী লকীতুল্লাহ তাঁর বড় পুত্র শাহ্ ওলী উল্লাহকে ভাবী গদীনশীন করে যান। তাঁর নিকট অসংখ্য লোক আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করেন। তিনি ২০ রমজান ১৩০১ হিজরী/ জুন ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন এবং পারিবারিক কবরস্থানে সমাধিস্থ হন। শাহ্ ওলীউল্লাহর ইন্তিকালের পর তাঁর পুত্র শাহ্ সূফী খলীলুল্লাহ গদীনশীন হন। তিনি একজন কামিল লোক ছিলেন। স্থাপত্য শিল্পে বিশেষ অনুরাগী শাহ্ খলীলুল্লাহ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত পিতার সঞ্চিত অর্থ দিয়ে দায়রা শরীফে ইমারতসমূহ নির্মাণ করেন। তিনি মসজিদের সম্প্রসারণ করেন, খানকাহর পুরনো ইমারতটি পুনর্নির্মাণ করেন, মেহমানখানা প্রস্তুত করেন, অজুর জন্য গভীর হাউজ প্রস্তুত করেন, জাঁকালো একটি দেউড়ি তৈরী করেন এবং কবরস্থানে কবরের জায়গা ফুরিয়ে যাওয়ায় তিন গম্বুজ বিশিষ্ট রওজা নির্মাণ করেন।[৩] ইমারত নির্মাণের প্রতি তাঁর এত আগ্রহ ছিল যে, তিনি নিজেই ঐ সব কাজের তত্ত্বাবধান করতেন।

হাকীম হাবীবুর রহমান শাহ্ খলীলুল্লাহর মুরীদ তথা ভক্ত ছিলেন। তাঁর মুরশিদের স্থাপত্য-প্রীতি, নির্মাণ কার্যের তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন সম্পর্কে বলেন: একদিন তিনি সংবাদ পেলেন যে, শাহ্ খলীলুল্লাহ সিঁড়ি থেকে পড়ে গেছেন। কাল বিলম্ব না করে আজীমপুর দায়েরায় ছুটে গেলেন এবং শাহ্ সাহেবকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় দেখতে গেলেন। তাঁকে জানানো হল যে, নির্মাণ কাজ চলা অবস্থায় শাহ্ সাহেব বাঁশের একটি মইতে চড়ে উস্তাগারদের কাজের তত্ত্বাবধান করছিলেন, তখন রোদ ছিল প্রখর। হঠাৎ মাথা চক্কর দিয়ে তিনি মই থেকে মাটিতে পড়ে যান এবং গুরুতরভাবে আহত হন। হাকীম সাহেবের সেখানে পৌছার কিছুক্ষণ পর শাহ্ সাহেব সজ্ঞা ফিরে পান। হাকীম সাহেব তাঁকে বললেন ঃ অসুখ নিয়ে নির্মাণ কার্যে এত ব্যস্ত থাকা ও কষ্ট করা আপনার উচিত ছিল না। উত্তরে শাহ্ সাহেব বললেন ঃ 'মিঞা' ঐ যে সামনে একটা 'বুতখানা' (মন্দির) দেখা যাচ্ছে, তা আমার ঈর্ষা হয়, আমি চাইনা যে, ঐ দেউড়িটি দায়রা শরীফের দেউড়ির চাইতে অধিকতর উঁচু হোক, কারণ তা হলো 'বুতখানা' আর এটা হলো 'ইসলামখানা'। ইসলামখানার বাহ্য ও অভ্যন্তরীণ উভয় সৌন্দর্যই কায়েম থাকা প্রয়োজন।

শরী'আত প্রচারের প্রতি তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ ছিল। শরী'আত শিক্ষার প্রতি লোকদের অনীহা দেখে তিনি দুঃখবোধ করতেন। একদিন তিনি হাকীম হাবীবুর রহমানকে বলেনঃ ৪০টি বছর ধরে বাপ দাদার গদীতে আসীন

১। মুন্সী রহমান আলী তায়েশ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৮।
২। হাকীম হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০২।
৩। হাকীম হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০২।

Dhaka University Institutional Repository

আছি। দেখলাম, আল্লাহর পথ নির্দেশের জন্য খুব কম লোকই আমার নিকট যাতায়াত করে থাকেন। যারা আসেন, তারা কেবল তাবিয-তুমার ও ঝাড়-ফুঁকের জন্যই এসে থাকেন। শাহ্ খলীলুল্লাহ ঢাকার আল্লাহওয়ালা লোক,বিভিন্ন খানদানের হাল-হকীকত সম্পর্কে খুবই জ্ঞাত ছিলেন। তিনি পূর্ব-পুরুষদের রীতিনীতি মেনে চলতেন। ঢাকার পুরনো শরীফ লোকদের ন্যায় তিনি ও রন্ধন কার্যে সুনিপুণ ছিলেন। অত্যধিক ব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি নিজে মাঝে মধ্যে স্বহস্তে উৎকৃষ্ট খাবার তৈরী করতেন। স্বহস্তে কাজ করতে তিনি কখনও ইতস্তত করতেন না। তিনি "তুহফা-এ-আসরার-এ-খলিল" শীর্ষক পুস্তক রচনা করেন। ১৩৩৯ হিজরীর জমাদিউল আওয়াল /১৯২১ সালের জানুয়ারী মাসে পরলোক গমন করেন।[১]

শাহ্ খলীলুল্লাহর অবর্তমানে তাঁর বড় পুত্র শাহ্ সূফী লকীতুল্লাহ (দ্বিতীয়) সাজ্জাদানশীন হন। তিনি 'মুঝদা-এ-হক-করামত-এ- বর হক' নামে আজীমপুর দায়েরার ইতিহাস ও কারামত সংক্রান্ত একটি উর্দু কিতাব রচনা কনের। ৭৮ পৃষ্ঠার এই কিতাবটি ঢাকা থেকে ১৩৫২ হিজরী/১৯৩৩ খৃঃ প্রকাশিত হয়।[২] তিনি 'শাহ্ মুহাম্মদ ফজলে হক' নামে বেশী পরিচিত ছিলেন বলে তিনি কিতাবটিকে 'মুঝদা-এ-ফজলে হক' নামে অভিহিত করেন। শাহ্ লকীতুল্লাহ তাঁর মেঝো পুত্র শাহ্ ফয়জুল্লাহকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন। কিন্তু তাঁর পূর্বেই ১৩৭৩ হিঃ ১৯৫৩ সালে এই পুত্রের মৃত্যু ঘটে। এতে তিনি মর্মাহত হন। তিনি ১৩৭৯ হিঃ/১৯৫৯ খৃঃ ওফাতপ্রাপ্ত হন।[৩]

দ্বিতীয় শাহ্ লকীতুল্লাহর ইহধাম ত্যাগের পর তাঁর বড় পুত্র শাহ্ ওলী উল্লাহ (দ্বিতীয়) গদ্দীনশীন হন। ১৩৮৯ হিজরী/১৯৬৯ সালে তাঁর ইন্তিকালের পর ছোট ভাই আলহাজ্জ শাহ্ সূফী ফয়জুল্লাহ সাজ্জাদানশীন হন।

এছাড়াও হযরত শাহ্ সূফী সায়্যিদ দায়িমের (রঃ) খলীফাদের মধ্যে হযরত সূফী জংগী শাহ্ (চট্টগ্রাম), হযরত সূফী চান্দ শাহ্ (সন্দীপ) তাঁর মাজার হাতিয়ায়, হযরত শাহমান্ডে (ঢাকা), হযরত শাহ্ ফয়জুল্লাহ (ঢাকা), হযরত বাড়াশাহ্ (ঢাকা), হযরত শাহ্ গুলাম আলী (ঢাকা), হযরত শাহ্ আবু সাঈদ (কুমুর লাউ), হযরত মারী শাহ্ (আজীমপুর কবরস্থান মাযার) এবং নোয়াখালী জিলার শ্যামপুর দায়রা শরীফের প্রতিষ্ঠাতা হযরত শাহ্ সূফী যাকী উদ্দিন হোসাইনী অন্যতম ছিলেন।[৪] হযরত দায়িমের (রঃ) খাদিমগণের মধ্যে মৌলভী হাসান রেজা, মৌলভী ইয়ার মুহাম্মদ, মৌলভী ইলাহী বক্স, খন্দকার শাহ্ মুহম্মাদ যামান, শাহ্ মুহাম্মদ হায়াত, শাহ্ করম আলী, শাহ্ সূফী মুহাম্মদ সিদ্দিক (রঃ) প্রমুখরা অন্যতম ছিলেন।[৫]

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই প্রধানতঃ সম্পদশালী ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের দান-দক্ষিনা, ভক্তদের তুহফা ও আল্লাহভীরু জনসাধারণের হাদিয়া থেকেই ঢাকার আজীমপুর দায়েরাসহ দেশের অন্যান্য এলাকার দায়েরার লোকজনের জীবিকা নির্বাহ হত।[৬]

১। হাকীম হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০২।
২। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯৫-৯৬।
৩। আইনুন জারিয়া, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৮।
৪। শাহ্ সূফী সায়্যিদ আহমদ উল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩।
৫। শাহ্ সূফী সায়্যিদ আহমদ উল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩।
৬। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ , প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

উনিশ শতকের ঢাকাস্থ তিনজন পীরের সামাজিক মর্যাদা ও তাদের জীবিকার উপায় সম্পর্কে এ, এল ক্লে বলেন ঃ *'There are three pirs or holy men of great Sanctity in the vicinity of the town, one at Azimpoora near the Government elephant depot (pilkhanah), another at the village of Moghbazar, about three miles to the north of the town beyond the Race-course, and a third at Ekrampore in the suburbs to the east ward, near the Dhulay creeck, Fakirs are numerous in the city and subsist principally on the bounty of the wealthy Musalman in-habitants, as Mirza Golam peer, Khajeh Abdool Gunny and others''*[১]

শাহ্ সূফী দায়িম (রঃ) প্রতিষ্ঠিত খানকাহ্ শরীফে পূর্ববর্তী বুযুর্গদের সংগৃহীত কিতাব সমূহের জন্য একটি গ্রন্থাগার রয়েছে। এতে অনেক দুষ্প্রাপ্য আরবী, ফারসী ও উর্দু গ্রন্থের মধ্যে শাহ্ ফজলে হক-এর 'মুক্তদা-এ-ফজল-এ-হক' এবং শাহ্ খলীলুল্লাহর 'আসবার-এ-খলীল উল্লেখযোগ্য। এই খানকাহ্ শরীফে সোনালী রংগের দু' টি সুন্দর কুর'আন শরীফ রয়েছে। তন্মধ্যে একটিতে বাদশাহ্ আলমগীরের আমল থেকে দ্বিতীয় শাহ্ আলমের যুগ পর্যন্ত ঢাকার কাযীদের সীলমোহরের ছাপ রয়েছে। এটি কুর'আনের একটি বিরল কপি।

এই খানকাহর লোকেরা বর্তমানে শুধু আধ্যাত্মিক দীক্ষা নয় বরং আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে চাকুরী বাকরিতে নিয়োজিত আছেন। ছোট দায়েরার গদীনশীনগণ ও এ ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। সূফী দায়িমুল্লাহ একজন ভাল ইউনানী চিকিৎসকও বটে। তিনি 'দায়িমী হেলথ কমপ্লেক্স' নামে একটি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছেন। কয়েকটি জেলায় এই দাওয়া খানার অনুমোদিত এজেন্টও রয়েছে। এ ছাড়াও তিনি বেশ কয়েকটি মাদ্রাসাও এতিমখানা স্থাপন করেছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলার আমিরাবাদ সুফিয়া 'আলিয়া মাদ্রাসা, সুফিয়া দায়িমীয়া মুসলিম এতিমখানা ও কুমিল্লার আস্‌মতুল্লার এতিমখানা উল্লেখযোগ্য।[২]

১। A.L. Clay- Principal Head of the History and Statistics of Dhaka Division - London 1868,.p.29.

২। নূরুল আলম, আজীমপুর দায়রা শরীফের আত্মকথা, তারিখ বিহীন, পৃঃ ১১।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা শাহ্ আতাউল্লাহ হুসাইনী
(মৃঃ - ১৮০৪/ ১৮০৫)

মাওলানা শাহ আতাউল্লাহ্ হুসাইনী সায়্যিদ লাল শাহ্-এর পৌত্র মাওলানা রহমতুল্লাহ-এর পুত্র ছিলেন। তিনি দিল্লীতে বসবাস করতেন। দিল্লী থেকে চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত সাতকানিয়া থানার সাতঘর গ্রামে আগমন করেন । তাঁর জন্মকাল, চট্টগ্রাম আগমনের সময় ও জীবনৈতিহাস সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায়নি ।

জাহিরী ইলম-এ তিনি গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন । একবার তিনি রোম শহরে গিয়েছিলেন। রোমের বাদশাহ তাঁকে একটি তরবারী দান করেন। তরবারীখানা অদ্যাবধি সযত্নে রক্ষিত আছে। রোগীদের তরবারীখানা ধৌত করে পানি পান করালে আরোগ্য লাভ করে বলে জনসাধারণের ধারণা ।

আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ইল্‌ম-এ-লাদুনী দান করেছিলেন। হাকীকত, তরীকত, শরী'আত ও মা'রিফাত-এ তাঁর খুব প্রতিভা ছিল। তিনি সর্বদাই আল্লাহর যিক্‌র-এ নিমগ্ন থাকতেন। সূফী নামেই তাঁকে অভিহিত করা হত। তিনি ২২শে শাওয়াল ১২১৯হিঃ/ ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে ইনতিকাল করেন। সাতঘর গ্রামে তাঁর মাযার অবস্থিত। তাঁর জনৈক মুরীদ আবদুল জব্বার সদাবী তাঁর ইনতিকাল সম্পর্কে একটি ফারসী কবিতায়[১] বর্ণনা করেছেন তাঁর নাম সৈয়দ আতাউল্লাহ । তিনি দিল্লীর অধিবাসী এবং সৈয়দ লাল শাহের পৌত্র ছিলেন । ২২শে শাউয়াল, ১২১৯ হিঃ/২৪শে মাঘ, ১৮০৪ইং রোজ শনিবার আসরের নামাযের সময় তিনি ইনতিকাল করেছেন এবং মৃত্যুর তৃতীয় দিবস সোমবার সকাল বেলা তাঁকে দাফন করা হয় ।[২]

পীর জঙ্গী
(মৃত্যুঃ ১৮১৫ইং)

পীর জঙ্গী শাহ্ সুলতানুল আওলিয়া (রঃ) ১৮শ ও ১৯শ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বুযুর্গ, পীর ও সূফী সাধক ছিলেন । বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে তিনি এতদঞ্চলে, বিশেষত ঢাকা জিলায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেন । শাহ্ সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (রঃ)-এর অন্যতম সহযোগী এবং এতদঞ্চলে মুজাহিদ সংগ্রহ, প্রশিক্ষণ প্রদান তাদেরকে সীমান্ত প্রদেশে প্রেরণের তত্ত্বাবধানে তিনি নিয়োজিত ছিলেন বলে জানা যায় । তা ছাড়া আধ্যাত্মিক তা'লীম প্রদানসহ দাওয়াত, তাবলীগ প্রভৃতি দ্বীনী দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে এতদঞ্চলে ইসলামের পতাকাকে সমুন্নত রাখেন ।

পীর জঙ্গী (রঃ)-এর প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না । জানা যায়, তিনি বাগদাদ থেকে প্রথমে ভারতে আগমন করেন । ভারত আগমনের পূর্বে তিনি স্থানীয় মুসলিম মনীষী-

---

১। ফারসী কবিতার অংশ বিশেষ হল ঃ-

پس از حمد اله نعت پیغمبر ـ کشم تاریخ وفات هادی سقرر .

بتاریخ اثنا عشرین شهر شوال [illegible] نوزده هجرت سال

২। মাওলানা এম, ওবাইদুল হক, বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ, পৃঃ ৫-৬

Dhaka University Institutional Repository

দের সাহচর্য লাভ করেন এবং তাঁদের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন । অতঃপর সদ্য পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ ভারতীয় মুসলমানদেরকে ইংরেজ দাসত্বের কবল থেকে উদ্ধার এবং ইসলামের সুমহান আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে ভারতে আগমন করেন ।

বাংলায় তখন হিন্দু জমিদারদের দৌরাত্ম্য ছিল । মুসলিম প্রজারা তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। অপরদিকে বৃটিশ বেনিয়াদের দোর্দন্ড প্রতাপে মুসলিম সমাজের অস্তিত্ব বিপন্ন প্রায় । এমনি দুর্দিনে সমাজকে উদ্ধারের জন্য পীর জঙ্গী বাংলাদেশের ঢাকায় তাঁর কর্মক্ষেত্র নির্দিষ্ট করেন । তিনি বাংলাদেশে অথবা ঢাকায় কখন, কোথায় এবং কিভাবে আগমন করেন তা অস্পষ্ট । যা হোক, শেষ পর্যন্ত তৎকালীন ঢাকা শহরের ব্যস্ততা এড়িয়ে নিকটবর্তী মতিঝিলের জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে তিনি আস্তানা স্থাপন করেন- যা আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য খুব অনুকূল ছিল । জঙ্গলে বসবাসকালীন সময়ে স্থানীয় জনগণ তাঁকে জঙ্গলের পীর বলতে থাকায় তাঁর নাম 'পীর জঙ্গী' হয়ে যায় অথবা তিনি স্থানীয় জমিদার ও বৃটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে জঙ্গ বা জিহাদে অংশগ্রহণ ও মুজাহিদ বাহিনীকে সর্বোতভাবে সহযোগীতা করায় তাঁর নাম 'পীর জঙ্গী' বা জিহাদী পীর হয় বলে অনুমান করা হয় । তবে, এ ব্যাপারে এ পর্যন্ত কোন নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায়নি ।

মতিঝিল জঙ্গলেই তিনি শেষ জীবন অতিবাহিত করেন । এ সময় পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে হিন্দুদের প্রাধান্য থাকায় পীর জঙ্গী হিন্দুদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতে থাকেন । তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে এতদঞ্চলে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং নওমুসলিমরা এখানকার জঙ্গলে এসে বসবাস শুরু করে। বর্তমান মতিঝিল কলোণী ও কমলাপুর রেলওয়ে ষ্টেশন স্থাপনের পূর্ব পর্যন্ত এখানে জঙ্গলের পাশাপাশি মুসলিম জনবসতিও বর্তমান ছিল ।

পীর জঙ্গী (রঃ)-এর মৃত্যুর সঠিক তারিখ পাওয়া যায় না । তবে তাঁর মাযার গাত্রে লিখিত ১২২১ বঙ্গাব্দ/১৮১৫ খৃষ্টাব্দ থেকে অনুমান করা যায় যে, তিনি উক্ত তারিখেই ইন্তিকাল করেন । আর যেহেতু তিনি ইরাক থেকে আগমন করেন এবং তাঁর প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে কোন তথ্য অবগত হওয়া যায় না, সেহেতু লিখিত ১৮১৫ সনই তাঁর মৃত্যু সন বলে মনে হয় । বালাকোট যুদ্ধ (৬ই মে ১৮৩১ ইং) সংঘটিত হওয়ার ১৬ বৎসর পূর্বে তিনি ইন্তিকাল করেন ।

পীর জঙ্গী (রঃ)-এর শাগরিদদের সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না । তবে মতিঝিলে এসে তিনি বন্ধুশাহ্ নামক একজন অভিজাত হিন্দুকে ইসলামে দীক্ষিত করেন ও মুরীদ করেন । অতঃপর পর্যায়ক্রমে বন্ধুশাহ-এর মাধ্যমে শাগরিদত্বের সিলসিলা চলতে থাকে । পীর জঙ্গীর পর্যায়ক্রমিক শাগরিদরা হলেন ঃ ১। বন্ধু শাহ্ ২। আফাজ উদ্দিন শাহ্ ৩। ইলিয়াস শাহ্ ।

পীর জঙ্গীর মৃত্যুর পর তাঁর আস্তানা সংলগ্ন এলাকায় তাঁকে দাফন করা হয় পরে যা মাযারে রূপ নেয়। মাযারের পাশেই বহু পরে বর্তমান পীর জঙ্গী মসজিদটি নির্মিত হয় । বর্তমানে এটি ঢাকার অন্যতম বৃহৎ মসজিদ । ইহার সংস্কার কাজ এখনও অব্যাহত রয়েছে ।

পীর জঙ্গী মাযারের প্রায় ৩৬ বিঘা জমির ওয়াকফ এষ্টেট ছিল । পরে সরকার কলোণী নির্মাণকালে সামান্য কিছু বাদে বাকি জমি হুকুম দখল করে । বর্তমান মাযার ও মসজিদ ছাড়াও ওয়াকফ এষ্টেটের কিছু জায়গা পড়ে আছে এবং কতকাংশে দোকান আছে ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতি বৎসর রজব মাসের ২৫, ২৬ ও ২৭ তারিখ উরস পালিত হয়।[১]

সূফী সায়্যিদ ওয়ারিস আলী (রঃ)
(মৃঃ ১৮৩১)

সায়্যিদ আহমদ শহীদের সাথে বালাকোট-এর যুদ্ধে (১৮৩১ খৃঃ) যেসব বাঙ্গালী অংশগ্রহণ করে শাহাদাত বরণ করেন সূফী সায়্যিদ ওয়ারিস আলী (রঃ) তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি বাংলার অন্যতম সূফী সাধক সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরীর মুরীদ ও খলীফা ফতেহ আলী-এর পিতা ছিলেন।[২] তিনি চট্টগ্রাম-এর অধিবাসী ছিলেন।[৩] তাঁর জন্ম তারিখ ও জীবনী সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায়নি। তিনি একজন বড় 'আলিম, পরহেযগার ও বুযুর্গ লোক ছিলেন। সায়্যিদ আহমদ শহীদের বাঙ্গালী সহযোদ্ধাদের মধ্যে তিনি বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তিনি পাকিস্তানের সোয়াত জিলার পশ্চিমাংশে পাহাড়ী অঞ্চলে পানজতার নামক স্থানে ১৮৩১সালে বালাকোটের যুদ্ধে শহীদ হন। সীমান্ত প্রদেশের পানজতারে তাঁর মাযার আছে।[৪]

হযরত শাহ্ আমানতুল্লাহ (রঃ) ওরফে আমানত শাহ্

চট্টগ্রামের বার আওলিয়ার অন্যতম হযরত শাহ্ আমানতুল্লাহ (রঃ) বিহারে এক পাঠান বংশে জন্ম গ্রহণ করেন।[৫] তবে মাওলানা নূরুর রহমান 'তাযকেরাতুল আওলিয়া' গ্রন্থে তাঁকে পাকিস্তানের সীমান্ত প্রদেশের লোক বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর জন্মের সঠিক তারিখ জানা যায়নি, তবে তাঁর জীবনীর উপর লিখিত বিভিন্ন তথ্যের মাধ্যমে জানা যায় যে, তিনি অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে জন্ম গ্রহণ করেন। শাহ্ আমানতুল্লাহর পিতার নাম ছিল শাহ্ নি'য়ামতুল্লাহ। তাঁর পূর্ব পুরুষগণ বাগদাদের অধিবাসী ছিলেন। এবং হযরত বড় পীর আব্দুল কাদের জীলানী (রঃ) এর বংশধর ছিলেন।[৬]

শাহ্ আমানতুল্লাহর পিতামহ শায়খ সদরুদ্দীন বাগদাদ থেকে বিহারে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন এবং বিহারের সুপ্রসিদ্ধ সূফী শাহ্ মুন'য়িম পাকবাচের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন।

শাহ্ আমানতুল্লাহর পিতা শাহ নি'য়ামতুল্লাহ বিহারের একজন বিখ্যাত 'আলিম, সাধক ও ইসলাম প্রচারক ছিলেন। সেখানকার বহু লোক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, অনেক মুসলমান তত্ত্বজ্ঞানের শিক্ষা লাভ করেন। একমাত্র পুত্র শাহ্ আমানতুল্লাহর প্রাথমিক শিক্ষার ভার তিনি নিজেই গ্রহণ করেন। পিতার নিকট প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করে উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে পাটনার একটি উচ্চ পর্যায়ের মাদ্রাসায় ভর্তি হন।[৭]

১। ইসলামী বিশ্বকোষ, চতুর্দশ খন্ড, পৃঃ ৪৫০ -৪৫১।
২। মতীউর রহমান, আয়না-ই-উয়াইসী, পৃঃ ১৪৫।
৩। মতীউর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪১।
৪। মতীউর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৫।
৫। মাওলানা এম ওবায়দুল হক, বাংলাদেশের পীর আওলিয়াগণ, রশীদ এ্যান্ড ব্রাদার্স,- হামিদিয়া লাইব্রেরী, ফেনী, নোয়াখালী, পৃঃ ১০৮।
৬। মোবারক করীম জওহর, ভারতের সূফী, পৃঃ ১৯৩।
৭। মোবারক করীম জওহর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

শাহ্ আমানতুল্লাহ, পিতার নিকটেই কিছুটা আধ্যাত্মবিদ্যা লাভ করেন। পরে বিহারের অনেক সূফী সাধকের সাহচর্যে থেকে উচ্চতর স্তরে উন্নীত হন। বিহারের বিখ্যাত সাধক শাহ্ মুন'য়িম পাকবাচের পীর খলীলুদ্দীন তাঁর পীর ছিলেন। পিতার ইন্তিকালের পর শাহ্ আমানতুল্লাহ পিতার স্থলাভিষিক্ত হয়ে ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন এবং জীবনের মধ্যভাগ পর্যন্ত বিহারেই কাটান।[১]

আধ্যাত্মিকজ্ঞান অর্জনের জন্য শাহ্ আমানতুল্লাহ বহু দেশ যেমন দিল্লী, কাশ্মীর, লক্ষ্ণৌ, মুর্শিদাবাদ গমন করেছিলেন। দিল্লীতে এসে তিনি জনৈক ব্যক্তির নিকট শাহ আব্দুর রহীম শহীদের বুযুর্গীর কথা শুনে তাঁর অনুসন্ধানে লক্ষ্ণৌ উপস্থিত হন। সেখানে যেয়ে তিনি জানতে পারলেন যে, হযরত শাহ্ শহীদ মুর্শিদাবাদ আছেন। লক্ষ্ণৌ থেকে মুর্শিদাবাদ এসে তাঁর সাক্ষাত পান। হযরত শাহ্ আব্দুর রহীম শাহ্ আমানতুল্লাহকে দেখেই তাঁর যোগ্যতার পরিচয় পেয়ে অতি আগ্রহের সাথে তাঁকে মুরীদ করেই প্রথমে উচ্চ পর্যায়ের সবক প্রদান করেন। শাহ্ আমানত তাঁর কাংখিত মুর্শিদ পেয়ে কঠোর পরিশ্রম করে অল্প দিনের মধ্যে কাদ্‌রিয়া, চিশ্‌তিয়া, নকশ্‌বন্দিয়া এবং মোজাদ্দিদীয়া তরিকাহর খিলাফত লাভ করেন।[২]

শাহ্ আমানত তখনও বিয়ে করেন নাই। সাংসারিক ঝামেলায় লিপ্ত না হয়ে বনে জঙ্গলে ঘুরে নিরিবিলি আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করাই ছিল তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু হযরত শাহ্ আবদুর রহীম তাঁকে বিবাহ-শাদী করে সাংসারিক হতে এবং হালাল উপায়ে জীবিকা উপার্জনের ব্যবস্থা করে শরী'আতের বিধান অনুযায়ী সংসার যাত্রা নির্বাহ করতে নির্দেশ প্রদান পূর্বক চট্টগ্রাম চলে আসার পরামর্শ দেন। পীর সাহেবের পরামর্শ অনুযায়ী তিনি চট্টগ্রামে চলে আসেন। চট্টগ্রামে এসেই তিনি অনায়াসে জজ কোর্টে মীর দফতরীর পদে চাকুরী নিয়ে হালাল জীবিকার ব্যবস্থা করে শহরেই কোন এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে বিবাহ করেন। অতঃপর তিনি দিনে চাকুরী ও রাতে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করতে লাগলেন।

হযরত শাহ্ আবদুর রহীম ইতোমধ্যে কয়েকবার ঢাকায় আগমন করেছিলেন। সংবাদ পেয়ে প্রত্যেক বারই শাহ্ আমানত ঢাকায় এসে তাঁর সাথে সাক্ষাত করে ফয়েয লাভ করেন।[৩] হযরত শাহ্ আমানতুল্লাহর চট্টগ্রাম আগমনের কারণ সম্পর্কে আরো একটি কিংবদন্তী রয়েছে- "একদা তিনি স্বপ্নে দেখলেন যে, তার মরহুম পিতা নি'য়ামতুল্লাহ তাঁকে বিহার ত্যাগ করে বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলে যাবার আহবান জানাচ্ছেন। স্বপ্নের মাধ্যমে সন্তানকে চট্টগ্রাম শহর দেখিয়ে দিয়ে তিনি অদৃশ্য হয়ে যান"।[৪]

স্বপ্ন দেখার পর থেকেই তাঁর মন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে। তাঁর পক্ষে আর বিহার থাকা সম্ভব হচ্ছিল না। কাজেই তিনি কালবিলম্ব না করে পিতার স্বপ্ন নির্দেশিত শহরের উদ্দেশ্যে বের হন। অবশেষে বাংলাদেশে এসে এমন একটি

১। মোবারক করীম জওহর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৪।
২। মাওলানা এম ওবায়দুল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৯।
৩। মোবারক করীম জওহর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৪।
৪। মোবারক করীম জওহর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

শহরের সন্ধান পেলেন যার সঙ্গে তাঁর স্বপ্নে দেখা শহরটি হুবহু মিলে গেল। তিনি জানতে পারলেন এ শহরের নাম চট্টগ্রাম। তিনি আল্লাহর অশেষ শুক্র আদায় করে সেখানেই অবস্থান করার মনস্থ করলেন।[১]

হযরত শাহ্ আমানতুল্লাহর (রঃ) চট্টগ্রামে আগমনের কারণ সম্পর্কে মাহবুব উল আলম সাহেব বলেন, " ইংরেজ জজ মোহাম্মদ শফি শাহ্কে পাগল সাব্যস্ত করে যেদিন জেলে নেবার হুকুম দিলেন সেদিন তিনি তাঁর নাড়িতে চট্টগ্রামের টান অনুভব করলেন। দেখলেন চট্টগ্রামের বেলায়েত খালি পড়ে আছে। তাঁকে নিজে গিয়েই উহার শাসন ভার নিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গেই চট্টগ্রাম রওয়ানা হলেন"।[২]

উপরোক্ত তিনটি কারণের যে কোন কারনেই তিনি চট্টগ্রামে এসে থাকুন না কেন-উক্ত কারণগুলোর কোনটিকেই খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। তাঁর চট্টগ্রাম আগমনে উল্লেখিত প্রত্যেকটি কারণই ক্রিয়া করেছে, একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। যে কোন কারণেই হোক, তিনি চট্টগ্রামে এসে নিজের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন রেখে স্থানীয় জজকোর্টে একটি সামান্য চাকুরী গ্রহণ করেন এবং রাতে ইবাদতে মশগুল থাকেন।[৩]

তাঁর চাকুরীর পদ নিয়েও বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে। কেহ কেহ বলেন তিনি পিয়নের চাকুরী নেন; আবার কেহ কেহ বলেন- তিনি পাখা টানার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। জনসাধারণ তাঁকে খান সাহেব বা মিঞা সাহেব বলে ডাকত।[৪] তখন কোর্ট কাচারীতে ফারসী ভাষায় কাজকর্ম চলছিল। আর শাহ্ আমানতুল্লাহ ছিলেন ফারসী ভাষায় অগাধ পান্ডিত্যের অধিকারী।[৫] তিনি ইচ্ছে করলে যে কোন উচ্চ সরকারী পদে অধিষ্ঠিত হতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা কেন করেননি তা বলা মুশকিল। তবে শাহ আমানতুল্লাহ (রঃ) এর যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত না হয়ে সামান্য পিয়নের পদে চাকুরী গ্রহণ করার পশ্চাতে কয়েকটি কারণ থাকতে পারে। হয়ত বা নিজের জ্ঞান গরিমা প্রকাশ করার ইচ্ছা তাঁর আদৌ ছিলনা। দেশে ইংরেজ রাজত্ব চলার কারণে মুসলমানদের চাকুরীর সংস্থান দিন দিন কমে আসছিল হয়ত বা ইংরেজ রাজত্ব স্থাপনের পর সরকারী চাকুরী এবং ব্যবসা বাণিজ্যসহ সকল ক্ষেত্রে মুসলমানেরা একে একে অবহেলিত হয়ে পড়ে। তাই তিনি জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা হিসাবে এই পিয়নের চাকুরী গ্রহণ করেন।[৬]

শাহ্ আমানত (রঃ) চট্টগ্রামের কদম মোবারক মসজিদের অদূরেই একটি বাসস্থান নির্মান করেন এবং বিবাহ করে অতি সাধারণ সংসারী লোকের মতই সেখানে বাস করতে থাকেন। অন্যান্যের মত তিনিও যথারীতি গৃহস্থালীর কাজ করতেন। কিন্তু লোক চক্ষুর অন্তরালে তিনি অতি সঙ্গোপনে চালিয়ে যান একনিষ্ঠ আধ্যাত্মিক-সাধনা।[৭] কদম

১। মোবারক করীম জওহর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৫।
২। মাহবুব-উল-আলম, চট্টগ্রামের ইতিহাস, পৃঃ ৫।
৩। আব্দুল করিম, হযরত শাহ্ সূফী আমানত খান; প্রকাশনায় - শাহজাদা বেলায়েত উল্লাহ খান, খানকা শরীফ, হযরত শাহ্ সূফী আমানত খান (রঃ), হযরত শাহ্ আমানত সড়ক, চট্টগ্রাম- ৩য় প্রকাশ, শ্রাবণ-১৩৯২ বাংলা, পৃঃ ২৪।
৪। আবদুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪।
৫। মোবারক করীম জওহর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০০।
৬। আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪।
৭। মোবারক করীম জওহর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০০।

Dhaka University Institutional Repository

মোবারক মসজিদে বসেই তিনি আধ্যাত্মিক-সাধনা করেন। বর্তমান জামে মসজিদটি ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে নওয়াব শায়েস্তা খান চট্টগ্রাম বিজয় করলে তাঁর পুত্র ও চট্টগ্রামের প্রথম মোগল নওয়াব বুযুর্গ উমেদ খান নির্মাণ করেন। কিন্তু ইংরেজরা তাদের শাসনামলে মসজিদটিকে গোলা বারুদ প্রভৃতি যুদ্ধ সামগ্রীর গুদামে পরিণত করে। চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক হামীদুল্লাহ খানের প্রচেষ্টায় পরে মসজিদটি মুসলমানদের ব্যবহারের জন্য ফেরত দেয়া হয়। শাহ্ আমানতুল্লাহর চট্টগ্রামে আগমনের সময়ও মসজিদটি ইংরেজদের গুদামে পরিণত ছিল এবং সেই কারণে নওয়াব ইয়াসিন খান কর্তৃক নির্মিত কদম মোবারক মসজিদ জামে মসজিদ রূপে পরিগণিত ছিল।[১]

শাহ্ আমানতুল্লাহর চট্টগ্রাম আগমনের সঠিক সন তারিখ জানা যায়নি। তবে বিভিন্ন সূত্র থেকে অনুমান করা যায় যে, তিনি ১৭৮১ খৃঃ থেকে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কোন এক সময় চট্টগ্রাম আসেন। যেহেতু তিনি চট্টগ্রাম আসার পর পরই স্থানীয় জজকোর্টে চাকুরী নেন এবং ১৭৮১ সালের পূর্বে চট্টগ্রামে কোন জজকোর্ট ছিলনা। তাই অনুমিত হয় যে, তিনি ১৭৮১ সালের পরেই চট্টগ্রামে আসেন। ইংরেজ সরকার চট্টগ্রাম জজকোর্ট স্থাপন করেন ১৭৮১ সালে।[২]

প্রত্যেক ওলি দরবেশের স্বভাব এই যে, তাঁরা আধ্যাত্মিক জগতে যত উচ্চ মর্যাদাই লাভ করুন না কেন তাঁরা তা সর্বদাই গোপন রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। জনসাধারণের মধ্যে নিজেদের স্বরূপ প্রকাশ করতে তাঁদের একান্তই অনিচ্ছা। তবুও কালক্রমে মানুষের নিকট তাঁদের স্বরূপ ধরা পড়ে যায়। শাহ্ আমানতুল্লাহর জীবনেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। চট্টগ্রাম এসে তিনি নিজকে যথাসাধ্য গোপন রাখার চেষ্টা করেছিলেন। সুফী সাধকরা দুঃস্থ, বিপন্ন ও গরীবদের সেবা ও সাহায্য করেন। কিন্তু মাঝে মধ্যে তাঁরা এমন কিছু সেবা সাহায্য করেন যা করতে গিয়ে তাঁরা আর নিজেদেরকে গোপন রাখতে পারেন না। তদ্রূপ নিম্নোক্ত ঘটনায় শাহ্ আমানতুল্লাহ (রঃ) নিজকে আর গোপন রাখতে পারেননি এবং তাঁর সূফী সাধনা প্রকাশ পায়।

শাহ্ আমানতুল্লাহ চট্টগ্রাম কোর্টে পিয়নের, মতান্তরে পাখা টানার কাজ করতেন। তখন সন্দ্বীপবাসী মতান্তরে কক্সবাজার বা মহেশখালীর জনৈক[৩] লোক তার মোকাদ্দমার তারিখ জানার জন্য চট্টগ্রাম শহরে আসেন। মোকাদ্দমায় নিযুক্ত তার পক্ষের উকিলের সংগে সাক্ষাত করে জানতে পারলেন যে, সেদিনই তার মোকাদ্দমার শুনানীর তারিখ, অথচ তার সঙ্গে মোকাদ্দমা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নেই। লোকটি উকিলের নিকট আরো জানতে পারলেন যে, আগামীকাল প্রয়োজনীয় দলীলপত্র দেখাতে না পারলে মামলা খারিজ হয়ে যেতে পারে। এ কথা শুনে লোকটি যেমন আশ্চর্য হয়ে পড়েন তেমনি নিজেকে অত্যন্ত বিপন্নবোধ করেন। কেননা, মোকাদ্দমার তারিখ অজ্ঞাত থাকায় মোকাদ্দমার শুনানীর জন্য এবং বিচারের জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেননা। লোকটি এর জন্য উকিলকে দায়ী করলে উকিল ভুলবশতঃ লোকটিকে মোকাদ্দমার তারিখ জানাতে পারেননি বলে দুঃখ প্রকাশ করেন।

১। আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪-২৫।
২। মোবারক করীম জওহর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৪।
৩। মাওলানা এম ওবাইদুল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১০।

Dhaka University Institutional Repository

লোকটি উকিলের সাথে পরামর্শ করে ঠিক করলেন যে, তিনি জজের নিকট মোকাদ্দমা মুলতবী করার আবেদন জানাবেন, যাতে তিনি দলীল দস্তাবেজ নিয়ে আসতে পারেন। কিন্তু কোর্টে এসে তিনি তার বিপরীত অবস্থা দেখতে পান। জর্জ মামলাটি অনেক পুরানো বলে মূলতবী করার আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। জজ সাহেব সেদিনই শুনানী দিতে চাইলেন। লোকটির অনেক কান্না কাটিতে তিনি একদিনের সময় দিলেন। কিন্তু এ সময়ের মধ্যে মহেষখালী থেকে দলীল-পত্রাদি নিয়ে আসা সম্ভব ছিলনা। তাই লোকটি কোর্ট ছুটির পর মনের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে চলে আসছিল। এ সময় শাহ্ আমানতও ঘরে ফিরছিলেন। লোকটির ক্রন্দনে শাহ্ আমানত অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন যে, আগামীকালের মধ্যে মোকাদ্দমা সংক্রান্ত কাগজপত্রাদি দাখিল না করতে পারলে তার মোকাদ্দমা খারিজ হয়ে যাবে এবং সে কাঙ্গাল হয়ে পড়বে। লোকটির দুরবস্থার কথা শুনে শাহ্ সাহেবের দয়া হল। শাহ্ সাহেব জানতে চাইলেন তাঁর সম্পত্তিগুলো হালাল পথে অর্জিত কিনা। লোকটি হলফ করে বলতে লাগলো তার সম্পত্তি সব হালাল পথে অর্জিত। শাহ্ সাহেব লোকটিকে ঐ দিনই মাগরেবের নামাজের পর সদরঘাটে সাক্ষাত করার অনুরোধ করেন। লোকটি এতে আশ্বস্ত হয়ে ভাবলেন যে, শাহ্ সাহেব কোর্টে চাকুরী করেন, তিনি হয়তো জজকে ধরে একটা ব্যবস্থা করে দেবেন। সে যা হোক সন্ধার পর নির্দিষ্ট স্থানে উভয়ের সাক্ষাত হল। সদরঘাটে লোকটিকে দেখে শাহ্ সাহেব বললেন- আমি তোমার কোন উপকার করে দিলে কারো কাছে তা প্রকাশ করতে পারবেনা, করলে তোমার অমঙ্গল হবে। লোকটি তাতেই রাজী হল এবং কারো নিকট তা না বলার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল। শাহ্ সাহেব লোকটির চক্ষু বন্ধ করে দিলেন এবং একখানা রুমাল নদীতে বিছিয়ে দিলেন। রুমালখানি নদীতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে একখানা কিস্তিতে পরিণত হল। শাহ্ সাহেব লোকটিকে কিস্তিতে উঠিয়ে দিয়ে বললেন- কিস্তিখানি তাঁকে যেখানে নিয়ে যায় সেখানে গিয়েই তিনি নামবেন এবং দলীল দস্তাবেজ নিয়ে পুনরায় কিস্তিতে সওয়ার হবেন এবং আবার চোখ বন্ধ করবেন এবং আবার কিস্তি যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই যেন তিনি চোখ খোলেন ও নেমে পড়েন। শাহ্ সাহেবের নির্দেশমত লোকটি তাই করলেন। তিনি যখন অনুভব করতে পারলেন যে, কিস্তিটি মাটির সঙ্গে লেগেছে তখন চোখ খোলে অবাক বিস্ময়ে দেখলেন যে, কিস্তিখানি ঠিক তাঁর বাড়ীর ঘাটেই লেগেছে। শাহ্ সাহেবের আদেশমত তিনি কাউকে কিছু না বলে নিঃশব্দে কাগজপত্র নিয়ে একই কায়দায় কিস্তিতে সওয়ার হয়ে সুবহি সাদিকের সময় সদরঘাট (চট্টগ্রাম) এসে পৌঁছেন।

শাহ্ সাহেব লোকটিকে পূর্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়ে দিয়ে গন্তব্যস্থানে চলে যান। লোকটি আনন্দে দলীল দস্তাবেজ নিয়ে কোর্টে হাজির হয়ে উকিলকে কাগজপত্র বুঝিয়ে দিয়ে মোকাদ্দমার শুনানীর জন্য তৈরী হলেন। অবশ্য উকিল সাহেব এত অল্প সময়ের মধ্যে কাগজ কোথায় পাইলেন জানতে চাইলে লোকটি বললেন কাগজপত্রগুলো শহরেই আমার এক বন্ধুর নিকট ছিল সেকথা ভুলে গিয়েই পূর্বের দিন মোকাদ্দমা মূলতবী রাখার আবেদন জানিয়েছিলাম। জজ সাহেব এজলাসে বসার পর মোকাদ্দমার শুনানী আরম্ভ হলে লোকটি এক মহাবিপদের সম্মুখীন হল। জজ সাহেব লোকটির দলীলপত্র দেখে রেগে গেলেন এবং বললেন যে, এই অল্প সময়ের মধ্যে তোমার বাড়ী হতে কাগজপত্র আনা সম্ভব নয়। তুমি শঠ মিথ্যাবাদী। তিনি দলীল দস্তাবেজ তার বন্ধুর কাছে রেখে ভুলে গিয়ে পূর্বের দিন মোকাদ্দমা মূলতবী রাখার আবেদন করেছিলেন বলে অজুহাত দেখাতে চেষ্টা করলেন। উকিলও জজ সাহেবকে লোকটির পক্ষে সাফাই গেয়ে বুঝাতে চেষ্টা করলেন যে, লোকটি শঠ এবং মিথ্যাবাদী নয়। জজ সাহেব এতে মোটেই কর্ণপাত করলেন না, তিনি লোকটিকে কোর্ট অবমাননার শাস্তি প্রদানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। আর সে শাস্তির মেয়াদ ৭ বৎসর কারাদন্ড।

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ব প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ থাকলেও লোকটি পরিস্থিতির শিকার হয়ে শাহ্ সাহেবের কারামতের কথা প্রকাশ করে দিলেন। কোর্টে উপস্থিত সকলেই লোকটির কথা শুনে আশ্চর্য হলেন। ইংরেজ জজও অলৌকিক (super natural) কাজের মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনা শুনে স্তম্ভিত হলেন। তিনি এজলাসে স্থির থাকতে পারলেন না। এজলাস থেকে নেমে এসে অতি পরিচিত নগণ্য চাকুরে শাহ্ আমানতুল্লাহর পা জড়িয়ে ধরে বললেন, হুজুর আমার এত দিনের বহু অন্যায় ও বেয়াদবী মাফ করে দেবেন। মেহেরবানী করে আপনি আর কোর্টে আসবেন না। আপনার যাবতীয় খরচ আমিই বহন করব।[১]

শাহ্ আমানতুল্লাহ অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে জজকোর্টে পিয়নের চাকুরী গ্রহণ করেননি। তাঁর অর্থের কোন প্রয়োজন ছিলনা। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল নিজের প্রকৃত স্বরূপকে লোক চক্ষুর অন্তরালে রাখা। সেই গুপ্ত রহস্যই যখন প্রকাশিত হয়ে গেল তখন আর চাকুরী করার কোন প্রয়োজনই রইলনা। কাজেই তিনি চাকুরী ছেড়ে দিয়ে পরিপূর্ণভাবে জনসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। চট্টগ্রাম শহরের লালদীঘির পাড়ে একটি খানকাহ্ গৃহ স্থাপন করে সেখানে বসে দিবা রাত্রী আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত রইলেন।[২] অল্পকালের মধ্যে তাঁর বুযুর্গী ও কামালিয়াতের কথা সমগ্র চট্টগ্রাম শহরে এবং মফঃস্বলে আলোচিত হতে লাগল এবং চট্টগ্রাম ও অন্যান্য জেলার বহু 'আলিম ও পরহেযগার লোক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করে মুরীদ হয়ে তত্ত্বজ্ঞানে দীক্ষা গ্রহণ করতে লাগলেন। এমনকি সুদূর আসাম প্রদেশ থেকে প্রচুর সংখ্যক ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষও তাঁর নিকট এসে ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হন।[৩]

তাঁর নিকট সমাগত হিন্দু মুসলমান থেকে অযাচিতভাবে যে প্রচুর পরিমাণ নজরানা পেতেন তার সামান্য অংশ তিনি নিজের জন্য ব্যয় করে বাকী সব দীন দুঃখীদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। তিনি সমাগত শিষ্য ও দর্শনার্থীদের জন্য একখানা বৃহৎ বৈঠকখানা ঘর এবং একটি লঙ্গরখানা খুলে দিলেন। ফলে তাঁর মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধিপায়।[৪]

সুদীর্ঘ ৪৭/৪৮ বৎসরকাল একনিষ্ঠভাবে ইসলামের খেদমত করে তিনি পরলোক গমন করেন।[৫] তাঁর মৃত্যুর সন তারিখ সঠিক জানা না গেলেও অনুমান করা হয় যে, তিনি ১৮৪১ সালের অল্পকাল পূর্বেই ইহলোক ত্যাগ করেন।

আইনুন জারিয়া গ্রন্থের বরাত দিয়ে মাওলানা এম ওবাইদুল হক 'বাংলাদেশের পীর আওলিয়াগণ' এবং মাওলানা নূরুর রহমান 'তাযকেরাতুল আওলিয়া' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ১১৮৭ হিযরীর ৩০ শে জিলকদ তিনি ইন্তিকাল করেছেন। আনওয়ার খাঁ নামক জনৈক বংশধর ১২৫৮হিঃ/ ১৮৪১ খ্রীষ্টব্দে তাঁর মাযার ও মসজিদ ওয়াক্ফ করে দিয়েছেন। এই সূত্রে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই হযরত শাহ্ আমানতুল্লাহ খান ইন্তিকাল করেন।[৬]

১। আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২-৩৮।
২। মোবারক করীম জওহর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০১।
৩। মোবারক করীম জওহর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০২।
৪। মোবারক করীম জওহর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০৩।
৫। মোবারক করীম জওহর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০৩।
৬। মাওলানা নূরুর রহমান, তাযকেরাতুল আওলিয়া , খন্ড-৬, পৃঃ ১৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

চট্টগ্রাম শহরের জেলখানার উত্তরে এবং লালদীঘির পূর্বদিকে মাত্র ২/৩ মিনিটের পথ দূরে তাঁর মাযার শরীফ অবস্থিত । প্রত্যেক বৎসর জিলহজ্জ মাসের প্রথম তারিখে তাঁর মাযারে বিরাট উরস হয় । উরস তিন দিন ধরে চলে ।[১]

এখন থেকে প্রায় পৌনে দুইশত বৎসর পূর্বে শাহ্ আমানতুল্লাহর খানকাহ্ শরীফ প্রতিষ্ঠিত হলেও দিন দিন তাঁর উন্নতি সাধিত হয়েছে । বর্তমানে সেখানে একটি বিরাট সুরম্য মসজিদ স্থাপিত হয়েছে। এই মসজিদের পাশেই তাঁকে দাফন করা হয়েছে । প্রতিদিন হাজার হাজার দর্শনার্থী ও তীর্থযাত্রী এসে তাঁর পবিত্র মাযার যিয়ারত করে ।

হযরত শাহ সূফী আলী রিজা
প্রকাশ কানু শাহ (রঃ)
(১৭৫৯- ১৮৪৭ইং)

চট্টগ্রাম জেলাধীন আনোয়ারার ওশখাইন (আলীনগর) গ্রামে ১৭৫৯ইং সনে হযরত শাহ সূফী আলী রেজা প্রকাশ কানু শাহ (রঃ) জন্ম গ্রহন করেন । তাঁর পিতার পূর্ব পুরুষ সপ্তম শতকের শেষের দিকে গৌড়ে আগমন করেন । তাঁর পিতামহ শাহ্ মনোহর পটিয়া থানার চক্রশালায় বসতি স্থাপন করেন । তাঁর পিতা শাহ মুহাম্মদ সাচি চান্দখালি নদীর পশ্চিম তীরে ওশখাইন গ্রামে স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করেন ।

তিনি উরদু, ফারসী, আরবী ও বাংলা ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন এবং হাজীগঞ্জের শাহ আলাউদ্দিনের পুত্র শাহ রিয়াজুদ্দিনের নিকট আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভ করেন । আধ্যাত্মিক সাধনার পাশাপাশি তিনি সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন । উরদু, ফারসী ও আরবী সাহিত্যে তাঁর অগাধ জ্ঞান থাকলেও তিনি সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষাকেই অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন । তিনি ছড়া, কবিতা, সাহিত্য, প্রবন্ধ, জীবনতত্ত্ব, নীতিজ্ঞান, ধর্মতত্ত্ব ও আত্মচরিতমূলক পুস্তকাদি রচনা করেছেন । তাঁর রচিত পুস্তক সমূহের মধ্যে ১) জ্ঞান সাগর, ২) আগমন ৩) সৃষ্টি পত্তন ৪) যোগ কলন্দর ৫) শাহ্নাম (দুই খন্ড) ৬) ষষ্ট চক্রবেদ ৭) সিরাজ কুলুব ৮) ধ্যানমালা ও ৯) খাবনামা প্রভৃতির সন্ধান পাওয়া যায়, এ ছাড়াও তাঁর অসংখ্য মারিফতী গান রয়েছে ।

এই সাধক ১৮৪৭ ইং ইনতিকাল করেন । প্রতি বছর ৩০শে পৌষ তাঁর বার্ষিক উরস উদযাপিত হল।[২]

১। মাওলানা এম ওবাইদুল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১২ ।
২। বি, এ, আজাদ ইসলামাবাদী, চট্টগ্রাম স্মরনী, প্রকাশকাল, ৩রা জুলাই, ১৯৮৭ ইং, পৃঃ ১৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

হাজী শরী'আতুল্লাহ
(১৭৮১ - ১৮৪০)

আঠার শতকে বাংলাদেশের মুসলমানদের অবস্থা অত্যন্ত শোচণীয় ছিল।[১] একদিকে তারা নিজেদের ধর্ম ও আদর্শ থেকে দুরে সরে যায়, নিজেদের অবস্থা ও কর্তব্য সর্ম্পকেও উদাসীন হয়ে পড়ে। অন্যদিকে ভূঁই-কোড় হিন্দু জমিদার ও আমলাদের দৌরাত্ম্যে মুসলমান জনসাধারণের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠে। ইতিপূর্বে মুসলমান সমাজে ইসলাম পরিপন্থী বিভিন্ন কুসংস্কার ব্যাপকভাবে অনুপ্রবেশ করে। তারা ইসলামী জীবনাদর্শ ত্যাগ করে কুসংস্কারাচ্ছন্ন জীবন যাপনে মেতে উঠে। ইসলামের মৌলিক আদর্শ ও রীতি-নীতির পরিবর্তে তারা বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানের প্রতি অধিক আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে ধর্মের নামে অর্ধমের প্রাধান্য দেখা দেয়। মুসলিমদের এমনি দুর্দিনে আলোকবর্তিকার ন্যায় যাঁর আবির্ভাব ঘটে তিনি হলেন বাংলার ফরায়েযী আন্দোলনের প্রতিষ্টাতা হাজী শরী'আতুল্লাহ। তিনি ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে ফরিদপুর (বর্তমান মাদারীপুর) জেলার শিবচর থানার অর্ন্তগত শামাইল গ্রামে এক সাধারণ মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[২] তাঁর পিতার নাম আবদুল জলিল তালুকদার। তিনি ছিলেন একজন সৎ, সাধু, অমায়িক ও উদার প্রকৃতির ব্যক্তি, একজন প্রজা-বৎসল তালুকদার। সাধারণ অত্যাচারী জমিদার তালুকদারের ন্যায় তিনি প্রজাদের উপর জুলুম অত্যাচার করতেন না। তাঁর উদারতার কারণে প্রজারা তাঁকে অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করত। মুহাম্মদ আজীম তালুকদার ও মুহাম্মদ আশিক তালুকদার নামে আবদুল জলিলের দুই ভ্রাতা ছিল। মুহাম্মদ আজিম সাংসারিক কাজ কর্ম নিয়ে শামাইল গ্রামে[৩] থাকতেন। ছোট ভাই আশিক ছিলেন একজন বিজ্ঞ 'আলিম। তিনি মুর্শিদাবাদের প্রসিদ্ধ নবাব বাহাদুরের দরবারে মুফ্তী হিসাবে সপরিবারে অবস্থান করতেন।

হাজী শরী'আতুল্লাহ বাল্য বয়সে মাতাকে হারান। মাত্র আট বছর বয়সে তাঁর পিতার ইন্তিকালের পর তিনি ও তাঁর বোন তাদের চাচা মুহাম্মদ আজীম তালুকদারের তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হতে থাকেন। মুহাম্মাদ আজীমের কোন সন্তানাদি ছিল না। তাই, তিনি ও তাঁর স্ত্রী তাদেরকে আদর যত্নসহকারে লালন পালন করতেন।

বাল্যকাল থেকেই হাজী শরী'আতুল্লাহ জ্ঞানানুরাগী ছিলেন। কিন্তু গ্রামে লেখাপড়ার তেমন কোন ভাল ব্যবস্থা ছিল না। অন্যদিকে স্নেহপরায়ণ চাচাও তাঁকে দুরে কোথাও পাঠাতে রাজী ছিলেন না। তাই চাচার অগোচরে লেখাপড়ার উদ্দেশ্যে তিনি কলিকাতা চলে যান। সেখানে তিনি তৎকালীন বুযুর্গ 'আলিম মাওলানা বশারত 'আলীর কাছে পবিত্র

১। হুমায়ুন আবদুল হাই, মুসলিম সংস্কারক ও সাধক, পৃঃ ৫৫।

২। হাজী শরী'আতুল্লাহর জন্মতারিখ নিয়ে মতভেদ আছে। গোলাম সাকলায়েন বাংলাদেশের সূফী সাধক এবং Muhammad Abdullah, someMuslim Statwarts, নামক গ্রন্থে তাঁর জন্ম তারিখ ১৭৮০ খৃষ্টাব্দ লিখেছেন। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখা যেতে পারে - Khan Muinuddin Ahmed, Tomb inscription of Haji Shariatullah Journal of the Asiatic Society of Pakistan, Vol. III 1958, p. 187-95.

৩। মতান্তরে বাহাদুরপুর। শামাইল ও বাহাদুরপুর উভয় গ্রাম একই থানার অন্তর্গত; শামাইল গ্রাম বাহাদুরপুর গ্রামের প্রায় দেড় মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত।

৪। জুলফিকার আহমদ কিসমতী, বাংলাদেশের সংগ্রামী ওলামা পীর-মাশায়েখ, পৃ ২-৩; মোঃ আবদুস সাত্তার, ফরিদপুরে ইসলাম, পৃঃ ১৪০।

Dhaka University Institutional Repository

কুর'আন শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর তিনি তাঁর উস্তাদের পরামর্শক্রমে আরবী ও ফারসী ভাষা শেখার জন্য ভারতের হুগলী জেলার অর্ন্তগত ফুরফুরা গমন করেন। দুই বৎসরে তিনি উক্ত ভাষাদ্বয়ে যথেষ্ট বুৎপত্তি অর্জন করেন। এরপর চাচা মুহাম্মদ 'আশিকের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে মুর্শিদাবাদ গমন করেন। সেখানে তিনি চাচার কাছে আরবী ও ফারসী শিক্ষা লাভ করেন। একদিন চাচা -চাচীর সাথে নৌকা যোগে নিজ গ্রাম শামাইল-এ আসার পথে কালবৈশাখী ঝড়ের কবলে পতিত হলে চাচা চাচী উভয়েই প্রান হারাণ। তাই শরী'আতুল্লাহ শোকাতুর মনে গ্রামে না এসে কলিকাতায় তাঁর উস্তাদ মাওলানা বাশারত 'আলীর নিকট ফিরে যান। সেখানে তিনি অত্যন্ত মনোযোগের সাথে লেখাপড়ায় আত্মনিয়োগ করেন।[৩]

১৭৯৮/১৭৯৯ইং সনে শরী'আতুল্লাহ মাত্র ১৮ বছর বয়সে হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে উস্তাদ মাওলানা বাশারত 'আলীর সাথে মক্কা গমন করেন। মক্কায় তিনি তৎকালীন ছোট আবু হানীফা নামে খ্যাত প্রখ্যাত বুযুর্গ মাওলানা তাহির সম্বল আল-মক্কীর[৪] শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং সেখানে প্রায় ২০ বছর অবস্থান করে কুরআন, হাদীস,ফিক্হ প্রভৃতি শাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেন ও মাওলানা উপাধি লাভ করেন। তিনি মাওলানা সম্বলের নিকট বাইআতও হন।[৫]

হাজী শরী'আতুল্লাহ তাঁর চাচা 'আজীম তালুকদারের অসুস্থতার খবর পেয়ে ১৮১৮ইং সনে মক্কা থেকে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।[৮] দেশে ফিরে এসে তিনি নি'আমত বিবি নাম্নী এক গুণবতী ও রূপবতী মহিলাকে বিয়ে করেন। জনৈক লেখকের মতে তিনি মক্কা থেকে দেশে প্রত্যাবর্তন করে মাত্র চার বছর এদেশে অবস্থান করেন এবং পুনরায় মক্কায় চলে যান। এ সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ

চারি সাল হেদায়েত করি নামদার।
পুনঃ যে খাহেষ হৈল মক্কা মওয়াজ্জমার।

দেশে আগমনের কিছুদিন পর তিনি মুসলিম সমাজ থেকে পীর পূঁজা, কবর পূঁজা, বিদ'আত ও কুসংস্কার বিদূরিত করে ইসলামের পুনর্জাগরণের কাজ শুরু করেন।[৭] ইংরেজ শাসিত এদেশের মুসলিম সমাজের অবস্থা তখন অত্যন্ত করুণ ছিল। তারা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকেও নানা প্রকার শির্‌ক, বিদ্'আত ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল। তিনি আরও দেখতে পান যে, মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থা অত্যন্ত নিম্ন পর্যায়ে পৌছেছে, তারা এমন কুসংস্কারে নিমজ্জিত হয়ে আছে যে, কোন মুসলমান পরিবার বা সমাজের পক্ষে তা বরদাস্ত করা সম্ভব

১। Dr. Muinuddin Ahmed Khan, History of the Faraidi Movement , p. 142 .
২। জুলফিকার আহমদ কিসমতী, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ৩।
৩। Dr. Muinuddin Ahmed Khan, op.cit, p. 143.
৪। তিনি প্রসিদ্ধ শাফী তরিকার প্রধান ছিলেন। হুমায়ুন আবদুল হাই, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৬।
৫। মোঃ আবদুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪০; জুলফিকার আহমদ কিসমতী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩-৪; হুমায়ুন আবদুল হাই, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৬।
৬। Gibb and Kramers, Shorter Encyclopedia of Islam , p. 99
৭। Khan Muinuddin Ahmed, op.cit

Dhaka University Institutional Repository

নয়। মুসলিম পরিবারগুলো শুধু নামে মাত্র তাদের পূর্ব পুরুষদের ধর্মীয় উত্তরাধিকারী হিসেবে পরিবিদিত। মূলতঃ তাদের মধ্যে ইসলামের নিত্যপালনীয় কিছুই নেই। বরং তারা দীর্ঘদিন যাবত হিন্দুদের পাশাপাশি বসবাস করে হিন্দু সংস্কৃতির প্রতিই আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। ইসলামের মৌলিক ও স্বতন্ত্র সংস্কৃতির কথা তারা একেবারেই ভুলে বসেছে। তিনি মুসলমানদেরকে ধর্মবিমুখতা, চরিত্রহীনতা, ধর্মের প্রতি অনাগ্রহ ও বিভিন্ন কুসংস্কারের পথ পরিহার করে ইসলামের দিকে আগমনের আহবান জানালেন। কিন্তু মুসলমানদের অনাগ্রহ ও স্বধর্ম ইসলামের প্রতি তাদের ঔদাসিন্য শরী'আতুল্লাহকে অত্যন্ত বিচলিত করে তোলে। তাই, তিনি পুণরায় মক্কার উদ্দেশ্যে পদব্রজে যাত্রা করেন। প্রথমে তিনি বাগদাদ যান। সেখানে হযরত ইমাম হুসাইন (রাঃ) ও হযরত আবদুল কাদের জীলানী (রঃ) এর কবর যিয়ারত করেন। অতঃপর বায়তুল মুকাদ্দাস ও মিসর যান। হজ্জব্রত পালনের পর আপন মুরশিদ (মাওলানা তাহির সম্বল)-এর সাথে সাক্ষাত করেন। তাঁর থেকে দোয়া নিয়ে পবিত্র মদীনায় উপস্থিত হন। হাজী শরী'আতুল্লাহ প্রায় দু'বছর হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর রওযা পাকের কাছে অবস্থান করেন এবং ইবাদত, রিয়াযত ও মুশাহাদায় রত থাকেন। এ সময় তিনি উপর্যুপরি তিন বার রাসুলুল্লাহ (সঃ) কে স্বপ্নে দেখেন যে, রাসুল (সঃ) তাঁকে দেশে এসে ইসলাম প্রচারের নির্দেশ দেন। অতঃপর তিনি পবিত্র মক্কা শরীফে এসে তাঁর মুরশিদের নিকট স্বপ্নের বিবরণ খুলে বলেন। মুরশিদ তাঁর উপর খুব সন্তুষ্ট হন, তাঁকে খিলাফত প্রদান করেন[১] এবং 'কুতুবুল বাংগাল' উপাধীতে ভূষিত করে দেশে এসে ইসলাম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করার নির্দেশ দেন।[২]

অনেকে বলেন যে, মক্কা অবস্থানকালেই তিনি ওহাবী মতবাদের সংস্পর্শে আসেন ও এ মতে বিশ্বাস স্থাপন করেন। এ সম্পর্কে সঠিক কিছু বলা কঠিন। কারণ, দেশে এসে তিনি ওহাবী মতবাদ প্রচার করেননি বরং তিনি ফরায়েযী আন্দোলন নামে এক নুতন মতবাদ প্রচার করেন।

১৮২০ সালে হাজী শরী'আতুল্লাহ স্বদেশ স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন। তখন এদেশের মুসলমানেরা প্রকৃত ইসলাম থেকে অনেক দূরে গিয়ে নানা প্রকার শির্ক ও বিদ'আতে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। হিন্দুদের দেব-দেবীর নামে মানত করা, কবর পূঁজা, পীর পূঁজা, দরগাহ পূঁজা, গাজীর শিরনী, ফাতেমার শিরনী, পাঁচ পীরের পূঁজা, খোয়াজ-খিযিরের নামে ভেলা ভাসান প্রভৃতি ইসলাম বিরুদ্ধ কাজে তারা নিজেদেরকে আত্মনিয়োগ করে। কালিমা, নামায, রোযা ও পর্দা মুসলমান সমাজ থেকে প্রায় লোপ পায়। তাছাড়া মুসলিম সমাজে পতিতাবৃত্তি, পরনারী হরণ, মদ্যপান, জুয়া, ঘুষ, সুদ ইত্যাদি অনৈসলামিক কাজ ব্যাপক ভাবে অনুপ্রবেশ করে।[৩] এমনি কুসংস্কারে জর্জরিত মুসলমান সমাজকে তিনি খাঁটি ইসলামী নীতি ও বিধি-সম্মত ব্যবস্থার দিকে আহবান করেন। এতদ উদ্দেশ্যে তিনি বাংলার পল্লীতে পল্লীতে ব্যাপক প্রচার অভিযান চালান। তাঁর এ উদাত্ত আহবানে বাংলাদেশের ফরিদপুর, বরিশাল, ঢাকা, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা (বর্তমান কুমিল্লা), খুলনা প্রভৃতি জিলার অগণিত লোক সাড়া দেয়।[৪] অশিক্ষা কুশিক্ষায় নিমজ্জিত অধঃপতিত মুসলমান সমাজকে আলোর দিকে, প্রতিটি মুসলিম পরিবারকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত

১। মোঃ আবদুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪১; জুলফিকার আহমদ কিসমতী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪।
২। মোঃ আবদুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪১; জুলফিকার আহমদ কিসমতী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪।
৩। জুলফিকার আহমদ কিসমতী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫।
৪। মোঃ আবদুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪১; জুলফিকার আহমদ কিসমতী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫।

Dhaka University Institutional Repository

হওয়া এবং তদনুযায়ী জীবন যাপনের জন্য যে আন্দোলনের ডাক দেন পাক-ভারত-বাংলা উপমহাদেশের ইতিহাসে তা ফরায়েযী আন্দোলন নামে খ্যাত।[১] ফরায়েজ আরবী 'ফারীযাহ্' শব্দের বহু বচন। ফরীযাহ অর্থ অপরিহার্য করণীয় কর্তব্যসমূহ অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর প্রেরিত রাসুলের উপর ন্যস্ত কর্তব্য সমূহঃ যথা-সৃষ্টিকর্তা, এক আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের উপর ঈমান আনয়ন করা, দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা, পবিত্র রমযান মাসে রোযা রাখা, অর্থবান মুসলমানদের পবিত্র হজ্জব্রত পালন করা ও গরীবদের যাকাত প্রদান করা প্রভৃতি মেনে চলা। আর যারা উক্ত কর্তব্যসমূহ পালনের অঙ্গীকারভুক্ত তাদেরকেই ফরায়েযী বলে অভিহিত করা হয়।[২]

ফরায়েযী আন্দোলনের মাধ্যমে আল্লাহর নির্দেশ ও রাসুল (সঃ) এর জীবনাচরন পুংখানুপুংখরূপে প্রতিপালনের ও কুর'আন সুন্নাহ্ অসমর্থিত সমস্ত অনুষ্ঠানে যোগদান থেকে বিরত থাকার জন্য আহবান করা হয়। ফরায়েযীরা মহরমের দশ তারীখকে হযরত আদম (আঃ) ও বিবি হাওয়া (আঃ)- এর পৃথিবীতে আগমন দিবস মনে করেন। তাঁরা আরও মনে করেন যে, এ তারিখেই আরশ-কুরসী ও স্বর্গসমূহ সৃষ্টি করা হয়েছে। এ জন্য হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ কর্তৃক মহরমের দশ তারীখ ইবাদতের জন্য বিশেষ দিবস হিসাবে পালিত হয়েছিল। তাই ফরায়েযীগণ মহরমের দশ তারীখ ও পরবর্তী দিন রোযা রাখেন এবং সারারাত ইবাদত করেন। এদিনে তাঁরা বিত্তহীন অসহায় ও এতিমদের মধ্যে খাদ্য বিতরণ করেন। প্রতি পক্ষের সাথে কোন বৈরিতা থাকলে এ দিবসের শিক্ষার আলোকে তাদের মধ্যে পুনঃর্মিলন প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁরা রাসুল (সঃ) এর নির্দেশিত সুন্নাহ গুরুত্বের সাথে পালন করেন। কিন্তু, শহীদ ইমাম হাসান (রাঃ) ও হুসাইন (রাঃ)- এর আত্মোৎসর্গের স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রচলিত উৎসবাদি দর্শন থেকেও তাঁরা বিরত থাকেন। এছাড়া তাঁরা পুতি, ছাতি ও চিল্লার আচার - অনুষ্ঠান হতে দুরে থাকেন। এসব অনুষ্ঠান শিশু জন্মের তিন দিনের মধ্যে পালিত হত। তাঁরা শিশু জন্মের পর একমাত্র আকীকাহ্ অনুষ্ঠান পালন করে থাকেন।[৩] ঠিক একইভাবে তাঁরা বিয়ের আনুষ্ঠানকেও বিভিন্ন প্রকার লৌকিক আচার থেকে পৃথক করেন। ইতিপূর্বে সমাজে বিয়ে উপলক্ষে নানা প্রকার নিয়ম-কানুন পালন করা হত। যেমন-১. জাঁক-জমকের সাথে বসে থাকা ২. হলুদ গায়ে মেখে তা বরণ করা ৩. বিয়ের পোশাক পরিচ্ছদের জন্য সুনির্দিষ্ট পরিমাণ ও ৪. সবগশ্ত্ শোভা যাত্রা ইত্যাদি। ফরায়েযীগণ এসব কিছু বর্জন করেন। তাঁরা বিয়ের দিন কুর'আন সুন্নাহ মুতাবিক বর-কনের সাজ-সজ্জা করতেন। বিয়ের মুহূর্তে গান-বাজনা, অশ্লীল নৃত্য-গীত ইত্যাদিও তাঁরা নিষিদ্ধ করেন। তবে, বিয়ের দিনে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও দরিদ্র ব্যক্তিদের জন্য ওয়ালিমা ভোজের ব্যবস্থা করতেন।

ফরায়েযীগণ সমাধি সংক্রান্ত সৎকার্যাদি সুন্দরভাবে পরিচালিত করতেন। তাঁরা কবরে পুষ্প অর্পণ ও ফাতিহাখানির বিরোধিতা করেন। তাঁদের মতে কবরের মাঝখানে মাটি দিয়ে উঁচু করা ঠিক নয়। এমন কি কবরের উপর কোন ইট পাথরের স্মৃতি স্তম্ভ নির্মাণেরও তাঁরা বিরোধিতা করেন।[৪]

১। গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৭।

২। হুমায়ুন আবদুল হাই, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৭।

৩। হুমায়ুন আবদুল হাই, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৭; মোঃ আবদুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪১।

৪। হুমায়ুন আবদুল হাই, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৭; মোঃ আবদুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪১।

Dhaka University Institutional Repository

ফরায়েযী আন্দোলনের সংগঠক হাজী শরী'আতুল্লাহ হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তিনি সমসাময়িক ইসলাম পুনঃর্জাগরণকারীদের ন্যায় সংস্কার ও একত্ববাদের নিঃশর্ত বাস্তবায়নের উপর জোর দেন। ইসলামের মৌলিক বিধান থেকে বিচ্যুতিকেও তিনি বিদ'আত বলে মনে করেন।[১]

হাজী শরী'আতুল্লাহ তাঁর ফরায়েযী নীতি প্রচার করার সাথে সাথে তা সমাজে কার্যকরী করার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালান। তিনি ফরিদপুর ও বরিশাল জেলা অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে ঘুরে অধঃপতিত মুসলমান সমাজে নুতন করে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। পাড়ায় পাড়ায়, মসজিদে-মসজিদে তিনি কুর'আন ও নামায শিক্ষার ব্যবস্থা করেন।[২] পুরুষানুক্রমিকভাবে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত এক শ্রেণীর লোকের বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি তাঁর একদল অনুসারী নিয়ে এ আন্দোলনে অবতীর্ণ হন। নানা প্রকার সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কারে নিপতিত মুসলমানদের তিনি ইসলামের পূর্ণ অনুসরণে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাস, দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায প্রতিষ্ঠা, রমযান মাসে রোযা রাখা ইত্যাদির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার জন্য সবার প্রতি আহবান জানান।

মোটকথা সমাজ-সংস্কার এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলমানদেরকে পুণরায় সত্যিকার ইসলামের পথে ফিরিয়ে আনাই ছিল হাজী শরী'আতুল্লাহ-এর আন্দোলনের উদ্দেশ্যে। ফরায়েযীদের নিয়ম-কানুন ও আচার অনুষ্ঠান প্রভৃতি বেশ কঠিন ধরণের ছিল এবং তা যথাযথভাবে পালন করা হত। তাদের সমকালীন আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে একটি মৌলিক বিবরণ দিয়ে গেছেন জেম্স টেইলর। তিনি বলেন ঃ- *"They (the Faraejees) Profess to adhere to the strict letter of Koran and reject all ceremonies that are not sanctioned by it. The commemoration of the martyrdom of Hassan and Husein is not only forbidden but even urtnessing the ceremonies connected with it, is avoided by them. They reject the rites puttee, chuttee and chilla which were performed between the first and fortienth day after the birth of a child and observe the 'rite of Aqiqa'. In the same way they have diversted the marriage ceremony of its formalities; The funaral/funreal obserqutes are concluded with a corresponding degreee of simplicity. Offering of fruits, flowers at the grave and the various Fatiha ceremonies being prohibited; their graves are not raised above the surface of the ground, not marked by the building of brick of stone".*[৩]

হাজী শরী'আতুল্লাহ তাঁর এ সংস্কার আন্দোলনে প্রায় বিশ বছর সময় কাটান। এ সংস্কার কর্মসূচীকে আন্দোলনে রূপ দিতে গিয়ে তিনি প্রধানতঃ দরিদ্র কৃষক শ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করেন। ফলে, তিনি রাজনৈতিকভাবে ইংরেজ এবং সামাজিকভাবে জমিদার ও নীল কুঠিয়ালদের বিরোধিতার সম্মুখীন হন। তাঁর এ সংগ্রাম কয়েক বছরের মধ্যেই ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা, যশোর, কুষ্টিয়া, ঢাকা, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা (বর্তমান বৃহত্তর কুমিল্লা) প্রভৃতি জিলায় ছড়িয়ে পড়ে। জেম্স টেইলরের মতে, ফরায়েযী আন্দোলনের প্রথম দশ বছরের মধ্যে উল্লিখিত অঞ্চল সমূহের

১। মোঃ আবদুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪১; জেমস টেইলর, কোম্পানী আমলে ঢাকা, পৃ ঃ ১৯২।
২। মোঃ আবদুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৩; জেমস টেইলর, কোম্পানী আমলে ঢাকা, পৃ ঃ ১৯২।
৩। মোঃ আবদুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমান জনসংখ্যার প্রায় ছয় ভাগের একভাগ লোককে তিনি তাঁর অনুগত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ১৮৩৭ সালে তাঁর মুরীদের সংখ্যা ১২,০০০ বলে জানা যায়।[১]

ফরায়েযী আন্দোলনের ব্যাপক বিস্তৃতি সম্পর্কে জেম্‌স টেইলর বলেন ঃ- " *Within the last ten years a Mohammedan set has sprung up in this part of the country and has spread with extra ordinary rapidity in this district (Dhaka), Faridpur, Backergonj and Mymensingh. The founder of it is a man of the name of Shariatullah (sic), a native of Fareedpur"*[২]

হাজী শরী'আতুল্লাহ অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার সাধন করেছিলেন। তিনি এ দেশকে 'দারুল হারব'[৩] বা বিধর্মী রাজ্য বলে ঘোষনা দেন। আর 'দারুল হারব' -এ মুসলমানদের পক্ষে জুম'আ ও ঈদের নামায পড়া না জায়েজ। তাই, তিনি এ দেশে জুম'আ ও ঈদের নামায পড়া না জায়েয বলে ঘোষণা দেন। এ দেশকে 'দারুল হারব' ঘোষণা করলেও তিনি ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেননি। আবদুল বারী বলেন ঃ- *"But unlike Syed Ahmad Shahid, Shariatullah does not appear to have formulated any revolutionary principle about Jihad or to have preached any direct action against the English rules"*[৪] কিন্তু এ সত্ত্বেও তিনি সরকারের হাত থেকে রেহাই পাননি। এ সম্পর্কে টেইলর বলেনঃ- *The Farajees have the charcter of being Stricter in their morals than their other Mohammadan bretheren but they are inclined to intolerence and prosecution and in showing their contempt of the religious opinions of their neighbours. They frequently occasion affrays and disturbances in the town. Their leader Hajee Shariatullah has more than once been taken in custody on this acccount, and is at present under the ban of police. I believe, for exciting his disciples in the country to with hold the payment of revenue"*[৫]

পীর মুরীদ প্রথার পরিবর্তে তিনি গুরু-শিষ্য বা ছাত্র -শিক্ষক প্রথার প্রচলন করেন। অথচ এর পূর্বে এখানে এ ধারণা করা হত যে, পীরেরা মুরীদানকে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করে বেহেস্তে নিয়ে যাবেন। ফলে, অনেক মুরীদ পাপাচারে লিপ্ত থাকত এবং যথাযথভাবে ইসলামের বিধানগুলো অনুশীলন করত না। কারণ, তাদের ধারণা ছিল যে, আমলে আখলাকে কিছুটা ত্রুটি থাকলেও পীর সেটা সারিয়ে নেবেন। বিবাহ ও অন্যান্য সামাজিক উৎসবাদিতে অযথা অপব্যয় করতে তিনি নিষেধ করেন। তিনি আরও ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয়

১। কবি রুহুল আমিন, দৈনিক ইনকিলাব, ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৯০।

২। James Toylor, A Sketech of the topographly and Statistics of Dhaka , p. 248-249

৩। যে দেশ অমুসলিম সরকার দ্বারা শসিত সে দেশকে 'দারুল হারব' বলে।

৪। James Toylor, opicit p. 248.

৫। হুমায়ুন আবদুল হাই, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৭; সমাচার দর্পন, ২২শে এপ্রিল ১৮৩৭, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত, সংবাদপত্রে সেকালের কথা (তৃতীয় সংস্করন, কলিকাতা) পৃঃ ৩৭৯-৮০।

Dhaka University Institutional Repository

করবেনা এবং আল্লাহর নির্দেশিত ফরয কর্তব্য সম্পাদনেই তাদের অধিক মনোযোগী হতে হবে।[১] তিনি আরও বলেন যে, নবজাতকের জন্মলগ্নে তার পিতাকেও ধাত্রীর সঙ্গে একযোগে শিশুর নাড়ী কাটতে হবে। হিন্দু ধর্মের প্রথানুসারে শুধু ধাত্রীর দ্বারা নাড়ী কাটা চলবে না। এর ফলে জনসাধারণ ও তাঁর শিষ্যদের মধ্যে কিছুটা অসন্তোষ দেখা দেয়।[২]

হাজী শরী'আতুল্লাহ নিম্নশ্রেণীর মুসলমান তথা কৃষক ও কারিগর শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী সংস্কার আন্দোলন গড়ে তোলেন। তাঁর এ আন্দোলন সম্পর্কে জেম্স ওয়াইজ বলেন ঃ " বহু বছর ধরে শরী'আতুল্লাহ তাঁর নিজের জেলাস্থ গ্রামগুলোতে এই নতুন মতবাদ প্রচার করতে থাকেন। এতে তিনি অনেক বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও তাঁর একদল বিশ্বাসী শিষ্য গড়ে উঠে এবং ক্রমশঃ তিনি একজন ধার্মিক ও ধর্মীয় নেতা হিসাবে সু-পরিচিত হয়ে উঠেন"।[৩]

জনগণের মধ্যে এ আন্দোলনের প্রভাব প্রতিপত্তি এবং হাজী শরী'আতুল্লাহর সংস্কার প্রচেষ্টা এক অভাবনীয় সাফল্যের সৃষ্টি করে। এ সম্পর্কে জেম্স ওয়াইজ তাঁর মোহামেডান্স অব ইষ্টার্ন বেঙ্গল গ্রন্থে লিখেন ঃ " হিন্দুদের বহু ঈশ্বরবাদ নীতির সাথে দীর্ঘ দিনের সম্পর্কের ফলে মুসলমানদের মধ্যে যে সব কুসংস্কার ও দুর্নীতি দেখা দিয়েছিল তার বিরুদ্ধে কথা বলার প্রথম সোচ্চার প্রচারক হিসাবে তাঁর (হাজী শরীআতুল্লাহ) আবির্ভাব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কিন্তু বাংলার চেতনাহীন ও উদাসীন চাষী সমাজের মধ্যে তিনি উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগ্রত করার ব্যাপারে যে সাফল্য অর্জন করেন, তা আরও বেশী চমকপ্রদ। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে একজন অকপট ও সহানুভূতিসম্পন্ন প্রচারকেরই প্রয়োজন ছিল আর মানুষের মনে প্রভাব বিস্তারের অধিক ক্ষমতা শরীআতুল্লাহর চেয়ে অপর কারুর মধ্যে কখনও দেখা যায়নি"।[৪]

হাজী শরী'আতুল্লাহ তদানীন্তন মুসলিম সমাজে একজন অভিভাবকের ভূমিকা পালন করেন। বিপদে-আপদে, সুখে-দুঃখে পরামর্শদাতা হিসাবে তিনি মজলুম জনতার পাশে ছিলেন। ইসলামের পুনর্জাগরণ এবং তৎকালীন লাঞ্ছিত মুসলমানদের সামাজিক অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অপরিসীম। তিনি হিন্দু জমিদার ও নীল কুঠিয়াল ইংরেজ ব্যবসায়ীদের অত্যাচার নিপীড়নের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ হতে পরামর্শ দেন। হিন্দু জমিদারদের বহু অবৈধ কর আদায়ের বিরোধিতা করেন।[৫] ফলে জমিদাররা সংঘবদ্ধভাবে কলিকাতার বিভিন্ন পত্রিকার মাধ্যমে হাজী শরী'আতুল্লাহকে তীতুমীরের মত ইংরেজদের বিকল্প সরকার গঠনের দায়ে অভিযুক্ত করার চেষ্টা করে এবং তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা শুরু করে। তৎকালে খৃষ্টান পাদ্রীদের দ্বারা পরিচালিত 'সমাচার দর্পন' পত্রিকায় ১৮৩৭ সালের ২২শে এপ্রিল প্রকাশিত সংখ্যায় এক বেনামী চিঠিতে যে ভাষায় তাঁর কুৎসা রটনা করা হয় তাহলো এই ঃ- " ইদানিং জিলা ফরিদপুরের অন্তর্গত শিবচর থানার সরহদ্দে

১। Abdul Bari, The Reform movement in Bengal, History of the freedom movement, vol.-I, p. 547.
২। James Taylor, Ibid, p. 248; হুমায়ুন আবদুল হাই, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৯।
৩। জুলফিকার আহমদ কিসমতী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮।
৪। গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৮।
৫। খান মুহাম্মদ সিদ্দিক, 'পীর দুদু মিয়া', পৃঃ ২১-২২।

Dhaka University Institutional Repository

বাহাদুর গ্রামে শরি'আতুল্লাহ নামক এক জবন বাদশাহী লওনোছক হইয়া ন্যূনধিক ১২০০০ জোলা ও মুসলমান দলবদ্ধ করিয়া নূতন এক সরা জারি করিয়া চতুর্দিকস্থ হিন্দুদিগের বাটি চড়াও করিয়া দেবদেবী পুজার প্রতি অশেষ প্রকার আঘাত জমাইতেছে এবং জিলা ঢাকার অন্তঃপতি মুলফতগনজ থানার সরহদ্দে রাজনগর নিবাসী দেওয়ান মৃত্যুঞ্জয় রায়ের স্থাপিত দ্বাদশ শিবলিঙ্গ ভাঙ্গিয়া নদীতে বিসর্জন দিয়াছে। আমি বোধকরি শরী'আতুল্লাহ জবন যে প্রকার দলবদ্ধ হইয়া উত্তর প্রবল হইতেছে, অল্পদিনের মধ্যে হিন্দু ধর্ম লোপ হইয়া অকালে প্রলয় হইবে"।[১] এ অভিযোগপত্র থেকে হাজী শরী'আতুল্লাহ, তাঁর আন্দোলন এবং অনুসারীদের ব্যাপারে হিন্দু জমিদারদের ষড়যন্ত্রের মাত্রা সহজেই অনুমেয়। হিন্দুদের এ ষড়যন্ত্রের সাথে খৃষ্টানরাও সহযোগী হিসাবে কাজ করে।

হাজী শরী'আতুল্লাহ ছিলেন অত্যন্ত সজাগ প্রকৃতির লোক। ইসলামের পুনর্জাগরন এবং তৎকালীন লাঞ্ছিত মুসলমানদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অপরিসীম। তাঁর অক্লান্ত কর্তব্য নিষ্ঠার ফলে অচিরেই তাঁর আন্দোলন বিরাট সফলতা লাভ করে। ফলে, মুসলমানদের চিরাচরিত শত্রু বৃটিশ-হিন্দু জমিদার, আমলা ও ইংরেজ নীল কুঠিয়ালরা অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়ে। এ সম্পর্কে চমকপ্রদ বর্ণনা দিয়েছেন জেম্‌স ওয়াইজ। তিনি বলেন, "জমিদারগণ এই নতুন মত প্রচারের ফলে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। কারণ, এর ফলে মুসলমান চাষীরা সংঘবদ্ধ হল এবং অচিরেই বিরোধ দেখা দিল। ফলে শরী'আতুল্লাহ তাঁর নতুন বাসস্থান নয়াবাড়ী থেকে বিতাড়িত হয়ে নিজ জন্মস্থানে ফিরে গেলেন। সেখানে তাঁর কাজ আরম্ভ হল। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি বিপুল সংখ্যক অশিক্ষিত মুসলমান জনগণকে তাঁর দলভুক্ত করলেন। তিনি অত্যন্ত প্রভাবশালী হয়ে উঠেন এবং কেউ তাঁর আদেশ মানতে একটুও দ্বিধা করত না। তিনি অত্যন্ত বিবেচনা ও সাবধানতার সঙ্গে কাজ করতেন এবং অধিকাংশে সময়েই ধর্মীয় সংস্কারকের ভূমিকা পালন করতেন। পূর্ব বাংলার জন্মভূমির এক দরিদ্র মুসলমান ঘরে জন্মগ্রহণ করে তিনি বাংলার হৃদয়োত্তম কৃষকদের জীবনে নব-জাগরণ এনেছিলেন। এ কৃতিত্বের জন্য যে সহানুভূতি ও সততার প্রয়োজন, তা একমাত্র শরী'আতুল্লাহ ছাড়া আর কারো মধ্যে ছিল না। আর কেউ তেমন সহানুভূতি নিয়ে জনগণের চিত্তে আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারেননি। অত্যন্তসাধারন ঘরে জন্মগ্রহণ করে তিনি নির্মল ও আদর্শ জীবন জীবন যাপন করে গেছেন, ফলে তাঁর দেশবাসীরা তাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। জনগন তাদের সমস্ত দুর্দশায় তাঁকে নিজেদের পিতার মত বিবেচনা করতেন"।[২]

হিন্দু জমিদাররা হাজী শরী'আতুল্লাহ সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করত, তাদের পক্ষ থেকে পত্রিকা সম্পাদককে লেখা একটি পত্রের কিয়দংশে থেকে তা সহজে অনুমান করা যায়। যেমনঃ- "আরও শ্রুত হওয়া গেল শরী'আতুল্লাহর দলভুক্ত দুষ্টজনেরা ঐ ফরিদপুরের আন্তপতি পাটকান্দা গ্রামের বাবু তারিনী চরন মজুমদারের প্রতি নানা প্রকারের দৌরাত্ম অর্থাৎ তাহার বাটিতে দেব-দেবীর পূজায় আঘাত জন্মাইয়া গোহত্যা ইত্যাদি কুকর্ম উপস্থিত করিলে মজুমদার বাবু যবনদিগের সহিত সম্মুখ যুদ্ধ অনুচিত বোধ করিয়া ফরিদপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুজুরে জ্ঞাপন করিলে ঐ সাহেব বিচারপূর্বক কয়েকজন যবনকে কারাগারে বদ্ধ করিয়াছেন এবং এ বিষয়ের বিলক্ষণ অনুসন্ধান করিতেছেন। হে সম্পাদক মহাশয়! দুষ্ট যবনেরা মফস্বলে এ সকল অত্যাচার ও দৌরাত্ম ক্ষান্ত না হইয়া

১। জুলফিকার আহমদ কিসমতী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯।
২। মোঃ আবদুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

বরং বিচারগৃহ আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইল।" শ্রুত হওয়া গেল ফরিদপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের যে সকল আমলা ও মোক্তারকারেরা নিযুক্ত আছে তাহারা সকলেই শরী'আতুল্লাহ যবনের মতাবলম্বী"।[১] সংস্কার বিরোধীরা অনেক মিথ্যা মামলা মুকাদ্দমা হাজী শরী'আতুল্লাহ ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে ইংরেজদের কোর্টে দায়ের করে এবং নানাভাবে তাঁকে ও তাঁর আন্দোলনকে দমন করতে চেয়েছিল। ১৮৩১ সালের ফরায়েযী ও ফরায়েযী বিরোধীদের মধ্যে এক সংঘর্ষ হয়। এ সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে তাঁর ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে একটি মামলা দায়ের করা হয়। হিন্দু জমিদারগণ বিচারের কাজে আদালতকে সাহায্য করে। ফলে, বিচারে হাজী সাহেবের দু'জন শিষ্যের কারাদন্ড হয়। কয়েকজনকে জরিমানাও করা হয়। হাজী শরী'আতুল্লাহকেও অভিযুক্ত করার চেষ্ট করা হয়। কিন্তু কোন প্রমাণ পাওয়া না যাওয়ায় ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁর থেকে মুচলেকা নিয়ে তাঁকে ছেড়ে দেন। হাজী সাহেব তখন ঢাকার নয়াবাড়ী নামক স্থানে দাওয়াতী কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এসব বাধা ও অন্যান্য অসুবিধা হেতু তিনি সাময়িকভাবে নয়াবাড়ীর কেন্দ্র পরিহার করে ফরিদপুরে স্বগ্রামে ফিরে যান এবং সেখান থেকেই আন্দোলনের কাজ পরিচালনা করেন।[২]

হাজী শরী'আতুল্লাহ ইংরেজদের নাগপাশ থেকে মুসলমানদের মুক্ত করার জন্য যে দৃঢ়সংকল্প গ্রহণ করে ফরায়েযী আন্দোলন শুরু করেছিলেন, তা বাঙালী মুসলমানদের জন্য একটি দিগ-দর্শন বৈ কিছু নয়। প্রকৃতপক্ষে, হাজী সাহেবের চরিত্রবল, অসীম ব্যক্তিত্ব ও আধ্যাত্মিক বল অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি যুগিয়েছিল।

হাজী শরী'আতুল্লাহ একজন নীতিবাদী, অত্যন্ত অমায়িক ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক ছিলেন। অতি সাধারণভাবে তিনি জীবন যাপন করতেন। তিনি একজন গোঁড়া হানাফী ছিলেন। তিনি তাঁর কার্যদক্ষতাগুণে তাঁর সমসাময়িক কালে সুন্নী মুসলমানদের মানসিক উন্নতি ও সমৃদ্ধি ঘটান। মোটকথা, তাঁকে বাঙালী মুসলমান সমাজের 'নবজাতির পুরোধা' বললে অত্যুক্তি হবেনা। সবচেয়ে বড় কথা হল এই যে, এই মহামানব বাংলার বিপর্যস্ত কৃষক ও কারিগর সম্প্রদায়ের মধ্যে নব জাগরন আনয়ন করেন।[৩]

হাজী শরী'আতুল্লাহ ফরিদপুরের নিভৃত শামাইল গ্রামে যে ইসলামী পুনঃর্জাগরণের সূচনা করে গিয়েছিলেন পরবর্তীতে তা সমগ্র বাংলা ও আসামে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। তিনি জীবিতাবস্থায়ই তাঁর সুযোগ্য পুত্র দুদু মিয়াকে পবিত্র মক্কা শরীফে লেখা পড়া শেষ করিয়ে দেশে ফিরিয়ে এনেছিলেন। দুদু মিয়াকে তিনি নিজের পাশে রেখেই কিছুকাল আন্দোলনের প্রশিক্ষণ দান করেন। পরবর্তী ফরায়েযী আন্দোলনের কাজে দুদু মিয়া পিতার চেয়েও বিচক্ষণতা ও সফলতার বিকাশ ঘটিয়েছিলেন। এই মহান নেতা ১৮৩৯/৪০ খৃষ্টাব্দে উনষাট বছর বয়সে নিজ গ্রাম শামাইলে ইন্তিকাল করেন। তাঁর মৃতদেহ সেখানেই সমাহিত করা হয়। তাঁর উত্তরসূরী ফরায়েযী জামা'আতের অন্যতম নেতা আবু খালিদ রশীদ উদ্দীন ওরফে বাদশাহ মিয়া (১৮৮৪-১৯৬০) ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে/ ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে তাঁর নামানুসারে 'বাহাদুরপুর শরী'আতীয়া আলীয়া মাদ্রাসা' নামে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এই মাদ্রাসাটি ফরিদপুর জেলায় প্রতিষ্ঠিত প্রথম আলীয়া মাদ্রাসা। হাজী শরী'আতুল্লাহ এর অধঃস্তন পঞ্চম পুরুষ

১। জুলফিক্কার আহমদ কিসমতী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯।

২। খান মুহাম্মদ সিদ্দিক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১-২২; হুমায়ুন আবদুল হাই, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬০।

৩। উজীর আলী, মোসলেম রত্নহার, পৃঃ ১৬; মোঃ আবদুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

(বর্তমান গদ্দীনশীন) আবুল হাফিজ মুহসিন উদ্দিন আহমদ (দুদু মিয়া)-এর জ্যেষ্ঠপুত্র আবুল হাসানাত মুহসিনউদ্দীন আহমদ (আবূবকর) বর্তমানে উক্ত ঐতিহ্যবাহী মাদ্রসাটির অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।[১]

হযরত সায়্যিদ নিসার আলী ওরফে তীতুমীর
(১৭৮২ - ১৮৩১)

পলাশীর যুদ্ধের (১৭৫৭ খৃঃ) প্রায় পঁচিশ বছর পর এবং সিপাহী বিদ্রোহের (১৮৫৭ খৃঃ) পঁচাত্তর বছর পূর্বে ভারতের পশ্চিম বঙ্গের অন্তর্গত ২৪ পরগণা জিলার বশীরহাট মহকুমাধীন বাছড়িয়া থানার অন্তর্গত মুসলমান বহুল চাঁদপুর গ্রামের পশ্চিম পাড়ায় এক সম্রান্ত পরিবারে ১৭৮২ সালে তীতুমীরের জন্ম হয়। তাঁর প্রকৃত নাম সায়্যিদ নিসার আলী।[২] তবে, তীতুমীর নামেই তিনি অধিক প্রসিদ্ধ।[৩] তাঁর পিতার নাম সায়্যিদ হাসান আলী ও মাতার নাম রোকেয়া আবিদা খাতুন।[৪] ছোট বেলা থেকেই তীতুমীরের লেখা পড়ার প্রতি খুব ঝোঁক ছিল। সাড়ে চার বছর বয়সে তাঁর আব্বা-আম্মার কাছেই তাঁর লেখাপড়ার হাতে খড়ি। পাঁচ বছর বয়সে তাঁকে এক মক্তবে ভর্তি করে দেয়া হয়। তাঁর আব্বা-আম্মা উভয়ই তাঁর পড়াশুনার প্রতি বিশেষ নজর রাখতেন। তাঁকে আরবী, ফার্সী, উর্দু ও বাংলা শেখাবার জন্যে দু'জন গৃহ শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়।[৫]

অত্র এলাকার তৎকালীন নামকরা উস্তাদ মুন্শী লাল মিয়াকে তীতুমীরের আরবী, ফার্সী ও উর্দু পড়াবার আর সু-পন্ডিত রাম কমল ভট্টাচার্যকে তাঁর বাংলা ও অংকে শেখানোর জন্য নিযুক্ত করা হয়। তাঁরা দু'জনেই সবিশেষ যত্ন ও নিষ্ঠার সাথে তীতুমীরকে এসব বিষয় শিক্ষা দিতেন।[৬] এ ছাড়া বিহার শরীফের মশহুর 'আলিম হাফিজ নি'আমত উল্লাহকে তীতুমীরের ইসলামী শরী'আত ও তরীকত সম্বন্ধীয় জ্ঞান দানের জন্যে নিয়োজিত করা হয়। লেখাপড়ায় খুব মনোযোগী হওয়ার ফলে মাত্র আঠার বছর বয়সে তিনি মাদ্রাসার পড়া শেষ করেন। অল্প দিনের মধ্যে তিনি আরবী, ফার্সী, উর্দু ও বাংলায় অগাধ জ্ঞান লাভ করেন।[৭] এ সব ভাষায় তিনি সুন্দর বক্তৃতা দিতে ও আলাপ আলোচনা করতে পারতেন। তাঁর বক্তৃতার ভাষা ও কথা বলার ভঙ্গিমা অত্যন্ত মার্জিত, সাবলিল, যুক্তিপূর্ণ ও বুদ্ধিদীপ্ত ছিল।

১। গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৯; জুলফিকার আহমদ কিসমতী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০।

২। তীতুমীরের একাধিক উপাধি ছিল। তন্মধ্যে 'সায়্যিদ' তাঁর বংশগত, 'মীর' নওয়াব প্রদত্ত, 'শাহ্' জনতা প্রদত্ত, 'বাদশাহ্' ইংরেজ প্রদত্ত এবং 'শায়খ' তাঁর সাধনালব্ধ উপাধি। (এ বি এম আবদুল বারী, তীতুমীর ঃ মুক্তি সংগ্রামের প্রথম শহীদ, পৃঃ ৬)।

৩। তীতু নামে প্রসিদ্ধ লাভের পেছনে একটা ঘটনা আছে। তা'হলো এই যে, একবার তিনি শৈশবে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে ভীষণ রুগ্ন ও দুর্বল হয়ে পড়েন। তিতা ঔষধ খেয়ে তিনি ধীরে ধীরে সুস্থ ও সবল হয়ে উঠেন। তাই তার নাম হয় তিতা মিয়া। পরবর্তীকালে 'তিতা মিয়া' থেকে তীতুমীর নামে পরিচিত হন। তীতুমীরের আরেক ভায়ের নাম ছিল মিঠা মিয়া। আসল নাম ছিল সায়্যিদ [illegible] আলী। [এ, বি,এম আবদুল বারী, তীতুমীরঃ মুক্তি সংগ্রামের প্রথম শহীদ, পৃঃ ৬]।

৪। অগ্রপথিক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ৩য় সংখ্যা, মার্চ ১৯৯৪, পৃঃ ২০।

৫। এ, বি, এম, আবদুল বারী, তীতুমীর ঃ মুক্তি সংগ্রামের প্রথম শহীদ, পৃঃ ৮।

৬। এ, বি, এম, আবদুল বারী , প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮।

৭। এ, বি, এম, আবদুল বারী , প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮।

Dhaka University Institutional Repository

হাফিজ নি'আমতুল্লাহ চাঁদপুর দু'বছর অবস্থান করার পর তীতুমীরকে নিয়ে বিহার শরীফ গমন করেন। সেখানে অবস্থানকালে তিনি বহু ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান পরিদর্শন ও পীর, ওলী-আওলিয়াদের মাযার যিয়ারত করেন। দীর্ঘ ছয় মাস পর তিনি সেখান থেকে নিজ গ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন। বিহার শরীফ পরিভ্রমনের ফলে তাঁর দৃষ্টিভংগি উদার হয়, জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি পায় এবং অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধি ঘটে।[১] তীতুমীরের জন্মকালীন সময়ে প্রায় দেশব্যাপী শরীর কসরৎ বিদ্যার জনপ্রিয়তা ছিল। বিশেষ করে যারা কুস্তি, হা-ডুডু, লাঠি খেলা, তীর-তলোয়ার, ঢাক-সড়কি চালনায় দক্ষ ছিলেন তাদের খুব কদর ও সমাদর ছিল। শরীর কসরৎ বিদ্যার উৎকর্ষের জন্য গড়ে উঠেছিল বহু 'আখড়া'।[২] তরুণ বয়স থেকেই তিনি হাফিজ নি'আমতুল্লাহর কাছে কুস্তি, লাঠি খেলা, তীর-তলোয়ার, ঢাল-সড়কি চালনার কলা-কলা শিখেছিলেন।[৩] অতঃপর তিনি এক আখড়ায় ভর্তি হন। সেখানে নিয়মিত ডন, কুস্তি, লাঠিখেলা, তীর ছোড়া, তলোয়ার চালানো প্রভৃতি শিক্ষা করে অতি অল্পদিনের মধ্যেই তিনি একজন মস্তবড় কুস্তিগীর ও মুষ্টিযোদ্ধা হিসেবে পরিচিত হন। যৌবনের শুরুতে তিনি গ্রামরক্ষী দল গঠন করে গ্রাম ও গ্রামের আশে পাশে যাতে শান্তি-শৃংখলা বিঘ্নিত না হয় তার ব্যবস্থা করেন। যৌবনে পদার্পন করার পর তাঁর আব্বা-আম্মা দেখে শুনে বর্তমান ভারতের পশ্চিম বংগের বশীরহাট মহকুমার অধীন বাদুড়িয়া থানার অন্তর্গত খাসপুর গ্রামের কামিল দরবেশ শাহ্ সূফী মুহাম্মদ আসমতুল্লাহ সিদ্দীকীর পৌত্রী ও হযরত শাহ্ সূফী রহীমুল্লাহ সিদ্দীকীর কন্যা ময়মুনা খাতুনের সাথে তাঁকে বিয়ে দেন। বিয়ের কয়েক মাস পর তাঁর পিতা হাসান আলী মাত্র পঞ্চাশ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। বিয়ের চৌদ্দ দিন আগে তাঁর ছোট দাদা (পিতামহ) সায়্যিদ ওমর দারাজ একশত পাঁচ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।[৪]

পিতার ইন্তিকালের পর তীতুমীর কলিকাতার তালতলায় গিয়ে তাঁর ওস্তাদ হাফিজ নি'আতুল্লাহর পীর ভাই হাফিজ মুহাম্মদ ইসমাঈলের বাসভবনে অবস্থান করতে থাকেন। এখানে কয়েকদিন অবস্থানের পর তিনি শুনতে পান যে, মিসরীগঞ্জের নাদির হুসাইন খলীফার আখড়ায় একদল নামকরা কুস্তিগীরের কুস্তি প্রতিযোগিতা হচ্ছে। একদিন তিনি সেখানে কুস্তি প্রতিযোগিতা দেখতে যান। কুস্তি দেখে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ন হওয়ার ইচ্ছা তাঁর ওস্তাদের কাছে ব্যক্ত করেন। তৃতীয় দিনের প্রতিযোগিতায় বারজন কুস্তিগীরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কুস্তিগীর 'আরিফ আলীর' সাথে প্রতিযোগিতা করে বিজয়ী হন। ফলে, চতুর্দিকে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে।[৫]

একদিন মীর্জা গোলাম আম্বিয়ার[৬] বাড়ীতে তীতুমীরের সংগে বরিশালের যবরদস্তপীর শাহ্ কামাল ও তালতলার দরবেশ যাকী শাহ্ এর মুলাকাত হয়। যাকী শাহের নির্দেশানুযায়ী তীতুমীর কামিল মুরশিদের সন্ধানে বাংলা, বিহার,উড়িষ্যা, দিল্লী, আগ্রা ও আজমীরের বহু স্থান পরিভ্রমন করেন। অবশেষে ১৮২১ সালে তিনি হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ গমন করেন। এখানে এসে তিনি দু'জন সূফী সাধক হযরত শাহ্ মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন ও সায়্যিদ আহমদ বেরলভীর (রঃ) সাহচর্য লাভ করেন এবং সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (রঃ)-এর ঘনিষ্ঠ

১। এ, বি, এম, আবদুল বারী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯।
২। এ, বি, এম, আবদুল বারী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১।
৩। এ, বি, এম, আবদুল বারী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০।
৪। এ, বি, এম, আবদুল বারী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২।
৫। এ, বি, এম, আবদুল বারী, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৩।
৬। মীর্জা গোলাম আম্বিয়া কলকাতার মীর্জাপুরের একজন নামকরা জমিদার ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

সান্নিধ্যে আসেন ও তাঁর ব্যক্তিত্ব ও মতবাদে মুগ্ধ হয়ে তাঁর কাছে চার তরীকাহ্য় (কাদ্‌রিয়া, চিশ্‌তিয়া, মুজাদ্দিদিয়া ও নক্‌শবন্দিয়া)মুরীদ হন।[১]

অল্প কিছুদিনের মধ্যে তীতুমীর নিজের চেষ্টা সাধনা বলে খিলাফত লাভ করেন। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় চল্লিশ বছর। এর কিছুদিন পর সৈয়দ আহমদ বেরলভী (রঃ) তাঁকে সংগে নিয়ে মদীনায় রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর রওযা মুবারক যিয়ারত করেন ও মসজিদে নববীতে জুম'আর নামায আদায় করেন। এখানে অবস্থানকালীন সময়ে তিনি অন্যান্য বুযুর্গানে দীনের রওযা যিয়ারত করেন। অতঃপর তিনি ইরান, ইরাক, সিরিয়া, কুফা, কারবালা, মিসর ও আফগানিস্তানের বহু ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন করেন।[২] মক্কা শরীফে অবস্থানকালে তাঁরা মুহাম্মদ বিন্ আবদুল ওহাব প্রবর্তিত ও প্রচারিত সমাজ-সংস্কার ও ধর্মীয়-পুনর্গঠন আন্দোলনের সংগে পরিচিত হন। বাংলার মাটিতে যাঁরা এ আন্দোলন পরিচালনা করেন তাঁদের মধ্যে তীতুমীর ও হাজী শরী'আতুল্লাহ অন্যতম ছিলেন।[৩]

বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার মৃত্যুর (১৭৫৭ খৃঃ) পর এখানকার অধিকাংশ মুসলমান উঁচু বর্ণের হিন্দুদের পরামর্শ ও নির্দেশানুযায়ী ধর্ম-কর্ম করতে শুরু করে। সালাম দেওয়ার পরিবর্তে তারা নমস্কার বা আদাব দিতে, লুঙ্গি ছেড়ে ধুতি পরতে, মুসলমানী নামের আগে শ্রী লিখতে, ইসলামী, আরবী ও ফার্সী নাম রাখা বাদ দিয়ে পাচু, জটে, গোবরধন, নেপাল, দুলাল ইত্যাদি হিন্দুয়ানী নাম রাখতে অভ্যস্ত হয়ে উঠে। কেবল তাই নয়, প্রকৃত শিক্ষা বিবর্জিত জনগণ দীনদারী পরহেযগারী বাদ দিয়ে ইবাদত, বন্দেগী ও অযু-গোসল ইত্যাদি পরিত্যাগ করে উপবাস আরাধনা, স্নান করা, বলির পাঠা ছাগল যোগান দেওয়া, পূঁজা পার্বনে যোগ দেওয়া ইত্যাদি হিন্দু সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে উঠে।[৪]

ঠিক এমনি এক রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে বাংলার মুসলমানদের পরিত্রানের জন্য অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে কাজ করেন তীতুমীর ও হাজী শরী'আতুল্লাহ।[৫] বাংলাদেশের এমনি এক দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে ১৮২১ সালের শেষ ভাগে তীতুমীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। একই সময়ে সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (রঃ)ও সুবে বাংলায় আগমন করেন। তিনি বিভিন্ন স্থানের 'আলিম ও বিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে কলিকাতায় শামসুন্নাহার খানমের বাগান বাড়ীতে এক পরামর্শ সভায় মিলিত হন। এ সভায় তৎকালীন মুসলমান সমাজের দুরাবস্থা ও বর্গী দস্যুদের দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদ সংস্কার সাধনের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়।

কলিকাতার সভা সমাপ্তির পর তীতুমীর স্বগ্রাম প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি চাঁদপুর, হায়দারপুর, নোয়াপাড়া, রাজাপুর, হুগলী গাঁ, আটঘরা, সন্নিয়া, শিমলা, বেডগুম, বেগমপুর (বিনেটআটি) কীর্তিপুর, কোলাসুর, মান্দ্ররা, বশাইকাটি প্রভৃতি স্থানে সভা সমিতিতে যোগদান করে মুসলমানদিগকে ধর্মের পাবন্দ হতে সুন্নত তরীকাহর অনুসরণ করতে

১। এ, বি, এম, আবদুল বারী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫।
২। এ, বি, এম, আবদুল বারী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫।
৩। এ, বি, এম, আবদুল বারী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬।
৪। এ, বি, এম, আবদুল বারী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮।
৫। এ, বি, এম, আবদুল বারী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮।

Dhaka University Institutional Repository

উপদেশ দেন। এমন কি পূজা পার্বনে চাঁদা দিতে, বলির পাঠা ছাগল যোগান দিতে, দাঁড়ি কামাতে ও ধূতি পরতে নিষেধ করেন। ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপে শরীক হতে, শিরুকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে, অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধাচারণ করতে উপদেশ দেন। এই উদ্দেশ্যে সকলকে তিনি ঐক্যবদ্ধ হতে অনুরোধ করেন। তিনি নিজে বর্তমান বাদুড়িয়া থানার পূর্বদিক দিয়ে প্রবাহিত ইছামতি নদীর তীরবর্তী সরফ রাজাপুর গ্রামের শাহী আমলে নির্মিত ও বর্গী দস্যু কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্থ মসজিদটির সংস্কার সাধন করেন। সেখানে তিনি জুম'আর নামায কায়েম করেন। মুসল্লীগনকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়তে, রমযান মাসে রোযা রাখতে, কাছা না দিয়ে কাপড় পরতে, মুসলমানী নাম রাখতে সকলকে নসীহত করেন। মুসলমানদেরকে বিশেষ ভাবে তাকীদ দেন তারা যেন- ১) এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর উপাসনা করে, ২) নিরাকার আল্লাহর সাথে শরীক না করে,৩) পীর পূঁজা ও কবর পূঁজা না করে,৪) কুর'আন-হাদীসের খেলাফ কাজ না করে,৫) কুসংস্কারধর্মী ও অনৈসলামিক কাজ না করে।

এ ছাড়া তিনি আরও বলতেন-ধর্মীয় বিধি-বিধানের প্রতি উপেক্ষা করা পাপ। অমুসলমানদের কার্যকলাপ যারা অনুসরণ করবে আল্লাহ তাদের শাস্তি দিবেন। মুসলমানদের অবশ্যই পোশাক-পরিচ্ছদ, কথা বার্তায়, ব্যবহারে, সাহিত্য সংস্কৃতিতে মুসলমানী ছাপ রাখতে হবে। নচেৎ আল্লাহ মহাবিচারের দিন তাদেরকে অমুসলমানদের সাথে স্থান দিবেন। তাঁর কথায় আকৃষ্ট হয়ে দলে দলে লোক তাঁর কাছে আসতে থাকে। কিছুদিনের মধ্যে তীতুমীর তাদের নিয়ে গনফৌজ নামে এক জিহাদী দল গড়ে তোলেন।[১] তীতুমীরের সংস্কারধর্মী ও জনহিতকর কার্যাবলী স্থানীয় হিন্দু জমিদার ও নীলকর সাহেবদের মাঝে ভীতির সঞ্চার করে। ফলে, নিরীহ কৃষকদের উপর তাদের অত্যাচার ও শোষণের মাত্রাও বৃদ্ধি পায়। পূঁড়ার প্রভাবশালী জমিদার শ্রী কৃষ্ণদেব রায়, গোরব ডাঙ্গার জমিদার শ্রীকালী প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, গোবরা গোবিন্দ্রপুরের জমিদার শ্রী রামনারায়ণ নাগ, নাগরপুরের জমিদার শ্রী গৌরপ্রসাদ চৌধুরী, সাফরাজ পুরের জমিদার শ্রী কে,পি, মুখার্জি, কলিকাতার গোমস্তা লাঠু বাবু প্রমূখ স্বনাম ধন্য ব্যক্তি একজোট হয়ে তাদের স্ব স্ব এলাকায় তীতুমীরের অনুসারীদের উপর জুলুম ও করের সংখ্যা ও মাত্র বাড়িয়ে দেন। আগেই মুসলমান প্রজাদের জমিদারের কাচারী ঘরে প্রবেশ কর, জমিদার পুত্রের টিকি কর, কন্যার বিড়াল বিবাহ কর এবং ১২ মাসে ১৩ পূজার কর দিতে হত।[২] পূঁড়ার জমিদার শ্রী কৃষ্ণদেব রায় উপরোক্ত জমিদারদের সাথে সলাপরাপর্শ করে এই পাঁচ দফা ফরমান জারি করেন যে,

১। যারা তীতুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করবে, দাঁড়ি রাখবে ও গোঁফ ছাটবে তাদের চাপ দাঁড়ি রাখার জন্য আড়াই টাকা এবং গোঁফ ছাটার জন্য ও ছোট দাঁড়ির জন্য পাঁচসিকা কর দিতে হবে।

২। কাঁচা মসজিদ তৈরীর জন্যে পাঁচশত টাকা এবং পাকা মসজিদ তৈরীর জন্য এক হাজার টাকা নজরানা দিতে হবে।

৩। চলতি নাম পরিবর্তন করে আরবী মুসলমানী নামকরণের জন্যে মাথাপিছু পঞ্চাশ টাকা দিতে হবে।

৪। কেউ গরু যবেহ করলে তার ডান হাত কেটে দেয়া হবে।

৫। কেউ তীতুকে তার বাড়ীতে আশ্রয় দিলে তার ভিটে-মাটি থেকে উচ্ছেদ করা হবে।

১। এ, বি, এম, আবদুল বারী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০।

২। অগ্রপথিক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৯ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মার্চ, ১৯৯৪, পৃঃ ২১।

Dhaka University Institutional Repository

জমিদার কর্তৃক ফরমান জারি হওয়ার পর তীতুমীর জমিদার শ্রীকৃষ্ণদেবের কাছে পত্র লেখেন যে, "মহাশয়, আমি আমার দীন ইসলাম জারি করছি মাত্র। ইসলাম শান্তির ধর্ম। মুসলমান শান্তিকামী ও তাওহীদবাদী। মুসলমানদেরকে ধর্মের বিধি-নিষেধ শিক্ষা দিচ্ছি মাত্র। এটা ধর্মীয় অনুশাসনের অংশ। এতে আপনার অসন্তোষের কি কারণ থাকতে পারে?"

ইতোমধ্যে তীতুমীরের প্রভাব ২৪ পরগণা, নদীয়া, খুলনা ও ফরিদপুরের এক বিস্তীর্ণ এলাকা ছড়িয়ে পড়ে। তীতুমীর জমিদারদের দাঁড়ির উপর খাজনা ধার্যের ও কর আদায়ের তীব্র প্রতিবাদ করেন। মুসলমানরা তাঁর নেতৃত্বে সুসংগঠিত ও সুসংহত হয়। তারা ঐক্যবদ্ধভাবে জমিদারদের কাচারী বয়কট করে ও কর দিতে অস্বীকার করে। ফলে মুসলমান গরীব প্রজাদের উপর অমানুষিক নির্যাতন ও অত্যাচার বৃদ্ধি পায়।[১] তীতুমীরের অনুসারী জনৈক আমীনুল হক এই কর দিতে অস্বীকার করায় পূঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদেবের লোকেরা তার উপর অকথ্য নির্যাতন করে জেলে পাঠায় এবং জেলেই তাঁর মৃত্যু হয়।[২] মুসলমানদের উপর জমিদাররা কিরূপ জুলুম-নির্যাতন করত তার একটি চিত্র ১৮৩২ সালের ২৭শে আগষ্টের সমাচার দর্পনে পাওয়া যায়। ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের মর্ম হল এই যে, কোন এক মসজিদে মুসলমানরা যখন আযান দিয়ে নামায পড়ত তখন স্থানীয় জমিদারের সন্তানেরা তাদের বিদ্রূপ করত এবং চিৎকার করে নামাযে বাধা সৃষ্টি করত। একদিন অনেকটা রাগান্বিত ও বিরক্ত হয়েই মুসুল্লীরা একজনকে চপেটাঘাত করে। এ খবর শোনার পর জমিদার লোকজন পাঠিয়ে মুসুল্লীদের অনেককে ধরে নিয়ে যায়। পরে তাদের সরদারকে (সম্ভবত ইমাম) ধরে আনা হয় এবং হিন্দু নাপিত ডেকে তার চুল দাঁড়ি প্রসাব দিয়ে ভিজিয়ে দেয়া হয় এবং তাকে মারাত্মকভাবে প্রহারও করা হয়। জমিদারের এই দৌরাত্ম্যের প্রতিকার চেয়ে আদালতে নালিশ করা হয়। কিন্তু আমলারা ঘুষ নিয়ে মামলা ডিসমিস্ করে দেয়। অতঃপর ঐ জমিদারের লোকেরা নামাযের সময় মুসুল্লীদেরকে প্রস্তর নিক্ষেপ ও ঠাট্টা বিদ্রূপ করত। এমন কি একদিন তারা একটি শুকর জবেহ করে তার রক্ত মসজিদে ছড়িয়ে দেয়।[৩] ইতোপূর্বে তীতুমীর কর্তৃক সরফরাজপুরের শাহী মসজিদটির সংস্কার সাধন ও সেখানে জুম'আর নামায কায়েম করার সংবাদ পেয়ে জমিদারের চরেরা একদিন শুক্রবার নামাযের সময় তাতে আগুন ধরিয়ে দেয় ও নিকটস্থ মুসলমানদের বাড়ী-ঘর লুটপাট করে। তখন তীতুমীর বাধ্য হয়ে বশীরহাট মহকুমায় পূঁড়ার জমিদারের বিরুদ্ধে মসজিদ পোড়ানোর ও মুসলমানদের বাড়ী-ঘর লুট পাট করার অভিযোগ দায়ের করেন। কিন্তু হিন্দু দারোগা অপরাধীর বিচার না করে তীতুমীরের বিরুদ্ধে উল্টো চার্জশিট দাখিল করে। উপায়ান্তর না দেখে তীতুমীরের ভক্তরা বারাসাতের ম্যাজিষ্ট্রেটের দরবারে দারোগার পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের সুবিচার প্রার্থনা করেন। কিন্তু এবারও বিচারের রায় জমিদারের অনুকূলে দেওয়া হয়। অবশেষে তীতুমীর তাঁর ভাগ্নে ও প্রধান শাগরিদ গুলাম মা'সূমকে আদালতের এরূপ রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার জন্য ১৮৩১ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর কলিকাতার আলিপুরে পাঠান। জজ সাহেব কর্মস্থলে ছিলেন না বিধায় গুলাম মাছুম ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসেন।[৪] বশীরহাটের দারোগা ও বারাসাতের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট তীতুমীরের বিপক্ষে ছিলেন। জমিদাররা নিরীহ গরীব মুসলমানদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করতে লাগল। তাদের জমিও

১। এ, বি, এম, আবদুল বারী, তীতুমীর ঃ মুক্তি সংগ্রামের প্রথম শহীদ, পৃঃ ২৪।
২। অগ্রপথিক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৯ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মার্চ, ১৯৯৪, পৃঃ ২১।
৩। অগ্রপথিক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৯ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মার্চ, ১৯৯৪, পৃঃ ২১।
৪। এ, বি, এম, আবদুল বারী, তীতুমীর ঃ মুক্তি সংগ্রামের প্রথম শহীদ, পৃঃ ২৪।

Dhaka University Institutional Repository

ক্রোক করে নিতে ও বাড়ীঘর লুটপাট করে ভিটে মাটি ছাড়া করতে লাগল। তীতুমীরের শাগরিদদের হয়রানি ও নাজেহাল করার জন্য পিঠমোড়া দিয়ে দু'হাত বেঁধে জমিদারের কাচারিতে নিয়ে আসা হত। তারপর তাদের উপর কঠোর নির্যাতন চালান হত।[১] জমিদারদের নির্যাতনের আইনগত প্রতিকার না হওয়ায় তীতুমীর ও তাঁর অনুসারীরা ১৮৩১ সালের অক্টোবরে সশস্ত্র লড়াইয়ের প্রস্তুতি হিসেবে নারিকেলবাড়িয়ায়[২] প্রশাসনিক কেন্দ্র ও বাঁশের কেল্লা[৩] বা দুর্গ নির্মাণ করেন। তীতুমীরের সংগে ফকীর মিসকীন শাহ্ তাঁর দলবলসহ যোগদান করেন। ১৮৩১ সালের নভেম্বর মাসে তীতুমীরের অনুসারীরা পুঁড়ায় প্রবেশ করে এবং বাজারে একটি গরু জবেহ করে তার রক্ত একটি মন্দিরে ছড়িয়ে দেয়। তারা আরও কয়েকটি গ্রামে হানা দেয় এবং বহু বিত্তবান হিন্দুর আনুগত্য লাভ করে। এসব ঘটনায় তীতুমীরের সমর্থক সংখ্যা বেড়ে যায় এবং তার বাহিনী আরও স্ফীত হয়। ভীত সন্ত্রস্ত জমিদাররা অতঃপর তীতুমীরকে দমনের জন্য সামরিক সাহায্য চেয়ে বাংলার তৎকালীন গভর্নরের (বেন্টিংক, ১৮২৮-৩৫) কাছে দরখাস্ত করেন। গভর্নরের নির্দেশে কলিকাতা থেকে যশোরে একটি সেনাদল পাঠান হয়। যশোরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডারের নেতৃত্বে এই বাহিনী ১৮৩১ সালের ১৫ই নভেম্বর নারিকেলবাড়িয়া আক্রমণ করে। কিন্তু তীতুমীরের গণফৌজ যুদ্ধের এক পর্যায়ে এই বাহিনীকে চারদিক থেকে ঘেরাও করে ফেলে। যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষের বহু লোক হতাহত হয়। আলেকজান্ডার কোনমতে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন। বিজয়ী বাহিনী অতঃপর কয়েকটি নীলকুঠি লুট করে। ১৮৩১ সালের ১৭ই নভেম্বর কৃষ্ণনগরের ম্যাজিস্ট্রেট আর একটি বাহিনী নিয়ে নারিকেলবাড়িয়া অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু তীতুমীরের বাহিনীর সাথে যুদ্ধে বিপর্যস্ত ও পর্যুদস্ত হয়ে পলায়ন করে। অবশেষে আলেকজান্ডার ও মেজর স্কটের নেতৃত্বাধীন বাহিনী ১৮৩১ সালের ১৯শে নভেম্বর মাসে নারিকেলবাড়িয়া আক্রমণ করে। তারা কামান দেগে বাঁশের দুর্গ ধূলিসাৎ করে দেয়। তীতুমীরের বাহিনী অসীম সাহসিকতার সাথে লড়াই করে পরাজিত হয়। গোলার আঘাতে মুক্তি ফৌজের ৫০ জন বীর[৪] মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেন। ময়েজউদ্দীন বিশ্বাস ও তীতুমীরের পুত্র মীর জওহার 'আলী ও অন্যান্য অনেকে শহীদ হন। কামানের গোলার আঘাতে তীতুমীর ও মিসকীন শাহের দেহ[৫] খন্ড বিখন্ড হয়ে যায়। তীতুমীরের দুই পুত্র মীর তুরাব আলী, মীর গওহর আলী ও সেনাপতি গুলাম মা'সুম সহ ৩৫০ জন মুজাহিদ বন্দী হন। ৩৫০ জনকেই আলিপুর আদালতে বিচারার্থে প্রেরণ করা হয়। তন্মধ্যে ১১ জনকে যাবজ্জীবন ও ১৪০ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড দেয়া হয়। সেনাপতি গুলাম মাসুমকে ক্ষমা ভিক্ষা করতে বলা হয়। কিন্তু তিনি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে তাঁকে নারিকেলবাড়িয়ার বাঁশের কেল্লার পূর্বদিকে প্রশস্ত খোলা ময়দানে প্রকাশ্য দিবালোকে ফাঁসি দেওয়া হয়। বিচার চলাকালে ৪ জন বন্দী কারাগারে ইন্তিকাল করেন। একজন পাগল হয়ে যান। বাকী বন্দীরা কঠোর কারা নির্যাতন ভোগের পর খালাস পান।

যুদ্ধ শেষে ইংরেজ সেনাপতি তার অধীনস্থ সৈন্যদের একত্রিত করে ভাবগম্ভীর স্বরে বলেন, "বন্ধুগণ, যুদ্ধে আমরা

১। এ, বি, এম, আবদুল বারী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬।

২। নারিকেলবাড়ীয়ার উত্তরে হুগলী গাঁ, দক্ষিণে মেসে সোমপুর, পূর্বে ভরবরে নদী ও কুলিয়া গ্রাম, পশ্চিমে কুরুজ ও কেরশা।

৩। বাঁশের কেল্লার মধ্যে ভক্ত মুরীদানদের থাকার জন্য কয়েকটি ঘর নির্মিত হয়। ঘরগুলো নারিকেল পাতায় ছাওয়া ছিল। পাশেই একটি মসজিদ যা দীর্ঘদিন বিরান অবস্থায় পড়েছিল। মসজিদটির দৈর্ঘ্য ৩০ হাত ও প্রস্থ ১২ হাত ছিল।

৪। অগ্রপথিক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৯ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মার্চ, ১৯৯৪, পৃঃ ৩৩।

৫। জনশ্রুতি আছে যে, তাঁরা উভয়ে অন্তর্হিত হন।

Dhaka University Institutional Repository

জয়ী হয়েছি সত্যি কিন্তু জীবন দিয়েছেন এক ধর্মপ্রাণ দেশ-প্রেমিক মহাপুরুষ। তোমরা তাঁর অমর আত্মার প্রতি সম্মান দেখাও।"[১]

তীতুমীর ছিলেন একজন কর্মবীর ও পরিশ্রমী। পরিশ্রমকে তিনি কখনও ভয় করতেন না। তিনি সময়ের কাজ সময়ে করতে পছন্দ করতেন, বৃথা সময় নষ্ট করা তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল। তিনি সংকর্মী ও সত্যসাধক ছিলেন।[২]

তিনি ছিলেন বিনয়ী, নম্র ও ভদ্র।[৩] তিনি প্রকৃত জ্ঞানী, তত্ত্বদর্শী, সাধক ও ধর্মভীরু ছিলেন। তাঁর মধ্যে দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলীর বিকাশ সাধিত হয়েছিল।[৪] তিনি ছিলেন সৎসাহসী ও স্বাধীন চেতা, অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রামী। তিনি ইসলামের নিষ্কলুষ এবং খাঁটি অনুসরণে ও অনুশীলনে মুসলমানদের উজ্জীবিত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। খাঁটি ও প্রকৃত তাওহীদ প্রচারে সচেষ্ট ছিলেন এবং পরিপূর্ণভাবে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সকলকে উদ্বুদ্ধ করতেন। স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর কল্যাণ সাধনাই তাঁর জীবনের স্বপ্ন ও সাধনা ছিল।

বর্তমানে তীতুমীরের বংশোদ্ভূত পরিজনের এক বৃহৎ অংশ শিয়া মাযহাব ভুক্ত। তারা তাঁর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনার জন্য নারিকেলবাড়িয়ার বিজন প্রান্তরে প্রতি বছর যে মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করেন, সেখানে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলে সমবেত হয়।

১। এ, বি, এম, আবদুল বারী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯।
২। এ, বি, এম, আবদুল বারী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯।
৩। এ, বি, এম, আবদুল বারী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০।
৪। এ, বি, এম, আবদুল বারী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪।

Dhaka University Institutional Repository

শাহ্ আজীম
(জন্মঃ ১৭৮৫ইং)

বাংলাদেশের বৃহত্তর নোয়াখালী জিলায় যে সব সূফী-সাধক ইসলাম প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তাঁদের মধ্যে শাহ্ আজীম বা আজম শাহ্ অন্যতম ছিলেন। তাঁর পূর্ব পুরুষ ইরাকের বাগদাদের অধিবাসী ছিলেন।[১] শাহ্ আজীম-এর পিতার নাম শাহ্ মুহাম্মাদ রফী উদ্দীন এবং দাদার নাম শাহ্ মুহাম্মদ নুদুল্লী । তিনি ছিলেন হযরত শাহ্ জালাল (রঃ)-এর ভ্রাতষ্পুত্র। শাহ্ মুহাম্মদ নুদুল্লী ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে সিলেট থেকে চট্টগ্রাম জিলার ফটিকছড়িতে এসে আস্তানা স্থাপন করেন। চট্টগ্রামের মহান সাধক শাহ্ আমানত উল্লাহর মুরীদ ঢাকার আজীমপুর দায়রার প্রতিষ্ঠাতা সাধক শাহ্ দায়িম বালক শাহ আজীমকে সাথে নিয়ে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা আগমন করেন । তিনি তাকে খুব স্নেহ করতেন। বালক আজীমও তাঁর খিদমত করতেন। তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করে তিনি প্রভূত আধ্যাত্মজ্ঞানের অধিকারী হন ।[২]

শাহ্ আজীম ১৭৮৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন।[৩] চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে অবশেষে প্রাক্তন নোয়াখালী জেলার লক্ষীপুরে (বর্তমান জেলা) এসে উপনিত হন। লক্ষীপুর তখন জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন ছিল। তিনি এই অরণ্যের মধ্যে আস্তানা স্থাপন করেন। এই স্থানকে বর্তমানে দিয়ারা বাড়ী বা দায়রা বলে ।[৪] অত্র অঞ্চলের তৎকালীন প্রখ্যাত সাধক চাঁদ শাহ্ ফকীরের বড় মেয়ে খায়রুন্নিছাকে বিবাহ করেন ।[৫]

শাহ্ আজীম ধর্ম শাস্ত্রে প্রগাড় পান্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন । ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে ফারসী ভাষায় তাঁর লিখিত ২৫ খানা পুস্তকের পান্ডুলিপির মধ্যে ২০ খানার নাম পাওয়া যায়। বাকীগুলোর কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না । যে সব পান্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া গেছে সেগুলো হল ঃ

১। উমদাতুল ইসলাম
২। কাসীদ-ই-আবদুল কাদির জীলানী
৩। বুরহানুল আরিফীন
৪। খুদাই তত্ত্বের দলীল
৫। দীওয়ান

১। জাহিদুল গনি চৌধুরী, নোয়াখালীর চরিতাভিধান, পৃঃ ১২৭ ।
২। ডঃ আবদুল কাদের, নোয়াখালীতে ইসলাম, পঃ৭৮ ।
৩। তাঁর জন্ম-সন সম্পর্কে পরস্পর অসংলগ্ন বর্ণনা দেখা যায়। শিলালিপিতে, তাঁর জন্ম সন ১০১৩হিঃ/১৬০৪ইং লেখা হয়েছে। কিন্তু জাহিদুল গনি রচিত নোয়াখালীর চরিতাভিধান গ্রন্থে লেখা হয়েছে যে, তিনি ১৭৮৫ সালে সর্বপ্রথম লক্ষীপুরে আগমন করেন। তাহলে এতদুভয়ের মধ্যে ১৮১ বৎসরের সময়ের ব্যবধান হয়। তাছাড়া তিনি ছিলেন মাওলানা ইমামুদ্দিনের সমসাময়িক এবং তাঁর ছোট শ্যালিকাকে বিবাহ করেন। আর ইমামুদ্দীনের জন্ম সন তারিখ ছিল ১৭৮৮ ইং। তাই, শিলালিপিতে বর্ণিত জন্ম তারিখ ও লক্ষীপুর আগমনের তারিখ কোনটাই সঠিক নয়। বরং ১৭৮৫ ইংরেজীতে তাঁর জন্ম সন হবে। (ডঃ আবদুল কাদের, নোয়াখালীতে ইসলাম, পৃঃ ৮১-৮২) ।
৪। জাহিদুল গনি চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৭ ।
৫। ডঃ আবদুল কাদের, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

৬। হযরত শাহ্ সূফী যাহিদ
৭। পান্দে নামা-ই-নবী করীম (হযরত আলীর প্রতি রসূলের নসীহত)
৮। রাহাতুল কুলুব
৯। কিতাবুততীব
১০। ফযীলাতুন্নিসা ওয়া সিওয়ায়া (৩৩টি আয়াতের ফযীলত)
১১। তালীম দ্বীন
১২। লুবাবুল আবরার (হাদীছের সার)
১৩। মুবতাল-ই-দুআয়ে মাসুরা
১৪। হাদীছে আরবাইন
১৫। আল আমল বিন নিয়্যাত
১৬। ফাযায়িল-ই-কিতাবুল মুত্তাকী
১৭। শামায়িল-এ-নবী করীম (সঃ) (হযরত (সঃ)এর চেহারা মুবারকের বর্ণনা সম্বলিত পুস্তক)
১৮। মুনাযাতিল্লাহি তাআলা
১৯। মুখতালিফুল আমল
২০। হিদা'আত-ই-ইসলাম (মসলা ও দু'আ সম্পর্কীয়) ।[১]

শাহ্ আজীম-এর হাতের লেখা অত্যন্ত সুন্দর ছিল। তিনি একজন বড় আলিম ও উচ্চ স্তরের সূফী-সাধক ছিলেন। ফারসী সাহিত্যে তৎকালে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না। এছাড়া সিরাতুল মুস্তাকিম অধ্যায়, (ইসমাইল শহীদ সংকলিত সায়্যিদ আহমদ বেরলভীর উপদেশমালা যার জন্য স্বয়ং মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী দুবার মাওলানা ইমামুদ্দীনের বাড়ীতে গমন করেন) নওশিরওয়ার ওযীর বুজরকে মোহরকৃত খবরনামা, হাসান বসরী প্রণীত রিসালা-ই-ফযলে মক্কা, তরীকা-ই-কাদিরিয়া এবং মাওলানা কারামত আলীর রাহাতে রূহ প্রভৃতি দুর্লভ পুস্তক তাঁর উত্তরাধিকারীদের নিকট আজও বিদ্যমান আছে।

উক্ত কিতাবগুলো তিনি স্বহস্তে পাটখড়ি দিয়ে কাগজ তৈরী করে তাতে লিপিবদ্ধ করেন। পাটখড়ি পানিতে ভিজিয়ে গুড়ো করে মন্ড তৈরী করে পাথর চাপা দিয়ে পানি নিংড়িয়ে তিনি এ কাগজ প্রস্তুত করেন।

শাহ্ আজীম একজন সাধক ও ইসলাম প্রচারক ছিলেন। তিনি শরী'আতপন্থী আলিম ছিলেন। গান-বাজনা তিনি বিদ'আতী কাজ বলে মনে করতেন। দ্বীন-হীন অবস্থায় জীবন যাপন করতে পছন্দ করতেন । তাঁর মৃত্যুর সন তারিখ সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি ।[২]

হযরত শাহ্ আবুল লায়ছ
(মৃত্যু ঃ ১৮৫৮-ইং)

হযরত শাহ্ আবুল লায়ছ শাহ্ হাফিজ আবু তুরাব-এর পুত্র ছিলেন। তাঁর জন্ম তারিখ সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। তিনি একজন কামিল ওলী ছিলেন। অনেকের মতে তিনি তৎকালীন বাংলার কুতুব ছিলেন। 'তাস্‌দীকুন্নিহাদ' গ্রন্থে খন্দকার ফজলে রাব্বী লিখেছেন যে- হযরত আবুল লায়ছ এর বক্ষ প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ইলম দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। তিনি তৎকালীন বাংলাদেশের কুতুব ছিলেন। দেশের

১। ডঃ আবদুল কাদের, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮০।
২। ডঃ আবদুল কাদের, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮০।

Dhaka University Institutional Repository

জনসাধারণ তাঁর খুব ভক্তি করত। জনসমাজে তাঁর বহু কারামতের কথা প্রসিদ্ধ আছে। তাসাউফ সম্পর্কে তাঁর কয়েকখানা গ্রন্থ আছে- যদ্বারা তাঁর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের গভীরতার প্রমাণ মেলে। কিতাবগুলোর নাম হল- (১) যুবদাতুল ফাওয়ায়িদ ২) রিসালা-ই-লায়ছিয়া, (৩) কানয-ই-রিয়ায (৪) শাজারা-ই-নিজামিয়া ও (৫) শাজারাতুল 'আরিফীন । তাঁর নামানুসারে লায়ছিয়া বংশ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এই মহান সাধক ১২২২হিঃ/১৮৫৮ খৃঃ ইনতিকাল করেন ।[১]

শাহ্ যকি উদ্দীন
(মৃত্যু ঃ - ১৮৫৮)

আনুমানিক ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে সায়্যিদ মাসুম নামক জনৈক সূফী-সাধক চট্টগ্রাম জেলার হাওলা নামক স্থানে এসে বসতি স্থাপন করেন। সায়্যিদ যকিউদ্দিন তাঁর অধঃস্তন পুরুষ। তাঁর পিতা সায়্যিদ শামসুদ্দীন একজন সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। বাংলা একাদশ (খৃষ্টীয় ১৭শ) শতাব্দীর শেষভাগে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তাঁকে মকতবে ভর্তি করে দেয়া হয়। প্রথম থেকেই তিনি ভাবুক প্রকৃতির লোক ছিলেন বিধায় পড়াশুনায় তাঁর মন বসত না। মক্তবে অধ্যয়ন না করে তিনি মাঠে-ময়দানে, বনে জংগলে ঘুরে বেড়াতেন। সংসারমুখী হওয়ার জন্য তাঁকে নিজ আত্মীয়ের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করানো হয়। কিন্তু তিনি কবুল বলেই বিবাহ মজলিস হতে বের হয়ে আর ঘরে ফিরে আসেননি। বহু বৎসর তিনি চট্টগ্রাম পাহাড়ে বসবাস করে অবশেষে ঢাকায় এসে আজীমপুরার তৎকালীন বিখ্যাত পীর শাহ্ রওশন আলী (মৃঃ ১৮২২) এর খিদমতে হাজির হন। দীর্ঘদিন তাঁর খিদমতে থেকে অনেক কষ্ট করে আধ্যাত্মবিদ্যা হাসিল করেন এবং ১২২০বাং/১৮১৩খৃঃ নোয়াখালী (বর্তমান লক্ষীপুর) জেলার কাঞ্চনপুরে অবস্থিত মীরান শাহের কবর যিয়ারত করে শ্যামপুরে গিয়ে দায়রা স্থাপনের আদেশপ্রাপ্ত হন। তদনুযায়ী কিছুদিন তিনি মীরান শাহের কবরের পাশে অবস্থান করেন। এলাকাটি জনবসতিহীন জংগলাকীর্ণ ছিল বিধায় কচু ঘেচু খেয়ে জীবনপাত করতেন এবং গভীর রাতে জংগল থেকে বের হয়ে নদীর উপর জায়নামায পেতে আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করতেন। অতঃপর শ্যামপুর নিবাসী মুহাম্মদ কুরায়শ বেপারী ও অন্যান্যদের সহায়তায় শ্যামপুরে অবস্থান করতে শুরু করেন এবং সেখানে একখানা মসজিদ ও দায়রা স্থাপন করে এতদঞ্চলের হিন্দু মুসলমানদের মাঝে ইসলাম প্রচার করেন। শাহ যকিউদ্দীন দায়রা বাড়ীতে একটি লঙ্গরখানা স্থাপন করেন। প্রতি শুক্রবার একটি গরু জবাই করে তিনি গরীব-দুঃখী মানুষদের খাওয়াতেন ও দান-খয়রাত করতেন। নিজে কচু, কচুর শাক প্রভৃতি তৈল, লবন ও মসল্লা ছাড়াই সিদ্ধ করে খেতেন।

পারিবারিক জীবনের প্রথম অবস্থা সম্পর্কে কোন কিছু জানা যায় নাই। তবে, শ্যামপুরে এসে অনেকদিন অবস্থানের পর অত্র এলাকার মুমিনপুর গ্রামের কাযী বাড়ীর কাযী আবদুল শুকুর-এর ইয়াতীম মেয়ে আফসারুন্নিছা খাতুনকে বিয়ে করেন। তাঁর গর্ভে চারপুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। কন্যাটি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায়। জেষ্ঠ্যপুত্র সায়্যিদ আবদুস সালাম সাধারনতঃ বড় মৌলবী সাহেব নামে খ্যাত ছিলেন । তিনি একজন গরীব দরদী লোক ছিলেন। তিনি ভাটিয়াল্লপুর গিয়ে নুতন দায়রা স্থাপন করেন। প্রতি শুক্রবার তাঁর লংগরখানায় গরীব-দুঃখীদের উদ্দেশ্যে যিয়াফত দিতেন। ২য় পুত্র শাহ্ সায়্যিদ হিদায়াতুল্লাহ পিতার স্থলাভিষিক্ত হন এবং পিতার লংগরখানা চালু রাখেন। অত্যন্ত

১। মাওলানা এম, ওবাইদুল হক, বাংলাদেশের পীর আউলীয়াগণ, পৃঃ ৯৩-৯৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

বিনয়ী ও দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। ৩য় পুত্র সায়্যিদ আবদুল খালিক 'ছোট মৌলবী সাহেব' নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি নোয়াখালী জিলার মাইজদীর নিকটস্থ পদুয়ায় গিয়ে বসবাস করতে থাকেন। ৪র্থ পুত্র সায়্যিদ আবদুল জব্বার একজন প্রখ্যাত আলিম ছিলেন। তিনি চট্টগ্রামের জিলা জজ হন, কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারনে পিতার বিরাগভাজন হয়ে কালাতিপাত করে পরলোকগমন করেন।

শাহ্ যকীউদ্দিন ৯ই মাঘ, বৃহস্পতিবার ১২৬৫ বাং/১৮৫৮ ইং আসরের নামাযের সময় ইন্তিকাল করেন। পরদিন শুক্রবার তাঁকে দাফন করা হয়। [১]

১। ডঃ আবদুল কাদের, নোয়াখালীতে ইসলাম, পৃঃ ৮২-৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত মাওলানা ইমামুদ্দীন (রঃ)
(১৭৮৮ - ১৮৫৯)

ইসলামের সংস্কার ও পুনরুজ্জীবনে বাংলার মুসলমানগণ বিশেষ করে নোয়াখালী জিলার মুসলমানগণ মাওলানা ইমামুদ্দীন (রঃ) এর নিকট সর্বাধিক ঋনী। তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেছেন এ নিয়ে বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে। গোলাম সাকলায়েন তাঁর 'বাংলাদেশের সূফীসাধক' গ্রন্থে মাওলানা ইমামুদ্দীন (রঃ) সন্দ্বীপের অন্তর্গত হাজীপুর (সায়াদুল্লাহপুর) গ্রামের অধিবাসী ছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন।[১] রাজীব হুমায়ুনও তাঁকে সন্দ্বীপের অধিবাসী বলে উল্লেখ করেছেন।[২] মাওলানা আতাহার উদ্দীন মোল্লা তাঁর জন্মস্থান নোয়াখালী জিলার চৌমুহনী বন্দরের পূর্ব দক্ষিণে অবস্থিত হাজীপুর গ্রাম বলে বর্ণনা করেছেন।[৩] ডঃ আব্দুল কাদের তাঁর (ইমামুদ্দীনের) জন্মস্থান চৌমুহনী বাজারের আড়াই মাইল দক্ষিণ পূর্বদিকস্থ হাজীপুর গ্রাম বলেছেন। কিন্তু যারা তাঁকে সন্দ্বীপের অধিবাসী বলেন তিনি তাদের সাথে একমত নন।[৪] আয়না-ই-উয়াইসী-এর গ্রন্থকার মতীউর রহমান- এর মতে তিনি নোয়াখালী জেলার রৌশনাবাদ অঞ্চলের আম্বরাবাদ পরগনার হাজীপুরের অধিবাসী ছিলেন। তাঁকে যারা নোয়াখালী জেলার সুধারাম সদরের কাছে অবস্থিত সাদুল্লাহপুর গ্রামে জন্মগ্রহণকারী বলে উল্লেখ করেছেন তা সঠিক নয় বরং তিনি মূলতঃ হাজীপুর গ্রামেই জন্মগহণ করেন। পরবর্তী জীবনে অবশ্য তিনি সাদুল্লাপুরে বসতি স্থাপন করেছিলেন।[৫]

মাওলানা ইমামুদ্দীন (রঃ)-এর জন্মতারিখ নিয়েও মতভেদ রয়েছে। কোন কোন ঐতিহাসিক-এর মতে তাঁর জন্মতারিখ ১১৯১বাং কিংবা ১১৯৯বাং। আবার অনেক ঐতিহাসিকের মতে, তিনি ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। ইংরেজী সনকে সঠিক বলে ধরে নিলে তাঁর জন্মকাল ছিল ১১৯৫ বঙ্গাব্দের জৈষ্ঠ্য-আষাঢ় মাস।[৬] ডঃ আব্দুল কাদের 'নোয়াখালীতে ইসলাম' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি ৬৩ বৎসর বয়সে ১২৬২ বঙ্গাব্দে ইন্তিকাল করেন। এই হিসাব অনুযায়ী ইমামুদ্দীনের জন্মকাল ১১৯৮ বঙ্গাব্দ (১২৯১ হিঃ)।[৭] আর গোলাম সাকলায়েন তাঁর জন্ম ১১৯৫ বঙ্গাব্দ/১৭৮৮খৃষ্টাব্দ বলে উল্লেখ করেছেন।[৮] তাঁর পিতা তনুল্লা ছিলেন হাজীপুর গ্রামের সন্তান ও গরীব পরিবারের অধিবাসী। ইমামুদ্দীনের বয়স যখন ৩ বৎসর তখন তাঁর পিতা মারা যান।[৯] পিতার মৃত্যুকালে তাঁর মাতার বয়স ছিল আনুমানিক ১৮ বৎসর। এ বয়সে বৈধব্য জীবন নিরাপদ নয় বলে মনে করে তিনি উক্ত গ্রামেরই জায়গীরদার সমীরুদ্দীনের নিকট পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিবাহের পর মাতা শিশু পুত্রকে নিয়ে দ্বিতীয় স্বামীর গৃহে চলে আসেন।[১০] এখানেই শিশু ইমামুদ্দীন বি-পিতার অবজ্ঞার মধ্য দিয়ে বড় হতে

১। গোলাম সাকলায়েন, বাংলাদেশের সূফী সাধক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৮৭, পৃঃ ১২৭।
২। রাজীব হুমায়ুন, সন্দ্বীপের ইতিহাস সমাজ ও সংস্কৃতি, সন্দ্বীপ শিক্ষা ও সংস্কৃতি পরিষদ, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃঃ ২২৭।
৩। মাওলানা আতাহার উদ্দীন মোল্লা, বালাকোটের গাজী মাওলানা ইমামুদ্দীন (রঃ), প্রকাশনায় মকবুল আহমদ, নোয়াখালী সমিতি, ঢাকা, ৩৩৪/ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা - ৫, পৃঃ ৩।
৪। ডঃ আব্দুল কাদের, নোয়াখালীতে ইসলাম - ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ- ১৯৯১ পৃঃ ১০৮।
৫। মতীউর রহমান, আয়না-ই-উয়াইসী-পাটনা-১৯৭৬ ইং, পৃঃ ১২৪।
৬। এ, এম, এম আতাহার উদ্দীন মোল্লা আহমদাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩।
৭। ডঃ আব্দুল কাদের, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩।
৮। গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৭।
৯। ডঃ আব্দুল কাদের, নোয়াখালীতে ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ১৯৯১ পৃঃ ১০৮।
১০। এ, এস, এম, আতাহার উদ্দীন মোল্লা আহমদাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪।

Dhaka University Institutional Repository

থাকেন। বি-পিতার আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে তাঁকে গোচারনা করতে হয়।[১] বাল্যকাল থেকেই তিনি প্রখ্যাত 'আলিম-এ-দ্বীন হওয়ার মনোবাসনা পোষণ করতেন। এজন্য খর রৌদ্রে ঝোপের আড়ালে বসে তিনি মহৎ চিন্তায় নিমগ্ন থাকতেন।[২]

বাল্যকাল থেকেই তিনি ন্যায় পরায়ণ মন-মানসিকতা সম্পন্ন হয়ে উঠেন। গোচারনার সময় গরু কোন কারণে কারো শষ্য নষ্ট করলে তিনি তজ্জন্য মনে খুব কষ্ট অনুভব করতেন। মাঝে-মধ্যে তাঁর বি-পিতা তাকে বেত্রাঘাত করতেন, কিন্তু তিনি কখনো প্রতিবাদ করিতেন না।[৩] বি-পিতার নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে মাত্র ১০/১২ বছর বয়সে মায়ের পরামর্শে তিনি 'আলিম-এ-দ্বীন হওয়ার উদ্দেশ্যে ধীরে ধীরে ঢাকা অভিমুখে যাত্রা করেন।[৪] সারাদিন হাটতেন ও রাতে কোন এক বাড়ীতে প্রবাস যাপন করতেন। বাড়ীওয়ালা দয়া করে কিছু খাবার দিলে খেতেন, নতুবা অনাহারে রাত কাটাতেন। কখনও বা কারো কাজ করে দুপুরের আহারের ব্যবস্থা করতেন, আর আহার না পেলে দু' এক পয়সার চিড়া-মুড়ি কিনে খেতেন। এভাবে পথ চলে প্রায় একমাস পর ঢাকায় এসে পৌছেন।[৫] বাল্যকালে তিনি জনৈক মাওলানা শাহ আব্দুল আযীযের নিকট প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।[৬] ঢাকা এসে তিনি লোক মুখে ঢাকার মুহসিনিয়া মাদ্রাসায় ইসলামী শিক্ষার উত্তম ব্যবস্থার কথা শুনে খুব আনন্দিত হন।[৭] হুগলীর বিখ্যাত দানবীর হাজী মুহাম্মদ মুহসিন এর বিরাট ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির আয়ের টাকায় তদানীন্তন ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর[৮] সরকারী তত্ত্বাবধানে এই মাদ্রাসা এবং হুগলী ও চট্টগ্রামে আরও দুটি মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। এক সহৃদয় ব্যক্তি তাঁকে (ইঁমামুদ্দীন) নিজের বাড়ীতে থাকতে দেন এবং তাঁর পড়াশুনার প্রবল আগ্রহ দেখে মুহসিনিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি করে দেন।[৯]

ইমামুদ্দীন খুবই মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং লেখাপড়ায় মনোযোগী ছিলেন। কিন্তু মাদ্রাসার পাঠ্য সূচী তাঁর মনঃপূত হয়নি বলে তিনি জায়গীরদাতা ও স্বীয় শিক্ষক বৃন্দ থেকে বিদায় নিয়ে ঢাকা ছেড়ে কলিকাতার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।[১০] কলিকাতার বিদ্যুৎশাহী ধনবান ব্যক্তি মাওলানা হাফিজ জামালুদ্দিন তাঁর মুর্শিদ হযরত মাওলানা সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (রঃ) এর পরামর্শক্রমে বর্তমান সার্কুলার রোডস্থ সিন্দুরিয়া পট্টিতে একখানা মসজিদ ও খারিজী মাদ্রাসা স্থাপন করেন। মাদ্রাসায় কোম্পানী সরকারের সিলেবাস অনুযায়ী পড়ানো হত না। ধর্মীয় শিক্ষার সাথে সাথে বিপ্লবী চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠার উপযোগী মাদ্রাসার পাঠ্যসূচী প্রণয়ণ করা হয়।[১১] ইমামুদ্দীন মাদ্রাসার

১। এ, এস, এম, আতাহার উদ্দীন মোল্লা আহমদাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫।
২। এ, এস, এম, আতাহার উদ্দীন মোল্লা আহমদাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬।
৩। এ, এস, এম, আতাহার উদ্দীন মোল্লা আহমদাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬।
৪। ডঃ আব্দুল কাদের, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৮।
৫। ডঃ আব্দুল কাদের, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৮।
৬। গোলাম সাকলায়েন- বাংলাদেশের সূফী সাধক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃঃ ১২৭।
৭। এ, এস, এম, আতাহার উদ্দীন মোল্লা আহমদাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০।
৮। এ, এস, এম, আতাহার উদ্দীন মোল্লা আহমদাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০।
৯। এ, এস, এম, আতাহার উদ্দীন মোল্লা আহমদাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০।
১০। ডঃ আব্দুল কাদের, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৯-১১।
১১। এ, এস, এম, আতাহার উদ্দীন মোল্লা আহমদাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠাতার সঙ্গে সাক্ষাত করেন। তিনি ইমামুদ্দীনকে স্ব-গৃহে স্থান দেন এবং তাঁর অধ্যয়ন স্পৃহা দেখে তাঁকে মাদ্রাসায় ভর্তি করান।[১] কাঙ্খিত জ্ঞান সাধনার উদ্দেশ্যে ইমামুদ্দীন নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন।

হাজী জামালুদ্দিন তৎকালীন প্রখ্যাত সূফী-সাধক, সংস্কারক ও মুজাদ্দিদ বলে বিবেচিত সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (রঃ) এর খলীফা ছিলেন। শিরক ও বিদ্'আয়াতের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম মুসলিম সমাজে এক নবজাগরণের সৃষ্টি করে। পাঞ্জাবে শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনার উদ্দেশ্যে তিনি (বেরলভী) তার বিশ্বস্ত মুরীদদের খলিফা নিয়োগ করে নানা জায়গায় প্রেরণ করতেন। হাজী জামালুদ্দীন ছিলেন তাঁদের অন্যতম। সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (রঃ) কলিকাতা আগমন করলে হাজী জামালুদ্দীনের বাড়ীতে অবস্থান করতেন।[২]

পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি ইমামুদ্দীন আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভের আশায় ব্যাকুল হয়ে উঠেন। এ সময় সায়্যিদ আহমদ লক্ষ্ণৌ শহরে হাজী জামালুদ্দীনের বাড়ীতে আগমন করেন। ফলে, তার (ইমামুদ্দীন) সাথে তাঁর সাক্ষাত ঘটে। ইমামুদ্দীনের প্রতিভা ও সৌজন্যতায় মুগ্ধ হয়ে তিনি তাঁকে (ইমামুদ্দীন) হাজী সাহেবের নিকট থেকে রায়বেরেলতিতে নিয়ে যান।[৩] ১৬ বছর বয়সে ইমামুদ্দীন সায়্যিদ আহমদের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করে তাঁর সংস্কারমুলক কার্য তৎপরতার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন।[৪]

সায়্যিদ আহমদ বেরেলভী (রঃ) প্রায় দেড়যুগ ইমামুদ্দীনকে ফৌজী শিক্ষাসহ বিভিন্ন দ্বীনী ইলম শিক্ষা দান করেন। তিনি সায়্যিদ আহমদ সাহেবের তাহাজ্জুদ নামাযের পানির যোগান দিতেন। আনুমানিক ১৮ বৎসর পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে মুর্শিদের অনুবর্তনকরতঃ ১৮২০ সালে প্রায় ৩২ বৎসর বয়সে মাওলানা ইমামুদ্দীন স্বীয় সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন এবং আত্মপ্রতিষ্ঠা ও বৃহত্তম ত্যাগের উদ্দেশ্যে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন।[৫] বেরলভী সাহেবের প্রিয় শাগরিদ মাওলানা আব্দুল হাই ও শহীদ ইসমাইলের নিকট হতেও তিনি আধ্যাত্তিক জ্ঞান লাভ করেন।[৬]
নকশবন্দিয়া মুজাদ্দিদিয়া তরীকাহ্নুযায়ী তাঁর শাজারা নিম্নরূপ ঃ-

হযরত মুহাম্মদ (সঃ)

↕

হযরত আবু বকর (রাঃ)

↕

হযরত সালমান ফারসী (রঃ)

১। এ, এস, এম, আতাহার উদ্দীন মোল্লা আহমদাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১।
২। ডঃ আব্দুল কাদের, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৯।
৩। ডঃ আব্দুল কাদের, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৯।
৪। গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৭।
৫। এ, এস, এম, আতাহার উদ্দীন মোল্লা আহমদাবাদী, পৃঃ ১২-১৩।
৬। ডঃ আবদুল কাদের, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১০।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হযরত আবু বকর (রাঃ)

↕

হযরত ইমাম যাফর সাদিক

↕

হযরত খাজা বায়েজীদ বিস্তামী (রঃ)

↕

হযরত হাসান আসকারী (রঃ)

↕

হযরত খাজা আবু ইয়াকুব ইউসুফ হামাদানী (রঃ)

↕

হযরত আবদুল খালিক গিজদাওয়ালী (রঃ)

↕

হযরত মাওলানা আরিফ রেউগীরী (রঃ)

↕

হযরত খাজা মাহমুদ উনজির ফাগনবী (রঃ)

↕

হযরত খাজা আযিযান আলী রামিতাইনী (রঃ)

↕

হযরত খাজা মুহাম্মদ বাবাই সাম্মাসী (রঃ)

↕

হযরত সায়্যিদ আমীর কুলাল (রঃ)

↕

হযরত ইমাম বাহাউদ্দীন নক্শবন্দ (রঃ)

Dhaka University Institutional Repository

হযরত খাজা আলাউদ্দীন সাত্তার (রঃ)

↕

হযরত মাওলানা ইয়াকুব চরখী (রঃ)

↕

হযরত খাজা নাসিরুদ্দীন ওবায়দুল্লাহ আহরার (রঃ)

↕

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ যাহিদ ওয়াখশী (রঃ)

↕

হযরত মাওলানা দরবেশ মুহাম্মদ (রঃ)

↕

হযরত খাজা মুহাম্মদ আসকান্ডী (রঃ)

↕

হযরত খাজা বাকী বিল্লাহ (রঃ)

↕

হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আল্‌ফ-ই-সানি শায়েখ আহমদ ফারুকী সেরহেন্দী (রঃ)

↕

হযরত শায়খ আদম বান্নুরী (রঃ)

↕

হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবদুল্লাহ আকবারাবাদী (রঃ)

↕

হযরত মাওলানা শাহ্ আবদুর রহীম মুহাদ্দিস-ই দেহলভী (রঃ)

Dhaka University Institutional Repository

হযরত মাওলানা ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস-এ দেহলভী (রঃ)

↓

হযরত মাওলানা শাহ্ আবদুল আজীজ মুহাদ্দিস-ই দেহলভী (রঃ)

↓

হযরত মাওলানা সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (রঃ)

↓

হযরত মাওলানা ইমামুদ্দীন বাঙ্গালী সুধারামী (রঃ)।[১]

সুদীর্ঘ দুইযুগ দ্বীনী ইল্‌ম ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভের পর মাওলানা ইমামুদ্দীন মায়ের সাথে সাক্ষাত ও স্বদেশের অধঃপতিত মানুষকে হিদায়াত[২] করার উদ্দেশ্যে দেশে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি প্রার্থনা করলে তাঁর মুরশিদ তাঁকে অনুমতি দেন, তাঁকে খিলাফত প্রদান করেন এবং বলেন তোমার মাতা হজ্জব্রত পালনের ইচ্ছা পোষন করলে তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। তাঁর পীর ভাই চট্টগ্রামের সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী এ সময় খিলাফত লাভ করেন। মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী তখনও খিলাফত পাননি। ইমামুদ্দীন (১৮২০ সালে) মুরশিদের অনুমতি নিয়ে গ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এ সময় বেরলভী (রঃ) এক ঝটিকা সফরে কলিকাতা আসেন। খুব সম্ভবতঃ মাওলানা ইমামুদ্দিনও তার সংগে আসেন।[৩]

কলিকাতা হতে নোয়াখালীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত হাজীপুরের পথ ছিল বড়ই দুর্গম। বহু গ্রাম, নদ-নদী, বন-জঙ্গল, মাট-ঘাট পেরিয়ে গন্তব্যে পৌঁছতে হত। ইমামুদ্দীন মায়ের খেদমতে আসার পথে যেখানেই রাত্রি হয় সেখানেই কোন লোকালয়ে বিশ্রাম নেন।[৪] দেশ-প্রেমে উদ্বেলিত হয়ে তিনি মুসলমান সমাজের গোষ্ঠীগত বাদ বিসম্বাদ, উপজাতীয় কোন্দল, শিরক, বিদ্'আত, অনাচার, অবিচার, অশিক্ষা ও কুশিক্ষার বিরুদ্ধে হিদায়াতে তৎপর হন। তিনি দেখতে পান যে, এ দেশের উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেনীর লোক লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বদৌলতে প্রায় সর্বহারা। একটু সুযোগ পেলেই এই সর্বহারাগোষ্ঠী আক্রোশে ফেঁটে পড়বে। তারা চায় একটা বলিষ্ঠ নেতৃত্ব। মাওলানা ইমামুদ্দিন এ সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন। পথে পথে তাবলীগ করে তিনি ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে জনগণের মাঝে জিহাদী চেতনা জাগিয়ে তোলেন এবং বিভিন্ন স্থানে জেহাদী সংগঠন গড়ে তোলেন।[৫] এভাবে তিনি আপন মায়ের সন্ধানে পথ চলতে লাগলেন। এক সন্ধায় তিনি আশ্রয়ের খোঁজে রাস্তা

১। এ, এস, এম, আতাহার উদ্দীন মোল্লা আহমদাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪-২৫।
২। ডঃ আবদুল কাদের, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১০।
৩। এ, এস, এম, আতাহার উদ্দীন মোল্লা আহমদাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬।
৪। এ, এস, এম, আতাহার উদ্দীন মোল্লা আহমদাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮-১৯।
৫। এ, এস, এম, আতাহার উদ্দীন মোল্লা, আহমদাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯২।

Dhaka University Institutional Repository

দিয়ে হেটে চললেন। এমন সময় লোকজনের কাছে মসজিদের সন্ধান চান। লোকেরা তাঁকে পীয়ারীগনূজের তোরাব খাঁর মাযারের উত্তর পাড়ের বিরান মসজিদ দেখিয়ে দেয়। মসজিদটি জনমানবহীন এক ভুতুড়ে পরিবেশে ছিল। সেখানে জ্বীনদের আড্ডাখানা ছিল। ইমামুদ্দিন আযান দিয়ে সেখানে নামায আদায় করেন। পরে রাত্রে ঘটনাক্রমে দলপতিসহ জ্বীনেরা মাওলানার নিকট তওবা করে। ফলে, সেদিন হতে অত্র অঞ্চলে জ্বীনদের উৎপাত বন্ধ হয়। এ ঘটনার পর ইমামুদ্দীনের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।[১] এরপর সেখান থেকে চলে যাবার পথে সন্ধ্যায় এক পুকুর পাড়ে ওযু করে আযান দিয়ে নামায আদায় করেন। নামায শেষে চলার পথে সম্মুখে একখানা জীর্ণ কুটির দেখতে পান। ঘরে কে আছেন জানতে চাইলে এক বৃদ্ধা বের হয়ে এলেন। বৃদ্ধার নিকট রাত্রির জন্য একটু আশ্রয় প্রার্থনা করলে বৃদ্ধা তাঁকে ঘরের মাঝখানে একখানা কাপড় টাংগিয়ে এক পাশে তাঁর জন্য জায়গা করে দেন। সেখান থেকে তিনি বাড়ী বাড়ী ঘুরে জাহিল লোকদের হিদায়াত করতে লাগলেন। লোকজনের কাছে বি-পিতা ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের খোঁজ নিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে তাদের মৃত্যু হওয়ায় তাদের কোন সন্ধান পেলেন না। নিজের পরিচয় গোপন রাখায় কেউ তাকে চিনতে পারল না।[২]

কিন্তু আতাহার আলী মোল্লা তাঁর প্রণীত গ্রন্থ 'বালাকোটের গাজী মাওলানা ইমামুদ্দীন' এ উল্লেখ করেছেন যে, আশ্রয় প্রার্থীত রাত্রেই ঘরে ইবাদতে মশগুল অবস্থায় বৃদ্ধার কান্নার সুরে তার ধ্যান ভেংগে যায় কিন্তু বি-পিতা ও বৈমাত্রেয়দের খোঁজখবর নিতে পারেননি। এর পূর্বেই মাতা পুত্রের পরিচয় ঘটে। ধ্যান ভঙ্গের পর ইমামুদ্দীন বৃদ্ধার কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। বৃদ্ধা বললেন, বাবা! আমার মত দুঃখিনী এ জগতে আর কেউ নেই। আমার একটি ছেলে ছোট বেলায় ঘর ছেড়ে চলে গেছে। জানিনা সে কোথায় আছে, কেমন আছে, এখনো সে ফিরে আসেনি। জানিনা সে বেঁচে আছে কিনা। মাওলানা ছেলের নাম জানতে চাইলে বৃদ্ধা বললেন তাঁর নাম 'ই-মামুদ্দীন'। মাওলানা পর্দা সরিয়ে শায়িতা মাতার কদমবুচী করে বললেন আমিই আপনার ছেলে বেলায় হারিয়ে যাওয়া হতভাগ্য ইমামুদ্দীন। দীর্ঘ দুই যুগ পর[৩] মাতা পুত্রের সাক্ষাত হল। হারাধন পেয়ে বৃদ্ধা পুত্রকে জড়িয়ে ধরেন। পরে তিনি মাতার নিকট জানতে পারলেন যে, বি-পিতা নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেছেন। তাঁর শুধু বংশই লোপ পায়নি বরং তার সব বিলীন হয়ে গেছে।[৪] বৃদ্ধা যে বাস্তুভিটায় আছেন এটাই ইমামুদ্দীনের পিতৃপুরুষের ভিটা। বি-পিতার মৃত্যুর পর প্রবাসী ইয়াতীম সন্তানের অপেক্ষায় মাতা ইমামুদ্দীনের ভিটাতেই আশ্রয় নেন।[৫] স্বীয় মুর্শিদের অনুমতি নিয়ে মায়ের সাথে দেখা করার ও দ্বীনি ইল্‌ম প্রচারের জন্য খিলাফত নিয়ে নিজ গ্রামে পদার্পন করে মুসলমানদের মধ্যে শিরক-বিদ্'আতের ব্যাপক প্রচলন দেখতে পান। ঈষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী-এর অধীনে চাষীরা দৈন্য দশার শেষ প্রান্তে এসে পৌছেছে। খ্রীষ্টানগণ অর্থের বিনিময়ে দরিদ্র লোকদের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করতে থাকে। মুসলমানগণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে দৈন্যের শেষ পর্যায়ে পৌছতে বেশী দেরী নেই। মাওলানা এসব কিছুর পরিনাম চিন্তায় শঙ্কিত হলেন। তিনি ধর্মান্তর ব্যবস্থা রোধে ইসলামের অর্থনৈতিক করনীয়-ফিত্‌রা, যাকাত প্রদান ও দ্বীনী জনগণকে খয়রাতি সাহায্যের জন্য ধনবানদের উদ্বুদ্ধ করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

১। ডঃ আবদুল কাদের, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১১।
২। ডঃ আবদুল কাদের, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১১।
৩। এ, এস, এম, আতাহার উদ্দীন মোল্লা আহমদাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫।
৪। এ, এস,এম, আতাহার উদ্দীন মোল্লা আহমদাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫।
৫। এ, এস,এম, আতাহার উদ্দীন মোল্লা আহমদাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬-২৭।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর প্রচার কার্য জোরে শোরে শুরু হলে একদল লোক তাঁর বিরুদ্ধাচারণ করতে আরম্ভ করে। নোয়াখালী জেলার নুরপুর গ্রামে (হাজীপুর থেকে ৬/৭ মাইল দুরে) জবর আলী ফকীর নামে এক ভন্ড লোক গান-বাদ্য, কবর পুজা ইত্যাদি বিদ'আত ও শিরক কাজের মাধ্যমে মুসলমানদের গোমরাহ্ করার সংবাদ শ্রবণ করে ইমামুদ্দীন সেখানে উপস্থিত হন এবং ফকীরের লম্বা চুল কেটে দেন। অবশ্য পরে সে তওবা করে এবং আজীবন মাওলানার মহৎ কাজে সহায়তা করে এবং ১৮৫৭ সালে মক্কা মোয়াজ্জমায় ইন্তেকাল করে।[১] এর পর তিনি চট্টগ্রামে এরূপ আরেক ফকীরের অনৈসলামিক কর্মকান্ড বন্ধ করে চট্টগামে হিদায়াত, দ্বীনি শিক্ষা ও তাবলীগ কেন্দ্র স্থাপন করে নোয়াখালীতে ফিরে আসেন।[২]

প্রাচীন বিশ্বাসে ঘা পড়ায় ও ভন্ড ফকীরদের রিযুক বন্ধের উপক্রম হওয়ায় তারা দল বেঁধে কুমিল্লার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট গিয়ে নালিশ করে যে, কোথা হতে এক মৌলবী এসে ধর্মের নতুন নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে আমাদের পুরাতন রুসূম রেওয়াজ নষ্ট করে দিচ্ছে। তাদের অভিযোগ শুনে ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে তলব করেন। তিনি যথা সময়ে তাঁর এজলাসে হাজির হন। আচকান, পায়জামা-পাগড়ী পরিহিত আপাদমস্তক উজ্জ্বল চেহারা দেখেই তিনি বুঝতে পারলেন ইনি সাধারণ লোক নন। ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে সসম্মানে চেয়ারে বসিয়ে ব্যাপার জানতে চান। তাঁর জওয়াব শুনে তিনি বুঝতে পারলেন যে, তাঁর মতই ঠিক এবং তা কার্যকরী হলে দেশে অপরাধ প্রবণতা হ্রাস পাবে। কাজেই, তিনি তাঁকে একখানা অনুমতিপত্র দিয়ে বললেন, আপনি নিশ্চিন্তে আপনার সংস্কারকার্য চালিয়ে যেতে থাকেন। কোন প্রকার বিপদে পড়লে আমার নিকট আসবেন।[৩] এভাবে সংস্কারবিরোধীদের সমস্ত অপচেষ্টা বানচাল হয়ে যায় এবং মাওলানা সাহেবের আন্দোলন নির্বিবাদে এগিয়ে চলে। তিনি গ্রামে গ্রামে ঘরে হিদায়াত করতে থাকেন। ২/৩ মাস পর একবার লক্ষীপুর জিলাধীন রায়পুরা গিয়ে সেখানেও আন্দোলন চালু করেন। স্বার্থবাদী মহল ক্ষেপে গিয়ে তার প্রাণনাশের চেষ্টা করে।[৪] তিনি আল্লাহর রহমতে বেঁচে যান । তারা তওবা করে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। রহীমপুর গ্রাম নিবাসী সুদখোর পাচু পাটওয়ারীর কবর থেকে অনবরত আগুন উঠতে থাকে। তার পুত্রগণ কবরের নিকট কুর'আন শরীফ খতম করার বন্দোবস্ত করলেও আগুন কমেনি বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। একদিন হঠাৎ মাওলানা সাহেব কবরের কাছে উপস্থিত হতেই কবরের আগুন থেমে যায়। এ দেখে এলাকার সুদখোররা তওবা করে সুদ খাওয়া ছেড়ে দেয়।[৫] এভাবে তিনি ইসলামের বানী প্রচার করে শিরক-বিদ'আতে নিমজ্জিত দেশবাসীকে উদ্ধার করেন এবং খৃষ্ট-ধর্মাবলম্বীদের ষড়যন্ত্র থেকে মুসলিম সমাজকে রক্ষা করেন। মাওলানা ইমামুদ্দীন ১৮২০ সালে কলিকাতা থেকে নিজ গ্রামে প্রত্যাবর্তন করে উপমহাদেশীয় আদর্শমূলক ঐতিহ্যের সূত্রপাত ঘটান। ফলে, নোয়াখালী ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে ধর্মীয় শিক্ষা ও জিহাদী মনোভাব আলিম সমাজের মধ্যে ব্যাপকতা লাভ করে এবং অত্র অঞ্চল এশিয়ার দ্বিতীয় আরবের মর্যাদার অধিকারী হয়।[৬]

১। এ, এস, এম, আতাহার উদ্দীন মোল্লা আহমদাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮।
২। এ, এস, এম, আতাহার উদ্দীন মোল্লা আহমদাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮।
৩। ডঃ আবদুল করীম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১১।
৪। ডঃ আবদুল করীম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১২।
৫। এ, এস, এম, আতাহার উদ্দীন মোল্লা আহমদাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮-২৯।
৬। এ, এস, এম, আতাহার উদ্দীন মোল্লা আহমদাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯।
৭। এ, এস, এম, আতাহার উদ্দীন মোল্লা আহমদাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯।

Dhaka University Institutional Repository

রামগতিতে (উত্তর হাতিয়া) চাঁদ শাহ্ নামে জনৈক বুযুর্গ ব্যক্তি বাস করতেন। ধ্যানযোগে তিনি জানতে পারলেন যে, মাওলানা ইমামুদ্দীন কলিকাতা থেকে নোয়াখালীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছেন। তিনি স্বীয় জামাতা লক্ষীপুর দায়রার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা আজম শাহ্কে পত্র লেখেন যে, তরুণ মাওলানা ইমামুদ্দীন বাড়ী পৌছলে তার সংগে যেন তার ছোট কন্যার শুভ বিবাহের প্রস্তাব দেয়া হয়। যথাসময়ে তাই করা হলে ইমামুদ্দীন মাতার অনুমতি নিয়ে সে প্রস্তাব গ্রহণ করেন। আড়ম্বরহীন পরিবেশে মাত্র সাড়ে তিন টাকা দেনমোহরানায় ইমামুদ্দীনের সাথে হযরত চাঁদ শাহ্ -এর কনিষ্ঠ কন্যা আসমাতুন্নিসার শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়।[১] রাত্রে চাঁদ শাহ্ বাসর ঘরে আগুন লাগিয়ে দেন। ইমামুদ্দীন এক মুঠো বালুতে দো'আ পড়ে ফুঁদিয়ে জ্বলন্ত বেড়ার দিকে ছুড়ে মারেন, এতে আগুন নিভে যায়। কারামত পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হন।[২]

অনেক ওলি-আল্লাহ তাঁর দরবারে আসতেন। মগুরীখোলার শাহ্ আহসানউল্লাহ সাহেব কিছু দিন তাঁর খিদমতে ছিলেন। তিনি তাঁর বহু কারামতের কথা বলেগেছেন। শাহ্ ইসমাঈল শহীদ রচিত গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক সিরাতুল মুস্তাকীম পাঠ করার জন্য মওলানা কারামত আলী তাঁর গৃহে এসে প্রথমবার ১৮ দিন অবস্থান করেন এবং শেষবারে তাঁর খেলাফত গ্রহণ করেন ।[৩]

ইমামুদ্দীন পীরের নির্দেশানুযায়ী দেশে ফিরে হিদায়াতের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। ফলে, এতদঞ্চলের মুসলমানগণ শরী'আতের সঠিক পথ দেখতে পায়। তাঁর হিদায়াতের কার্য ১২২৭ বাংলা হতে আরম্ভ হয়েছিল বিধায় সেকালের মুসলমানদের ২৭শে মুসলমান বলা হয়ে থাকে। শুধু তাই নয় বর্তমান সময়ও যদি কোন মুসলমান ধর্মীয় কাজে খাঁটি ও অগ্রগামী হয় এতদ্বঞ্চলের লোক তাকে সাতাইশে মুসলমান বলে।[৪] বিবাহের পর তিনি দেশ সেবার কাজে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। একবার তিনি রায়পুর গমন করে সেখানেও তিনি হিদায়াত, দ্বীনী তা'লীম ও জিহাদী চেতনা প্রচারের সুবন্দোবস্ত করে নিজ বাড়ীতে ফিরে আসেন। তাঁর মায়ের শরীর দুর্বলহেতু তিনি হজ্জ করতে পারবেন না বলে মাওলানা একাই হজ্জ্ব যাত্রার উদ্দেশ্যে কলিকাতা গিয়ে মুরশিদের অবস্থান কেন্দ্রে গিয়ে তাঁর সাথে মিলিত হন।[৫]

শতাব্দীর রেঁনেসার নায়ক শাহ্ সায়্যিদ আহমদ বেরলভী পাক ভারতের মুসলমানদের পুনর্জাগরণের বাণী প্রচার করেন। তিনি তাঁর সঙ্গী সাথীদের নিয়ে ১৮২১ থেকে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনবার হজ্জব্রত পালন করেন।[৬] মাওলানা ইমামুদ্দীন সায়্যিদ আহমদ বেরেলভীর একজন অনুরক্ত ভক্ত ও খলীফা ছিলেন। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মে তিনি স্বীয় মুরশিদের সাথে বালাকোটের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। দূর্ভাগ্যবশতঃ যুদ্ধে মুজাহিদ বাহিনীর অবস্থানের খবর ফাঁস করে দেয়ার কারণেই এ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় ঘটে। এই বালাকোটেই হযরত সায়্যিদ আহমদ

১। ডঃ আবদুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৩।

২। ডঃ আবদুল কাদের, প্রাগুক্ত,পৃঃ ১১৩।

৩। এম, ওবায়দুল হক, বাংলাদেশের পীর আওলিয়াগণ, রশিদ এ্যান্ড ব্রাদার্স, হাবিবিয়া লাইব্রেরী, ফেনী, নোয়াখালী ১৯৮১ইং, পৃঃ ১৭৫ - ১৭৬।

৪। এম, ওবায়দুল হক, পৃঃ ১৭৫।

৫। এ, এস, এম, আতাহার উদ্দীন মোল্লা আহমদাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩।

৬। এ, এস,এম, আতাহার উদ্দীন মোল্লা আহমদাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

বেরেলভী ও মাওলানা ইসমাঈল দেহলভীসহ আরো অনেকে শাহাদাৎ বরণ করেন। এ যুদ্ধে মাওলানা ইমামুদ্দীনের দু'টি দাঁত আল্লাহর রাহে শহীদ হয়। এ কারণে তিনি অবশ্য গর্বিত ছিলেন। যুদ্ধ শেষ হলে মাওলানা ইমামুদ্দীন রায়বেরেলীতে স্বীয় মুরর্শিদের জন্মভূমি যিয়ারত করে দেশে ফেরেন।[১]

সায়্যিদ আহমদের ইন্তিকালের পর তাঁর আন্দোলন এ দেশে কিছু দিনের জন্য তীব্রতা হারায়, কিন্তু মুছে যায়নি। বরং তাঁর যোগ্য খলিফাগণ তাঁর মহান আদর্শ সামনে রেখে পাক-ভারতে আন্দোলন চালিয়ে যান। প্রকৃত প্রস্তাবে বালাকোটের সংঘর্ষের পর থেকে মাওলানা বেলায়েত আলী ও মাওলানা এনায়েত আলী রাজশাহী ও মালদহ জেলাতে, মাওলানা কারামত আলী, মাওলানা ইমামুদ্দীন ও মাওলানা নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী এ দেশে সংস্কার আন্দোলন পরিচালনা ও এর প্রচার কার্য চালান। মাওলানা কারামত আলী প্রায় সমগ্র বাংলাদেশে, মাওলানা নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী চট্টগ্রাম অঞ্চলে এবং মাওলানা ইমামুদ্দীন নোয়াখালী অঞ্চলে ইসলামের প্রচার-প্রসার ও সংস্কার আন্দোলনে কাজ চালিয়ে যান। মাওলানা ইমামুদ্দীন (রঃ) সম্ভবতঃ ১৮৩১ সালের শেষের দিকে ৪৩ বৎসর বয়সে নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। তাঁর ভাঙ্গা দাঁত গুপ্তচরদের সন্দেহের উদ্রেক করতে পারে এ আশংকায় তিনি গোপনে তাবলীগ করেন।[২] সৌভাগ্যবশতঃ ইমামুদ্দীনের নিজ পরগণার কোম্পানী সরকারের মালিক মুক্তার দারোগা সাবের খাঁ মাওলানার প্রিয়তম শিষ্য, পরহেজগার দানশীল ও মহানুভব ব্যক্তি ছিলেন।[৩] তিনি ছিলেন নোয়াখালীর বিখ্যাত দারোগা বাড়ীর প্রতিষ্ঠাতা। নিমক মহলের দারোগাগিরি করে তিনি অনেক টাকা উপার্জন করেন এবং ভুলুয়া জমিদারীর সাত পয়সার অংশ ক্রয় করে জমিদার হন।[৪]

বাল্যকালে মাওলানা বি-পিতার গৃহ ত্যাগ করেন। অতঃপর ধর্মজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান ও আধ্যাত্ম জ্ঞান লাভ করে দেশে ফিরে অত্যন্ত পান্ডিত্যপূর্ণ ভাষায় বক্তৃতার মাধ্যমে ইসলাম প্রচার করতেন। এতদউদ্দেশ্যে একখানা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার জন্য সাবের খাঁ বার্ষিক তেইশ হাজার টাকা দিয়ে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। যেহেতু তিনি কোম্পানীর দারোগা, সেহেতু কোম্পানীর সিলেবাস অনুযায়ী মাদ্রাসার পাঠ্য সূচী হবে। তা না হলে মনজুরী পাওয়া যাবে না। তাই মাওলানা প্রতি বৎসর ছয়জন মেধবী ছাত্রকে ইসলামী শিক্ষার সর্বোচ্চ সনদ লাভের জন্য দেওবন্দ পাঠাতে হবে এ শর্তে রাজী হলেন।[৫] দারোগা সাহেব তাতেই সায় দিয়ে বললেন মাদ্রাসার পাঠ্যসূচী কোম্পানীর সিলেবাস অনুযায়ী দেখানো হবে। আর আমাদের যোগ্যলোক তৈরী করার মত জ্ঞান শিক্ষার্থীদের দেয়া হবে। সেখানে (দেওবন্দ) নোয়াখালীর মাদ্রাসার ছাত্রদের মধ্য থেকে প্রতিবছর মেধাবী ছয়জনকে পড়ানোর সু ব্যবস্থা করা হল। তাদের প্রচেষ্টায় নোয়াখালীর বিভিন্ন জায়গায় অনেক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। নোয়াখালী জিলার মুসলিম অধিবাসীগণ জিলার শিক্ষা বিস্তারে শরীক হয়ে যে অবদান রাখে তার প্রণেতা ও উদ্যোক্তা স্বয়ং মাওলানা এবং আর্থিক সাহায্যকারী দারোগা সাবের খাঁ ছিলেন।[৬] তিনি মাওলানা সাহেবকে মাইজদীর চার মাইল পূর্বদিকস্থ সাদুল্লাহপুরে এক দ্রোন জমিসহ একটি ছাড়া বাড়ী নিষ্কর দান করেন এবং একটি দালান ও হাওলীর প্রাচীর নির্মাণ করে দেন। এই বাড়ী দান পেয়ে মাওলানা সাহেব হাজীপুর হতে এখানে চলে আসেন।

১। এ, এস, এম, আতাহার উদ্দীন মোল্লা আহমদাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৯।
২। গোলাম সাকলায়েন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২৮।
৩। এ, এস, এম, আতাহার উদ্দীন মোল্লা আহমদাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪১।
৪। এ, এস, এম, আতাহার উদ্দীন মোল্লা আহমদাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪১।
৫। ডঃ আবদুল কাদের, প্রাগুক্ত, ১১৩।
৬। এ, এস, এম, আতাহার উদ্দীন মোল্লা আহমদাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

১২৭৩ বঙ্গাব্দে দারোগা সাহেব তাঁকে একটি তালুক ওয়াক্ফ করে দেন। এ ছাড়া যখনই তিনি তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে আসতেন তখনই তাকে একটি মোহর নজরানা দিতেন।[১] মাওলানা গ্রামবাসীর অনুরোধে হাজীপুর থেকে সাদুল্লাহপুর এসে বসতি স্থাপন করেন। মাওলানা সাহেবের বংশধরগণ সাদুল্লাপুরে দেড় শত বছর ধরে আছে কিন্তু এখনও তা সরকারী বাড়ী বলেই খ্যাত।

১৮৪০ এর দশকে মীরেরসরাই ও সীতাকুন্ডে দারাইল্যা গোত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ হলে চট্টগ্রাম বাসীদের সাথে তাদের বিরোধ বাধে। মাওলানা ইমামুদ্দীনের হস্তক্ষেপের ফলে দারাইল্যাগোত্র ও চট্টগ্রাম বাসীদের মধ্যে কিছুটা সদ্ভাব ও মেলা মেশার সূচনা হয়।

মাওলানা ইমামুদ্দীন ১৮৫৮ সালে পবিত্র হজ্জব্রত পালন উপলক্ষে মক্কা শরীফ গমন করেন। মক্কায় তিনি সহীহ্ সালামতে হজ্জ সমাপনান্তে দেশে ফেরার উদ্দেশ্যে জাহাজ যোগে মক্কা ত্যাগ করেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, এ মহান সাধক পথিমধ্যে জাহাজেই কলেরায় আক্রান্ত হয়ে ১৮৫৯ সালে ইন্তিকাল করেন।[২] তিনি কাফনের কাপড় সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর লাশ দাফনান্তে সাগরে ভাসিয়ে দেয়া হয়। শ্বেতবাস পরিহিত চারজন লোক তা নিয়ে নীচের দিকে নেমে যেতে দেখা যায়। অচিরেই সেখানে একটি চর জেগে উঠে। তাঁর মৃত্যুস্থান শুকতারা সংলগ্ন এই চরটি 'চর ইমামিয়া' নামে পরিচিত হয়। কিন্তু তাঁর কবর সনাক্ত করা যায়নি।[৩] অনুসন্ধানে জানা যায় যে, আরব সাগরের উপকূলে শুকতারা নামে কোন নদী কিংবা 'চর ইমামিয়া' নামে কোন দ্বীপ নেই। তবে মাইজদির ২০/২২ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে (মতান্তরে ১০/১২ মাইল পূর্বে) চর ইমামুদ্দীন নামে একটা চর আছে। খুব সম্ভবতঃ এখানেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। অবশ্য তাঁর পবিত্র স্মৃতি রক্ষার্থেও চরটির এই নাম হতে পারে।[৪]

তাঁর কোন পুত্র সন্তান ছিল না। মুসাম্মাৎ আবিদা খাতুন, মুসাম্মাৎ হামিদা খাতুন ও মুসাম্মাৎ বদরুন্নেছা নামে তাঁর তিন কন্যা ছিল। দুই কন্যাকে বিয়ে দিয়ে দুই জামাতা ঘরে আনেন। নবী করীম (সঃ)-এর ন্যায় দৌহিত্রের মারফতেই তাঁর বংশ রক্ষা পায়। তৃতীয় কন্যাকে তালতলী দাগনভূঁইয়া (ফাজিলপুর) নিবাসী মুনাওয়ার আলী চৌধুরীর সংগে বিয়ে দেন। কিন্তু অকালে তার মৃত্যু ঘটে।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী, নিরহংকার ও নম্রস্বভাবের লোক এবং শরী'আতের একান্ত পাবন্দ ছিলেন। তাঁর কোন প্রকার অর্থ লিপ্সা ছিলনা। তিনি সাদা-সিদা জামা কাপড় পড়তেন, সরল জীবন যাপন করতেন। তিনি জীবনে ১২ বার হজ্জ করেছেন বলে জানা যায়।[৫]

হজ্জে যাবার কালে তিনি বড় জামাতা মাহমুদ আলীকে যোগ্যতাবোধে খিলাফত দিয়ে যান। তিনি ও তাঁর পুত্র মাওলানা আব্দুল আযীয মরহুমের কার্য চালু রাখেন। তৎপরে এই বংশে আর কোন উপযুক্ত আলিমের জন্ম হয়নি।

১। এ, এস, এম, আতাহার উদ্দীন মোল্লা আহমদাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৫।
২। এ, এস, এম, আতাহার উদ্দীন মোল্লা আহমদাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৫।
৩। এ, এস, এম, আতাহার উদ্দীন মোল্লা আহমদাবাদী, প্রাগুক্ত , পৃঃ ৪৭।
৪। রাজীব হুমায়ুন, সন্দ্বীপের ইতিহাস সমাজ ও সংস্কৃতি, সন্দ্বীপশিক্ষা ও সংস্কৃতি পরিষদ, ঢাকা, ১৯৮৭ ইং, পৃঃ ২২৭।
৫। গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৯।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা ফয়যুল্লাহ

তিনি মাওলানা ইমামুদ্দীনের (১৭৮৮-১৮৫৮) খলীফা ছিলেন। প্রথম জীবনে সন্দ্বীপে বসবাস করতেন। অতঃপর বামনী গ্রামে এসে বসবাস করতে থাকেন। সেখানে তাঁর উপর অহেতুক অত্যাচার হতে থাকায় রায়পুরায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন।[১]

সূফী 'আলীমুদ্দীন

তিনি মাওলানা ইমামুদ্দীনের (১৭৮৮-১৮৫৮) খলীফা ছিলেন। বিলুপ্ত নোয়াখালী শহরের ৮ মাইল পূর্বদিকে তল্লাখালী গ্রামে তাঁর মাযার অবস্থিত। তিনি অত্যন্ত কামিল লোক ছিলেন। তাঁর থেকে বহু কারামত প্রকাশিত হয়।[২]

মাওলানা 'আবদুল্লাহ

তিনি মাওলানা ইমামুদ্দীনের (১৭৮৮-১৮৫৮) খলীফা ও কাশ্‌ফ শক্তিসম্পন্ন ওলী ছিলেন। তিনি প্রায়ই মাজযুব অবস্থায় থাকতেন। নোয়াখালী শহরের সাথে অবস্থিত তাঁর মাযার নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।[৩]

চাঁদ শাহ্ ফকীর

তাঁর জন্ম - মৃত্যুকাল সম্পর্কে কোন তথ্য জানা যায় নাই। তবে তিনি যে ১৭৫৭-১৮৫৭ সময়ের মধ্যবর্তীকালের একজন সূফী সাধক ছিলেন এতে কোন সন্দেহ নেই। কেননা, মাওলানা ইমামুদ্দীন (১৭৮৮-১৮৫৮) ও শাহ্ আযীম (মৃঃ ১৮৫৮) তাঁর দু'কন্যার জামাতা ছিলেন। হাতিয়ার চর রমিজে তাঁর আস্তানা ছিল। তাঁর দু'কন্যা ও চার পুত্র ছিল।[৪]

মৌলবী মুহাম্মদ ছমী

মৌলবী মুহাম্মদ ছমী হযরত মাওলানা ইমামুদ্দীন-এর জামাতা ছিলেন। মাওলানা ইমামুদ্দীন ইন্তিকালের পর তিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। এ ছাড়া তাঁর সম্পর্কে আর কিছু জানা যায় নাই।[৫]

১। ডঃ আবদুল কাদের, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৯।
২। ডঃ আবদুল কাদের, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৯।
৩। ডঃ আবদুল কাদের, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৮।
৪। ডঃ আবদুল কাদের, নোয়াখালীতে ইসলাম, পৃঃ ১১৬।
৫। মাওলানা এম, ওবাইদুল হক, বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ, পৃঃ ২৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা সায়্যিদ গাদা হাসান আল হুসাইনী (রঃ)

(মৃঃ ১৮৬৫ - ১৮৭১ইং)

মাওলানা সায়্যিদ গাদা হাসান আল হুসাইনী চট্টগ্রাম জিলার অধিবাসী ছিলেন। তাঁর জন্ম তারিখ, সন ও স্থান সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। তিনি তাঁর সময়ে বাংলার পুর্বাঞ্চলের প্রায় সকলের উস্তাদ ও শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ছিলেন। জনসাধারন, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ তাঁকে অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করত। তৎকালে তাঁকে 'শায়খুশ্ শুয়ুখ' অর্থাৎ সকলের মুরশিদ বা পথিকৃৎ বলা হত।[১] তিনি লক্ষ্ণৌ শহরে শিক্ষালাভ করেন। লক্ষ্ণৌর নিজামিয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ও দরসে নিযামিয়া পদ্ধতির প্রণয়নকারী মাওলানা নিজামুদ্দীন (মৃঃ ১৭৪৮খৃঃ) ও তাঁর পুত্র তদানীন্তন ভারত উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ আলিম ও বাহরুল উলুম (বিদ্যাসাগর) মাওলানা 'আবদুল 'আলী (মৃঃ ১৮২০খৃঃ) -এর অন্যতম শিষ্য ছিলেন। চট্টগ্রামে তাঁর নিজস্ব মাদ্রাসা ও খানকাহ্ ছিল।[২] তিনি চট্টগ্রাম জেলার একজন বড় বুযুর্গ ও স্বাধীনচেতা লোক ছিলেন। আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করতেন, আল্লাহর দেওয়া রিযকের উপর ভরসা করতেন। আমীর-ফকীর প্রশাসক কারো নিকট তিনি যেতেন না এবং নিজ অভাব অভিযোগের কথা কারো কাছে প্রকাশ করতেন না। তবে, কেবল মাত্র শায়খ মুহাম্মদ আনীসের কাছে যাতায়াত করতেন এবং তাঁর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতেন। কেননা, তিনি (শায়খ মুহাম্মদ আনীস) যাহেরী ও বাতেনী ইল্ম-এ কামিল ও একজন বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। মুহাম্মদ আকবর আলী দারোগার পুত্র মৌলভী আবদুল্লাহ এবং আদালতের কাযী ও পরে সদর আমীন ফৌজদার ইসমাতুল্লাহর বিশেষ সঙ্গতি ও প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। তা সত্ত্বেও তারা সায়্যিদ গাদা হাসানের সাহচর্যে ধন্য হতেন এবং তাঁর শিষ্যত্ব লাভ করাকে বড় গৌরবের বস্তু মনে করতেন। বাংলার পূর্বাঞ্চলের ছাত্র-শিক্ষক সকলে তাঁর নিকট সমবেত হতেন। অনেক দূর-দূরান্তর থেকে লোক তাঁর খিদমতে এসে উপকৃত হত।[৩] তিনি কখনও কারও মুখাপেক্ষী হননি। কথিত আছে যে, ১৭৬৫ ইং শাহ্ আলম কর্তৃক বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাতে সমর্পন করা হয়। কোম্পানী আমলের সূচনা লগ্নে ইংরেজ অফিসাররা স্থানীয় বুযুর্গ তথা শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তিবর্গের মন রক্ষার চেষ্টা করতেন। সে সময়কার 'বড় সাহেব বলে কথিত জনৈক অফিসার' একবার সায়্যিদ গাদা হাসানের সাক্ষাতে আসেন এবং অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাঁর খানকাহ্র সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকেন, কিন্তু তিনি খানকাহ্ থেকে বের হয়ে 'বড় সাহেবের' সাথে সাক্ষাত করলেন না এবং তাঁর কোন মুরীদ তাকে বসার জন্য অনুরোধ করলেন না। অবশেষে 'বড় সাহেব' ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে গেলেন। শাসক ও প্রশাসকদের তিনি হেয় চক্ষে দেখতেন। আরও কথিত আছে যে, একদা 'বড় সাহেব' ঘোড়ায় চড়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। গতানুগতিকভাবে তার ঘোড়া সায়্যিদ গাদা হাসানের সামনে এসে পড়লে তিনি 'বড় সাহেবকে' দেখামাত্র ঘৃনাভরে গলিতে ঢুকে আত্মগোপন করেন। তিনি 'বড় সাহেবের' ঘোড়ার দিকেও তাকালেন না।[৪]

তিনি ১৮৬৫ ও ১৮৭১ সনের মধ্যবর্তী কোন এক সময় ইন্তিকাল করেন।

১। খান বাহাদুর হামীদুল্লাহ্, আহাদীসুল খাওয়ানীন, পৃঃ ১৮৪; ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ, পৃঃ ১১৭; মাওলানা এম, ওবাইদুল হক, বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ, পৃঃ ২৪৪।

২। খান বাহাদুর হামীদুল্লাহ্, আহাদীসুল খাওয়ানীন, পৃঃ ১৮৪; ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্,, বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ, পৃঃ ১১৭।

৩। খান বাহাদুর হামীদুল্লাহ্, আহাদীসুল খাওয়ানীন, পৃঃ ১৮৮, ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্,, বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ, পৃঃ ১১৭; মাওলানা এম, ওবাইদুল হক, বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ, পৃঃ ২৪৪।

৪। অফিসারের আসল নাম ছিল হেরী ভেরলস্ট। তিনি ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর চট্টগ্রামস্থ চীফ ছিলেন।

৫। খান বাহাদুর হামীদুল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮৪-১৮৮; ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ ১১৭-১১৮; মাওলানা এম, ওবাইদুল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪৪-৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

১৭.

মাওলানা মুসলিহ্ উদ্দীন
(মৃঃ - ১৮৯৯ ইং)

মাওলানা মুসলিহ উদ্দীন উপমহাদেশের একজন প্রখ্যাত 'আলিম, ফিক্হবিদ ও ধর্মপ্রচারক ছিলেন। তাঁর পিতার নাম মাওলানা রজব আলী। তিনি জৌনপুরে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই বড় হন। কিছুকাল নিজ এলাকায় পড়াশুনা করেন। তৎপর চাচা মাওলানা কারামত আলী (১৮০০-১৮৭৩)-এর সংস্পর্শে আসেন, ঘনিষ্ঠ সহচর হিসাবে তাঁর খিদমত করেন, তাঁর হাতে বায়আত হন, তাঁর নিকট থেকে খিলাফত প্রাপ্ত হন এবং তাঁর সাথে তাবলীগ করেন। তাঁর মৃত্যুর (১৮৭৩) পর বাংলায় বিশেষত নোয়াখালী, সন্দ্বীপ, ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, পাবনা, চট্টগ্রাম, রংপুর, দিনাজপুর, মালদহ, আসামের ধুবড়ী গোয়ালপাড়া, বার্মার আরাকান প্রভৃতি স্থানে ইসলাম প্রচার করেন।[১] তিনি মাওলানা কারামত আলীর ভাতিজা ছিলেন। কারামত আলীর মৃত্যুর পর তিনি তাঁর পরিবারের তত্ত্বাবধান করেন। মাওলানা আবদুল আউয়াল জৌনপুরী (রঃ) তাঁর কাছেই লালিত পালিত হন এবং তাঁরই বদৌলতে লক্ষ্ণৌ ও পবিত্র মক্কায় উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন।

১৩০৬ হিজরী মুতাবিক ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে মাওলানা মুসলিহ উদ্দীন পাবনায় ইন্তিকাল করেন এবং তথায় তাঁকে দাফন করা হয়।[২]

১। আবদুল আউয়াল জৌনপুরী, মুফীদুল মুফতী, পৃঃ ১৪২-৪৩; আবদুল হাই লখনৌবী, নুযহাতুল খাওয়াতির ৮ম খন্ড, পৃঃ ৪৭৬; ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, মাওলানা আবদুল আউয়াল জৌনপুরী (রঃ), পৃঃ ১৩।

২। মাওলানা আবদুল বাতেন, মাওলানা হাফেয আহমদ জৌনপুরী, পৃঃ ২৫; ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

শাহ্ আহ্সান উল্লাহ্

(১৭৯৮-১৯২৬)

'মগুরী খোলার শাহ্ সাহেব নামে' পরিচিত শাহ্ আহ্সান উল্লাহ্ একজন উচ্চ স্তরের আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী কামিল মুরশিদ, আবিদ ও বিশিষ্ট ধর্ম প্রচারক ছিলেন। তবে তিনি সংসার ত্যাগী ছিলেন না।

শাহ্ আহ্সান উল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জ জেলার অন্তর্গত আড়াই হাজার থানাধীন টেটিয়া নামক একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে বাংলা ১২০৫ সনের (১৭৯৮ খৃঃ) ভাদ্র মাসের শেষ জুম'আ রাত্রির শেষ ভাগে জন্মগ্রহণ করেন। বিধবা দাদী তার নাম রাখেন 'আহ্সান'। তাঁর লকব ছিল 'হযরত কেবলা', আর কুনিয়াত ছিল 'দরবেশ মিয়া'। তাঁর পিতার নাম নূর মুহাম্মদ ওরফে 'ঠাকুর মোল্লা'। নূর মুহাম্মদ টেটিয়ার চর এলাকায় জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে গ্রামের ছেলে মেয়েদেরকে অংক, বাংলা, আরবী ও ফার্সী ভাষা শিক্ষা দিতেন। তাই, উক্ত এলাকার সকলেই তাঁকে ভক্তি - শ্রদ্ধা করত। শুধু মুসলমানগণই নয়, হিন্দুগণও তাঁর কোমলতা ও পরোপকারিতা দেখে তাঁকে 'ঠাকুর মোল্লাজি' এবং তাঁর স্ত্রীকে 'ঠাকুর মা' বলে ডাকত। শাহ্ আহ্সান উল্লাহ্র দাদার নাম ছিল হযরত শাহ্ রফিউদ্দিন। তাঁর পূর্ব পুরুষের বসতি ছিল দিল্লীতে। সেখান থেকেই তাঁরা প্রথমে বাংলাদেশের সোনারগাঁও এসে বসতি স্থাপন করেন।[৫] তাঁর উর্ধ্বতন পূর্ব পুরুষ শাহ্ নওজোয়ান হযরত শাহ্জালাল (রঃ) (মৃঃ ১৩৪৬ খৃঃ) এর ইসলাম প্রচার কাজে যোগদানের উদ্দেশ্যে তাঁর বন্ধু বাবা আদম শহীদের সাথে এলাহাবাদ থেকে সিলেটে আসেন। তাঁরা ছিলেন মূলত মক্কার অধিবাসী প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর (রাঃ) এর বংশধর। ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে তাঁরা ভারতে এসে দিল্লীতে বসবাস শুরু করেন, পরে বাংলাদেশে আসেন।[৬]

শাহ্ আহ্সান উল্লাহ্র মৃত্যু দিবস উপলক্ষে ঢাকার একজন সাংবাদিক তাঁর প্রতিবেদনে শাহ্ সাহেবের বংশ পরিচয় দিতে গিয়ে বলেনঃ *"His holiness was a descendant of Hazrat Abu Bakar Siddique the first Khalifa of Islam. It is said that a fore father of this family , who was himself a devotee of the first rank. Left Mecca for India with Hazrat Baba Adam, in order to propagate Islam. After residing at Delhi for some time he came to Sonargaon and began to preach Islam."*[৭]

শাহ্ নওজোয়ান দেখতে পেলেন যে, অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর মিশনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে না। তাই, তিনি সোনারগাঁও-এ বিয়ে করে বসতি স্থাপন করেন ও এখানে ইসলাম প্রচার ও মক্তব - মাদ্রাসা স্থাপন করেন। তিনিই হলেন শাহ্-আহ্সান উল্লাহ্র বাংলাদেশীয় প্রথম পূর্ব পুরুষ। আহ্সান উল্লাহ্র পিতা শাহ্ নূর মুহাম্মদ ওরফে

১। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, ঢাকার কয়েকজন মুসলিম সুধী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৯১, পৃঃ ৩০১।

২। এ, এফ, এম, আব্দুল মজিদ রুশদী হযরত কেবলা ঢাকা আওলাদে রুশদী, পৃঃ ৯।

৩। এ, এফ, এম, আব্দুল মজিদ রুশদী, প্রাগুক্ত পৃঃ ৯।

৪। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, পূর্বোক্ত,পৃঃ ৩০৩; এ, এফ, এম, আব্দুল মজিদ রুশদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯।

৫। গোলাম সাকলায়েন বাংলাদেশের সূফী সাধক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭, পৃঃ ১৪৯।

৬। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০২, এ, এফ, এম, আব্দুল মজিদ রুশদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২।

৭। এ ,এফ এম, আবদুল মজিদ রুশদী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭৪; ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, প্রাগুক্ত,; পৃঃ ৩০৩।

Dhaka University Institutional Repository

'ঠাকুর মোল্লা' শাহ্ নওজোয়ানেরই অধঃস্তন পুরুষ। তিনি সোনারগাঁও থেকে এসে পরবর্তী সময়ে উক্ত টেটিয়া নামক স্থানে বসতি স্থাপন করেন।[১] জন্মের ছয় বছর পর শাহ্ আহ্সান উল্লাহ্ তাঁর মাতাকে হারান। এর দু বছর পর (১২১৩ বাং /১৮০৬ খৃঃ) তাঁর পিতাও ইহধাম ত্যাগ করেন। তখন আট বছরের শিশু শাহ্ আহ্সান উল্লাহ-র লালন পালনের ভার তাঁর বিধবা দাদী ও ফুফুর উপর অর্পিত হয়।[২] বাল্যকাল থেকেই তিনি ভাবুক প্রকৃতির ছিলেন। তাঁর সুমধুর ব্যবহারের জন্য পাড়ার ছেলেমেয়েদের কাছে অতি আদরণীয় ছিলেন।[৩]

পিতার ইন্তিকালের তিন বৎসর পর তাঁর পিতামহের মৃত্যু হয়। দাদীর অবর্তমানে তাঁর লালনপালনের দায়িত্ব পড়ে ফুফু ও চাচার উপর। ফুফু তাঁকে সন্তানের ন্যায় আদর সোহাগ করলেও চাচা সম্পত্তির লোভে তাঁকে কষ্ট দিতেন। শাহ্ আহ্সান উল্লাহ্ চাচার ইচ্ছানুযায়ী তাঁর সমুদয় সম্পত্তি চাচাকে দান করে দেশ ত্যাগ করেন এবং এর প্রায় ৪৫ বৎসর পর ঢাকা শহরের ১২ মাইল দূরে সাভার থানাধীন মন্তরীখোলা গ্রামে গিয়ে বসতবাড়ী, মক্তব ও মাদ্রাসা স্থাপন করে তথায় বসবাস করতে থাকেন।[৪]

শাহ্ আহ্সান উল্লাহ্, পিতামাতা ও ফুফুর নিকটই প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেছিলেন। ১৩ বছর বয়সে শাহ্ সাহেব চাচার সংগে মামার সাথে সাক্ষাত করতে ঢাকায় আসেন এবং তথায় সাত বছর তিনি আরবী ও ফার্সী শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর মামা সৈয়দ উবায়দুল্লাহ (মৃঃ ১৯৩৫)-এর পিতা শাহ্ হাফিজুল্লাহ্ (মৃঃ ১৮৯৬)-তাঁর গৃহ শিক্ষক ছিলেন।[৫] শাহ্ সাহেবের হস্তাক্ষর সুন্দর ছিল। তিনি পবিত্র কুর'আন-এর পান্ডুলিপি তৈরি করে তা হতে অর্জিত অর্থে শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ করতেন।[৬] তাঁর চাচার আর্থিক অবস্থা মোটেই স্বচ্ছল ছিল না বিধায় চাচা তাঁকে দিয়ে কৃষি কাজ করাতেন এবং প্রায়শই ক্ষেত খামারে কাজ করার জন্য পীড়াপীড়ি করতেন।[৭] তাই, তিনি অনেক কষ্ট করে জায়গীর থেকে জায়গীর বাড়ীওয়ালার কৃষি কার্য করে, মাটি কেটে, মাছ ধরে ইত্যাদি দৈহিক পরিশ্রম করে পড়াশোনা করতেন।[৮]

শাহ্ সাহেবের স্মরণ-শক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও প্রখর ছিল। ৩২ বছর বয়সে ১২৩৭ বাংলা (খৃঃ ১৮৩০) ঢাকার সুজাতপুরের মাওলানা নিজামুদ্দীনের নিকট তাফসীর ও হাদীস শিক্ষা আরম্ভ করেন। তিন বৎসর যাবত হাতে লিখে সিহাহ সিত্তাসহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ- সমূহ ও তাফসীর-ই ইবনে আব্বাস, তাফ্সীর-ই বায়হাকী ও তাফ্সীর-ই ইবনে জারীর আত্তাবারী ইত্যাদি অধ্যয়ন করেন। তাঁর লিখিত গ্রন্থসমূহ তাঁর বাড়ীর নিজ কুতুব খানায় এখনও বিদ্যমান আছে।[৯]

১। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০৩।
২। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩০৩; এ ,এফ এম, আবদুল মজিদ রুশদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১; গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫০।
৩। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০৩; ।
৪। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০৩-৪; এ ,এফ এম, আবদুল মজিদ রুশদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২ । গোলাম সাকলায়েন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫০।
৫। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০৫; এ ,এফ এম, আবদুল মজিদ রুশদী, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৩।
৬। এ ,এফ এম, আবদুল মজিদ রুশদী, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৩।
৭। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, প্রাগুক্ত,; পৃঃ ৩০৪।
৮। এ ,এফ এম, আবদুল মজিদ রুশদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩।
৯। এ ,এফ এম, আবদুল মজিদ রুশদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪।

Dhaka University Institutional Repository

হাদীস শিক্ষা লাভ করার পর শাহ্ সাহেব আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভ করতে আগ্রহী হন এবং তাঁর নানীর নিকট আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রথম সবক গ্রহন করেন। কালেমা তাইয়্যেবার যিক্র-আযকার দ্বারা ছয় লতিফাকে আয়ত্ব করার শিক্ষাও তাঁর নিকটই লাভ করেছিলেন। নানীর ইন্তিকালের পর তাঁর নানা (মায়ের চাচা) হযরত শাহ পীর মুহাম্মদ সাহেবের নিকট নানা প্রকার যিক্র আয্কার ও দু'আ শিখতেন[১]। সাত বৎসর যাবত 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ্'-এর সবক লাভ করার পর 'মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্'-এর সবক শিক্ষা গ্রহণ করেন। কালেমা তাইয়্যেবার আমলকে নিজ আয়ত্বে আনার জন্য সুদীর্ঘ ২০ থেকে ৩০ বৎসর পর্যন্ত সময় ব্যয় করেন এবং কালেমা তাইয়্যেবার নমুনায় নিজেকে গড়ে তোলেন।[২] শাহ্ সাহেব ৩৩ বছর বয়সে ১২৩৮ বাং (১৮৩১ খৃঃ) হাদীস শিক্ষা শেষ করার পর তাঁর নানা তাঁকে আরও কঠোর সাধনা ও হজ্জ ব্রত পালন করার এবং বিয়ে না করার উপদেশ দেন।[৩]

শাহ্ সাহেব ৩৪ বৎসর বয়সে নানার আদেশে হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ রওয়ানা হন।[৪] হজ্জব্রত পালনশেষে মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তণের পথে বাগদাদে অনেক ওলী-আওলিয়ার মাযার যিয়ারত করেন। বাগদাদ থেকে তুরস্কে যান ও মাওলানা রুমীর (১৭৯২-১৮৫৫) মাযারে ৭ মাস অবস্থান করেন এবং মাযারের প্রতিবেশী ও মুসাফিরদের পানি সরবরাহ করেন। অতঃপর খোরাসানে (ইরান) চলে আসেন এবং এক সম্মোহিত ফকীরের সাহচর্যে ৪০ দিন অতিবাহিত করার পর দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। শিক্ষার প্রতি একাগ্রতাই ছিল তাঁর একমাত্র সম্বল। কুর'আন, হাদীস, ফিক্হ প্রভৃতি শাস্ত্রে পান্ডিত্য ও ব্যুৎপত্তি লাভ করার পর হজ্জব্রত পালন করেন। অতঃপর তিনি 'ইলম-ই-মারিফাত' লাভের প্রতি মনোনিবেশ করেন। এ সময় ১২৪৫বাং/১৮৩৮ খৃঃ শাহ্ সাহেবের নানা[৫] ইন্তিকাল করেন। নানার মৃত্যু বেদনায় শাহ্ সাহেবের হৃদয় ক্রমশঃ কাতর হয়ে পড়লে কালীম শাহ্ বাগদাদী নামক জনৈক অপরিচিত আগন্তুক সাধক একদিন শাহ্ সাহেবের নিকট উপস্থিত হন। শাহ্ সাহেব তাঁকে কাদ্রিয়া তরীকাহতে বায়'আত করান। তখন থেকে তিনি তাঁর মুর্শিদের সংগে বৎসরকাল অবস্থান করে তাঁকে নানা রোগের ঔষধ শিক্ষা দেন। প্রস্থানের সময় তিনি বলে যান যে, চিশ্তিয়া তরিকাহয় মুরীদ হলে শাহ্ সাহেব ইল্ম-ই-মা'রিফাত এর শেষ প্রান্ত বেলায়েতের স্তরে পৌঁছতে সক্ষম হবেন।[৬]

কালীম শাহ্ বাগদাদীর চলে যাবার পর তিনি প্রথম চিল্লা স্বরূপ ঢাকার অদূরে মীরপুরের শাহ্ আলী বাগদাদীর পবিত্র মাযারে ১৪ বৎসর আধ্যাত্মিক সাধনা করেন।[৭] অতঃপর নারায়ণগঞ্জ শহরের নিকটবর্তী শাহী কেল্লার মধ্যস্থিত মসজিদে দ্বিতীয় চিল্লা স্বরূপ প্রায় তিন বৎসর অবস্থান করেন। এর পর তিনি এক বছর ঢাকার লালবাগে প্রিন্স আজমশাহ্ প্রতিষ্ঠিত কিল্লার (১৬৭৮ খৃঃ) মসজিদের নিকটবর্তী সুড়ংগে তৃতীয় ও সর্বশেষ চিল্লা সমাপ্ত করেন।[৮]

১। এ ,এফ এম, আবদুল মজিদ রুশদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪।
২। এ ,এফ এম, আবদুল মজিদ রুশদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬।
৩। এ ,এফ এম, আবদুল মজিদ রুশদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭।
৪। নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী , সংগ্রাম, ২৪ জৈষ্ঠ্য ১৩৯০, বাংলা।
৫। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০৫।
৬। এ ,এফ এম, আবদুল মজিদ রুশদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯।
৭। এ ,এফ এম, আবদুল মজিদ রুশদী, ক্ত, পৃঃ ২০।
৮। এ ,এফ এম, আবদুল মজিদ রুশদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১।

Dhaka University Institutional Repository

এমনিভাবে ১৮ বৎসর কঠোর সাধনার পর সমাজসংস্কার ও ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা প্রচারের দিকে একনিষ্ঠভাবে মনোনিবেশ করেন। এ সময়েই তিনি তাঁর মশুরীখোলাস্থ বাড়ীতে মসজিদ ও মক্তব প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে মশুরীখোলা এলাকাটি ছোটখাট শহরতলীতে পরিনত হয় এবং হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে দলে দলে লোকজন তাঁর নিকট আসতে থাকে ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভ করতে শুরু করে।[১]

শাহ্ সাহেব ১২৭৮ বাং/১৮৭১ ইং সালের দিকে ঢাকার শাহ্সাহেব লেনে একটি বাড়ী নির্মান করেন এবং তাঁর মশুরী খোলাস্থ মক্তবটিকে ১৮৭১ সালে উক্ত লেনে এক ভাড়া করা বাড়ীতে স্থানান্তরিত করেন। অতঃপর তিনি ঢাকার বাড়ী ও মশুরীখোলার বাড়ী উভয় স্থানেই অবস্থান করতে থাকেন।[২]

শাহ্ সাহেব তাঁর চিরকুমার নানা পীর মুহাম্মদ সাহেবের অনুকরণে জীবন যাপন করার মনস্থ করেছিলেন। নানা তাঁকে কঠোর সাধনা, হজ্জ পালন এবং বিয়ে না করার উপদেশ দিয়েছিলেন। পরে আত্মীয়-স্বজনের অনুরোধে বিশেষ করে তিনি (শাহ্ আহসান উল্লাহ্) হযরত শাহ্ তাজ মুহাম্মদের বংশের একমাত্র পুত্র হওয়ায় ৫০ বছর পরে তিনি তাঁকে (শাহ সাহেব) বিয়ে করার আদেশ দেন। শাহ্ সাহেব স্বীয় পিতৃব্যের অনুরোধে ৬৫ বৎসর বয়সে প্রথম বিয়ে করেন। কিন্তু বিয়ের রাত্রিতেই তাঁর নববিবাহিতা স্ত্রী কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান। এই বিয়োগ ব্যথায় ব্যথিত হয়ে তিনি নামায, রোযা এবং আল্লাহর যিক্র-আয্কারে মশগুল থাকেন এবং অবসরে গ্রামের নিরক্ষর লোকদেরকে বিশেষতঃ বালক-বালিকাদেরকে শিক্ষা দান করতেন। সাংসারিক বিষয়ে তিনি উদাসীন ছিলেন বিধায় তাঁর চাচা তাঁর উপর ক্ষুব্দ ছিলেন। তাই, শাহ্ সাহেব পুনরায় বিদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পথে বিবিরকান্দি গ্রামের শরীফুদ্দীন মাতাব্বরের সাক্ষাত পান এবং মাতাব্বরের অনুরোধে শাহ্ সাহেব সেখানে থেকে তাঁর ছেলে মেয়েদের নামায রোযা এবং তথায় একখানা মক্তব প্রতিষ্ঠা করেন।[৩] শাহ্ আহ্সান উল্লাহ ৭৫ বছর বয়সে মশুরীখোলার জনাব কাজীমুদ্দিন মোল্লা সাহেবের ৭ বৎসর বয়স্কা কন্যাকে দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে বিয়ে করেন। তাঁর গর্ভেই শাহ্ সাহেব এর ৯ কন্যা ও ৪ পুত্র জন্ম গ্রহণ করে।

৯৬ বৎসর বয়সে শাহ্ সাহেব ৭০ বৎসর বয়স্কা তাঁর পীর হযরত বাবা খাজা লস্কর মোল্লা সাহেবের বিধবা কন্যাকে তৃতীয় স্ত্রী হিসেবে বিয়ে করেন। খাজা লশ্কর মোল্লা ছিলেন শাহ্ আহসান উল্লাহ-র মুরশিদ। ঢাকা জেলার বৈদ্যের বাজার এলাকাস্থ চর ভাসানিয়াতে তাঁর বাড়ী ছিল। খাজা লশকর মোল্লা ১২৮১ বাং /১৮৭৪ খৃঃ নিজ বাড়ীতে ইন্তিকাল করেন। নরসিংদী জেলার পাইকারচর ইউনিয়নের দাউচর ভাসানিয়া গ্রামে তাঁর কবর অবস্থিত। ১০১ বৎসর বয়সে তাঁর তৃতীয় স্ত্রী চরভাসানিয়া গ্রামে ইন্তিকাল করেন।[৪]

শরীফুদ্দিন মাতাব্বরের মক্তবে শিক্ষা দানকালে শাহ্ সাহেব মুসলমান সমাজের করুণ অবস্থার কথা ভেবে বড়ই চিন্তিত হন এবং তাদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার উদ্দেশ্যে দেশ ভ্রমণে বের হন। বালাকোটের যুদ্ধে (১৮৩১সালে)

১। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০৫।

২। এ ,এফ এম, আবদুল মজিদ রুশদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯।

৩। এ ,এফ এম, আবদুল মজিদ রুশদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪।

৪। এ ,এফ এম, আবদুল মজিদ রুশদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪।

Dhaka University Institutional Repository

সায়্যিদ আহ্‌মদ শহীদ (১৭৮৬-১৮৩১ খৃঃ), ইসমাঈল শহীদ (১৭৯৬-১৮৩১ খৃঃ) ও তাঁদের সংগীদের শাহাদৎ বরণের পর বাংলাদেশে সায়্যিদ আহ্‌মদ শহীদের সুযোগ্য তিনজন খলিফা হযরত মাওলানা কারামাত আলী জৌনপূরী (রঃ) (১৮০০-১৮৭৩ খৃঃ), হযরত মাওলানা ইমামুদ্দিন সন্দ্বীপি (রঃ) (১৭৮৮-১৮৫৭) এবং হযরত শাহ্ গুলযার মোল্লা বাংলাদেশের পল্লীতে ইসলাম প্রচারের কাজ চালিয়ে ছিলেন। মাওলানা কারামত আলী ও মাওলানা ইমামুদ্দিনের সাথে শাহ্ আহসান উল্লাহর সাক্ষাত ঘটে। তিনি কিছু দিন তাঁদের সাহচর্যে কাটান। শাহ্ গুলযার মোল্লা ছিলেন শাহ্ আহসান উল্লাহর দাদা পীর। শাহ্ আহসান উল্লাহ কখনও তাঁকে দেখেননি। তাঁর কবর কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দির সোনারচরে অবস্থিত।[২]

ঢাকার পশ্চিমে কলাতিয়া বাজারের মসজিদ প্রাংগনে এক ওয়াজ মাহফিলে মাওলানা কারামত আলী শাহ্ আহসান উল্লাহ সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বাণী করে বলেন যে, কালে তিনি (আহসান উল্লাহ) এই বাংলাদেশের বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গ ও আসামের একজন সুপ্রসিদ্ধ কামেল ওলী ও হাদী হবেন। ঐ সভায় তাঁর রচিত কিতাব 'রাহ নাজাত' ও 'মিফতাহুল জান্নাত' তাঁকে (শাহ্ আহসান উল্লাহ) পুরস্কার দেন। ১২৬৫ বাং/ ১৮৫৮ খৃঃ শাহ্ আহসান উল্লাহ শাহ্ লশকর মোল্লার নিকট আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে অতি কষ্টে ঢাকা (বর্তমান নারায়ণগঞ্জ) জেলার বৈদ্যের বাজার এলাকাহ্ চরভাসানিয়ায় গমন করেন। লসকর মোল্লা তাঁকে নিজ বাড়ীতে 'চিশতিয়া তরিকাহ্‌র' বায়'আত করেন।[৩] তিনি ১২৭৭ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসের প্রথম শুক্রবার 'চিশতিয়া খান্দানের ফায়েয লাভ করেন।[৪] হযরত খাজা লসকর মোল্লা নরসিংদী জেলার পাইকার চর ইউনিয়নের দাড়িচর ভাসানিয়া গ্রামে ১২৮১ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের সোমবার নিজ বাড়ীতে ইন্তিকাল করেন।[৫] উক্ত গ্রামেই তাঁর কবর অবস্থিত।

চিশ্‌তিয়া খান্দানের ফয়েয লাভ করার পর শাহ্ সাহেব সমাজ সংস্কার, আল্লাহর একত্ববাদ ও রাসুলুল্লাহর সুন্নতের আদর্শ প্রচার করতে লাগলেন। চিশ্‌তিয়া তরিকাহ্‌র তিনি লোকদের ফায়েয দিতেন ও যিক্‌র আয্‌কার শিক্ষা দিতেন। এতে শাহ্ সাহেব লোকদের ব্যঙ্গ বিদ্রুপের সম্মুখীন হন। পরে তিনি বড়পীর আবদুল কাদের জীলানীর (রঃ) (মৃঃ ১১৬১ খৃঃ) স্বপ্নাদেশপ্রাপ্ত হয়ে কাদ্‌রিয়া তরিকাহ্‌তে মুরীদ করান। ১৩০১ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে ২৮ সদস্য বিশিষ্ট একদল হিন্দু সিদ্ধা তাঁর নিকট আগমন করে ইসলামের উদার নৈতিকতায় মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।

শাহ্ আহ্‌সান উল্লাহ হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তিনি ইজতিহাদের পক্ষপাতি ছিলেন না। মাওলানা কারামত আলীর ন্যায় তিনিও সিপাহী বিপ্লবের (১৮৫৭ সালে) পর এ দেশকে 'দারুল হরব' বা শত্রুদেশ বলে মনে করতেন না। পক্ষান্তরে ফরায়েযীরা পরাধীন (বৃটিশ শাসনাধীন) থাকায় এদেশকে 'দারুল হরব' বা শত্রু দেশ বলে মনে করতেন। ইসলামী শাসন ছিলনা বলে ফিক্‌হ্‌র দৃষ্টিকোণ থেকে জুম'আ ও দু' ঈদের নামায পড়াকে

১। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০৫।
২। এ ,এফ এম, আবদুল মজিদ রুশদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫।
৩। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০৬।
৪। এ ,এফ এম, আবদুল মজিদ রুশদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯।
৫। এ ,এফ এম, আবদুল মজিদ রুশদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯।

Dhaka University Institutional Repository

অবৈধ মনে করতেন।[১] ফরায়েযীদের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে জুম'আর নামায আদায় করার ফতোয়া দিতে গিয়ে তিনি লাজুম'আ দল কর্তৃক অনেক অন্যায় অত্যাচারের সম্মুখীন হন। আব্দুল মজিদ রুশদী তাঁর প্রণীত 'হযরত কেবলা' গ্রন্থে তাঁর বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেছেন। বাংলার বরিশাল, ঢাকা, ফরিদপুর ও ত্রিপুরা (বর্তমান কুমিল্লা) জেলার কয়েক স্থানে 'দুধিয়াল' [২ক] নামে অভিহিত লা-জুম'আ পন্থী মুসলমানগণ ফতোয়া প্রচার করছিল যে, এদেশ অর্থাৎ পরাধীন এই ভারত উপমহাদেশে জুম'আর নামায ও দুই ঈদের নামায পড়া বৈধ নয়। যে মুসলমান উক্ত নামায পড়বে তিনি পথভ্রষ্ট ও কাফির। এই দলের মধ্যে ফরিদপুরের দুদু মিয়ার নাম-ই উল্লেখযোগ্য।[২খ]

তারা নানা প্রকার বর্বর ও ধর্মবিরুদ্ধ নৃশংস কাজ করত। 'দুধিয়াল' মতের খলিফাগণের ইঙ্গিতে ঢাকা, ফরিদপুর ও ত্রিপুরার অনেক জুম'আর মসজিদ ধুলিস্যাৎ হয়েছিল। তারা জুম'আর নামায আদায়কারীদের ঘর-বাড়ীও জ্বালিয়ে দিত। তারা শাহ্ আহসান উল্লাহর ওস্তাদ মাওলানা নিজামুদ্দীন সুজাতপুরীর ঘর বাড়ীও জ্বালিয়ে দেয়। এমনকি তারা বাংলা ১২৯৭ সনে শাহ্ আহসান উল্লাহ সাহেবের পবিত্র মসজিদ ও তাঁর মগুরীখোলাস্থ বাড়ীর উপর আক্রমণ করতে উদ্যত হয় । তারা হযরত কেবলার বাড়ীর সীমানার মধ্যে ঢুকার সঙ্গে সঙ্গে অলৌকিকভাবে অন্ধ হয়ে যায়। পরে তারা ক্রন্দন রত অবস্থায় শাহ্ সাহেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে মুক্তি পায় এবং তওবা করে জুম'আর নামায আদায় করতে থাকে।

১২৯৮ বাং/১৮৯১ খৃঃ প্রায় তিন হাজার দুদুমিয়াপন্থী ফরায়েযী শাহ্ আহসান উল্লাহর প্রাণ নাশ করার জন্য মারমুখী হয়ে তাঁর বাড়ীর নিকট আসে। এমন সময় সাদা পোশাক পরিহিত শুভ্র দাঁড়ি বিশিষ্ট একজন লোক শাহ্ সাহেবের মত একজন বুযুর্গ লোকের প্রতি বেয়াদবি না করার অনুরোধ জানালে দুধিয়াল লোকের একজন লাঠির আঘাতে তাঁর মাথা ফাটিয়ে দেয়। এ নিয়ে তাদের নিজ দলের মধ্যেই মারামারি লেগে যায় এবং শত শত লোক যখম হয়ে বাড়ী ফিরে। দলের বুদ্ধিমান লোকেরা শাহ্ সাহেবের হাতে বায়'আত হয়ে জুম'আর নামায আদায় করতে লাগল।[৩] শাহ্ সাহেব প্রতি সপ্তাহে কালাতিয়া বাজারে তাঁর স্থাপিত মসজিদে জুম'আর নামায পড়াতেন। দুধিয়াল দল শাহ্ সাহেবকে হত্যা করার জন্য গোপনে পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। পুরস্কারের লোভে এক গুন্ডা রামদা নিয়ে তাঁকে হত্যা করতে গেলে তাঁর জ্যোতির্ময় চেহারা দর্শনে অভিভূত হয়ে পড়ে। কম্পিত অবস্থায় তার হাত থেকে রামদা পড়ে তার নিজেরই পা কেটে যায়। শাহ্ সহেব তাঁর নিজ চাদর ছিড়ে ক্ষতস্থানে পট্টি বেধে দেন এবং নিজ বাড়ীতে নিয়ে সেবাযত্ন করেন। গুন্ডা লোকটি শাহ্ সাহেবেরই এক বৃদ্ধা মুরীদের সন্তান ছিল।[৪]

১২৯৮ বাং/১৮৯১ খৃঃ কলাতিয়া বাজারস্থ জয়দেবপুর বাজার কাচারীতে শাহ্ সাহেবের সাথে দুদু মিয়ার ছেলে

১। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০৬ - ৩০৭।

২ক। দুধিয়াল বলে ফরায়েযী আন্দোলনের নেতা পীর মুহসিনউদ্দিন আহমদ দুদুমিয়ার অনুসারীদের বুঝানো হয়েছে ।

২খ। এ ,এফ এম, আবদুল মজিদ রুশদী, প্রাগুক্ত,; পৃঃ ৩৬।

৩। এ ,এফ এম, আবদুল মজিদ রুশদী, প্রাগুক্ত,; পৃঃ ৩৮।

৪। এ ,এফ এম, আবদুল মজিদ রুশদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৯-৪০।

Dhaka University Institutional Repository

(সম্ভবতঃ খান বাহাদুর সাঈদুদ্দিন আহমদ)[১] বাহাস করবেন বলে দিন সময় নির্ধারণ করা হয়। শাহ্ আহসান উল্লাহ সাহেব ঢাকার মুহ্সিনিয়া মাদ্রাসার হেড মৌলভী জনাব আব্দুস সালাম, ৬/৭ জন 'আলিম বন্ধু ও ছাত্র নিয়ে বাহাসের জন্য যথা সময়ে উপস্থিত হন। অন্যদিকে দুদু মিয়ার ছেলের সঙ্গে মৌলভী আইনুদ্দীন, মৌলভী আব্দুল জব্বার ও মৌলভী সমীরুদ্দীন বাহাসে যোগ দেন। তাঁরা সকলেই ছিলেন মাওলানা আব্দুস সালামের ছাত্র। তাঁরা উস্তাদকে দেখে বাহাসের ইচ্ছা ত্যাগ করে হতভম্ব হয়ে ফিরে যান।[২] এর কিছুদিন পর আটি, পাঁচদানা ও ভাওয়ালকান্দি গ্রামের 'দুধিয়ালগণ' পুনরায় পাঁচদানার মসজিদে শাহ্ সাহেবকে দুদু মিয়ার ছেলের সঙ্গে বাহাস করার অনুরোধ করেন। শাহ সাহেব যথাসময়ে উপস্থিত হলে দুদু মিয়ার ছেলে গা ঢাকা দেন। শাহ্ সাহেব সেখানে জুম'আর নামায ফরয হওয়া সম্পর্কে আলোচনা করে অনেক লোককে বায়'আত করান। সেদিন মাওলানা দরবেশ আলী নামের হযরত কেবলার একজন মুরীদ পাঁচদানার ঈদের মাঠের মজলিস হতে বাড়ী ফেরার পথে দুদুমিয়ার দল কর্তৃক দুদুমিয়ার ছেলের বজরায় অপহৃত হন। শাহ্ সাহেব পুলিশের সাহায্য চাইলে পুলিশ দুদু মিয়ার পুত্রকে কেরানীগঞ্জ থানায় চালান দেন এবং মাওলানা দরবেশ 'আলী পুলিশ হেফাজতে বাড়ি ফিরে আসেন। পরে পাঁচ হাজার টাকা মুচলেকা দিয়ে দুদুমিয়ার পুত্র থানা থেকে বাড়ী ফেরেন।[৩] এর কয়েকমাস পর আগলার জমিদার মজীদ মিঞার বাড়ীতে (যিনি দুদু মিঞার পুত্রের মুরীদ ছিলেন) শাহ্ সাহেবের সাথে দুদুমিয়ার পুত্রের বাহাসের তারিখ ঠিক করা হয়। উভয়ের মধ্যে জুম'আর নামায ফরয হওয়া নিয়ে আলোচনা হয়। দুদু মিঞার পুত্র শাহ্ সাহেবের যুক্তি খন্ডন করতে পারেনি। ফলে, মজীদ মিয়া শাহ্ সাহেবের হাতে তওবা করেন এবং সবাইকে জুম'আর নামায পড়ার নির্দেশ দেন। দুদুমিয়ার পুত্রকে বহু উপঢৌকনসহ বাড়ী পাঠিয়ে দেন। তারপর আর তাঁকে এ অঞ্চলে দেখা যায়নি।[৪] শাহ্ সাহেব জুম'আর নামায প্রচলনের জন্য বিভিন্নস্থানে ওয়াজ-নসীহত করতেন। মোমেনশাহীর মৌলবী শাহ্ আব্দুল লতীফ হাদীস, তাফসীর ও ফিক্হর অনেক কিতাব মাথায় নিয়ে তাঁর সাথে থাকতেন[৫] তাঁর প্রচেষ্টায় অনেক মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়। তন্মধ্যে মোমেনশাহীর পোড়াবাড়ী গ্রামের জুম'আ মসজিদ অন্যতম। সে সময় শাহ সাহেব তাঁর জীবনের শতবর্ষ পাড়ি দিয়েছিলেন। তবুও তিনি পায়ে হেঁটে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে মসজিদ উদ্বোধন করতেন।[৬]

শাহ্ সাহেব নিজের জীবনকে আধ্যাত্মিক সাধনায় উৎসর্গ করলেও তিনি সংসার বৈরাগী ছিলেন না। তিনি কৃষি কাজ করতেন, ফসল ফলাতেন এবং ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। শাহ্ সাহেব কুমিল্লার বিবিরকান্দি গ্রামে যখন ছেলে মেয়েদের পড়াতেন তখন তিনি রাখি মালের ব্যবসা করতেন। তাফসী মোল্লার বাড়ীতে তাঁর ধান, চাল, ডাল, মরিচ

১। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০৭।
২। এ ,এফ এম, আবদুল মজিদ রুশদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০-৪১।
৩। এ ,এফ এম, আবদুল মজিদ রুশদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৩।
৪। এ ,এফ এম, আবদুল মজিদ রুশদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৪-৪৫।
৫। এ ,এফ এম, আবদুল মজিদ রুশদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৬।
৬। এ ,এফ এম, আবদুল মজিদ রুশদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

ও পেঁয়াজ রসূন রাখার বড় বড় গোলা ঘর ছিল।[১] সিলেট থেকে বড় নৌকা নিয়ে ব্যবসায়ীগণ এসে তাঁর নিকট থেকে মাল নিতেন। তাঁর কারবার ছিল পরিষ্কার, কোন প্রকার ধোকাবাজি ছিল না। মাল বিক্রির পূর্বে তিনি মালগুলো ভাল করে নিজ হাতে শুকিয়ে নিতেন। লোকসান হলেও ব্যবসায়ে জবান ঠিক রাখতেন। কারবার করে শাহ্ সাহেব বহু টাকা পয়সা সঞ্চয় করেন। সঞ্চিত টাকা দিয়ে জায়গা-জমি, ঘর-বাড়ী ইত্যাদি খরীদ করেন। কারবারের টাকা দিয়ে তিনি অনেক মহৎ কাজও করেন। মগুরীখোলাস্থ জামে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করে উহার খরচের জন্য সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করেন। ঢাকার শাহ্ সাহেব লেনস্থ ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিতে বাড়ী নির্মাণ করেন ও মসজিদ তৈরী করে পানির জন্য কয়েকটি কূপ খনন করে দেন এবং আহ্‌সানিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। চাচার চাপে এক সময় তিনি নিজ প্রাপ্য পিতৃসম্পদ চাচাকে দিয়ে নিজে নিঃস্ব হয়ে পড়েন। কিন্তু পরবর্তীতে আল্লাহ্‌র অশেষ রহমতে প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হন।[২] তিনি মগুরীখোলার নিকটবর্তী বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে ১৫০/১৬০ কানি জমি খরিদ করেন।[৩]

হযরত শাহ্ আহ্‌সান উল্লাহ রাজনীতি না করলেও এক্ষেত্রে তিনি সচেতন ও দূরদর্শী ছিলেন। তিনি স্বতন্ত্র মুসলিম জাতিয়তাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। কংগ্রেস তথা হিন্দুদের সাথে মিলনধর্মী রাজনীতি করার পক্ষপাতি ছিলেন না।[৪] হযরত শাহ্ সায়্যিদ আবু আহমদ[৫] (১৩২৮ বাং) শাহ্ সাহেবের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন যে, এ সময় হিন্দু মুসলমান একত্রিত হয়েছে। উভয়ে একত্রে ইংরেজদের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন করলে ইংরেজরা ভারত ছেড়ে চলে যাবে, জনগণ স্বাধীনতা পাবে। শুনে শাহ্ সাহেব বললেন যে, তোমার কি কুর'আন শরীফের বাণী মনে নেই যে, মুশরিক হিন্দু ও ইহুদী এ দু সম্প্রদায়ের মত বড় দুশমন মুমিন মুসলমানদের আর দ্বিতীয় কেহ নেই। দেশী কাপড় পরিধান করুন, কারবার দ্বারা দেশকে উন্নত করুন। সন্তান সন্ততিগণকে জ্ঞান-বিজ্ঞানও ইল্‌ম-ই-কালামে উৎসাহিত করুন। সাবধান! হিন্দুদের সাথে মিশে ইংরেজদের বিরুদ্ধে কাজ করবেন না। দোয়া করি আপনার জীবদ্দশাতেই স্বাধীন মুসলমান দেশ দেখবেন।[৬]

হযরত শাহ্ সায়্যিদ আবু আহমদ ১৩৮৬/১৯৭১ সালে ১২৬ বৎসর বয়সে ইন্তিকাল করেন। তিনি স্বাধীন মুসলমান দেশ দেখতে পান। শাহ্ সাহেবের ভবিষ্যত বাণী অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হয়।

শাহ্ সাহেবের বিশিষ্ট মুরীদ দারুল উলুম মাদ্রাসার শিক্ষক মাওলানা হাফিজ আবদুল্লাহ শাহ্ সাহেবের নিকট ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের ইচ্ছা ব্যক্ত করলে উত্তরে শাহ্ সাহেব তাঁর বড় পুত্রকে ডেকে বললেন ঃ মাওলানা সাহেবকে ধীরস্থির মস্তিস্কে চিন্তা করতে বল। হিন্দু নেতৃত্বের অধীনে কোন মুসলমানের যাওয়া তাঁর পছন্দ নয়। প্রকৃত মু'মিন ও মুসলমান কখনই অধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকতে পারে না যদি তারা কুর'আন ও হাদীসের আদেশ-নিষেধ মতে চলে। মুসলমানদের শক্তির উৎস হল আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ-নিষেধ ও

১। গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫০।
২। এ ,এফ এম, আবদুল মজিদ রুশদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫১।
৩। এ ,এফ এম, আবদুল মজিদ রুশদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৪।
৪। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০৯।
৫। ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া থানার অন্তর্গত শিলুপানুয়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।
৬। এ, এফ এম, আবদুল মজিদ রুশদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৯-৩০।

Dhaka University Institutional Repository

রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর আদর্শ ও সুন্নতকে ভালভাবে আঁকড়িয়ে ধরে চললে মুসলমানরা প্রকৃত শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হবে। তারা শিক্ষা-দীক্ষায়, অর্থে ও ব্যবসা বাণিজ্যে বলীয়ান হতে পারবে। (তাঁর মতে) এ সময়ে ভারতের মুসলমানগণ কংগ্রেস ত্যাগ করে মুসলিম লীগকে মুসলমান জাতির একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বিবেচনা করতঃ তার পতাকা তলে এসে দাড়ানো উচিত। এতেই মুসলমানদের স্বাধীনতা আসবে। বর্তমানে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বের অধীনে দেশের যাবতীয় স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসাকে বয়কট করা হয়েছে। সরকারের সাহায্য ছাড়া কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই সুচারুরূপে চলতে পারে না। মৌলবী ও মোদাররিসগণের নিকট অনুরোধ এই যে, তারা যেন এই অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান না করেন ও ছাত্রদেরকে তা হতে দূরে রাখেন। এতে মুসলমানগণ অংশ গ্রহণ করলে তারা হিন্দুদের চেয়ে শিক্ষা ও ব্যবসায় ৫০ বৎসর পিছনে পড়ে যাবে।

শাহ্ সাহেবের কণিষ্ঠ পুত্র আবুল হাসান সাহেব বলেন- আমার পিতা সাধু সন্ন্যাসীগণের মত সংসার ধর্মত্যাগী অথবা সমাজ সংস্কার ও স্বাধীনতার প্রতি মোটেই উদাসীন ছিলেন না। গত ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় আমার আলীগড় কলেজ-বন্ধু আলী ভ্রাতৃদ্বয় (মাওলানা শওকত আলী ও মাওলানা মোহাম্মদ 'আলী) কনফারেন্স উপলক্ষে ঢাকায় আসেন ও হযরত বাবাজান কেবলার দরবারে এসে বাংলা ও আসামের মুসলমানদের ও তাঁর মুরীদগণকে এই নন-কো-অপারেশন আন্দোলনে যোগদানের জন্য একখানা হুকুমনামা লিখিয়ে নিতে চাইলেন। শাহ্ সাহেব মৃদু হেসে বললেন- বাবা! আমি নিজ চক্ষে সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭) দেখেছি। আমাদের প্রতিবেশী হিন্দুগণ আমাদের সঙ্গে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে আমাদেরকে যে বিপদে ফেলে দিয়েছিল, সেই ভয়াবহ দৃশ্য আমি এখনও ভুলতে পারিনি। স্বাধীনতার জন্য মুসলমানগণ দলে দলে কামান ও বন্দুকের সম্মুখীন হয়েছে, তাদের বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। অপর পক্ষে হিন্দুগণ দলে দলে গিয়ে ইংরেজ সরকারের চাকুরীতে ভর্তি হতে থাকে।

বাবা! আমারা পলাশীর যুদ্ধ (১৭৫৭) ও সিপাহী বিদ্রোহের (১৮৫৭) ক্ষতিগ্রস্থের ধাক্কা এখনও সামলে উঠতে পারিনি। এখন যদি আমরা হিন্দুদের সঙ্গে যোগদান করে তাদের নেতৃত্ব মান্য করে চলি এবং আমাদের মক্তব, মাদ্রাসা, স্কুল ও কলেজগুলো বন্ধ করে দেই তাহলে আমরা ১৮৫৭ সনের মত আরো ৫০ বৎসর পিছনে পড়ে যাব। আপনারা এখন মুসলমান সমাজের কর্ণধার। গান্ধী-মত পোষণ করে স্বীয় 'হোনেহার' সমাজকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়ে যাবেন না। এই আন্দোলনের প্রথম হতেই আমি লক্ষ্য করে আসছি যে, আপনাদের ইঙ্গিতেই প্রথমে মুসলমানদের একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান আলীগড় এম, এ, কলেজ, এরপর কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসা (বাংলার মুসলমানদের একমাত্র ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র) এবং কুমিল্লার হোসসামিয়া মাদ্রাসা (পূর্ব বঙ্গ ও আসামের একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান) ধর্মঘট করে। কিন্তু খবরের কাগজের কোন পৃষ্ঠায় বেনারস হিন্দু কলেজ কিংবা কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের ধর্মঘটের কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি। এই সংস্কৃত কলেজেই আমাদের বাংলা ভাষা হতে ইসলামী শব্দ তুলে সংস্কৃত পৌত্তলিক শব্দ যোজনা করে মুসলমানদের প্রিয় বাংলা ভাষাকে অনৈসলামিক করে তুলেছে।

বাবা! এই জনবহুল জাহাঙ্গীর নগরীর (ঢাকা) বুকে শত সহস্র মসজিদ মক্তব ও মাদ্রাসা ছিল। এদের চালকগণকে প্রায় জামে মসজিদে ও পথের বড় বড় বটগাছে ফাঁসি দেয়া হয়েছিল। ভয়ে ও আতংকে মুসলমানগণ এ স্থান ত্যাগ

Dhaka University Institutional Repository

করেছিল বিধায় আজ ঢাকা জনশূন্য বিরাট বিরান অরণ্যে পতিত হয়েছে। মুসলমানদের মসজিদ ও তৎসংলগ্ন মক্তব ও মাদ্রাসার নিশানাসমূহ এখনও এই অরণ্যের মধ্যে বিদ্যমান আছে।

বাবা! আমি এখন ১২১ বছর পাড়ি দিয়ে চলেছি। আমার অভিজ্ঞতা হতে অনুরোধ এই যে, কংগ্রেস হতে এখনই আপনারা চলে আসুন ও হিন্দুগণের বিশেষতঃ মিঃ গান্ধীর নেতৃত্ব ত্যাগ করুন ও নিজের পায়ের উপর দাঁড়ান এবং মরহুম খাজা স্যার সলিমুল্লাহর প্রতিষ্ঠিত মুসলিম লীগকে পরিপুষ্ট করুন। উত্তরকালে এটাই হবে মুসলমানদের একমাত্র প্রতিষ্ঠান ও মুখপাত্র। উপযুক্ত হলেই সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলী হবে।[1]

আলী ভ্রাতৃদ্বয় শাহ্ সাহেবের কথা শ্রবণ করে সিপাহী বিদ্রোহ ও তৎকালীন সময়ের পার্থক্য শাহ্ সাহেবকে বুঝাতে চাইলেন, হিন্দু-মুসলিম এর সম্মিলিত প্রতিষ্ঠান মাতৃভূমি উদ্ধারের সম্ভাবনা ব্যক্ত করলেন। এ সব শুনে শাহ্ সাহেব বললেন, বাবা! আমি দেখেছি যে, ঐ দিন আর বেশী দূরে নয় যেদিন আপনারাও হিন্দুদের স্বরূপ বুঝতে পেরে কংগ্রেস থেকে সরে পড়বেন।[2] দোয়া করি, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাদেরকে সুবুদ্ধি দান করুন ও সিরাত-ই-মুসতাকিম এর উপর কায়েম রাখুন। অতঃপর কুর'আনের এ আয়াতংশটুকু তিলাওয়াত করলেন ان اشد الناس عند الله عداه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا . অর্থাৎ- নিশ্চয় মানবগনের মধ্যে ইহুদী ও মুশরিকগনকে দুর্দান্ত শত্রু হিসেবে পাবে।

উপরোক্ত বর্ণনা হতে পরিষ্কার প্রতীয়মান হয় যে, রাজনীতির ক্ষেত্রে শাহ্ সাহেবের দূরদৃষ্টি ছিল। তিনি আঁচ করতে পেরেছিলেন যে, মিলনধর্মী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে উপমহাদেশের স্বাধীনতা আসবেনা, আর আসলেও তাতে মুসলমানদের স্বার্থ বজায় থাকবে না। এ জন্য তিনি 'কংগ্রেস' তথা হিন্দুদের সাথে মিলনধর্মী রাজনীতি করার পক্ষপাতি ছিলেন না। ১৩২৮/১৯২১ সালে যখন মহাত্মা গান্ধীর (১৮৬৯ - ১৯৪৮) নেতৃত্বে খিলাফত আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলন একাকার হয়ে গিয়েছিল, তখন মুসলিম লীগের স্বাতন্ত্রবাদও অনেকটা স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। তখনও শাহ্ সাহেবের স্বাতন্ত্রবাদে আঁচ লাগেনি। সে সময় উপমহাদেশের আকাশ বাতাস মুহাম্মাদ আলী (১৮৭৬ - ১৯৩১), শওকত আলী (১৮৭৩ - ১৯৩৮) ও গান্ধীর মিলনধর্মী অসহযোগ আন্দোলনে ছিল উদ্বেলিত। কিন্তু তখনও কোন কোন বিচক্ষণ নেতা নিশ্চিত ছিলেন যে, এই হিন্দু মুসলিম ঐক্য বেশী দিন টিকে থাকবেনা। কারণ, কংগ্রেস কখনও মুসলমানদের হিত কামনা করেনি এবং ভবিষ্যতেও করবেনা। এরূপ মনোভাব নিয়েই তখন ইকবাল (১৮৭০ - ১৯৩৮), এম, এ জিন্নাহ্ (১৮৭৬ - ১৯৪৮), এ, কে, ফজলুল হক (১৮৭৩ - ১৯৬১), হাকীম হাবীবুর রহমান (১৮৮১ - ১৯৪৭) প্রমুখ অসহযোগ আন্দোলনে সায় দেননি, স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা ছাড়তে রাজী হননি। তাঁরা ঐ আন্দোলনের পরিনতি সম্পর্কে যা ভাবতেন শেষ পর্যন্ত তা-ই ঘটল। চৌরিচৌরার ঘটনার অজুহাতে ১৯২২ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী তুঙ্গে উঠা অসহযোগ আন্দোলন গান্ধী বন্ধ করে দেন। ফলে বলতে গেলে মুসলমানদের খিলাফতের আন্দোলনেরও এর সাথে অবসান ঘটে। কিছুকাল পর হিন্দু মুসলিম দাংগা শুরু হয়।

১। এ ,এফ এম, আবদুল মজিদ রুশদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩১-৩২।
২। এ ,এফ এম, আবদুল মজিদ রুশদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩২।

Dhaka University Institutional Repository

উভয়ের রাজনীতি আবার ভিন্ন ভিন্ন ধারায় এগুতে থাকে। ১৯২৮ সালের ডিসেম্বরে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত 'ন্যাশনাল কনভেনশন' এ মুসলমানদের দিল্লী প্রস্তাব সমর্থিত না হওয়ায় মাওলানা মোহাম্মদ আলী, মাওলানা শওকত আলী সহ বড় বড় অনেক মুসলিম নেতাই 'কংগ্রেস' থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। এখানেই শাহ্ সাহেবের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার প্রমাণ মেলে।[১]

শাহ্ সাহেবের চরিত্র ছিল আদর্শস্থানীয়। দীর্ঘ ১২৮ বৎসর জীবনে তিনি রাসুলুল্লাহর (সঃ)-এর সুন্নতের অনুসরণ করেছেন। তাঁর কার্যকলাপ, আচার ব্যবহার, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় দেখলে মনে হত বাস্তবিকই রাসুলুল্লাহর প্রকৃত ওয়ারিস বা সত্য নায়েব নবী। বিষয় সম্পত্তির প্রতি তাঁর কোন লোভ ছিল না। তিনি গরীব ও নিরাশ্রয় ব্যক্তিকে সাহায্য করতেন। স্বল্পে তুষ্ট থাকতেন। কোন সময় উপবাস থাকলেও বিমর্ষ হতেন না। নিজের কাজ নিজেই করতেন, হাট বাজারে গিয়ে কেনা-কাটা করতেন। বাগান করারও তাঁর শখ ছিল। শাহ্ সাহেব কখনও কারো নিন্দা বা কুৎসা রটনা ও গাল মন্দ করতেন না কিংবা পরশ্রীকাতরতা দেখাতেন না।[২] ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তারের প্রতি শাহ্ সাহেবের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তিনি ১২৬৬ বঙ্গাব্দে মগুরীখোলার বাড়ীতে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন। ১২৭৮ বঙ্গাব্দে ঢাকার শাহ্ সাহেব লেনে বাড়ী নির্মিত হলে তা তথায় স্থানান্তর করেন। মাদ্রাসাটির নাম রাখা হয় "মাদ্রাসা দারুল উলুম আহসানিয়া"। হাজার হাজার মেধাবী ছাত্র এ মাদ্রাসা হতে তা'লীম হাসিল করে বড় বড় ওলামা ও আওলিয়া-এ-কেরামের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে।[৩] বর্তমানে মাদ্রাসাটি শতাব্দীর ঐতিহ্য বহন করে যথারীতি সরকারী মঞ্জুরীপ্রাপ্ত হয়ে সুষ্ঠুভাবে শিক্ষাবিস্তারে নিয়োজিত আছে।[৪] আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও শাহ সাহেবের প্রতি দেশের উচ্চ পদস্থ লোকজনের শ্রদ্ধাবোধ ছিল। ১৯০১ সনে নওয়াব সলিমুল্লাহ (১৮৭১-১৯১৫) শাহ্ সাহেবকে ইস্তিসকার নামায পড়ার জন্য অনুরোধ করেন। দেশে হাজারও 'আলিম থাকা সত্ত্বেও তাঁর উপর নওয়াব সাহেবের দৃষ্টি পড়েছিল।[৫] এটাই তাঁর সর্বজন শ্রদ্ধেয় হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

শাহ্ সাহেব জীবনে তিনটি বিয়ে করেন। প্রথম বিবাহ করেন ৬৫ বছর বয়সে। বিয়ের রাতেই নব-বিবাহিতা পত্নী কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। দ্বিতীয় বিয়ে হয় ৭৫ বছর বয়সে মগুরীখোলার জনাব কাযিমউদ্দীন মোল্লার ৭ বছর বয়স্কা কন্যার সাথে। এই স্ত্রীর গর্ভে ৯ কন্যা ও ৪ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। শাহ্ সাহেবের তৃতীয় বিয়ে হয় ৯৬

১। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০৯।
২। এ ,এফ এম, আবদুল মজিদ রুশদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৮-১৮০।
৩। এ ,এফ এম, আবদুল মজিদ রুশদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯১।
৪। এ ,এফ এম, আবদুল মজিদ রুশদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯২।
৫। এ ,এফ এম, আবদুল মজিদ রুশদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৫।

Dhaka University Institutional Repository

বছর বয়সে পীর খাজা লশকর মোল্লার ৭০ বছর বয়স্কা কন্যার সাথে। তাঁর এ বেগম সাহেবা ১০১ বছর বয়সে (১৩৪৬ বাং/১৯৩৯ ইং) চরভাসানিয়া গ্রামে ইন্তিকাল করেন। পিতার পাশেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

হযরত শাহ্ আহসান উল্লাহ ১২৮ বৎসর ৩ মাস ২৭ দিন বয়সে ১১, কার্তিক ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ/ ২০ রবীউস সানী, ১৩৪৫ হিজরী ২৬ অক্টোবর, ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ, বৃহস্পতিবার ফজরের নামাযের পর ৫টা ১৭মিনিটে ইন্তিকাল করেন। ঢাকার লক্ষীবাজার মিয়া সাহেব ময়দানের সাজ্জাদানশীন মরহুম মাওলানা শাহ্ সায়্যিদ আব্দুল্লাহ তাঁর জানাযার নামাযে ইমামতি করেন। জানাযায় আনুমানিক পনর হাজার লোক উপস্থিত ছিলেন। শামছুল উলামা আবূ নসর ওহীদ, শামছুল ওলামা ইসহাক বর্ধমানী, মাওলানা মুজাফ্ফার হুসাইন, আইনী সাহেব, সৈয়দ হাকীম আইয়ুব, সূফী ওসমান গণী, হাকীম হাবীবুর রহমান সহ দেশ-বিদেশের বহু প্রসিদ্ধ ওলামা, মাদ্রাসার শিক্ষার্থী, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক ও ছাত্র জানাযায় শরীক হন।[১]

ঢাকার শাহ্ সাহেব লেনে তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেই রাস্তার নাম করণ করা হয় শাহ্ সাহেব লেন।[২] শাহ্ সাহেবের ইন্তিকালের পর বড় পুত্র শাহ্ আব্দুল আযীয তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

<u>শাহ্ সাহেবের বংশ তালিকা ও খেলাফতের সিলসিলা ঃ</u>

বংশ তালিকা	------	খিলাফতের সিলসিলা
শাহ্ নওজোয়ান (সোনার গাঁও)	-	সৈয়দ আহমদ শহীদ (মৃঃ ১৮৩১)
------------- (অজ্ঞাত)	-	শাহ্ গুলজার মোল্লা (মৃঃ ১৮৭০)
------------- (অজ্ঞাত)	-	শাহ্ আহসান উল্লাহ (মৃঃ ১৯২৬)
শাহ্ তাজ মুহাম্মদ	-	শাহ্ আব্দুল আযীয (মৃঃ ১৯৪৮)
শাহ্ রফি উদ্দিন	-	শাহ্ আব্দুল লতীফ (মৃঃ ১৯৭২)
শাহ্ নুর মুহাম্মদ ঠাকুর মোল্লা	-	শাহ্ আহসানুজ্জামান (মৃঃ ১৯৫০)

শাহ্ আহসান উল্লাহ।[৩]

১। এ ,এফ এম, আবদুল মজিদ রুশদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭২।
২। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১৪।
৩। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১৫।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী (রঃ)

(১৮০০ - ১৮৫৮)

হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদের বাংলাদেশীয় অন্যতম খলীফা মাওলানা সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী নোয়াখালী জিলার অন্তর্গত ছোট ফেনী নদীর তীরবর্তী দান্দারা পরগণার মজলিসপুরে 'সাড়ে সাত ঘর' [১] নামে কথিত খান্দানসমূহের এক খান্দান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ব পুরুষরা গৌড়ের ইলিয়াস শাহী সুলতানদের আমাত্য ছিলেন। এই বংশের নাসীরুদ্দীন মাহমুদ শাহ্ (১৪৩৩-৬০) বাল্যকালেই পিতৃহারা হন। মৃত্যুকালে পিতা মু'আজ্জম শাহ্ তাঁর শ্যালকের (প্রধান ওযীর) উপর স্বীয় পুত্র মাহমুদ শাহের লালন-পালনের ভার অর্পন করেন।[২] এবং তাঁর উপর রাজ্য পরিচালনা ও ধনসম্পদ ন্যস্ত করে তিনি এ মর্মে ওসিয়ত করে যান যে, শাহজাদা মাহমুদ বড় হলে যেন শাসনভার ও গচ্ছিত সম্পদ তাঁর হাতে তুলে দেয়া হয়। কিন্তু মামা সেই ওসিয়ত অনুসারে কাজ করেননি বরং তিনি মাহমুদ শাহকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দেন। তিনি তাঁর অনুগত আমাত্য ও অনুচরবর্গ নিয়ে জৌনপুরের অধিপতি ইবরাহীম শাহ্ শার্কীর নিকট আশ্রয় নেন।[৩] ইব্রাহীম শার্কী মাহমুদ শাহের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করেন এবং তাঁর সাথে নিজ কণ্যার বিয়ে দিয়ে তাঁকে গৌড়ের রাজ্যলাভে সাহায্য করেন। মাহমুদ শাহের তিন পুত্র ছিল; রুকনুদ্দীন বারবক শাহ্ (১৪৫৯-৭৪ খৃঃ), জালালুদ্দীন ফতেহ শাহ (১৪৮১-৮৭ খৃঃ) ও আলা উদ্দীন ফীরুয শাহ্ ওরফে শাহ্জাদা খান। মাহমুদ শাহের জীবদ্দশাতেই তাঁর পুত্র ফীরুয শাহ্ বাংলার দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে পিতার প্রতিনিধিরূপে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তাঁর প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল মাহমুদাবাদে (বারবকুন্ড, চট্টগ্রাম)। তাঁর উত্তরসূরীগণ (শাহযাদখানী নরপতিগণ) ক্রমসংকোচনের মধ্য দিয়ে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষপর্যন্ত চট্টগ্রাম নোয়াখালী অঞ্চলে শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন[৪]। মাহমুদশাহী অমাত্য মাওলানা বরখোরদাদের সঙ্গে শাহজাদা ফীরুয শাহের ভগ্নী শাহজাদী মায়মুনার বিয়ে হয়। সেই ঘরে শুজা'আত খান জন্মগ্রহণ করেন। এই শুজা'আতখানী বংশেই ১৮০০ খৃষ্টাব্দে সূফী নূর মুহাম্মদের জন্ম হয়।[৫] তাঁর পূর্ব পুরুষ বীরযাদা দক্ষিণ চট্টগ্রামের চক্রশাল ছেড়ে ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে দান্দারা পরগনার মজলিসপুরে বসতি স্থাপন করেন।

সূফী নূর মুহাম্মদ পরিনত বয়সে মজলিসপুর থেকে চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত নিজামপুর পরগণার মিরসরাই-এর নিকটস্থ মালিয়াশ নামক গ্রামে বসতি স্থাপন করেন এবং নিজামপুর পরগণার নামানুসারে নিজামপুরী বলে অভিহিত হন। তাঁর বংশ তালিকা[৬] নিম্নরূপ ঃ

১। শেখ এ, টি, এম, রহুল আমীন, মাসিক মোহাম্মদী, ঢাকা, শ্রাবণ, ১৩৭১ পৃঃ ৭১৫-১৮।

২। সাহিত্য পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৯০, পৃঃ ৯২-৯৩; ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুলাই ১৯৮৬, পৃঃ ১১৪।

৩। ঢাকার এশিয়াটিক সোসাইটির বাংলা পত্রিকার এনামুল হক স্মৃতি সংখ্যার জন্য লিখিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন ও পরিকল্পনা অফিসার জনাব শেখ রহুল আমিনের 'স্বাধীন বাংলার রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক ইতিহাস সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক তথ্য' শীর্ষক পান্ডুলিপি থেকে সংকলিত; পৃঃ ১১৪।

৪। শেখ এ, টি, এম, রহুল আমীন, আল হেরা, ঢাকা, বৈশাখ, ১৩৮৪, পৃঃ ৩৩-৩৪।

৫। শেখ এ, টি, এম, রহুল আমীন, আল হেরা, ঢাকা, বৈশাখ, ১৩৮৪, পৃঃ ৩৭।

৬। এই বংশ তালিকা উক্ত জনাব শেখ রুহুল আমীনের নিকট থেকে প্রাপ্ত। তিনি শাহজাদখানী বংশের সন্তান, ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৫।

Dhaka University Institutional Repository

<u>সুলতান মাহমুদ শাহ</u>

১। শাহ্যাদী মায়মূনা
(স্বামীঃ আলা বখশ বরখোরদার)

২। বারবক শাহ্

৩। ফতেহ শাহ্

৪। ফীরুযশাহ্

(শাহ্যাদী মায়মূনা-র সন্তান:)

সূফী খান

শুজা'আত খান

↕

ইসমাঈল খান

↕

বীরযাদা ইবরাহীম খান

↕

শেখ আন্তি মুহাম্মদ

শেখ মজলিস

↕

শেখ বরুহ

↕

শেখ আমানুল্লাহ

↕

শেখ নাহের মুহাম্মদ

↕

শেখ মুহাম্মদ ফানাহ্

↕

শেখ সূফী নূর মুহাম্মদ

Dhaka University Institutional Repository

সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরীর পিতার নাম মুহাম্মদ ফানাহ্। তাঁর মায়ের নাম এবং কোথায় ও কাদের নিকট তিনি জ্ঞান লাভ করেন তা অজ্ঞাত।[১] প্রাথমিক জীবনে নোয়াখালী জিলার বাহমনী পরগণার অন্তর্গত ভুলুয়া গ্রামের শেখ যাহিদের মুরীদ হন। পরে কলিকাতায় গিয়ে ধর্মীয় শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। ক্রমশঃ তিনি আধ্যাত্মিকতার দিকে মনে প্রানে ঝুকে পড়েন এবং সংসার ত্যাগী হয়ে কলিকাতায় মিসরীগঞ্জে মুন্‌শী গুলাম রহমান মসজিদের নিকটস্থ লঙ্গরখানায় আস্তানা স্থাপন করেন।[২] ১৮২২ সালের অক্টোবর মাসে সায়্যিদ আহমদ শহীদ হজ্জে যাওয়ার পথে কলিকাতায় আগমন করেন এবং তথায় তিন মাস অবস্থান করেন। এ সময় সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী স্বপ্নে হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর পক্ষ থেকে সুসংবাদ প্রাপ্ত হন যে, "আমাদের ছেলে সন্তান সায়্যিদ আহমদ কলিকাতায় গিয়েছেন, তুমি তার হাতে বায়'আত গ্রহণ কর"। তাই কাল বিলম্ব না করে সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী চলে যান এবং নবী (সঃ) থেকে প্রাপ্ত সুসংবাদ অনুযায়ী সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রঃ) এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন এবং তাঁর খলীফা নিযুক্ত হন।[৩]

এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ২০ বৎসর।[৪] কলিকাতায় কিছুদিন তাঁর (সায়্যিদ আহমদ) সাহচর্যে থাকার পর সূফী সাহেব নিজামপুরে ফিরে আসেন। সায়্যিদ আহমদ শহীদ শিখ-ইংরেজ বিরোধী জিহাদ (১৮২৬ খৃঃ) ঘোষণা করলে তিনিও তাঁর সাথে পাঞ্জাবের কয়েক স্থানে জিহাদে অংশ গ্রহণ করেন। পেশওয়ার বিজয়ের কিছুপূর্বে ১৮৩০ সালে রনজিত সিংহের সামরিক অধিনায়ক পেশওয়ারের গর্ভনর সুলতান মুহাম্মদ খানের সংগে মর্দানের নিকট মাযারে যে জিহাদ সংঘটিত হয় তাতে সূফী নূর মুহাম্মদ ও তাঁর ভাই হাজী চাঁন্দ আহত হন। বন্দুকের গুলি সূফী নূর মুহাম্মদের হাঁটুর একদিক দিয়ে ঢুকে অপর দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়।[৫] বালাকোটের জিহাদ (৬ই মে, ১৮৩১) শেষে তিনি দেশে ফিরে ইসলাম প্রচার ও আধ্যাত্মিক সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন।[৬]

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে হযরত শায়খ আহমদ ফারুকী সিরহিন্দীর খলীফা মাওলানা হামীদ দানশমন্দ মঙ্গলকোটী শরীফ আবাদে (পশ্চিম বাংলা) ইসলাম প্রচার ও সংস্কারের যে কাজ শুরু করেন পূর্ব বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে তার পূর্ণাঙ্গ রূপ দান করেন সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী। তিনি সূফী সায়্যিদ ফতেহ আলী ওয়াইসীর পীর মুর্শিদ ছিলেন।[৭] তিনি একজন কামিল বুযুর্গ ছিলেন। কয়েকবার হজ্জব্রত পালন করেন। ধর্মনিষ্ঠায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। তাঁর চরিত্র ছিল আদর্শ স্থানীয়। সংসারের প্রতি উদাসীন থাকায় জীবনে বিয়ে করেননি। তিনি মিতভাষী ও কঠোর তাওহীদবাদী ছিলেন। আরবের মানুষকে রহমতের দরিয়া বলতেন। রুগীর সেবা ও মৃতের

১। ডঃ মুতীউর রহমান, আইনায়ে ওয়াইসী, পৃঃ ১১৫

২। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৬।

৩। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৬; ডঃ মুতীউর রহমান, আইনায়ে ওয়াইসী, পৃঃ ১০৩।

৪। ডঃ আবদুল কাদের, নোয়াখালীতে ইসলাম, পৃঃ ৮৮।

৫। এম ওবায়দুল হক, বাংলাদেশের পীর আওলিয়াগণ, পৃঃ ৩০৪।

৬। ডঃ মতিউর রহমান, আইনায়ে উয়াইসী, পৃঃ ১০৩।

৭। ডঃ মতিউর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৩।

Dhaka University Institutional Repository

জানাযাকে তিনি অবশ্য করণীয় বলে মনে করতেন। এক ওয়াক্ত নামায পড়ে অন্য ওয়াক্তের নামাজের অপেক্ষায় থাকতেন এবং কখনও বিশ্রাম গ্রহণ করলে আযান হয়েছে কিনা ঘন ঘন জিজ্ঞাসা করতেন।[১] এশার নামাযের পর কিছু ওজীফা ও সূরা কিরআ'ত পড়ে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকতেন। দুপুর রাতে নিদ্রান্বিত হয়ে তাহাজ্জুদ নামাযে নিরত হতেন ও ফজরের নামায পর্যন্ত যিক্‌র আয্‌কারে রত থাকতেন।[২]

শুক্রবার সকাল হতে জুম'আর নামায-এর জন্য প্রস্তুত হতেন এবং নামাযের পূর্বে খাওয়া দাওয়া সেরে নিতেন। তাঁর পোশাক পরিচ্ছদ ছিল অত্যন্ত সাদা-সিদে। সাদা লুঙ্গি, সাদা পাগড়ি ও সাদা চাদর পড়তেন। শীতকালে জুব্বা ও সিদরিয়া ছাড়া গরম কাপড় পড়তেন না। যোহর নামায হতে আসর নামায পর্যন্ত এবং ইশরাক নামাযের পর হাদীস ও তাসাউফের কিতাব পড়তেন। কুর'আন ও ওযীফা মশ্‌ক করতেন।[৩] তিনি কলিকাতা ও বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলের হাদীস শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। এতে অনুমিত হয় যে হয় যে, তিনি একজন বিশিষ্ট 'আলিম ও আরবীবিদ ছিলেন। খান বাহাদুর হামীদুল্লাহ তাঁকে মুজাহিদ, ধর্মের গাযী, হাজী, ফাযিল, 'আলিম, শরী'আত নিষ্ঠ ও মুসলমানদের পথিকৃত বলে উল্লেখ করেন।[৪]

মরহুম সূফী নূর মুহাম্মদ ছোট বড় সকলের সঙ্গে হাসিমুখে কথাবার্তা বলতেন এবং তাঁর ব্যবহারে সকলে আকর্ষিত হত।[৫] মৃত্যুকালে তাঁর বোন আমিনা বিবি জীবিত ছিলেন। তাঁর বোন বিবি আমিনা বিবির জনাব শায়খ নাজমুদ্দীন ভূইয়া নামক জনৈক ব্যক্তির সাথে বিয়ে হয়েছিল। তাঁর ছেলের নাম ছিল শায়খ আবদুর রহমান। শায়খ আবদুর রহমানের এক ছেলে ছিল, তার নাম ছিল শায়খ আবদুল গনী। তাঁর পাঁচ ছেলে শায়খ নূর আহমদ মুন্‌শী, শায়খ আবদুর রউফ, মৌলভী শায়খ আবদুল আযীয, শায়খ মুহাম্মদ মিয়া ও শায়খ সিদ্দীক আহমদ ছিলেন। শায়খ নূর আহমদ মুন্‌শীর তিন ছেলে শায়খ মুজিবুল হক, শায়খ সায়ীদুল হক এবং মাওলানা শায়খ বজলুল হক। শায়খ মুজিবুল হক নিঃসন্তান ইন্তিকাল করেন। শায়খ সায়ীদুল হকও দুই ছেলে মাওলানা শায়খ মুহাম্মদ ইজহারুল হক ও শায়খ মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীনকে রেখে ইন্তিকাল করেন।[৬]

সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী ২৪শে রবীউল আউয়াল ১২৭৫ হিজরী মুতাবিক পহেলা নভেম্বর, ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ (১৩ই কার্তিক, ১২৬৬বাং) সোমবার নিজামপুরে ইন্তিকাল করেন। নিজামপুরের মালিয়াশ গ্রামে তাঁর মাযার অবস্থিত।[৭] তাঁর প্রসিদ্ধ খলীফা খান বাহাদুর হামীদ উল্লাহ খান 'আহাদীসুল খাওয়ানীন' গ্রন্থে তাঁর ইন্তিকালের তারিখ এভাবে বর্ণনা করেন।

১। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ১০৩।
২। ডঃ আবদুল কাদের, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৮।
৩। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ৮৮।
৪। খান বাহাদুর হামীদ উল্লাহ খান, আহাদীসুল খাওয়ানীন, কলিকাতা, ১৮৭১, পৃঃ ২০৮।
৫। ডঃ আবদুল কাদের, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৮।
৬। মতিউর রহমান, আইনায়ে ওয়াইসী, পৃঃ ১২০।
৭। এম, ওবায়দুল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০৫।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা আকরাম আলী (রঃ)

মাওলানা আকরাম আলী চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত নিজামপুরের অধিবাসী এবং হযরত শাহ্ সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরীর বিশেষ খলীফা ছিলেন। তাঁর জন্ম-মৃত্যু ও জীবনেতিহাস সম্পর্কে কোন তথ্য জানা যায়নি। ১২৭৫হিঃ/১৮৫৮খৃঃ ইন্তিকালের সময় সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী তাঁর জানাযার নামায পড়াবার জন্য মাওলানা আকরাম আলীকে ওসীয়ত করেছিলেন। নূর মুহাম্মদ নিজামপুরীর ইন্তিকালের পর তিনি ভুলুয়া (ফেনী) ও নিজামপুরে লোকদের হিদায়াতের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।[১]

মুন্শী আবদুল করীম

মুন্শী আবদুল করীম হযরত মাওলানা সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরীর বিশিষ্ট মুরীদ ও খলীফা ছিলেন। তাঁর জীবনেতিহাস সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায়নি। তিনি সর্বদা সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরীর খিদমতে থাকতেন। হামিদ উল্লাহ খাঁ (১৮০৯-১৮৮০) লিখেছেন যে, তিনি ফানা ফিশ্ শায়খ[২] -এর শেষ স্তরে পৌঁছেছিলেন। সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী ইন্তিকালের পর তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন এবং অবশিষ্ট জীবন তাঁর মাযারের নিকটই কাটান।[৩]

মৌলবী হাজী আবদুল্লাহ

মৌলবী হাজী আবদুল্লাহ-এর জন্মকাল, জন্ম তারিখ ও জীবনেতিহাস সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায়নি। তিনি মৌলবী হামিদুল্লাহ খাঁ ইসলামাবাদির নিকট কিছুদিন ইল্ম শিক্ষা করেন। এরপর মাওলানা ইমামুদ্দীন (১৭৮৮-১৮৫৮) এর নিকট অনেকদিন ছিলেন। তারপর শাহ্ সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী-এর খাদিম ও মুরীদ হন। সূফী সাহেব তাঁকে পোষ্য পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। সূফী সাহেবের ইন্তিকালের পর তিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।[৪]

মৌলবী আন্ওয়ারুল্লাহ (রঃ)

মৌলবী আন্ওয়ারুল্লাহ (রঃ) ইসলামাবাদের (চট্টগ্রাম) অধিবাসী ছিলেন। সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী (রঃ)-এর শিষ্য ও খলীফা ছিলেন। কলিকাতায় বহুদিন যাবত সূফী সাহেবের খিদমতে অবস্থান করে আধ্যাত্মিক জ্ঞানার্জন করেন। পীর সাহেবের নিকট হতে বিদায় নিয়ে চট্টগ্রামের পাকা মসজিদের ইমামতি আরম্ভ করেন এবং লোকদের হিদায়াতে আত্মনিয়োগ করেন।[৫]

১। মাওলানা এম, ওবাইদুল হক, বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ, পৃঃ ৪।

২। শায়খ-এর কথার উপর এমন আশেক ছিলেন যে, শায়খ যা বলতেন তিনি তা-ই করতেন।

৩। মাওলানা এম, ওবাইদুল হক, বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ, পৃঃ ২৮।

৪। মাওলানা এম, ওবাইদুল হক, বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ, পৃঃ ৯৭-৯৮।

৫। মাওলানা এম, ওবাইদুল হক, বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ, পৃঃ ৯।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা কারামাত আলী জৌনপুরী (রঃ)
(১৮০০ - ১৮৭৩)

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার, প্রসার ও সংস্কারের ক্ষেত্রে যাঁর অবদান সর্বাধিক ও মুল্যবান তিনি হলেন মাওলানা কারামত 'আলী জৌনপুরী । তাঁর এ অবদান কেবল ব্যক্তিগতই নয়, বরং তা বংশানুক্রমিক।[১] বাংলা ও আসামে মুসলিম সমাজে যখন অনৈসলামিক বহু কুপ্রথা প্রচলিত হয়ে পড়ে, ইসলাম নামসর্বস্ব একটি প্রথায় পরিনত হয় এবং হিন্দু সমাজের রীতি-নীতি মুসলমান সমাজে ব্যাপকভাবে অনুপ্রবেশ করে, তখনই এদেশে তাঁর আগমন ঘটে এবং তিনি এদেশে এসে সমাজ থেকে সেসব কুপ্রথা দূর করার কাজে আত্মনিয়োগ করে ব্যাপক সফলতা লাভ করেন ।

মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী ১৮ মুহাররম, ১২১৫ হিঃ/ ১১ জুন, ১৮০০ইং[২] বর্তমান ভারতের উত্তর প্রদেশের জৌনপুর শহরের মোল্লাটোলা নামক মহল্লার এক সম্ভ্রান্ত সিদ্দীকী পরিবারে[৩] জন্মগ্রহণ করেন ।[৪] মোল্লাটোলা পাড়ার নামের সাথে তাঁর পরিবারের পেশার সাদৃশ্য ছিল বিধায় তাঁর পরিবার 'মোল্লা' নামে খ্যাত। ধর্মনিষ্ঠা ও ধর্মচর্চা-এর প্রচার ও প্রসার এবং খতীবী করা তাঁর পরিবারের বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্য ছিল ।

কারামত আলী সাহেবের পিতৃপ্রদত্ত আসল নাম ছিল আলী। পরে তাঁর থেকে অনেক কারামাত (অলৌকিক ঘটনা) সংঘটিত হয় বিধায় তিনি কারামত আলী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের কাজে নিয়োজিত থাকাকালীন সময়ে তিনি 'কারামত আলী' নামেই পরিচিত হন ।[৫] তাঁর রচিতমুকাশিফাত-ই-তাওবা, হুজ্জাত-ই-কাতিআ ও মুকামিউল মুতাদিঈন ইত্যাদি গ্রন্থে তিনি নিজের নাম কারামত আলী জৌনপুরী বলে পরিচিত। খাকসার আলী জৌনপুরী এ ভাবে লিখেছেন। তাছাড়া তাঁর সীল মুহরেও আলী জৌনপুরী লিখা আছে। কোন কোন সময় তিনি নিজের নাম আলী জৌনপুরী আস-সিদ্দীকী আল হানাফী লিখতেন ।[৬] বংশের দিক দিয়ে তিনি প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) -এর পঁয়ত্রিশতম উত্তরপুরুষ ।[৭] হযরত আবুবকর (রাঃ) পর্যন্ত তাঁর বংশ তালিকা নিম্নরূপ ঃ-

১। আমীরুল মোমেনীন সায়্যিদিনা হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ)
২। খাজা মুহাম্মদ
৩। খাজা আহমদ

১। ডঃ আবদুল কাদের, নোয়াখালীতে ইসলাম, পৃঃ ৯৫।
২। আবদুল হাই আল হাসানী, আবদুল্লাহ ইউসুফ আলী জন্ম তারিখ সম্পর্কে কিছুটা ভিন্নমত পোষণ করলেও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র, জামাতা, একান্ত ভক্ত ও সুযোগ্য খলীফা আবদুল কাদির ও দৌহিত্র আবদুল বাতিনের মতে উপরোক্ত তারিখ সঠিক বলে ধরে নেয়া হয়েছে।
৩। মাওলানা নুর মোহম্মদ আজমী, হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস , পৃঃ ২৬৬।
৪। আবদুল বাতিন, সীরাত-ই-মাওলানা করামাত আলী জৌনপুরী , পৃঃ ২৯৩, গুলাম রাসুল মিহর, জামাআত-ই-মুজাহিদীন, ২য় খন্ড, পৃঃ ২৯৩।
৫। ডঃ আবদুল কাদের, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৫, মুহাম্মদ হাসান আলী চৌধুরী, রংপুরে ইসলাম, পৃঃ ৯১।
৬। ইসলামী বিশ্বকোষ, খন্ড ৭ম, পৃ ৩২৭।
৭। ডঃ আবদুল কাদের, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

৪। খাজা ইবরাহীম
৫। খাজা আবূ মুহাম্মদ
৬। খাজা আওহাদ
৭। খাজা ওমর
৮। খাজা আবূ আলা
৯। খাজা আবূ সোবহান
১০। খাজা নাছিরুদ্দীন
১১। খাজা সাইফ উদ্দীন
১২। খাজা মুহআব
১৩। খাজা মুজাফফার
১৪। খাজা সূফী
১৫। খাজা আবদুল্লাহ
১৬। খাজা বায়যীদ
১৭। খাজা শামছুদ্দীন
১৮। খাজা সায়ফুল্লাহ
১৯। খাজা নাজীব
২০। খাজা নাসিরুদ্দীন
২১। কাযী নিজামুদ্দীন
২২। শায়খ আশরাফ
২৩। শায়খ বুরহানুদ্দীন
২৪। শায়খ সাদুল্লাহ হাফিজ
২৫। শায়খ মাখদূম শাহলাদ হাফিজ
২৬। শায়খ মুহাম্মদ হাফিজ
২৭। শায়খ হামিদ
২৮। শায়খ আবুল ফাত্তাহ
২৯। শায়খ আবদুল্লাহ
৩০। শায়খ আবূ মুহাম্মদ
৩১। শায়খ মুহাম্মদ ওলি
৩২। শায়খ মুহাম্মদ ফাজিল
৩৩। শায়খ মুহাম্মদ দায়েন
৩৪। শায়খ গুল মুহাম্মদ
৩৫। শায়খ হারুল্লাহ
৩৬। আবূ ইবরাহীম শায়খ ইমাম বখশ
৩৭। কারামত আলী জৌনপুরী ।[১]

১। ইসলামী বিশ্বকোষ, খন্ড.৭ম., পৃঃ ৩২৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর পিতার নাম ছিল আবু ইব্রাহীম শায়খ ইমাম বখ্শ। তিনি একজন তাপস ও অত্যন্ত বুযুর্গ লোক ছিলেন । তিনি জৌনপুর কালেক্টরীতে সিরিশতাদার হিসেবে চাকুরী করতেন । মুসলিম আমলে তাঁদের পরিবার খতীবী করত।

মাওলানা কারামত আলী পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান ছিলেন । শৈশবকাল থেকেই শান্ত, সুচতুর প্রত্যুৎপন্নমতি, সংযত, চিন্তাশীল, স্বল্পভাষী, ভাবুক ও ধীর প্রকৃতির ছিলেন । সাধারণ বালকদের চেয়ে চাল চলন ও আচার-আচরণে তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির ছিলেন । অকারণে হৈ-হুল্লোড় বা খেলাধুলা থেকে তিনি নিজেকে বিরত রাখতেন । সব সময়েই সৎ, বয়োজ্যেষ্ঠ, জ্ঞানী ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিবর্গের সংস্পর্শে থেকে ধর্মীয় আলাপ-আলোচনা করতে ও শুনতে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও প্রখর ধীশক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁর স্মরণশক্তি এত প্রখর ছিল যে, একবার কিছু পড়লে কখনও তা ভুলে যেতেন না। এমনকি মায়ের কোলে বসে দুধ পান থেকে শুরু করে শৈশবের প্রতিটি ঘটনাই তিনি আমরণ পুংখানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করতে পারতেন।[১] বাল্যকাল থেকেই তাঁর লেখাপড়ার প্রতি অত্যধিক ঝোঁক ছিল। গৃহে পিতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন । ৫ বৎসর বয়সে তাঁকে আমপারার সবক দেয়া হয় । ৭ বৎসর বয়সে তিনি আমপারা ও ১০ বৎসর বয়সে সমগ্র কুর'আন কণ্ঠস্থ করেন । তৎসঙ্গে ফারসী ভাষাও শিক্ষা করেন ।[২] শৈশবকাল থেকেই তিনি অত্যন্ত ধর্মভীরু ছিলেন। মাত্র ৭ বৎসর মতান্তরে ১০ বৎসর বয়ঃকাল থেকেই নিয়মিত নামায পড়তে ও রোযা রাখতে আরম্ভ করেন। নামাযের পর আল্লাহর ধ্যানে মশগুল হতেন। এতটুকু ছেলের এমনি ধরনের ধর্মনিষ্ঠা দেখে সাধারন লোকেরা অবাক হয়ে যেত ।[৩] ধর্ম-কর্ম ছাড়াও বাল্যকাল থেকেই তিনি মাতাপিতার সাংসারিক কাজে সাহায্য এবং উস্তাদ, মুরুব্বী, আলিম, বুযুর্গ ব্যক্তি, এমন কি মেহমানদের পর্যন্ত খিদমত করতে কখনও পিছপা হতেন না । আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর প্রতিও তিনি অতিশয় সংবেদনশীল, সহানুভূতি-সম্পন্ন ও পরদুঃখকাতর ছিলেন ।[৪] ইয়াতীম বালক-বালিকা ও বিধবা রমণীদের দুঃখ কষ্ট দেখলে তিনি ব্যথিত হতেন, তাদের খোঁজ খবর নিতেন এবং কারও বাড়ীতে পানির অভাবের কথা জানতে পারলে নিজে মশকে করে তা পৌঁছিয়ে দিতেন ।[৫] তৎকালে শিক্ষা সংস্কৃতির জন্য জৌনপুর নগরী প্রসিদ্ধ ছিল। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনান্তে সেখানকার কয়েকজন সেরা পন্ডিত ও বিশেষজ্ঞদের নিকট বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন । যেমন- মাওলানা কুদরতুল্লাহ রুদলুবীর নিকট ধর্মবিষয়ক, মাওলানা আহমদুল্লাহ থানভী থেকে হাদীস বিষয়ক, মাওলানা আহমদ আলী চেরিয়াকুটীর নিকট ইলম-ই-মা'কূলাত (জ্ঞানতত্ত্ব), কারী সায়্যিদ ইবরাহীম মাদানীর নিকট ইলম-ই-তাজবীদ শিক্ষা লাভ করেন ।[৬] মুলত তাঁর পিতার কাছে কুর'আন পাঠ শিক্ষা লাভ করলেও ছাত্র জীবনে ইলম-ই-তাজবীদ ভালভাবে শিক্ষার সুযোগ পাননি। পরবর্তীকালে মক্কায় গিয়ে ইলম-ই-তাজবীদ উত্তমরূপে শিখেন এবং এ বিষয়ে কয়েকখানি উন্নত মানের গ্রন্থ রচনা করেন ।[৭] দিল্লীর প্রসিদ্ধ 'আলিম শাহ্ ওয়ালী-এর পুত্র শাহ্

১। মুহাম্মদ হাসান আলী চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯২ ।
২। ইসলামী বিশ্বকোষ, খন্ড ৭ম, পৃ ৩২৭ ।
৩। ডঃ আবদুল কাদের, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৬ ।
৪। মুহাম্মদ হাসান আলী, চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯২ ।
৫। ডঃ আবদুল কাদের, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৬ ।
৬। ডঃ আবদুল কাদের, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৬; রশীদ, আহমদ, বাংলাদেশের সুফী সাধক , পৃঃ ১৮০, 'মুরাদুল মুরীদীন', মাওলানা কারামত আলী, অনুদিত এ.বি, এম, সানাহ উদ্দীন, পৃঃ ১৩; মুহাম্মদ হাসান আলী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯২-৯৩ ।
৭। ইসলামী বিশ্বকোষ, পৃঃ ৩২৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি হাদীসের জ্ঞান লাভ করেন । এভাবে অল্পকালের মধ্যেই মাওলানা সাহেব নিজেকে একজন বিখ্যাত আলিম ও পন্ডিত হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন । মাত্র উনিশ বৎসর বয়সে তিনি 'মিফতাহুল জান্নাত' নামে একটি অমূল্য গ্রন্থ উরদু ভাষায় রচনা করেন- যা অদ্যাবধি কমপক্ষে ১৮টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে ।[১] হাফিজ আবদুল গনীর নিকট তিনি 'ইলমুল কিতাবাত' (হস্তলিপি বিদ্যা) আয়ত্ব করেন । একজন সুনিপুন হস্তলিপি বিশারদ ছিলেন । সপ্তলিখন[২] পদ্ধতিতে লিখতে পারতেন। তিনি এত সুন্দর ও এত সুক্ষ্ম লিখতে পারতেন যে, একটি চালের উপর বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীমসহ সূরা ইখলাস এবং শেষে নিজের নামও লিখতে পারতেন । তিনি বহু লোককে লিখন-বিদ্যা শিক্ষা দিয়ে সুলেখক বানিয়েছিলেন । তাঁর লিখিত আরবী পুস্তকাবলী এবং হাতের লেখা কুরআন শরীফ আজও বহু লোকের নিকট বর্তমান আছে। নিজ হাতে কুর'আন শরীফ লিখে বিক্রি করে তিনি ইসলাম প্রচারের নিমিত্ত বিভিন্ন স্থানে যাতায়তের খরচ যোগাতেন ।[৩]

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পান্ডিত্য অর্জন করা ছাড়াও মাওলানা সাহেব প্রিয় মাতৃভুমিকে স্বাধীন করার মানসে সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং বিহারী নামক জনৈক সামরিক বিদ্যায় পারদর্শী স্বর্ণকারের নিকট হতে সামরিক শিক্ষায় দক্ষতা অর্জন করেন । এভাবে তিনি শুধুমাত্র ধর্মীয় বিষয়েই পান্ডিত্য লাভ করেননি, সৈনিক হিসেবেও যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি নিজের মঙ্গল, জনগণের কল্যাণ ও দেশের মুক্তি ও উন্নতির জন্য সকল প্রকার বিদ্যা শিক্ষা ফরয বলে মনে করতেন । পরবর্তীকালে পাক-ভারত ও বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের সময় বিভিন্ন স্থান সফরকালে বিপদাপদে এই সামরিক বিদ্যা তাঁর জীবন রক্ষার্থে সহায়তা করে ।[৪]

রায় বেরেলীর বিখ্যাত সংস্কারক সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (১৭৮২-১৮৩১) ১২৩৪/১৮১৯ সালে দিল্লী থেকে রায় বেরেলীতে প্রত্যাবর্তন করেন । এ সময়েই ১৮ বৎসর বয়সে কারামত আলী রায় বেরেলীতে তাঁর সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। তাঁর নিজের রচিত 'নুরুন আলা নুর' ও 'যাদুত তাকওয়া' গ্রন্থে কারামত আলী লিখেছেন যে, তিনি তাঁর মুরশিদ-এর হুকুমে রায় বেরেলীতে ১৮ দিন অবস্থান করে বেরেলীর মসজিদে মুরশিদ-এর কাছে আধ্যাত্মিক দীক্ষা পূর্ণ মাত্রায় লাভ করেন । তাঁর মুরশিদ এই ১৮ দিন যাবত তাঁকে 'ইলমুল মা'রিফাহ ওয়াত তারীকাহ' শিক্ষা দিয়ে যে সব রহস্য উদঘাটন করে দিয়েছেন তা পরবর্তীকালে আধ্যাত্মিক শিক্ষা দীক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত ফলপ্রসু হয়েছে ।[৫] ১২৩৬/১৮২১ সালে সায়্যিদ আহমদের মক্কা যাওয়ার পথে তিনি দ্বিতীয়বার তাঁর মুরশিদ এর সঙ্গে সাক্ষাত করেন এবং কলিকাতা পর্যন্ত তাঁর সাথে ছিলেন। এখান থেকে কারামত আলী আবার জৌনপুরে ফিরে যান এবং পরের বৎসরেই দীন ইসলামের দাওয়াত নিয়ে বাংলাদেশে আসেন। ১২৩৯/১৮২৩ সালে যখন সায়্যিদ আহমদ মক্কা থেকে কলিকাতা হয়ে রায়বেরেলীর দিকে ফিরে যাচ্ছিলেন তখন কারামত আলী আবার তাঁর মুরশিদ- এর সঙ্গে মিলিত

১। মুহাম্মদ হাসান আলী, চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৩।

২। তবে ইসলামী বিশ্বকোষে তাঁর নাসতালীক, নাসখ ও তুগরা এই তিন পদ্ধতির লেখার উল্লেখ রয়েছে।

৩। ডঃ আবদুল কাদের, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৫, কারামত আলী জৌনপুরী, মুরাদুল মুরীদীন , পৃঃ১৪, রশীদ আহমদ প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮০।

৪। মুহাম্মদ হাসান আলী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৩-৯৪; ডঃ আবদুল কাদের, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৬, রশীদ আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮০ ।

৫। মাওলানা কারামত আলী, নুরুন আলা নুর , পৃঃ ৭৩-৭৪; যাদুত তাকওয়া, পৃঃ ১১৩. ইসলামী বিশ্বকোষ, খন্ড-৭ম.,পৃঃ ৩২৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

হন এবং মির্যাপুর পর্যন্ত মুরশিদ-এর সাথে থাকেন । এই তৃতীয় বারের সাক্ষাতে সায়্যিদ আহমদ তাঁকে ১২৩৯ হিজরীর ২রা সাবান/ ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ৩রা এপ্রিল খিলাফতনামা দান করেন। এই খিলাফতনামা আজও তাঁর উত্তরাধিকারীদের কাছে সংরক্ষিত আছে ।[১] সায়্যিদ আহমদ বেরলভীর সাথে কারামত আলীর সাক্ষাত এবং তাঁর কাছে বায়'আত গ্রহণ সম্পর্কে কিছু মতের পার্থক্য আছে। যেমন - James Wise, J.C. Jack ও আল্লামা ইউসূফ আলীর মতে, মাওলানা কারামত আলী কলিকাতায় সায়্যিদ আহমদের সঙ্গে ছিলেন ।[২] নুরুদ্দীন যায়দী বলেন যে, মাওলানা কারামত আলী সায়্যিদ আহমদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। আবদুল কাদির কুমিল্লা হতে মাওলানা কারামত আলীর পুত্র আবদুল আওয়ালকে এক দীর্ঘ পত্রে লিখেন যে, মাওলানা কারামত আলী ২৩ বৎসর বয়সে বানারসে সায়্যিদ আহমদের হাতে বায়'আত হন। সুতরাং দীক্ষা লওয়ার সময় ও স্থান সম্পর্কে মতানৈক্য থাকলেও তিনি যে সায়্যিদ আহমদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে আধ্যাত্মিক দীক্ষা লাভ করেছিলেন এ ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই এবং তিনি যে অল্প বয়সেই তাঁর মুরশিদ সায়্যিদ আহমদের নিকট বায়'আত হয়ে আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করেছিলেন, তাও বিভিন্ন বর্ণনা হতে বুঝা যায় । নকশবন্দিয়া মুজাদ্দিদিয়া তারীকাহ অনুযায়ী মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী থেকে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) পর্যন্ত শাজারা নিম্নরূপ ঃ-

১। ফকীর কারামত আলী
২। হযরত সায়্যিদ আহমদ বেরলভী
৩। হযরত মাওলানা শায়খ আবদুল আযীয
৪। হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী
৫। হযরত শায়খ আবদুর রহীম
৬। হযরত শায়খ আবদুল্লাহ আকবরাবাদী
৭। হযরত সায়্যিদ আদম বান্নুরী
৮। হযরত শায়খ আমহদ সিরহিন্দী মুজাদ্দিদে-ই-আলফ-ই-সানী
৯। হযরত খাজা মুহাম্মদ বাকী বিল্লাহ
১০। হযরত খাজা আমবানকী
১১। হযরত মাওলানা দরবেশ মুহাম্মদ
১২। হযরত মাওলানা যাহিদ
১৩। হযরত ওবায়দুল্লাহ আহরার
১৪। হযরত মাওলানা ইয়াকুব চরখী
১৫। হযরত বাহাউদ্দীন নকশবন্দী
১৬। হযরত শাম্মাছী
১৭। হযরত আলী রামতেনী

১। ইসলামী বিশ্বকোষ, খন্ড ৭ম, পৃঃ ৩২৭।

২। James wise, Notes on the Races, casts and trades of Eastern Bengal, page-29; J.C. Jack, Bengal district gazetteer, Bakerganj, page-34; ইউসুফ আলী Encyclopedia of Islam, Voll-II, নুরুদ্দীন যায়দী, তাজাল্লী-ই-নুর, ২য় খন্ড, জৌনপুর, ১৯০০, পৃঃ ১২৩; আবদুল হাই আল হুসাইনী, নুযহাতুল খওয়াতির, পৃঃ ১৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

১৮। হযরত মাহমুদুল খায়ের ফাগনুবী
১৯। হযরত আরিফ রেগওরী
২০। হযরত খাজেগানে আবদুল খালিক আজদাওয়ানী
২১। হযরত ইউসুফ হামদানী
২২। হযরত আবু আলী ফারমেদী
২৩। হযরত ইমাম আবুল কাসিম কুশায়রী
২৪। হযরত আবু আলী দাকাক
২৫। হযরত শায়খ আবুল কাসিম নাছিরাবাদী
২৬। হযরত শায়খ আবু বকর শিবলী
২৭। হযরত সাইয়্যিদুত তায়েফা জুনায়দ বাগদাদী
২৮। হযরত শায়খ আবুল হাসান ছিরীছউতী
২৯। হযরত শায়খ মারুফ কারখী
৩০। হযরত ইমাম আলী রিযা
৩১। হযরত ইমাম মুছা কাজিম
৩২। হযরত ইমাম যাফর সাদিক
৩৩। রয়ীসুল ফুকাহা ওয়াত তাবেয়ীন হযরত কাসিম ইবনে মুহাম্মদ
৩৪। হযরত সালমান ফারসী
৩৫। হযরত আমীরুল মোমেনীন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)
৩৬। জনাবে সাইয়্যেদুল মুরসালীন ইমামুল মুত্তাকীন হযরত আহমদ মুজতবা মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ)।

এরপর মাওলানা কারামত আলী মক্কায় হজ্জ পালন করেন। তাঁর কোন পুস্তকে এ হজ্জের উল্লেখ করা হয়নি । তাঁর 'মিফতাহুল জান্নাত' গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেছেন যে তিনি হজ্জ সমাপনান্তে দেশে ফিরে (১২৪৩হিঃ/ ১৮২৭খৃঃ) এ পুস্তক ছেপেছেন। জেমস্ ওয়াইজ এর মতে, ''কারামত আলী সায়্যিদ আহমদ বেরলভীর সাথে হজ্জ পালন করেন''। কিন্তু এ তথ্য কোথাও পাওয়া যায়না। জে, সি, জ্যাক এর মতে, মাওলানা কারামত আলী সায়্যিদ আহমদের সাথে মক্কা যাননি। দ্বিতীয়বারও মাওলানা তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, মক্কায় কারীদের কাছে দু'বৎসরকাল যাবত 'ইলম-ই-কিরআত' শিক্ষা লাভ করেন অথচ সায়্যিদ আহমদ বেরলভী মক্কায় ১৪ মাস অবস্থান করেন ।[১] বিভিন্ন তথ্য যাচাই বাছাই করে এ তথ্যে উপনীত হওয়া যায় যে, তিনি মক্কা গিয়েছেন এবং হজ্জ সম্পন্ন করেছেন। কিন্তু তিনি তাঁর মুরশিদ সায়্যিদ আহমদের সঙ্গে হজ্জ সম্পন্ন করেননি । তিনি সম্ভবতঃ ১২৪০হিঃ/ ১৮২৬ সালে দেশে ফিরে আসেন ।

মাওলানা কারামত আলী হাদীস শাস্ত্রে একজন উচ্চস্তরের মুহাদ্দিছ ছিলেন এবং হাদীসের দু'খানা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'মিশকাতুল মাসাবীহ' ও শামাইলে তিরমিযি-এর উর্দূ অনুবাদ করেন । আরবী থেকে শুধু অনুবাদ করেই তিনি ক্ষান্ত হননি, বরং ভূমিকা লিখেছেন এবং স্থানে স্থানে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাও দিয়েছেন ।

১। ইসলামী বিশ্বকোষ, খন্ড-৭ম,পৃঃ ৩২৮।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি ফিকহ্ শাস্ত্রেও বুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন । তাঁর হাদীসের শিক্ষক আহমদুল্লাহ সাহেব তাকলীদ[১] সমর্থন করতেন। অনুরূপভাবে মাওলানা কারামত আলীও তাকলীদ সমর্থন করতেন । তিনি হানাফী মাযহাবের নিষ্ঠাবান অনুসারী ছিলেন । এ জন্যই তিনি ফিকহ্ শিক্ষার উপর অত্যধিক তাকীদ দিতেন এবং যারা ফিক্হ-র বিধান মানত না তাদের নিন্দা করতেন এবং তাদেরকে লা মাযহাবী বা ওয়াহাবী[২] বলতেন। অতএব যারা তাঁকে ওয়াহাবী বলেছেন তাদের ধারণা যে সত্য নয় এর দ্বারা তা পরিষ্কার বুঝা যায়। ফিকহ্ বিষয়ে তিনি তিনখানা পুস্তক- 'মিফতাহুল জান্নাত', যীনতুল মুসাল্লী ও 'তায্কিরাতুন নিসা' রচনা করেন যা মুসলিম সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে। বিশেষ করে তাঁর জীবনের প্রথম পুস্তক মিফতাহুল জান্নাত বহু বার উর্দু ও বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে যা আজও বাংলার প্রায় ঘরে ঘরে পাওয়া যায় ।[৩]

তিনি উচ্চ মানের একজন কারী ছিলেন । 'ইলমুত তাজবীদ'-এ তাঁর শিক্ষক ছিলেন ক্বারী সায়্যিদ মুহাম্মদ ইসকান্দারানী ও মুহাম্মদ ইবরাহীম মাদানী। তবে তাঁর প্রাথমিক বা মাধ্যমিক শিক্ষার পর্যায়ে কোন ক্বারী শিক্ষকের নাম পাওয়া যায় না। এতে প্রমানিত হয় যে, প্রাথমিক বা মাধ্যমিক শিক্ষার পর্যায়ে 'ইলমুত তাজবীদ' শিক্ষা লাভ করার তিনি কোন সুযোগ পাননি। তবে, মক্কায় গিয়ে তিনি এ বিদ্যা অর্জন করার সুযোগ পান এবং সুযোগ্য শিক্ষকের নিকট শিক্ষা লাভ করে এ বিষয়ের উপর চারখানা পুস্তক যথাঃ-শাহরি জাযারী হিন্দী (কলিকাতা ১২৬৪হিঃ/ ১৮৪৭ইং), কাওকাব দুররী (কলিকাতা ১২৬৩হিঃ/ ১৮৪৬ ইং), যীনাতুল কারী (কলিকাতা ১২৬৪হিঃ/ ১৮৪৭ ইং) ও মাখরিজুল হুরুফ রচনা করেন। তাঁর লেখা এ পুস্তকগুলো এদেশে এত সমাদৃত হয়েছে যে, এ দেশের বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এগুলো পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ।

কবি হিসেবে তিনি পরিচিত না হলেও তিনি সুন্দর ও সাবলীল কবিতা রচনা করতেন যা তাঁর গ্রন্থের কোন কোন স্থানে দেখা যায় ।

তিনি একজন সফল তর্কবিদ ছিলেন । ইসলাম প্রচারকালে যখন তিনি বিভিন্ন স্থানে যেতেন তখন তাঁকে তাঁর বিরোধীদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতে হয়। এ সব বিতর্কে তিনি তাঁর বিপক্ষকে হারায়ে জয় লাভ করতে সমর্থ হন ।[৪] কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ও বিদ'আত কার্যে লিপ্ত জনসমাজকে সৎ ও সুন্দর জীবনাদর্শের আলোকে উজ্জীবিত করে তুলতে তিনি ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজে বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু এ দায়িত্ব পালনের সময় তাঁকে অনেকবার নানা প্রকার ষড়যন্ত্র, নাশকতামূলক ও হিংসাত্মক চক্রান্তের শিকারে পরিনত হতে হয়েছে। দীনী শিক্ষা গ্রহনের মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে মোল্লাটোলার একটি দোতলা বাড়ীতে আটকে রেখে তাঁকে হত্যার হীন চেষ্টা চালানো হয়। কিন্তু তিনি ব্যাপারটি বুঝতে পেরে 'বুনট' নামক এক বিশেষ ধরনের ব্যায়াম কৌশলের মাধ্যমে শত্রুদেরকে বিভ্রান্ত করে আত্মরক্ষা করেন। আজমগড় জিলার বিখ্যাত সৈনিকরা মাওলানার লাঠি ও

১। তাকলীদ শব্দের অর্থ হার পরান, গলায় অথবা কাঁধে কোন কিছু ঝুলায়ে দেয়া। ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় ধর্মীয় ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের মতামতের অনুসরণ, অন্যের কথাও কাজের নির্ভুল হওয়া সম্পর্কে কোন যুক্তি প্রমাণের সন্ধান না করেই সেগুলোকে নির্ভুল বিশ্বাস করতঃ প্রামাণ্য বলে স্বীকার করা (ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খন্ড, পৃঃ ৪৫০)।

২।

৩। ইসলামী বিশ্বকোষ, খন্ড.৭ম.,পৃঃ ৩২৮।

৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২৮।

Dhaka University Institutional Repository

বুনট কৌশল দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। এই ঘটনার পর সে এলাকায় ইসলাম প্রচার তাঁর পক্ষে বিশেষ সহজসাধ্য হয় ।[১] আর একবার আজমগড়ের জমিদারদের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ হয় ।[২] ইসলাম প্রচার সম্পর্কে তিনি বলেন, ''এ ফকীর তাবলীগহেতু অনেক চেষ্টা ও কষ্ট করেছে । প্রাণ নাশের আশংকা নিয়েও দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করতে হয়েছে। কুরআন শরীফ নকল করে এবং তেজারতী করে ব্যয় সংকুলান করতে হয়েছে । প্রায় ক্ষেত্রে প্রান ভয়ে এ হতভাগ্যকে অস্ত্রসহ প্রস্তুত থাকতে হয়েছে''।[৩]

সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (রঃ) তাঁকে খিলাফতের অনুমতি দিয়ে বাড়ীর (জৌনপুর) উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার আদেশ প্রদান করেন। এককালীন ইসলামী শিক্ষার কেন্দ্র জৌনপুরও তখন শিরক-বিদ'আতের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। তাই, তিনি জৌনপুরের পার্শ্ববর্তী শহর আজমগড়, খয়রাবাদ, ফয়যাবাদ ও সুলতানপুর প্রভৃতি স্থানে সেখানকার মুসলিম সমাজকে বাস্তব জীবনে ইসলামের বিধান মেনে চলার আহবান জানিয়ে জৌনপুরে ফিরে এসে হিদায়াতের কাজে আত্মনিয়োগ করেন । ঘরে ঘরে গিয়ে নামায, রোযা, পর্দা ও অন্যান্য ধর্মীয় কার্যাবলী পালনের জন্য লোকদেরকে উপদেশ দিতে লাগলেন।[৪] তদানীন্তন জৌনপুরে দিনের বেলায় কোন আযান দেয়া হত না । কতিপয় মসজিদে সকাল সন্ধা সুর্যের উদয় অস্তের সংকেত প্রদানের জন্য আযান দেয়া হত । মসজিদগুলোতে গান-বাজনা ও অন্যান্য পাপাচারমুলক কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত হত । এ জঘন্য পাপাচারের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে তিনি মসজিদসমুহে নামায, আযান ও জামা'আত কায়েম করেন । মানুষ যাতে সহজেই ইসলামী তাহযীব ও তমদ্দুন সম্পর্কে অবহিত হতে পারে সে জন্য তিনি মসজিদে মসজিদে খন্ডকালীন মক্তবেরও প্রচলন করেন ।[৫]

জৌনপুরের শেষ শারকী সুলতান ইবরাহীম শারকী তাঁর পীর হযরত ঈসা তাজ (রঃ) -এর ইঙ্গিতে জৌনপুর শহরে এক বিরাট শাহী জামে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। কালক্রমে সেটি ব্যভিচারসহ বিভিন্ন জঘন্য পাপাচারের কেন্দ্রে পরিণত হয়। সেখানে আযান, জুম'আর নামায ও জামা'আত অনুষ্ঠিত হত না। ক্লাবের ন্যায় সমস্ত বাজে কাজে ব্যবহৃত হত। এমন কি কতকাংশে গরু ছাগল রাখা হত। মসজিদের এ দুরাবস্থা দেখে তিনি মর্মাহত হন । এবং মসজিদকে পবিত্র করতে সমর্থ হন। সর্বপ্রথম তিনি সে মসজিদে পাঁচজন মুসুল্লীসহ জামা'আতের সাথে নামায আদায় করেন। এরপর থেকে সেখানে নিয়মিত আযান ও জামা'আতের সাথে নামায আদায় অব্যাহত থাকে। জৌনপুর জামে মসজিদসহ এলাকার অন্যান্য মসজিদে নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও যিক্র এর মাহফিল কায়েম করেন। তাঁরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও সাধনার ফলে মৃতপ্রায় মসজিদগুলো আবার আযান, জামা'আত ও ধর্মীয় আলোচনায় মুখরিত হয়ে উঠে। এভাবে জৌনপুরের সর্বত্র ইসলামের আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত হয় এবং ইসলামী বিধি-বিধান পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠে ।[৬] অবশ্য এসব কর্ম সম্পাদন করতে তাঁকে বহু বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়। যেমন - একদা এক বুড়ী তাঁর গায়ে একটি কলস ছুড়ে মেরে বলে এই

১। মুহাম্মদ হাসান আলী চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৪।
২। ডঃ আবদুল কাদের, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৮।
৩। মুহাম্মদ হাসান আলী চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৪।
৪। ইসলামী বিশ্বকোষ, খন্ড.১১শ.,পৃঃ ৩৩০।
৫। মাওলানা এম,ওবাইদুল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৪; মুহাম্মদ হাসান আলী চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৫।
৬। মাওলানা এম,ওবাইদুল হক, প্রাগুক্ত,পৃঃ ১৯৪; মুহাম্মদ হাসান আলী চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃঃ৯৫-৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

নূতন মৌলবী নয়া আইন জারী করতে এসেছে । সে পাঁচ বার আযান দিতে বলে যা আমার বাপ-দাদারাও কখনও শুনেনি। আর একবার তাঁর বিরুদ্ধবাদীরা তাঁকে প্রাণে বধ করার জন্য টাকা দিয়ে মসজিদে এক গুন্ডা নিয়োগ করে । তিনি নামায পড়ে বের হওয়ার সময় সে তাঁর মাথার উপর তলোয়ার উত্তোলন করা মাত্রই তার হাত অবশ হয়ে যায় । তখন সে তাঁর কাছে সমস্ত ব্যাপারটা ফাঁস করে দেয়, তাঁর পায়ে পড়ে ক্ষমা চায় ও তাঁর মুরীদ হয় ।

জৌনপুরের প্রসিদ্ধ সরদার ইমাম বখশ হাজীসহ অন্যান্য ধর্মপ্রান ব্যক্তিদের সহযোগিতায় মাওলানা সাহেব তথায় ইসলামী শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে 'হানাফী মাদ্রাসা' নামে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন। কালক্রমে এই মাদ্রাসা সমগ্র ভারতে ইসলামী শিক্ষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত হয়। মাওলানা আবদুল হালীম উক্ত মাদ্রাসার প্রথম মুদাররিস ছিলেন। তৎকালীন অনেক বড় বড় আলিম এখানে শিক্ষা দান করতেন। এখানে অধ্যয়ন করে বহু ছাত্র 'আলিম হয়ে শিক্ষা বিস্তারের জন্য দূর দেশে গমন করেন। এভাবে তিনি আজমগড়, গাজীপুর, ফয়যাবাদ, সুলতানপুর ও জৌনপুরে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে ইসলাম প্রচার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজ সম্পন্ন করেন ।

পাঞ্জাবের তৎকালীন রাজা রণজিত সিংহ ও শিখরা মুসলমানদের উপর অকথ্য নির্যাতন করত। তাই, সায়্যিদ আহমদ বেরলভী তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। মাওলানা কারামত আলীও তাঁর সাথে জিহাদের অংশ গ্রহনের অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি তাঁকে তৎকালীন পূর্ব বাংলায় (বাংলাদেশ) এসে শিরক-বিদ'আতের বিরুদ্ধে জিহাদ করার আদেশ দেন। কারণ, তখন বাংলা ও আসামের মুসলমানদের ধর্মীয় অবস্থা অত্যন্ত করুণ ছিল। মুসলমানদের অনেকেই নামায-রোযা ছেড়ে অনেক শরী'আত বিরুদ্ধ কাজ, পীর পূজা ও কবর পূজায় লিপ্ত ছিল। গায়রুল্লাহর (আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে) মানত করত। মৃত পীর-ফকীরের মাযারে প্রয়োজন পুরনের জন্য দোয়া প্রার্থনা করত। হিন্দুদের পূজা-পার্বনে শরীক হয়ে শিরক করত। পর্দা প্রথা উঠে যাওয়ায় নারী হরণ ও ধর্ষণ প্রভৃতি অসামাজিক কাজ বৃদ্ধি পায় । অনেকেই লেংটি বা গামছা পরে থাকত ।[১] পূর্ব বাংলার মুসলমানদের এমনি দুর্দিনে তিনি জৌনপুর থেকে কলিকাতায় চলে আসেন । অতঃপর কলিকাতা থেকে খুলনা, যশোর, বরিশাল, চট্টগ্রাম, সন্দ্বীপ, ঢাকা, সিলেট ও আসামের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করে ইসলামের সংস্কার সাধনপূর্বক ইহার পুনরুজ্জীবনে সচেষ্ট হন ।[২]

মাওলানা কারামত আলী ১৮২১ খৃঃ সায়্যিদ আহমদ-এর সাহচর্যে প্রথম বারের মত কলিকাতা আসেন। কিন্তু এ সময়ে তিনি এদেশে বেশী দিন অবস্থান করেননি। জে, সি, জ্যাক-এর মতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার পর মাওলানা কারামত আলী ইসলামের আকীদা ও বিশ্বাস এদেশের লোকদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য ১৮২২ খৃঃ বাংলাদেশে আসেন। প্রথমে তিনি একাই এসেছিলেন। ১২৫০ বঙ্গাব্দে/ ১৮৩৫ খৃঃ তিনি পরিবার-পরিজনসহ বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য চলে আসেন। এ ভ্রমণের সময়েই কলিকাতায় তাঁর পুত্র হাফিজ আহমদ জম্মগ্রহণ করেন । অতঃপর তিনি ইসলামের খিদমতে সর্বক্ষণ নিয়োজিত থাকেন । ফরিদপুর, ঢাকা, বরিশাল, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, নোয়াখালী, কুমিল্লা, সিলেট, রংপুর, পুর্ণিয়া, খুলনা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও পাবনা

১। ডঃ আবদুল কাদের, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৮।

২। গোলাম সাকলায়েন, বাংলাদেশের সূফী-সাধক, পৃঃ৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

এই সমস্ত জেলার বিভিন্নস্থানে তিনি ইসলাম প্রচার ও প্রসারের নিমিত্তে ভ্রমণ করেন ।[১]

বাংলাদেশে সংস্কারের মহান উদ্দেশ্যে মাওলানা কারামত আলী জৌনপুর থেকে কলিকাতায় আগমন করেন। কলিকাতার সকল এলাকায় গিয়ে নামায, রোযা ও ধর্মীয় মুলনীতিসমুহ কায়েম করার জন্য চেষ্টা করেন। অপরদিকে তিনি বিধর্মীদের কার্যকলাপ মুলোৎপাটনের ব্যাপক প্রচেষ্টাও অব্যাহত রাখেন। অতঃপর তিনি কতিপয় মুরীদসহ পানসীযোগে কলিকাতা থেকে প্রথমে বাংলাদেশের যশোর জেলায় আগমন করে সেখানে দীন বিস্তৃত জনগনের মাঝে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেন। যশোর জেলার বিভিন্ন স্থানে খন্ডকালীন মক্তব স্থাপন করেন। এবং সেখানেও নামায, রোযা ও কালেমা কায়েম করেন।

তারপর তিনি পনসীযোগে বরিশাল অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেখানে তিনি কিছু সংখ্যক অজ্ঞ লোক কর্তৃক নাজেহাল হন। এতে হতোদ্যম না হয়ে তিনি অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে দাওয়াতের কাজ সম্পন্ন করে অতি অল্পকালের মধ্যে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হন। সেখান থেকে তিনি নোয়াখালী জেলার দিকে অগ্রসর হন এবং সেখানকার সর্বসাধারণ কর্তৃক সাদরে গৃহীত হন। ফলে তিনি নোয়াখালী জেলার হাতিয়া, সন্দ্বীপ, ভনুয়া প্রভৃতি প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিতে সক্ষম হন। তাঁর প্রচেষ্টার ফলেই অন্যান্য স্থানের চেয়ে বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার সর্বত্র অসংখ্য মসজিদ, মাদ্রাসা ও মক্তব স্থাপিত হয়। এরপর মাওলানা সাহেব ঢাকা রওয়ানা হওয়ার পুর্বে ফরিদপুর জেলায় অবস্থান করে তথায় ইসলাম প্রচার করেন। ঢাকা পৌছে তিনি তাঁর সহযোগীগনসহ গ্রাম-গ্রামান্তরে ছুটাছুটি করে স্বল্প সময়ের মধ্যেই ইসলামকে পূণঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। এভাবে সুদীর্ঘ আঠার বছর বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার শহর ও গ্রামগুলোতে ইসলাম প্রচারের কাজ করে জৌনপুরে প্রত্যাবর্তন করেন। স্বদেশে স্বল্পকাল অবস্থানের পর তিনি পুনরায় আসাম গমন করে সেখানে ইসলামের বাণী প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। আসামের মুসলমানদের করুণ অবস্থা দেখে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হন। সেখানে পুরুষরা লেংটি এবং মেয়েরা ব্যবহার করত ছোট ছোট গামছা। তিনি প্রথম দিকে ইসলাম প্রচারের চেয়ে সেখানে তাদের মাঝে মার্জিত পরিবেশ সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালান।[২] এজন্য তিনি কলিকাতা থেকে চার হাজার লুঙ্গি ও চার হাজার টুপি সংগ্রহ করে তাদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করেন ।[৩] জনৈক ইংরেজ ঐতিহাসিক বলেন, জৌনপুরের মওলানা কারামত আলী সাহেব বাংলা ও আসামের লোকজনদের শুধু মুসলমানে পরিনিত করেই ক্ষান্ত হননি, উপরন্তু কাপড় ও পোশাক প্রদান করে অমুসলমানদেরকে মুসলমানে পরিণত করেছেন''।[৪] বাংলাদেশ ও আসামের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমনের সময় তিনি যে শুধু মাত্র মৃতপ্রায় ইসলামকে সঞ্জীবিত করেছেন তা নয়, তিনি বহু অমুসলমানকেও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেছেন ।[৫] এরূপে মাওলানা কারামত আলীর ব্যাপক কর্মপ্রচেষ্টা ও প্রেরণার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ ইসলামের ছায়াতলে প্রবেশ করে বংশানুক্রমিকভাবে আল্লাহর বিধান মাফিক চলতে সমর্থ হয়েছে ।

১। ইসলামী বিশ্বকোষ, খন্ড-৭ম, পৃঃ ৩৩০।
২। মুহাম্মদ হাসান আলী চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৭-৯৮।
৩। ডঃ আবদুল কাদের, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০১।
৪। মুহাম্মদ হাসান আলী চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৮।
৫। গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

সেকালে বর্তমানের ন্যায় যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত না থাকায় মাওলানা কারামত আলী পরিবার পরিজনসহ নৌকাযোগে বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমন করতেন এবং নৌকাতেই সাধারণত বসবাস করতেন । যেখানে নৌকা বা পাল্কী যেত না সেখানে পদব্রজে গমন করতেন । তিনি যে নৌকায় চলাফেরা করতেন সেটি ভ্রাম্যমান বা চলমান মাদ্রাসা নামে পরিচিতি লাভ করেছিল । তাঁর এই ভ্রাম্যমাণ মাদ্রাসা থেকে যে সকল 'আলিম বের হতেন, তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন এক একজন মহান ধর্ম প্রচারক ও সুপন্ডিত ।[১] গ্রাম থেকে মূর্খ ছেলেদেরকে এনে নিজ খরচে তাদেরকে শিক্ষা দিতেন । ইসলাম প্রচারের কাজে তিনি বহু বাধার সম্মুখীন হওয়া সত্তেও একাজ থেকে সামান্যতমও বিচ্যুত হননি । বরিশাল গেলে সেখানকার মুসলমান নামধারী লোকেরা তাঁর নৌকায় ইট পাটকেল নিক্ষেপ করে । ফরিদপুরেও তিনি বাধার সম্মুখীন হন। তিনি নুতন শরী'আত জারী করতে এসেছেন বলে স্বার্থপর বিরুদ্ধবাদীরা লোকদেরকে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে। তদুপরি, তিনি উর্দুভাষী ছিলেন বিধায় দোভাষী সংগ্রহ করতে পারতেন না । ফলে, তাঁকে অনেক কষ্ট করে তাদেরকে তাঁর বক্তব্য বুঝাতে হত। চট্টগ্রামে মৌলবী মুখলিসুর রহমান নামে এক ভন্ডপীর 'শায়খুল মুসলিম' উপাধি ধারণ করে ফাতিহাখানি ও অন্যান্য কয়েকটি বিদ'আতের প্রবর্তণ করেন। সে পবিত্র কালিমা থেকে 'ইল্লাল্লাহ' বাদ দিয়ে তদস্থলে 'শায়খুল মুসলিম' বাক্যটা সংযোগ করে, যার অর্থ দাড়ায় 'শায়খুল মুসলিম ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নাই' । এভাবে সে সুস্পষ্ট খোদায়ী দাবী করে। তার অনুসারীরা মাওলানা জৌনপুরীকে কাফির বলে ঘোষণা করে। তাছাড়া সে মাওলানা (জৌনপুরী) এর নিকট সাতটি[২] জটিল প্রশ্ন লিখে পাঠায় । মাওলানা কারামত আলী 'আনওয়ারে কারামত' নামক পুস্তিকার মাধ্যমে সেগুলোর উত্তর প্রদান করেন।

মাওলানা কারামত আলী কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলমান-যারা ভন্ডপীর ও দরবেশদের খপ্পরে পড়ে এবং বহুকাল যাবত হিন্দু ধর্মের লোকজনের সঙ্গে বসবাস করে ইসলামী অনুশাসনের বিপরীত পথে জীবন যাপন করছিল তাদের নিকট ইসলামের সত্য মত ও পথ তুলে ধরেন। পীর পূজা, কবরপূজা, পীর-দরবেশদের নামে উরস করা - এসব কাজ হতে মুসলমানদেরকে তিনি বিরত রাখার চেষ্টা করেন। রুসমী ফাতিহা, লায়লাতুল বারা'আত, লায়লাতুল কদর-এ যে সব শির্ক-বিদ'আতের কাজ চলে আসছিল মুসলমানদিগকে সে সমস্ত শিরক ও বিদ'আতের কাজ হতে বিরত থাকার জন্য উপদেশ দিতেন ।[৩]

১। হাসান আলী, মোহাম্মদ, চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৯।

২। সাতটি প্রশ্নঃ ফাতিহাখানী বৈধ কিনা? যদি অবৈধ হয়, তা হানাফী মতবাদের আলোকে প্রমাণিত করা, মুহাম্মদী তরীকাহ্ সত্য কিনা? যদি সত্য হয়, তবে এই তরীকাহ্ প্রবর্তকদেরকে কেন মক্কা শরীফ থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল? যদি তাদের তরীকা বাতিল বলে প্রমাণিত হয়, তবে তাদের পেছনে ইকতেদা করা বৈধ হবে কি? মক্কার উলামা নতুন দলকে (লা মাযহাব) ওহাবী ফিরকা বলে আখ্যায়িত করেছেন কিনা? তাকবীয়াতুল ঈমান, তানবীরুল আইনাইন; সিরাতুল মুস্তাকীম, এবং মিআত মাসাইল এই বইগুলো যথার্থ কিনা? এই বইগুলো যদি সঠিক হয়, তবে এর রচয়িতাদের অনুসরণ করলে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে কিনা? মাওলানা ইসমাঈল, মাওলানা আবদুল হাইও তাদের অনুসারীগণ ঠিক পথে আছেন কিনা? মীর্জা আহমদের অনুসারিগণ নবী ও ওলীগণের সম্মান করাকে শিরক মনে করেন, তারা মীর্জা আহমদের নিহত হওয়ার পর তাঁর প্রতিকৃতি বানিয়ে অর্থ উপার্জন করে থাকে। এটা বৈধ কিনা? (মুহাম্মদ আবদুল বাকী, বাংলাদেশের আরবী, ফার্সী ও উর্দুতে ইসলামী সাহিত্যচর্চা (১৮০১-১৯৭১), অপ্রকাশিত সন্দর্ভ, পৃঃ ১৪৩।

৩। ইসলামী বিশ্বকোষ, খন্ড...৭ম.,পৃঃ ৩৩০।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা কারামত আলীর সংস্কার আন্দোলন 'মুহাম্মদী আন্দোলন' নামে পরিচিত। তাঁর এ আন্দোলন ছিল ত্রিমুখী । যেমন- শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে আন্দোলন, সংস্কার বিরোধীদেরকে সংস্কারের আওতায় আনয়নের আন্দোলন এবং বিদ'আত ও সংস্কার আন্দোলন বিরোধীদেরকে যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে সংস্কারের অনুকূলে আনয়ন করার আন্দোলন । সে সময় পূর্ববঙ্গে (বাংলাদেশ) 'ফরায়েযী আন্দোলন' ছিল একটি শক্তিশালী আন্দোলন। এই আন্দোলনের প্রবর্তক ছিলেন হাজী শরী'আতুল্লাহ (১৭৮১-১৮৪০) । ফরায়েযীদের মতে বৃটিশ অধিনস্থ বাংলা দারুল ইসলাম নয় বরং দারুল হারব অর্থাৎ যুদ্ধের দেশ। অতএব, এখানে জুম'আ ও ঈদের নামায জায়েয নহে । অমুসলিম শাসিত দেশে জুম'আ ও ঈদের নামাযের জামা'আত জায়েয হবে কিনা এ প্রশ্নটির উদ্ভব হয়েছিল দিল্লীর সুলতান মুহাম্মদ ইব্ন তুগলকের আমলে (৭২৬/১৩২৫-৭৫২/১৩৫১)। ৭৪১/১৩৪০ সালে এ প্রশ্নের উপর বিতর্ক হয়েছিল এই বলে যে, যেহেতু এই দেশ এমন একজন সুলতান দ্বারা শাসিত যিনি মুসলিম খলীফার অনুমোদন লাভ করেন নাই, সেহেতু এদেশে ইসলামী বিধান মুতাবিক জুম'আ ও ঈদের নামাযের জামা'আত বৈধ নয়। ফলে ৭৪৫/১৩৪৪ সালে তিনি মিসরের আব্বাসী খলীফার অনুমোদন লাভ করলে পর ঈদ ও জুম'আর নামাযের জামা'আত পুনরায় কায়েম হয় ।[১] পক্ষান্তরে, মাওলানা কারামত আলীর মতে এ দেশ দারুল হারব ও নয় দারুল ইসলামও নয় বরং দারুল আমান (নিরাপদ স্থান)। যেহেতু, ইংরেজরা মুসলমানদেরকে ধর্ম-কর্ম পালনে বাধা দেয়না সেহেতু ইহা দারুল আমান । অতএব, এখানে জুম'আ ও ঈদের নামায জায়েয। ফরায়েযীদেরকে লা জুম'আও বলা হয়। তিনি ফরায়েযীদেরকে ধর্মত্যাগী বলেও অভিহিত করেন । ফলে, দুই দলের মধ্যে বাহাস (বিতর্ক) হয়। এতে মাওলানা কারামত আলী জয়ী হন। কিন্তু বরিশালে তিনি হাজী শরী'আতুল্লাহর খলীফা মৌলভী আবদুল জব্বারের বিরোধিতার সদুত্তর দিতে পারেননি । অবশেষে তিনি বিদ্রুপ করে বলেন তোমাদের নেতা টিডিড (ফড়িং)-কে পংগপাল বলে ভুল করেছেন । মুহাম্মদীয়া জুম'আর সঙ্গে যেহেতু আখিরী যুহর এর নামায পড়ে এতেই বুঝা যায় যে, তাদের যুক্তিতে কিছু খুঁত আছে ।[২] বেনামাযীর জানাযা নিয়েও ফরায়েযীরদের সাথে মাওলানার মত পার্থক্য ছিল । ফরায়েযীদের মতে বেনামাযীর জানাযা জায়েয নহে । পক্ষান্তরে, মাওলানার মতে বেনামাযীর জানাযা আদায় করতে হবে। তাঁর মতে, একজন ঈমানদার লোক অলসতা বা উদাসীনতার কারণে নামায আদায় না করলেও সে কাফির হয়ে যায় না । সুতরাং এ রকম লোকজনের মৃত্যুতে তাদের জানাযার নামায আদায় করতে হবে ।

তিনি মুজতাহিদীন-ই-শরী'আতের তাকলীদ ওয়াজিব মনে করতেন। যে ব্যক্তি নিজে মুজতাহিদ নন তাঁর পক্ষে কোন মাধ্যম ব্যতিরেকে কুর'আন হাদীস হতে জীবনের বিভিন্ন হুকুম-আহকাম খুঁজে বের করে এবং সে মুতাবিক জীবন যাপন করাকে তিনি হারাম বা অবৈধ মনে করতেন। তাঁর মতে, কোন মাযহাবের লোক বিশেষ কোন সুবিধার জন্য অন্য মাযহাবের অনুসরন করতে পারবেনা। তবে কেহ যদি পুরোপুরিভাবে মাযহাব পরিবর্তন করে অন্য ইমামের অনুসরন করতে চায় তা করতে পারবে। মোটকথা, তিনি তাকলীদ-ই-শাখসী অর্থাৎ বিশেষ কোন এক মুজতাহিদের তাকলীদ জরুরী মনে করতেন ।

১। ইসলামী বিশ্বকোষ, খন্ড-৭ম, পৃঃ ৩৩০।
২। ডঃ আবদুল কাদের, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০০।

Dhaka University Institutional Repository

আহলুল হাদীসের ব্যাপারে মাওলানা কারামত আলী ভাল ধারনা পোষণ করতেন না । শেখপুরায় ফরায়েযী নেতা আবদুল জব্বার-এর সঙ্গে তাকলীদ-এর ব্যাপারে তাঁর মতবিরোধ হয়। আবদুল জব্বার জওয়াব-ই-কুতুল ঈমান নামে একখানা পুস্তক রচনা করেন যাতে তিনি তাকলীদ-ই-শাখসীর নিন্দা করেন এবং চার মাযহাব-এর মিশ্রনের পক্ষে মতামত প্রকাশ করেন। তাঁর মতে মাওলানা কারামত আলীর মুরশিদও এরকম চার মাযহাব বা তরীকার মিশ্রনে পঞ্চম তরীকাহ্‌ই-মুহাম্মদী উদ্ভাবন করেছিলেন । তিনি আরও বলেছিলেন যে, হানাফী মাযহাবের ইমাম আবূ হানীফা (রঃ), আবু ইউসুফ (রঃ) ও মুহাম্মদ (রঃ) প্রমূখরা সকলে কোন কোন বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ না করলেও তাঁদের সকলের মতামত হানাফী মাযহাবের মধ্যে গন্য। সুতরাং এই রীতিতে চার মাযহাবের মিশ্রনে পঞ্চম মাযহাব 'মুহাম্মদী মাযহাব' উদ্ভাবন জায়েয । মাওলানা কারামত আলী আবদুল জাব্বারের এ মতের বিরোধিতা করেছেন । এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, তরীকা-ই-মুহাম্মদীয়ার ব্যাপারে আবদুল জব্বার যা বলেছেন তা ঠিক নহে । কেননা, তাঁর মতে তরীক-ই-মুহাম্মদীয়া চার তরীকাহ্‌র সংমিশ্রন নয় এবং সায়্যিদ আহমদ শুধু তরীকা-ই-মুহাম্মদীয়াতেই বায়'আত গ্রহণ করতেন তাও সঠিক কথা নয় । ইমাম আবু হানীফা (রঃ) ও হানাফী মাযহাবের অন্যান্য ইমামের মধ্যে যে মত পার্থক্য দেখা যায় এর জওয়াবে তিনি মুজতাহিদ ফিশশারয়ী ও মুজতাহিদ ফিল মাযহাব এই দুই প্রকার মুজতাহিদের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করে দেখিয়েছেন যে, প্রথমোক্ত মুজতাহিদ কোন ভিন্ন স্বাধীন সত্তা নয় অথচ শেষোক্ত মুজতাহিদ সম্পুর্ণ স্বাধীন সত্তা ।

সায়্যিদ আহমদ (রঃ) বালাকোটের যুদ্ধে শহীদ হননি বরং অদৃশ্য হয়েছেন -এ ধারনা যাঁরা পোষণ করছেন মাওলানা কারামত আলী তাঁদের মত খন্ডন করেন। তিনি সায়্যিদ আহমদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং তাঁর একজন একনিষ্ঠ ভক্ত হিসেবে নিজেকে পরিচয় দিতেন। কোন সময় তাঁর মুরশিদের ব্যাপারে কোন প্রশ্ন উঠলে তিনি কড়া ভাষায় প্রতিবাদ করতেন। তিনি সায়্যিদ আহমদ শহীদকে উনবিংশ শতাব্দীর 'মুজাদ্দিদ' বলতেন। তিনি সায়্যিদ আহমদ (রঃ)-এর দু'জন শীর্ষস্থানীয় খলীফা শাহ্ মুহাম্মদ ইসমাইল ও মাওলানা আবদুল হাই-র প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষন করতেন। অবশ্য তিনি বলতেন যে, দুজনই হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন । তাঁর এ দাবী আবদুল হাই-র বেলায় সত্য হলেও শাহ্ মুহাম্মদ ইসমাঈলের বেলায় সত্য বলে মনে হয় না । কেননা শাহ্ সাহেব কোন মাযহাবের অনুসারী বলে মনে হয় না ।

মাওলানা কারামত আলী 'ওয়াহদাতুল ওজুদ' মতবাদের বিরোধী ছিলেন । ওয়াহদাতুল ওজুদ-এর প্রবক্তা চট্ট-গ্রামের মৌলবী মুখলিসুর রহমান-এর তিনি কঠোরভাবে সমালোচনা করেন। তিনি মীলাদুন নবী সমর্থন করতেন। কিন্তু প্রচলিত মীলাদুন নবী অনুষ্ঠানে রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর শরীর বা আত্মা অলৌকিকভাবে উপস্থিত হয় বলে যাঁরা ধারণা পোষণ করেন তিনি তাঁদের এ ধারনার নিন্দা করতেন। মীলাদ মাহফিলে রাসুলের (সঃ) প্রতি সালাম পাঠ করার সময় কিয়াম মুস্তাহাব মনে করতেন ।[১]

মাওলানা কারামত আলীর তাবলীগ নিছক ব্যক্তিগত ধর্মীয় প্রয়াস নয়, তা ছিল সুশৃংখল, সুপরিকল্পিত ও সুদূর প্রসারী একটি ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কারকমূলক আন্দোলন। তিনি একজন উত্তম সংগঠক ছিলেন। নিজ প্রচারাভিযান ও কর্মসূচীকে ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে স্থানীয় উপযুক্ত লোকদের

১। ইসলামী বিশ্বকোষ, খন্ড ৭ম,পৃঃ ৩৩০ ।

Dhaka University Institutional Repository

তা'লীম দিয়ে বাংলা-আসামের দিকে খলীফা নিয়োগ করতেন। এর পাশাপাশি তিনি তাঁর মিশনকে দৃঢ়ভিত্তিক করে তোলার লক্ষ্যে দেশের আনাচে-কানাচে অনেক ধর্মীয় সাহিত্যও ছড়িয়ে দেন।[১] এভাবে সমাজ-সংস্কার ও ধর্মাভিযানের ফলে বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে প্রচলিত হিন্দুয়ানী ধ্যান-ধারনা ও অনৈসলামিক চাল-চলন অনেকটা বিদূরিত হয়; তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, ঐক্য, জাতীয় চেতনা ও ইসলামী মূল্যবোধ জাগ্রত হয় যা পরবর্তীকালে নওয়াব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী, নওয়াব আমীর আলী, নওয়াব সৈয়দ আমীর হুসাইন ও নওয়াব আবদুল জব্বার প্রমুখের যুগে জাতীয় স্বাতন্ত্র্যমন্ডিত মুসলিম রাজনীতির রূপ পরিগ্রহ করে। এ আন্দোলনের ফলে উত্তর ভারতের আলিম, ফাজিল ও বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের[২] সাথে বাংলার আরবী শিক্ষিত মুসলমানদের ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে উঠে যা বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সর্ব ভারতীয় মুসলিম ঐক্য ও মুসলিম রাজনীতি গঠনে সহায়তা করে। তাঁর কর্মতৎপরতা এ দেশের নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মন মানসিকতা, ধর্মীয় তথা সামাজিক, রীতিনীতি ও পোশাক পরিচ্ছেদ বিশেষ পরিবর্তন সাধন করে। এ সম্পর্কে জেমস ওয়াইজ বলেন ঃ The most successful and celebrated missionaries, however, were Maulavis Karamat Ali, Zain-ul-abadin, and an Arab, Sayyid Mohammad Jamal-ul-Lail, whose preaching among the villages of Eastern Bengal has had the Most momentous effects, not only by uniting under one bane the vast majority of the middle and working classes, but also by arousing the intolerant spirit of Mohammadinism, which had lain dormant for nearly a country.[৩]

বাংলাদেশ ও আসামের বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শনের সময় তিনি যে শুধু মৃতপ্রায় ইসলামকে নব বলে সঞ্জীবিত করেছেন তা নয়, তিনি বহু অমুসলমানকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন।[৪] মৌখিক প্রচার ও কর্মাভিযানের পাশাপাশি তিনি প্রয়োজনের তাগীদে বিদ'আতী 'আলিম, ফাযিল, শরী'আতভ্রষ্ট পীর-ফকীর, ফরায়েযী ও ওহাবীদের মতামতের অসারতা প্রমাণ করে উর্দু ও আরবী ভাষায় বেশ কিছু পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করেন।[৫] তিনি গভীর পান্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। আরবী, ফারসী ও উর্দু ভাষায় তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল।[৬] ১৯ বৎসর বয়সে তাঁর প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হয় এবং ২০ বৎসর বয়সে উর্দু ভাষায় 'মিফতাহুল জান্নাত' (বেহেশতের চাবি) রচনা করেন। বই খানার অত্যাধিক চাহিদা বিধায় ইহার বহু সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং ১৮টি ভাষায় অনূদিত হয়। অবিভক্ত বংগে ইহাই ইসলামী বিধি-বিধানের নির্ভুল বিবরণ বলে পরিগণিত হত। পাকিস্তান বিভাগের (১৯৪৭) পূর্বে ইহা প্রায় প্রতি ঘরে ঘরে পঠিত হত।

রহমান আলী রচিত 'তাযকিরায়ে উলামা-ই-হিন্দ' নামক কিতাবে তাঁর ৪৬ খানা পুস্তকের নাম পাওয়া যায়। তম্মধ্যে ৩৬ খানা উর্দু, ৪ খানা আরবী ও ১ খানা ফারসী ভাষায় লিখিত মোট ৪১ খানা প্রকাশিত

১। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ , পৃঃ ২৫৪।
২। যথা দারুল উলূম (দেওবন্দ), মাজাহারুল উলূম (সাহরানপুর) ও ফিরিঙ্গিমহল (লক্ষ্ণৌ)।
ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ., পৃঃ ২৫৫।
৩। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫৫।
৪। গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৮।
৫। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫৪।
৬। গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে । এতদভিন্ন কলিকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে তাঁর কয়েকখানা পান্ডুলিপি রক্ষিত আছে । 'রাহাত-ই-রুহ' নামে এরূপ একখানা পান্ডুলিপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ লক্ষীপুরের (বর্তমান জেলা) মাওলানা মনসুরুল হক-এর নিকট থেকে এনে ফটোষ্ট্যাট করে রেখেছেন । তাঁর রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থগুলো হলোঃ-

আরবী গ্রন্থাবলী ঃ-

১। মুলাখখাস মামলুয়াতুন বিল্ বারাহিনিল কাতি'আ ঃ- ৩২ পৃষ্ঠার আরবী ভাষায় রচিত পুস্তিকাটি ১২৮৭হিঃ/ ১৮৭০ সালে 'মাতবা-এ-বশীরী' থেকে মুদ্রিত হয়। এতে মীলাদ ও কিয়ামের বৈধতার সমর্থনে যুক্তি এবং এ সম্পর্কিত মক্কা-মদীনার চার ইমামের ফতোয়া রয়েছে।

২। বারাহীন-ই-কাতইয়্যাহ ফী মওলুদ-ই-খাইরিল বারিয়্যাহ ঃ ৮০ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থখানাতে রাসুল-এ করীম (সঃ) এর জম্মলগ্নের ঘটনাবলী সম্পর্কে প্রামান্য যুক্তিসমুহ স্থান লাভ করেছে।

৩। আদ-দাওয়াতুল মাসনুনাহ ঃ ৭২ পৃষ্ঠার এই পুস্তিকাখানিতে দু'আ-দরুদসমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে।

৪। নাসীমুল হারামাইন ঃ গ্রন্থখানীতে মাওলানা জৌনপুরী তাঁর যাবতীয় ধর্মীয় চিন্তাধারা, ফরায়েযী, ওহাবী তথা ভারতীয় আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের ধ্যান-ধারনা, দারুল হারব ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। দুই শতাধিক পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটি ১২৭৭/১৮৭০ সালে রচিত হয় এবং জৌনপুরের আহমদী প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। এটি এখন দুষ্প্রাপ্য।

উর্দু গ্রন্থাবলী ঃ-

৫। মিফতাহুল জান্নাত ঃ এ গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ ১৮২৭ সালে প্রকাশিত হয়। পরবর্তী সংস্করণ ঢাকার চকবাজার এমদাদিয়া লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত হয়। এটি হচ্ছে ফিকহ্ শাস্ত্রের কিতাব।

৬। কাওকাব-ই-দুররী ঃ- আরবীতে স্বল্পজ্ঞান সম্পন্ন লোকদের জন্য কুর'আনের বিশেষ বিশেষ অংশের তালিকা। ১২৬৩ হিঃ/ ১৮৪৬ইং কলিকাতা থেকে প্রকাশিত।

৭। বায়'আত-এ তাওবা ঃ- গ্রন্থখানি ১৩৪৮ হিজরী/ ১৯২৯ সালে কানপুরের মজীদী প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। ফারায়েযীদের 'বায়'আত-এ-তাওবা' মতবাদের বিরুদ্ধে এটি রচিত হয়। কারামাত আলী 'কুয়াতুল ঈমান' গ্রন্থের চতুর্থ হিদায়াতকে পাঠকের সুবিধার্থে পৃথক করে 'বায়'আত তাওবা' শীর্ষক নামে প্রকাশ করেন। গ্রন্থখানাতে পীরের হাতে তাওবা ও অন্যান্য পীর-মুরীদী প্রথার সমর্থনেও আলোচনা রয়েছে।

৮। যীনাতুল কারী ঃ- আওয়াজ করে বিশুদ্ধভাবে কুরআন পাঠের নিয়মাবলী সম্পর্কে লিখিত। ১২৬৪ হিঃ কলিকাতা থেকে প্রকাশিত।

৯। ফায়দা-ই-আদা ঃ- জ্ঞানগর্ভমূলক ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কীয় গ্রন্থ। এতে আহমদ সরহিন্দীর মতবাদের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। ১২৬৪ হিজরীতে কলিকাতা থেকে প্রকাশিত।

১০। হুজ্জাত-ই কাতি'আ ঃ- উর্দু ভাষায় রচিত এই গ্রন্থখানি ১২৮২ হি/ ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত হয়। এটি হাজী শরী'আতুল্লাহ ও দুদু মিয়ার ফরায়েযী সমাজের বিরুদ্ধে লিখিত এবং জুম'আ জায়েয হওয়া সম্পর্কে মক্কা শরীফের কতিপয় 'আলিমের মতামত সম্বলিত পুস্তক।

Dhaka University Institutional Repository

১১। নূরুল হুদা ঃ- এ গ্রন্থখানা ১২৮২ হিজরীতে কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। সূফীবাদ সম্পর্কে সায়্যিদ আহমদ বেরলভীর মুজাদ্দিদীয়া তরীকার বিবরণ সম্বলিত একখানা গ্রন্থ।

১২। মুকাশিফাত-ই-রহমাত ঃ- ১২৮৬ হিজরীতে গ্রন্থখানা প্রকাশিত হয়। এতে দশটি উপদেশ, পাঁচজন মুনাফিকের আলোচনা, সায়্যিদ আহমদ বেরলভীর জীবনী ও কার্য প্রণালী এবং ওহাবীদের সম্পর্কে আলোচনা ও সমালোচনা করা হয়েছে।

১৩। যীনাতুল মুসাল্লী ঃ ১২৫৯ হিজরীতে কলিকাতা থেকে প্রকাশিত। এ গ্রন্থে ওযূ ও নামায সংক্রান্ত মাস'আলাসমূহ বিবৃত হয়েছে।

১৪। যাদুত-তাকওয়াহ ঃ প্রকাশনা, কলিকাতা ১২৮৭ হিঃ। ইসলাম ও তাসাউফ সম্পর্কে এতে আলোচনা করা হয়েছে।

১৫। মাখারিজুল হুরূফ ঃ কির'আত বিষয়ক গ্রন্থ ।

১৬। শারহি জাযারী পুস্তক ঃ প্রকাশকাল ১২৬৪হিঃ কলিকাতা। কির'আত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এতে স্থান পেয়েছে।

১৭। তাযকিরাতুল আকাঈদ ঃ মিথ্যা আকাঈদ বিশেষতঃ খারিজীদের আকাঈদ খন্ডন সংক্রান্ত বর্ণনা এতে রয়েছে।

১৮। কাউলাস সাবিত ঃ এ গ্রন্থে শিরক, বিদ'আত ও শরী'আত বিরোধী রীতিনীতির সমালোচনা করে তা খন্ডন করা হয়েছে।

১৯। হক্কুল ইয়াকীন ঃ ওয়াজ নসীহত ও আরকান-আহকাম সংক্রান্ত পুস্তক।

২০। নুকামিউল মুখতাদিঈন ঃ উরদু ভাষায় রচিত পুস্তিকাটি ১২৭৪ হি/১৮৫৭ সালে রচিত হয়। এর পরবর্তী সংস্করণ কানপুর মজিদী প্রেস থেকে ১৩৪৮ হিঃ/১৯২৯ সালে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে মূলতঃ চট্টগ্রামের মাওলানা মুখলিসুর রহমানের ফারসী ভাষায় উত্থাপিত সাতটি প্রশ্নের উরদু ভাষায় উত্তর দেয়া হয়েছে।

২১। কাউলুল হক্ক ঃ মীলাদ ও কিয়াম সম্পর্কিত একটি গ্রন্থ। প্রকাশনাঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৩৮৩ হিঃ/১৯৬৩ইং ।

২২। কাউলুল আমীন ঃ লা জুম'আপন্থীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমূলক একটি গ্রন্থ।

২৩। মুরাদুল মুরীদীন ঃ এতে ফরায়েযী মতবাদ, পীর, মীলাদ ও কিয়াম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

২৪। তরজমা-ই-শামায়েলে তিরমিযী ঃ আনওয়ার-ই-মুহাম্মদী শরহে শামায়েল-ই-তিরমিযী গ্রন্থের উরদু অনুবাদ।

২৫। তরজমা-ই-মিশকাত (১ম খন্ড) ঃ মিশকাত শরীফের উরদু অনুবাদ। হাদীস গ্রন্থের প্রাথমিক উরদু অনুবাদসমূহের অন্যতম।

২৬। মিরআতুল হক্ক ঃ ধর্মীয় কোন্দল সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে লিখিত পুস্তক।

২৭। ইতমিনানুল কুলুব ঃ বিদ'আতী ও ধর্মীয় কোন্দল সৃষ্টকারীদের প্রতিবাদের উত্তর সম্পর্কিত কিতাব।

২৮। রিসালা-ই-ফয়যে আম ঃ এটা তাসাউফ বিষয়ক একটা গ্রন্থ। এটি মূলতঃ 'নূরুন আলা নূর' শীর্ষক সূফীবাদ বিষয়ক গ্রন্থের সার সংক্ষেপ।

২৯। কুওয়াতুল ঈমান ঃ মা'রিফাত বিষয়ক কয়েকটি মাস্‌আলা সম্পর্কিত আলোচনার কিতাব। গ্রন্থটি উরদু ভাষায় রচিত। ১২৫২হিঃ/১৮৩৬ ইং কলিকাতা থেকে প্রকাশিত।

Dhaka University Institutional Repository

৩০। কিতাব-ই-ইস্তিকামাত ঃ- সুন্নাতের অনুসরণ ও ধর্মের প্রতি দৃঢ় থাকার বিষয় সম্বলিত নসীহত।

৩২। ইকরামুল হক ঃ মুরাকাবা ও ছয় লতিফার বিবরণ।

৩৩। নুরুন আলা নুর ঃ মা'রিফাত বিষয়ক কয়েকটি মাসআলা।

৩৪। তাযকিরাতুন নিসওয়ান ঃ পর্দা সংক্রান্ত মুল্যবান গ্রন্থ।

৩৫। কুররাতুল উয়ুন ঃ মক্কা মদীনার ফযীলত সম্পর্কিত পুস্তক।

৩৬। ফৎহি বাব-ই-সিবয়ান ঃ ছোটদের ফারসী ব্যাকরণ বিষয়ক গ্রন্থ।

৩৭। কারামাতুল হারামাইন ফী-ইযালাতি শিবহাতিল ফারীকাঈন ঃ মীলাদ ও কিয়াম সম্পর্কিত গ্রন্থ (অপ্রকাশিত)।

৩৮। ওয়ায়েজাতুল মুমিনীন ঃ

৩৯। রিসালায়ে ফয়সালা ঃ

৪০। আকাঈদ-ই-হক্ক ঃ

৪১। রাহাত-ই-রুহ ঃ ইল্‌ম-ই-মা'রিফাত বিষয়ক গ্রন্থ ।[১]

প্রকাশকরা এযাবত ১৯ খানা পুস্তককে 'যখিরা-ই-কারামত' নাম দিয়ে তিন খন্ডে প্রকাশ করেছেন। তাঁর পুস্তকগুলোর বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করলে এগুলোকে চারশ্রেনীতে ভাগ করা যায়। যেমন- (১) সাধারণভাবে দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা, (২) পারিবারিক ও সামাজিক জীবন সংস্কারকমূলক লেখা, (৩) ফারায়েযী ও আহলুল হাদীস মতবাদের যৌক্তিক খন্ডন ও সমালোচনা এবং (৪) পীর-মুরীদী বা আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কীয় লেখা। এ ছাড়া তাঁর অনুবাদ জাতীয় লেখাও যেমনঃ- তরজামা-ই-মিশকাত ও তরজামা-ই-শামাইল-ই-তিরমিযী রয়েছে। তাঁর রচনায় তিনি অনেক লেখকের নির্ভরযোগ্য রচনাবলীর নাম উল্লেখ করেছেন যেমনঃ- রাদ্দুল মুহতার, মাদারিজুন-নবূওয়া, জামি'সগীর, হিসন-ই-হাসীন, ফতওয়া-ই-আলমগীরী, শরহি বিকায়া, হিদায়া, জামিউর রামুয, কানযুদ-দাকাইক, তাফসীর-ই-মাদারিক, তাফসীর রুহুল বায়ান, আখবারুল আখবার, বুখারী, মুসলিম, ইবনে মাজাহ, তিরমিযী, আল কাওলুল জামিল, আওয়ারিফুল মা'আরিফ, সিরাত-ই-মুসতাকীম, তাকবিয়াতুল ঈমান, আল আশবাহ ওয়ান নাজাইর, মীযানুশ শারানী ইত্যাদি। তিনি নিজ পান্ডিত্য বলে অনেক কিতাবের মতবাদ খন্ডন করেন এবং তা করতে গিয়ে তাঁকে অন্যান্য নির্ভরযোগ্য কিতাবের হাওয়ালা (বরাত) দিতে হয়েছে। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি বহু লেখকের রচনাবলী পড়েছেন, বিশেষ করে বিতর্কিত কোন বিষয়ের উপর তাঁকে অনেক পড়াশুনা করতে হয়েছে। বিরোধীদের যুক্তি খন্ডন করতে তাঁকে বিরোধীদের বহু পুস্তকও পড়তে হয়েছে। যেহেতু তিনি বাংলা ভাষা পড়তে পারতেননা, সেহেতু বাংলা ভাষায় কোন বইয়ে কি আছে তা জানার জন্য তাঁর বাংলা ভাষী মুরীদদের কাছে বসে ঐ পুস্তকের বিষয়-বস্তুও পড়ায়ে শুনতে হয়েছে। তিনি সর্বদাই সমসাময়িক অবস্থা তুলে ধরতেন এবং ইহার সামাধান খুঁজে বের করার চেষ্টা করতেন । এ ক্ষেত্রেও তাঁকে সাল্‌ফ-ই-সালিহীন- এর রচনাবলী খুব নিবিড়ভাবে

১। রহমান আলী, তাযকিরা-ই-উলামা-ই-হিন্দ , পৃঃ ১৭১; ডঃ আবদুল কাদের, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০২-১০৪।

Dhaka University Institutional Repository

পাঠকরতে হয়েছে। কোন সমস্যার সমাধান দিতে গিয়ে তিনি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ফিকহ্ ও আকাইদ এর নির্ভরযোগ্য কিতাবের হাওয়ালা দিতেন। অনেক সময় তিনি নিজের মতের অনুকূলে হাদীছের উদ্ধৃতি দিতেন যদ্দ্বারা তাঁর মতের যথার্থতা প্রমাণিত হত। তিনি একজন অত্যন্ত কর্মঠ মানুষ ছিলেন-যিনি ইসলামের আদর্শ জনগনের মধ্যে প্রচার করার মানসে বিভিন্ন স্থান সফর করেছেন। এ কারণেই তিনি লেখার প্রতি পূর্ণ মনযোগ দিতে পারেন নাই । তিনি তেজস্বী ভাষায় বক্তৃতা ও খুরধার লিখনী দ্বারা মুসলিম জনগণের মধ্যে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা ও অনৈসলামিক কার্যকলাপের সংস্কার সাধন করতে তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন। কিন্তু, তিনি গভীর দার্শনিক চর্চায় মনোনিবেশ করতে সক্ষম হননি । ফলে, তিনি তেমন কোন উচ্চমানের মৌলিক রচনা রেখে যেতে পারেন নাই ।

তিনি ওহাবী ও লা-মাজহাবীদের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং তাঁর নিজের অজান্তেই তাসাওফবাদী হয়ে পড়েন। পীর-মুরীদী সম্পর্ক যাতে অধঃপতিত হয়ে পীর পূজায় পর্যবসিত না হয় তজ্জন্য উস্তাদ শাগরিদ পরিভাষা ব্যবহার করতেন। বস্তুতঃ বক্তৃতা ও লেখনীর সাহায্যে ইসলামের ব্যাপক প্রচারণার ক্ষেত্রে সফলকাম হওয়ার দরুণ সার্থক প্রচারক হিসেবে পরিগণিত হন। ইংরেজ ও বিরোধী মহলের সাধারণ লোকদের ধারণা তিনি ওহাবী কিন্তু 'মুফলাকাত-ই-বাহয়া' নামক গ্রন্থে তাঁর নিজের মতের বর্ণনা দ্বারাই এই ভ্রান্ত ধারণার নিরসন হয়ে যায় । ওহাবীদের কোন পুস্তক তিনি পাঠ করেননি, তবে লোকমুখে জানতে পারেন যে, তারা এতই কঠোর মতাবলম্বী যে, যাদের সাথে তাদের মতের মিল নেই তাদের সকলকেই তারা মুশরিক বলে মনে করে । তিনি শিরক ও বিদ'আতের মধ্যে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ফারাক করেন। তাছাড়া তিনি তার 'হুজ্জাত-ই-কাতি'আ' গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে ফাসিক ও কাফিরের পার্থক্য অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন ।

তিনি অতি সুশৃংখল ও নিয়মানুবর্তী ছিলেন । প্রত্যহ ফজরের নামাযের পর হতে ইশরাকের নামায পর্যন্ত মুরীদ গণের সাথে মুরাকাবায় বসতেন । অতঃপর ছাত্রদের কুর'আন শরীফ শিক্ষা দিতেন। তারপর চা পান করে কিতাব লিখতে বসতেন । দ্বি-প্রহরে খাওয়া-দাওয়া করার পর একটু বিশ্রাম নিয়ে আওয়াল ওয়াক্তে জামা'আতের সাথে যুহরের নামায আদায় করতেন । মসজিদে কখনও জামা'আতে নামায পড়া বাদ দিতেন ন । বাদ মাগরিব ছাত্রদের কির'আত মুখস্ত করাতেন । বিলম্বে এশার নামায পড়ে খাওয়া সেরে লিখতে বসতেন এবং সামান্য বিশ্রামের পর তাহাজ্জুদের নামায পড়তে উঠতেন। তৎপর ফজরের নামায পর্যন্ত যিকর আযকারে মশগুল থাকতেন ।

তিনি খুব কম খাদ্য গ্রহণ করতেন। আমের প্রতি তার খুব শখ ছিল । আমের মওসুম শেষ হলে আমের হালুয়া খেতেন । পাগড়ী পরিধান করতেন । প্রায় দিন-রাত সর্বক্ষন ওযু অবস্থায় থাকতেন ও তাসবীহ পাঠ করতেন ।[১]

ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার দিক থেকে মাওলানা কারামত আলী ছিলেন হানাফী মাযহাবের অনুসারী ও তাকলীদপন্থী । তবে তিনি ইমাম চতুষ্টয়ের বিধি বিধানের আওতায় ইজতিহাদেরও পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি ইমাম চতুষ্টয়ের মধ্যে যে কোন একজনের তাকলীদ করাকে অবশ্য কর্তব্য এবং পঞ্চম ইমামের

১। ড:আবদুল কাদের, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৫।

Dhaka University Institutional Repository

তাকলীদকে অবৈধ বলে মনে করতেন ।[১] এ ক্ষেত্রে তাঁর মুরশিদ সায়্যিদ আহমদ শহীদ হানাফীপন্থী হলেও তিনি তাকলীদকে অবশ্য কর্তব্য মনে করতেন না । তিনি প্রয়োজনে ইজতিহাদ করার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর হানাফী মতবাদ প্রচার ও তাকলীদ নীতি শিক্ষাদানের ফলে বাংলাদেশে ওহাবী তথা আহলে হাদীস আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠতে পারেনি । বর্তমানে বাংলাদেশে যে ধর্মীয় চিন্তাধারা ও আচার অনুষ্ঠান সাধারণ্যে প্রচলিত আছে, তাতে প্রধানতঃ মাওলানা কারামত আলীরই ছাপ পরিলক্ষিত হয়। তিনি ফরায়েযীদের মতবাদের বিরোধিতা করে উপমহাদেশে জুম'আ ও ঈদের নামায অবশ্য পালনীয় বলে ঘোষণা করেন এবং তা প্রচার করতে গিয়ে বিরুদ্ধবাদীদের সাথে অনেক তর্ক বাহাসে লিপ্ত হন। তিনি বিভিন্ন মাধ্যমে তাদের তীব্র সমালোচনা করেন এবং তাঁদেরকে খারিজী, রাফিযী, দাজ্জাল ও বিদ'আতী ইত্যাদি নামে অভিহিত করেন ।

সায়্যিদ আহমদ বেরলভী ১৮১৮ সালে ভারতকে দারুল হরব (শত্রুদেশ) বলে ঘোষণা করেন । পরবর্তীকালে কলিকাতা মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মাওলানা ওজীহ, কলিকাতার প্রধান কাযী ফযলুর রহমান, জিহাদ আন্দোলনের পাটনাস্থ খলীফা বেলায়েত 'আলী, ফরায়েযী নেতা হাজী দুদু মিঞা প্রমুখ উক্ত ধ্যান ধারণার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন। কিন্তু সায়্যিদ আহমদ শহীদের খলীফা হওয়া সত্ত্বেও মাওলানা কারামাত আলী পরবর্তী সময় তাঁর সেই রাজনৈতিক মতবাদকে উপমহাদেশের স্বার্থের পরিপন্থী বলে মনে করেন। মাওলানা কারামত আলী ১২৭৭/১৮৬০ সালে ভারতকে দারুল হারব আখ্যায়িত না করে 'দারুল ইসলাম' বলেই মত প্রকাশ করেন ।[২] তাছাড়া ২৩শে নভেম্বর ১৮৭০ সালে নওয়াব আবদুল লতিফের (১৮২৮-১৮৯৩) বাড়ীতে মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটির যাম্মাসিক সভায় তিনি দীর্ঘ বক্তৃতায় বলেন যে, বৃটিশ অধীনস্থ ভারতে দীন ইসলামের হুকুম আহকাম আদায় করতে কোন বাধা-নিষেধ নেই। সুতরাং বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা শরী'আত সম্মত হবে না। এরপর তিনি নওয়াব আবদুল লতিফ ও স্যার সায়্যিদ আহমদ-এর সঙ্গে ঐক্যমত পোষণ করে বৃটিশদের সাথে সহযোগিতার পক্ষে মত ব্যক্ত করেন। তাঁর যুক্তি ছিল যে, বৃটিশ শাসন কর্তাদের বয়কট করে দেশ মুক্ত করতে পারা যাবে না । অতএব, তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে মুসলমানদের অবস্থা ভাল করার চেষ্টা করা উচিত। বৃটিশ অধীনস্থ ভারত সম্বন্ধে তাঁর মুরশিদের ভিন্নমত ছিল। মাওলানা বলতেন যে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে হুকুম পরিবর্তিত হয়ে যায় ।[৩]

বাংলার পথভ্রষ্ট মুসলমানদের দীনের সঠিক পথে আনয়ন করতে তিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করেন । ধর্মপরায়ন মুসলমান সৃষ্টির প্রতিই তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। তাই, খুববেশী লোক তাঁর হাতে ইসলামে দীক্ষিত হয় নাই ।

মাওলানা কারামত আলী তিনটি বিবাহ করেন । প্রথম বিবাহ জৌনপুরে, দ্বিতীয় বিবাহ আজমগড়ে ও তৃতীয় বিবাহ নোয়াখালী জিলার লক্ষীপুরের আযম শাহের মেয়েকে । আবু নঈম মোঃ আবদুল আলীম তাঁর 'হায়াতে কারামত আলী জৌনপুরী' পুস্তকে লিখেছেন যে, তিনি নোয়াখালীতে আরও একটি বিবাহ করেন কিন্তু ইহা সঠিক নয় ।[৪]

১। মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী, মুকামিউল মুবতাদিঈন , পৃঃ ৪।
২। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫৬ ।
৩। ইসলামী বিশ্বকোষ, খন্ড ৭ম,পৃঃ ৩৩১ ।
৪। ডঃ আবদুল কাদের, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

দৈহিক গঠনের দিক থেকে মাওলানা সাহেব বিস্তৃত ললাট, দীর্ঘ ও প্রশস্ত নাক, পাতলা ঠোঁট এবং লম্বা দাঁড়ি বিশিষ্ট একজন সুন্দর ও পাতলা অবয়ব বিশিষ্ট দীর্ঘ দেহের অধিকারী সুপুরুষ ছিলেন। ইসলামের আদর্শ, তাহযীব তমদ্দুনের মুর্ত প্রতীক মাওলানা কারামত আলী মহানবী (সঃ) এর সুন্নতের পাবন্দ ছিলেন। এমনকি দারিদ্রহেতু অনেক দিন ভাতের সাথে কেবল সিদ্ধ লাউ খেয়ে জীবন ধারণ করে ইসলাম প্রচারে লিপ্ত ছিলেন। ইনতিকালের সময়ে কাফন কেনার পয়সাও তাঁর ঘরে ছিল না।

ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেনীর মানুষকেই তিনি সমভাবে ভাল বাসতেন। আসামে ইসলাম প্রচারকালে তিনি শুধু মুসলামনদের মধ্যেই পোশাকাদি বিতরণ করেননি, তাঁর এ দয়ায় দান থেকে গরীব অমুসলমানরাও বঞ্চিত থাকেনি। ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামকালে তিনি দু'জন ইংরেজ মহিলার জীবন রক্ষা করেছিলেন। বস্তুতঃ তিনি যা কিছু করেছেন তা সবই মানবতার খাতিরেই করেছেন। নিজের সুখ-সুবিধা বা স্বার্থের জন্য কিছুই করেননি।

মৃত্যুর পূর্বে তিনি মুসলমানদের উদ্দেশ্যে যে দিক নির্দেশনামূলক নসীহত রেখে যান তা হল এই ঃ-

১। প্রত্যেক মুমিন লোক যে পর্যন্ত নিজের সমস্ত ব্যাপার ও কাজ কারবার শরীয়তে মোহাম্মদীর দিকে রুজু না করিবে এবং এই ব্যাপারে নবী করীম (সঃ) কে হাকিম নিযুক্ত না করিবে এবং ঐ সমস্ত ব্যাপারে শরী'আতের মীমাংসাকে অন্তরের সহিত কবুল না করিবে, সে পর্যন্ত সে মুমিন নামের যোগ্য হইবে না।

২। যাহারা মনে করে যে, আধ্যাত্মিক তা'লীম কোন কিতাবে নাই, মাশায়েখে কেরামের সীনায় সীনায় চলিয়া আসিয়াছে, তাহারা ভুল ধারণা পোষণ করিতেছে, যাহা কিতাবে নাই তাহা গ্রহণযোগ্য নহে এবং তাহা ধর্মের কথাও নহে।

৩। নেককারদের সোহবতে থাকা নেককাজ করার চেয়েও উত্তম। আর পাপাচারীদের সোহবতে থাকা পাপ কাজ করার চেয়েও খারাপ।

৪। কাফেরের সোহবতের চেয়ে বেদআতী লোকের সোহবত অধিক মন্দ। বেদ'আতী ফেরকাগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ঐ ফেরকা যাহারা নবী করীম (সঃ) এর সাহাবীগণের সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করে।

৫। দুনিয়া ছায়ার তুল্য আর আখিরাত সূর্যের ন্যায়। ছায়ার দিকে যতই ধাবিত হইবে, কখনও ছায়াকে ধরিতে পারিবেনা। কিন্তু সূর্যের দিকে যতই যাইতে থাকিবে, ছায়াও সঙ্গে সঙ্গেই যাইবে।

৬। আউলিয়ায়ে কিরামের মধ্যে যদি কেহ দুনিয়া অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহা মানুষের উপকারের জন্যই করিয়াছেন।

৭। যদি কোন আলিম লোক কোন দরবেশ অথবা মাজযুবের খেলাফেশরা কাজ দেখিয়া অসন্তোষ জ্ঞাপন করেন, এবং বে-শরা দরবেশের কথা মান্য না করেন, তবে সেই আলেমের কোন ভয়ই নাই, রবং রাসুলে খোদা (সঃ) তাহার সহায় হইয়া থাকেন।

৮। আল্লাহ তায়ালার অভ্যাস এই যে, তিনি মানুষকে মুরশেদের উছিলায় হিদায়াত করেন। আল্লাহ পাক যাহাকে গোমরাহ করেন, সে কোন মুরশেদের সন্ধান পায় না। খোদার অন্বেষণকারীদের জন্য মুরশেদের শরণাপন্ন হওয়া একান্ত আবশ্যক; কিন্তু মুরশেদকে চিনিয়া লওয়া চাই। মুরীদের জন্য একান্ত

Dhaka University Institutional Repository

কর্তব্য যে, সে এমন একজন কামেল লোককে অবলম্বন করে, যিনি অনুসরণের যোগ্য। কেননা, এই মুরশেদই হইবেন পথের দিশারী ।

৯। স্বীয় সমস্ত কথা ও কাজকে যাচাই করিয়া দেখা এবং স্বীয় নফসকে আয়ত্বে রাখা প্রত্যেক মুরীদের জন্য অবশ্য কর্তব্য ।

১০। মানুষের নফসের পরিচ্ছন্নতা সাধন এবং নফসের দোষসমূহের সংশোধনই তরীকতের উদ্দেশ্য। নফসের দোষ দেশ ও কাল বিশেষে পরিবর্তিত হইয়া থাকে। অতএব, নফসের এছলাহের জন্য তরীকতের রীতিও পরিবর্তন হইয়া থাকে ।

১১। আহলুল্লাহর প্রতি বিশেষতঃ স্বীয় নফসের এছলাহের জন্য যে পীরের নিকট নিজেকে সমর্পন করিয়াছে এবং যাহার দ্বারা উপকৃত হওয়ার ইচ্ছা করিয়াছে তাঁহার কোন কাজে খুঁত বাহির করিয়া প্রশ্ন করাকে নিজের জন্য হলাহল (বিষ) তুল্য মনে করিও ।

১২। তরীকতপন্থীর কর্তব্য দিবা ও রাত্রির মধ্য হইতে কোরআন শরীফ তেলাওয়াতের জন্য একটু সময় নির্দিষ্ট করিয়া লওয়া ।

১৩। আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, অনর্থক কাজে লিপ্ত হইলে মানুষের পূর্বকৃত পরহেযগারী 'বরবাদ' হইয়া যায়। অতএব, মানুষ যখনই টের পাইবে যে, তাহার দ্বারা কোন অনর্থক কাজ সাধিত হইয়াছে, তৎক্ষাৎ তওবা করিয়া পুনরায় সেইরূপ না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিবে ।

১৪। লোক-দেখানোর উদ্দেশ্যে উত্তম পোশাক পরিধান করিলে নফসের কামনা পূর্ণ করা হয়। আর মোটা কাপড় পরিলে রিয়াকারী হয়। অতএব, ভাল কাপড়ই হউক আর মন্দ কাপড়ই হউক শুধু আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের নিয়তে পরিধান করা কর্তব্য। একবার সুফইয়ান সুরী (রাঃ) উল্টা কোর্তা পরিয়া পথে বাহির হইলেন, কোর্তার প্রতি তাঁহার লক্ষই ছিল না। লোকে দেখিয়া তাঁহাকে বলিল, হযরত আপনি তো উল্টো কোর্তা পরিয়াছেন। তখনই তিনি উহাকে সোজা করিয়া পরার ইচ্ছা করিলেন, পরক্ষণেই সেই ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া বলিলেন, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমি জামা পরিয়াছি । এখন উহাকে মানুষের খুশীর জন্য আর সোজা করিয়া পরিব না ।

১৫। শরী'আতে মোহাম্মদী আমাদিগকে অন্যান্য সমস্ত শরী'আত হইতে বিদায় করিয়াছে। এমন কি আছে, যাহা শরী'আতে মোহাম্মদীর মধ্যে নাই? হযুর (সঃ) তাওরাত পর্যন্ত অধ্যয়ন করিতে অসম্মত হন। সুতরাং মুশরিক এবং যোগীদের তরীকা অনুযায়ী কিংবা গণকের কথানুসারে আমল করিলে রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর কি পরিমাণ গযবের মধ্যে গ্রেফতার হইতে হইবে, চিন্তা করিয়া দেখা উচিত ।

১৬। কারামত প্রকাশিত হওয়া উচ্চস্তরের মুরশেদ হওয়ার জন্য শর্ত নহে। আসল কথা এই যে, যেকের আযকারের উদ্দেশ্য হইল অন্তরের শান্তি এবং আল্লাহ পাকের মহব্বত হাসিল করা। গায়েবী সুন্নত, নূর এবং নানা রকমের রং দেখার উদ্দেশ্য নহে, আর যেকের আযকারের ব্যবস্থা ও এই জন্য হয় নাই ।

১৭। হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ (রঃ) আমাকে বলিয়াছেন, 'উত্তম খাদ্য খাইও, উত্তম পোশাক পরিও, উত্তম যানবাহনে আরোহণ করিও, ইহাই তোমার জন্য রিয়াযত এবং মুজাহাদা'। ঈদের দিন সেমাই খাওয়া সম্বন্ধে আমি হযরত পীর সাহেব কেবলাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, মাওলানা পানাহারের মধ্যে বিদ'আত নাই । ঈদের দিন মিষ্টান্ন সুন্নত। সেমাইও তো মিষ্টান্নই বটে ।

১৮। নামায না পড়িলে নফস কখনও দুরস্ত হইবে না সে অন্যান্য নেক আমল এবং ছদকা খয়রাত যতই করুক না কেন। বলা বাহুল্য নফস রসাতলে যাউক ইহা কেহই পছন্দ করিবে না। তবে মানুষ বে-নামাযী থাকা কেমন করিয়া পছন্দ করিবে?

Dhaka University Institutional Repository

১৯। নামায মুমিনের জন্য মেরাজ, নামাযের দ্বারা বান্দা আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যে পৌছিয়া যায়। নামায আল্লাহ তা'আলার দীদারের মোকামের খবর প্রদান করে, নামাযে আল্লাহ তা'আলার দীদারের ঘ্রাণ পাওয়া যায় । ইহা অন্য কোন এবাদতে নাই ।[১]

মাওলানা সাহেব সুদীর্ঘ সাতান্ন বৎসরের মধ্যে একান্ন বৎসর বাংলা ও আসামে ইসলাম প্রচার ও সংস্কারমুলক কার্যাদি সুসম্পন্ন করার পর ১২৯০ হিঃ/ ১৮৭৩ ইং এর গোড়ার দিকে অসুস্থ অবস্থায় রংপুরে গমন করে শহরের মুনশীপাড়া নামক স্থানে বসতি স্থাপন করেন । সুগঠিত ও ব্যায়ামপুষ্ট হলেও অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে তাঁর দেহ ভেঙ্গে পড়ে । কিছুকাল কাতর অবস্থায় শয্যাশায়ী থেকে ১২৯০ হিজরীর ২রা রবীউস সানী মুতাবিক ৩০শে মে, ১৮৭৩ সালে শুক্রবার প্রায় ৭৩ বৎসর বয়সে সুব্হি সাদিকের সময় ইন্‌তিকাল করেন । মৃত্যুকালে তাঁর অধিকাংশ আত্মীয়-স্বজন তার সঙ্গে ছিলেন। বিকালে মুনশীপাড়ায় তাঁকে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ছয় পুত্র, নয় কন্যা এবং বহু সংখ্যক মুরীদ ও খলীফা রেখে যান । তাঁর মৃত্যুর এক মাস পর তাঁর সহধর্মিনীও ইন্‌তিকাল করেন। তাঁকে তাঁর পাশেই সমাহিত করা হয় । তাদের সমাধির পাশেই একটি সুরম্য মসজিদ নির্মান করা হয়েছে। মসজিদটি কারামতিয়া মসজিদ নামে তাঁর স্মৃতি বহন করছে । প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এনামে একটি মাদ্রাসাও স্থাপিত হয়। দুঃখের বিষয়, পরে ইহাকে নিউ স্কীম মাদ্রাসা ও পরিশেষে হাইস্কুলে পরিনত করা হয় । প্রতি বছর রবীউল আউয়াল মাসের ১২, ১৩ ও ১৪ইং তারিখে এ মসজিদ প্রাঙ্গনে উরস উদ্‌যাপিত হয় । এ উপলক্ষ্যে দেশ-দেশান্তর ও বহু দূর দুরান্তর থেকে হাজার হাজার লোক সমবেত হয়ে তাঁর স্মৃতি-চারন ও তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনা করে থাকে । উরসের সময় এখানে তিন দিন ব্যাপী ওয়াজ নসীহত ও যিক্‌র আযকারের অবস্থা করা হয়ে থাকে ।

মাওলানা ‘আবদুল করীম

তাঁর মাযারও শুল্লাখালী গ্রামে অবস্থিত। তিনি জৌনপুরের মাওলানা কারামত আলীর (১৮০০-১৮৭৩) খলীফা ও বুযুর্গ লোক ছিলেন ।[২]

মৌলবী আবদুর রহীম

মৌলবী আবদুর রহীম চট্টগ্রামের অন্তর্গত পাঠানটুলীর অধিবাসী ছিলেন । তাঁর জীবনেতিহাস সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায়নি। তিনি মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরীর(রঃ) হাতে খিলাফত লাভ করেছিলেন । পাঠানটুলিতে তাঁর মাযার আছে ।[৩]

১। মুহাম্মদ হাসান আলী চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০১-১০২; ডঃ আবদুল কাদের, প্রাগুক্ত, পৃ ঃ১০৫-১০৬।
২। ডঃ আবদুল কাদের, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৯ ।
৩। মাওলানা এম, ওবাইদুল হক, বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ, পৃঃ ৮৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

মৌলবী আবদুল বাকী (রঃ)

মৌলবী আবদুল বাকী (রঃ) চট্টগ্রামের অন্তর্গত পাঠানটুলীর অধিবাসী ছিলেন। মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরীর (রঃ) হতে খিলাফত লাভ করেছিলেন । তাঁর জন্ম-মৃত্যুসন সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। পাঠানটুলীতে তাঁর মাযার অবস্থিত ।[১]

মাওলানা আবুল হাসান
(১৮০১ - ১৮৫১)

মাওলানা আবুল হাসান নকশবন্দিয়া তরীকাহর বুযুর্গ ছিলেন । তাঁর উর্ধতন পুরুষ মীর মুনশী মুহাম্মদ সুফিয়ান ইবন সুলায়মান চট্টগ্রামস্থ কদম মুবারকের প্রতিষ্ঠিতা নওয়াব ইয়াসীন খাঁ-এর সহিত ১১৩৭হিঃ/১৭২৪ইং এ দেশে আগমন করেন । সুফিয়ান এর পুত্র মুহাম্মদ মুদাব্বির-এর বংশধর মুহাম্মদ দওলত ইবন দাবা-এর দরিদ্রগ্রস্থ হওয়ার কারণে পটিয়া মৌজা ছেড়ে চট্টগ্রাম শহরের নিকট চাঁদগাঁও পরগণার অন্তর্গত ফরিদর পাড়ার মহল্লায় এসে বসতি স্থাপন করেন । দওলত-এর দুই পুত্র ছিল । মুহাম্মদ মুকীম মিয়াযী ও মুহাম্মদ নুরুল্লাহ মিয়াযী । মাওলানা আবুল হাসান ছিলেন মুকীম মিয়াযী-এর পুত্র । তিনি ১৮০১ ইং সনে জন্মগ্রহণ করেন । ঢাকা মুহসিনিয়া মাদ্রাসা ও কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় দীনী শিক্ষা সমাপ্ত করে ভারতের কোন এক বিখ্যাত মাদ্রাসায় গমন করেন । তথায় সাত বছর উচ্চশিক্ষা লাভ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং পটিয়া থানার অন্তর্গত হাওলা নিবাসী মাওলানা মুফীযুল্লাহ-এর মুরীদ হয়ে আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করেন ।

তাঁর মুরীদ হওয়া সম্পর্কে কথিত আছে যে, তাঁর পিতা মুহাম্মদ মুকীম মিয়াযী তাঁকে নিয়ে আপন পীর মুফীযুল্লাহ-এর নিকট গমন করেন এবং তাঁর জন্য দু'আ করতে অনুরোধ করেন। তিনি আসরের নামায পড়ার পর কুর'আনের তাফসীর আরম্ভ করে পরদিন ফজরের নামাযের সময় শেষ করেন। পীর সাহেব তাঁর সুগভীর বিদ্যাবত্তা ও জ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং আপন নাতনীকে তাঁর সাথে বিয়ে দেন। তখন হতে তাঁর খ্যাতি লোক সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি মুনসিফ পদে বিভিন্ন স্থানে চাকুরী করে চট্টগ্রাম সদরের সাব জজ হিসেবে চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন ।

তিনি সর্বদা ন্যায় বিচার করতেন। অনেক কাজের মধ্যেও তিনি নিজেকে দীনী ইলম শিক্ষা দান কার্যে ব্যাপৃত রেখেছিলেন । তৎকালে চট্টগ্রামে এমন কোন আলিম ছিলেন না যিনি মাওলানা আবুল হাসান এর নিকট দীনী ইলম শিক্ষা করেননি । অতি অল্পদিনের মধ্যেই তিনি আধ্যাত্মিক বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি ১৮৫১ ইং মুতাবিক, ১২৮২ হিঃ ইন্তিকাল করেন ।[২]

১। মাওলানা এম, ওবাইদুল হক, বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ, পৃঃ ৩২ ।
২। মাওলানা এম, ওবাইদুল হক, বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ, পৃঃ ৮৯-৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত শাহ্ সায়্যিদ আবদুর রহীম (রঃ) ওরফে পরীবাগের শাহ্ সাহেব

(১৮১০-১৯৬১)

পুরো নাম সায়্যিদ শাহ্ আবদুর রহীম। পরীবাগের শাহ্ সাহেব নামেই তিনি বেশী খ্যাত ছিলেন। তাঁর নিজস্ব বর্ণনামতে জানা যায়, তিনি ১৮১০ সালে পাকিস্তানের হারারা জিলার হরিপুরস্থ খেলাওয়াত গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।[১] তাঁর পিতার নাম মাওলানা জিওন শাহ্।

শাহ্ সাহেব হরিপুরে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তৎকালীন ফারসীর আলিম মরহুম গোলাম গাউসের নিকট জামী, নিযামী, শেখ সাদীর গ্রন্থাবলী এবং মাওলানা জালালুদ্দিন রুমীর মসনবী অধ্যয়ন করেন। রাওয়ালপিন্ডি শহরে হাদীস ও তাফসীর শিক্ষা করেন। তৎকালীন প্রসিদ্ধ আহলে হাদীস আলিম মাওলানা আবদুল হাদী (পূর্ব নাম ইমামুদ্দিন)-এর নিকট হাদীস ও তাফসীর শাস্ত্রে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। পরবর্তীকালে এবোটাবাদ বামখিলের প্রসিদ্ধ বুযুর্গ হযরত মাওলানা আবদুল হক ওরফে লালাজী-এর নিকট দু বৎসর অবস্থান করেন ও তাসাওফের দীক্ষা গ্রহণ করেন।

আনুমানিক ১৯০০ সাল তিনি ঢাকায় আসেন। প্রথমে তিনি ঢাকা শহরের ইসলামপুর আমপট্টি অঞ্চলে ফরাসী গীর্জার নিকটবর্তী দোতালা মসজিদে ইমামতী করতে থাকেন।[২] তৎপর নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহর শাহবাগে অবস্থিত দুগ্ধ খামারে মুন্শী নিযুক্ত হন। লোকমুখে সে সময়ের একটি ঘটনা থেকে জানা যায় যে নওয়াব সাহেবের খামারে অত্যন্ত উচ্চ দামে ২০/২৫ সের দুধ দেয় এমন একটি গাভী আনয়ন করা হয়। গাভীটি অত্যন্ত দুর্ধর্ষ প্রকৃতির ছিল বিধায় কর্মচারীরা কয়েকদিন দুগ্ধ দোহন করতে পারেনি। অবশেষে শাহ্ সাহেবের কাছে আনা হলে তিনি মনে মনে কিছু কালাম পড়ে গাভীটির পিঠে চর মারেন, দুটো শিং ধরে থাকেন এবং কর্মচারীদেরকে দুগ্ধ দোহন করতে বলেন। গাভীটি তখন শান্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকে এবং দুগ্ধ দোহন শেষ হয়। এরপর গাভিটি আর কখনও গোলমাল করেনি। শাহ্ সাহেব দুধের দায়িত্বে থাকায় তিনি ঢাকার প্রাচীন লোকদের নিকট 'দুধ শাহ্' নামে খ্যাত।[৩]

শাহ্ সাহেবের সততা, নিষ্ঠা ও দক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে নওয়াব তাঁকে বিরাট বাগানসহ পরীবাগে একটি বাড়ী দান করেন। প্রথম জীবনে আরমানীটোলায় বসবাস করলেও প্রায় প্রত্যহই পরীবাগে[৪] আসতেন। অতঃপর শেষ জীবনে তিনি পরীবাগেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন।[৫] ঢাকায় এসে তিনি আরও

১। ইসলামী বিশ্বকোষ, চতুর্দশ খন্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩, পৃঃ ২৪৮। মাওলানা এম ওবাইদুল হক তাঁর বাংলাদেশের পীর-আউলিয়াগলণ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি ১৮২০/২৫ সনে পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডি হতে প্রায় ৪৫ মাইল দুরে হরিপুর শহরের উপকণ্ঠে চর শরীফ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি (শাহ সাহেব) নিজেই বলেছেন, যৌবনকালে তিনি চর শরীফ ছেড়ে হরিপুরে বসবাস করতে থাকেন। সেখানে তাঁর জ্যৈষ্ঠপুত্র শাহ আবদুল গফুর সপরিবারে বাস করছেন। শাহ্ আবদুল গফুরের দুই পুত্র ছিল মোহাম্মদ গুলাম সরওয়ার ও মোহাম্মদ খালেদ।

২। মাওলানা এম ওবাইদুল হক, বাংলাদেশের পীর-আউলিয়াগণ, পৃঃ ৬২।

৩। মাওলানা এম ওবাইদুল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৩।

৪। ঢাকা মহানগরীর প্রাণ কেন্দ্রে অবস্থিত শাহবাগের অদুরে অবস্থিত। এখানে নওয়াবদের অন্যতম সুন্দর বাগিচা ছিল। ফুল বাগানের অপরূপ সৌন্দর্য হতে স্থানটির নাম পরীবাগ হয়েছে। (ইসলামী বিশ্বকোষ, চতুর্দশ খন্ড, পৃঃ ২৪৯)।

৫। ইসলামী বিশ্বকোষ, চতুর্দশ খন্ড, পৃঃ ২৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

একটি বিয়ে করেন ।[১] তিনি একজন কামিল ও সাধক লোক ছিলেন ।[২] তাঁর আধ্যাত্মিকতায় মুগ্ধ হয়ে অনেকে তাঁর নিকট বায়'আত গ্রহণ করেন। শাহ্ সাহেবের বহুবিধ কীর্তির মধ্যে পরীবাগ শাহ্ সাহেব মসজিদটি অন্যতম। এটা ১৯০৪/৫ সনের দিকে নির্মিত হয়। উচু মিনার বিশিষ্ট মসজিদটি আয়তনে ১২০০ বর্গফুট। শাহ্ সাহেব বেশ কিছু সম্পত্তি এ মসজিদের নামে ওয়াক্ফ করে যান । এ সম্পত্তির আয় থেকেই মসজিদের যাবতীয় খরচ নির্বাহ করা হয়। শাহ্ সাহেব প্রতি শুক্রবার আসরের নামাযের পর তাঁর খানকাহ্তে সুরাতুল কাহফ ও সুরা মরিয়মের প্রথম রুকু তিলাওয়াত করে দোয়া করতেন-যাতে অনেক আলিম উলামা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গসহ অগনিত সাধারণ লোক উপস্থিত হতেন।[৩] তাঁর দোয়ার বরকতে বহু লোক আরোগ্য লাভ করত, অনেকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হত ।[৪] তাঁর নামানুসারে 'পরীবাগ শাহ্ সাহেব লেন' নামে একটি রাস্তা ছিল। পরবর্তীকালে এর নাম 'পরীবাগ শাহ্ সাহেব রোড' রাখা হয়। তিনি সুদীর্ঘ ১৫২ বছর ইসলামের খেদমত করে ১৯৬১ সালে পরীবাগে ইন্তিকাল করেন ।[৫] তাঁর জানাযায় লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়। পরীবাগে তাঁর নিজস্ব খানকাহ্য় তাঁকে দাফন করা হয় ।

হযরত আলী শাহ্
(মৃঃ - ১৮৬৫ইং)

হযরত আলী শাহ্ চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর জন্মস্থান ও জন্মকাল সম্পর্কে কোন তথ্য জানা যায়নি। তিনি একজন উচ্চ মার্গের সাধক ছিলেন। সময় সময় মাজযুব অবস্থায় থাকতেন। তখন তাঁর বাহ্যিক জ্ঞান লোপ পেত। সুদীর্ঘ ৫০ বছরের মধ্যে যতক্ষন সজ্ঞানে থাকতেন বিনা ওযুতে থাকতেন না। সর্বদা কেবলামুখী হয়ে নামাযের কায়দায় বসতেন। কখনও তাঁকে এর ব্যাতিক্রম করতে দেখা যায়নি। সজ্ঞান অবস্থায়ও তিনি লোকজনের সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা বলতেন না। মাজযুব থাকাকালীন অবস্থায়ও নামাযের সময় জ্ঞান ফিরে আসত এবং জামা'আতের সাথে নামায আদায় করতেন । কখনও তাঁকে নামায কাযা করতে দেখা যায়নি । তাঁর ইবাদতের মধ্যে পবিত্র কুর'আন তিলাওয়াতই ছিল প্রধান। তিনি পানাহার, ওযু এবং এস্তেঞ্জাসহ সব কাজে মাটির বাসন, গ্লাস ও লোটা-বদনা ব্যবহার করতেন। গযল শ্রবন করা পছন্দ করতেন না । মাজযুব অবস্থায় কেহ তাঁকে উলঙ্গ হতে দেখেনি। তিনি ইলম-ই-লাদুনীর অধিকারী ছিলেন । ১৩ রবীউস সানী, ১২৮২হিঃ/১৮৬৫ ইং বৃহস্পতিবার তিনি ইন্তিকাল করেন । চট্টগ্রামের হালীশহরে তাঁর মাযার অবস্থিত ।[৬]

১। মাওলানা এম ওবাইদুল হক, বাংলাদেশের পীর-আউলিয়াগণ , পৃঃ ৬৩।
২। নাজির হোসেন, কিংবদন্তীর ঢাকা , পৃঃ ৪৫।
৩। ইসলামী বিশ্বকোষ, চতুর্দশ খন্ড, পৃঃ ২৪৯।
৪। মাওলানা এম, ওবাইদুল হক, বাংলাদেশের পীর-আউলিয়াগণ , পৃঃ ৬৩।
৫। কিন্তু মাওলানা এম, ওবাইদুল হক, তাঁর বাংলাদেশের পীর-আউলিয়াগণ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি ১৪০ বছর বয়সে ১৯৬১ সনে ইন্তিকাল করেন, পৃঃ ৬৩ ।
৬। মাওলানা নুরুর রহমান, তাযকেরাতুল আওলিয়া, খন্ড-৬, পৃঃ ২১৭-১৮।

Dhaka University Institutional Repository

শাহ্ সূফী মুখলিসুর রহমান
(১৮১৩ - ১৮৮৪)

চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত সাতকানিয়া থানাধীন সোনাকানিয়া গ্রামে ১২২৯ হিঃ/১৮১৩ ইং সনে শায়খুল আরিফীন হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী মুখলিসুর রহমান (রঃ) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মৌলবী সায়্যিদ গুলাম আলী। তিনি একজন জমিদার ছিলেন এবং ওকালতি করতেন সূফী মুখলিসুর রহমান নিজ গৃহে প্রাথমিক আরবী ও ফারসী শিক্ষা লাভ করার পর নিজ গ্রামের পীর কাতাল শাহ এর দরগাহ বাড়ীর মদ্রাসায় লেখাপড়া করেন। তাঁর প্রথম নাম ছিল 'মিঞা জান', মাদ্রাসার জনৈক শিক্ষক তাঁর নাম পরিবর্তন করে এ নামে নামকরণ করেন। উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য তিনি কলিকাতা গমন করেন। শিক্ষালাভের পর বিহারের ভাগলপুরের হযরত মাওলানা সায়্যিদ শাহ ইমদাদ 'আলীর কাছে বায়'আত গ্রহণ করেন এবং কঠোর সাধনা করে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে কামালিয়াত অর্জন করেন। তিনি জাহিরী ও বাতিনী উভয় জ্ঞানে প্রভূতজ্ঞানের অধিকারী এবং শরী'আতের অত্যন্ত পাবন্দ ছিলেন। তিনি নিজে অযথা সময় নষ্ট করতেন না এবং তা পছন্দও করতেন না। সর্বদা কোন না কোন সৎ কাজে নিযুক্ত থাকতেন। সব সময় তিনি একটি মুনাজাত করতেন -''হে পালন কর্তা, এরূপ ধণাঢ্যতা থেকে রক্ষা কর যা তোমার প্রতি অসাবধানতার উদ্রেক করে, আর এরূপ দরিদ্রতা থেকে রক্ষা কর যা তোমার ইয়াদগারীতে অলসতা জন্মায়''। এই মহান সাধক ৭৩ বৎসর বয়সে ১২ই জিলকদ, সোমবার ১৩০২ হিঃ/১৮৮৪ইং সনে ইনতিকাল করেন। মির্জাখিল দরবার শরীফে তাঁকে সমাহিত করা হয়।[১]

মাওলানা শাহ্ ফসিহ উদ্দিন
(১৮১৩ - ১৮৯৩)

চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানার ফতেহপুরে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। আরবী ও ফারসী ভাষায় তাঁর প্রাগাঢ় জ্ঞান ছিল। তাঁর পিতা ঢাকায় শায়খ মুহাম্মদ দায়িম (রঃ)-এর শিষ্য ছিলেন। মাওলানা আশরাফ আলী সাহিপুরী মাওলানা তাঁর প্রধান শিষ্যদের অন্যতম ছিলেন।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ইনতিকাল করেন।[২]

পীর মুহসিন উদ্দীন আহমদ ওরফে দুদু মিয়া
(১৮১৯ - ১৮৬২ খৃঃ)

বাংলায় ঐতিহাসিক ফরায়েযী আন্দোলনের নেতা মাওলানা হাজী শরী'আত উল্লাহ-এর মৃত্যুর (১৮৩৯/৪০) পর হাজী শরী'আত উল্লাহ-এর আত্মীয়-স্বজন ও তাঁর শিষ্যরা সমবেত হয়ে সকলের মতানুসারে ইসলামী গণতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী তাঁর একমাত্র পুত্র দুদুমিয়াকে ফরায়েযী সম্প্রদায়ের নেতা নির্বাচিত করেন।[৩] কেননা, ফরায়েযী আন্দোলনকে সুসংগঠিত ও সুসংহত করার কার্যে এবং

১। বি, এ, আজাদ ইসলামাবাদী, চট্টগ্রাম স্মরণী, প্রকাশকাল ৩রা জুলাই, ১৯৮৭ ইং, পৃঃ১১।

২। বি, এ, আজাদ ইসলামাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬।

৩। আবদুল বারী, History of the freedom movement, পৃঃ ৫৫৪, হুমায়ুন আবদুল হাই, মুসলিম সাধক ও সংস্কারক, পৃঃ ৬১।

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দু জমিদার মহাজনদের অন্যায় অত্যাচার প্রতিরোধ আন্দোলনে দুদু মিয়া অত্যন্ত যোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। কর্ণেল প্যাম্প ডেল লিখেছেন, ''হাজী সাহেবের মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্যরা সমবেত হয়ে সকলের মতানুসারে তাঁর পুত্র দুদু মিয়াকে তাদের সম্প্রদায়ের নেতা নির্বাচিত করেন''। তাঁর প্রকৃত নাম মুহসিন উদ্দীন আহমদ দুদু মিয়া । পরবর্তী জীবনে তিনি পীর দুদু মিয়া নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন ।[১]

দুদু মিয়া ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে বর্তমান মাদারীপুর জেলার শিবচর থানাধীন মুলফতগঞ্জ[২] গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তিনি পিতার কাছে শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করেন । দুদু মিয়া নিজ বাড়ীতে পিতার নিকট আরবী ও ফারসী ভাষায় জ্ঞান লাভকালীন সময়ে তাঁর পিতা ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে মাত্র বার বৎসর বয়সে ইসলামী বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে তাঁকে মক্কা শরীফ পাঠিয়ে দেন । মক্কায় যাওয়ার পথে পীর দুদু মিয়া কিছুদিন কলিকাতায় অবস্থান করেন এবং পশ্চিম বঙ্গের তৎকালীন সংগ্রামী নেতা তীতুমীর এর গ্রামের[৩] বাড়ীতে গিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাত করার পর দোয়া কামনা করেন ও তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হন ।[৪] পীর সাহেবকে দেখে তীতুমীর সন্তুষ্ট হন, তাঁকে উপহার স্বরূপ তাসবীহ দান করেন। উক্ত তাসবীহ এখনও তাঁর উত্তরাধিকার মহিউদ্দীন আহমদ (দাদন মিয়া) এর কাছে সংরক্ষিত আছে।

তৎকালীন পূর্ববাংলায় ফরায়েযী আন্দোলন সংঘটিত করার জন্য হাজী শরী'আত উল্লাহ এককভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করার দরুণ এবং বার্ধক্যজনিত কারণে ক্লান্ত হয়ে পড়লে একমাত্র পুত্র দুদু মিয়াকে মক্কা শরীফ থেকে ডেকে পাঠান ।[৫] ছয়/সাত বছর মক্কা শরীফ অবস্থান করার পর দুদু মিয়া ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন ।[৬] মক্কা শরীফে তাঁর শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে তেমন কিছু জানা যায়নি। তবে তিনি পবিত্র কুরআন, আরবী ও ফারসী ভাষায় বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করেন। দেশে প্রত্যাবর্তনের পর শরী'আত উল্লাহ দুদু মিয়াকে কাছে রেখে আধ্যাত্মিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলেন । তাঁর অবর্তমানে যোগ্যতার সাথে ফরায়েযী আন্দোলন পরিচালনা করার যোগ্য করে তোলার উদ্দেশ্যে যথোপযোগী প্রশিক্ষণ-এর ব্যবস্থা করেন এবং ফরায়েযী প্রজাদের উপর হিন্দু জমিদার ও মহাজনদের ক্রমবর্ধিষ্ণু অত্যাচার রোধ করার লক্ষ্যে ফরায়েযী আন্দোলনকে সংগঠিত করার দায়িত্বে নিয়োজিত করেন ।

শরী'আত উল্লাহ শিরক, বিদ'আত এবং মুসলমানদের উন্নতি ও মুক্তির জন্য যে ফরায়েযী আন্দোলন শুরু করেছিলেন দুদু মিয়া তার পূর্ণতা দান করেন ।

দুদু মিয়া মক্কা শরীফ থেকে দেশে প্রত্যাবর্তন করেই বুঝতে পারলেন যে, তাঁর পিতার ধর্মীয় ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের ফলে ভুঁইফোড় হিন্দু জমিদার ও নীল-কুঠিয়ালরা তাঁর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ

১। পীরজাদা মুহিউদ্দীন আহমদ, আপোষহীন এক সংগ্রামী পীর দুদু মিয়া (রঃ), পৃঃ ৯-১২।

২। মুলফতগঞ্জের বর্তমান নাম বাহাদুরপুর । পূর্বে ইহা বাকেরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত ছিল ।

৩। পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশপরগণা জিলার বারাসাত মহকুমার বসিরহাট থানার অন্তর্গত চাঁদপুর ।

৪। ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৩শ খন্ড, পৃঃ ৪৫৭ ।

৫। পীরজাদা মুহিউদ্দীন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০ ।

৬। কিন্তু ইসলামী বিশ্বকোষ (১৩শ খন্ডের ৪৫৭ পৃষ্ঠা) বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি পাঁচ বছর পর দেশে প্রত্যাবর্তন করেন ।

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। ইংরেজরা প্রভাবশালী হিন্দুদের সহযোগিতায় মুসলমানদেরকে ভূমিহীন চাষী ও দরিদ্র শ্রমিক শ্রেণীতে পরিণত করে ফেলেছে । উচ্চ পদস্থ মুসলমান কর্মচারীদেরকে তাঁদের নিজ নিজ পদ থেকে বরখাস্ত করে সেখানে অকর্মণ্য ও জালিম হিন্দুদেরকে নিয়োগ করা হয় । ফলে, মুসলমানদের অর্থনৈতিক অবস্থা চরম শোচনীয় হয়ে পড়ে । দুদু মিয়া আরও বুঝতে পারলেন যে, মুসলমানদের অবস্থা পরিবর্তন ও উন্নত করতে না পারলে এদেশে মুসলমানদের মুসলমান হিসেবে টিকে থাকা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে । তাই, তিনি এসব হিন্দুজমিদারদের ও নীলকরদের শোষণ, জুলুম ও অত্যাচার থেকে মুসলমানদের রক্ষা করতে সচেষ্ট হন ।[১] এবং বিদেশী ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদ সাধন করে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য এক মহাপরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হন । স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে ঘুরে তিনি প্রচার করতে লাগলেন যে, আল্লাহর দুনিয়াতে সব মানুষ সমান, জমির উপর ইচ্ছামত কর ধার্য করার ক্ষমতা কারও নেই। সাথে সাথে তৎকালীন তথাকথিত মোল্লা-মৌলভীদের প্রচলিত উৎপীড়নমূলক ধর্মীয় রীতিনীতি রদ করে মুসলমানদেরকে ঈমানের বলিষ্ঠতা নিয়ে অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে মুকাবিলার জন্য মুসলমানদের আহবান জানান ।[২] দুদু মিয়া পিতার মৃত্যুর পর ফরায়েযী সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহন করেই আক্রমণাত্মক নীতির প্রস্তাব দেন। তিনি মনে করলেন যে, তাঁর পিতার আদর্শবাদ ও নরমপন্থী নীতিই শত্রুদেরকে মুসলমানদের উপর অত্যাচার করতে সাহস জুগিয়েছে । তাই তিনি প্রথমেই পিতার প্রচারিত আদর্শ থেকে একটু সরে যান। পীর প্রথার প্রচলন শুরু করেন। নিজ নামের পূর্বে 'পীর' শব্দ ব্যবহার করেন এবং নিজে পীর বলে অভিহিত হন। তিনি সমগ্র বাংলাকে কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত করে প্রত্যেক অঞ্চলে একজন করে খলীফা বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। এসব খলীফার কর্তব্য ছিল " To keep the sect together, make prosetytes and collect contributions for the furtherance of object of the association"[৩] এ কাজ ছাড়াও খলীফাদের স্থানীয় গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় খবরাখবর বাহাদুরপুরস্থ প্রধান কার্য্যালয়ে পাঠাতে হত। তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের জমিজমা ও টাকা পয়সা সংক্রান্ত যাবতীয় গন্ডগোল খলীফাদের নিয়ে মীমাংসা করতেন । কেউ তাদের আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত না হলে বা বিচার অমান্য করলে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতেন। এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত বর্ণনা প্রনিধান যোগ্য ঃ- "Dhudhu Miyan compelled the poor riots to join his sect and on refusal caused them to be beaten,ex-communicated from the society of the faithfull and their crops to be destroyed" [৪] তিনি সকল মুসলমানকে তাঁর সম্প্রদায়ভুক্ত করার জন্য সর্বপ্রকার কৌশল প্রয়োগ করেন। এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে শক্তিও প্রয়োগ করেন । এসব কাজের পেছনে তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু জমিদার ও নীল করদের শোষণ ও অত্যাচার থেকে মুসলিম জাতিকে মুক্ত করে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলিম সমাজে পূর্ণাঙ্গ ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা ।[৫] পিতার মত তিনিও শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। দীর্ঘদিন থেকে হিন্দু জমিদারগণ মুসলমানদের নিকট থেকে যেসব কর আদায় করত তা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত ছিল না । এ সমস্ত করের মধ্যে বিবাহ, জমিদারের কাচারীতে আগমন, জমিদার পরিবারের কারও বিবাহ, শ্রাদ্ধ, জমিদার

১। পীরজাদা মুহিবউদ্দীন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০ ।

২। পীরজাদা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩।

৩। Journal of Asiatic Society of Bengal, Vol-LXIII, Part-III, No.-1, 1894, P-50

৪। হুমায়ুন আবদুল হাই, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৩।

৫। হুমায়ুন আবদুল হাই, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

পুত্রের পৈতাগ্রহণ, বরযাত্রা, ফরায়েযী প্রজাদের দাড়ির উপর ২.৫% হারে খাজনা, দুর্গাপূজা, কালিপূজা প্রভৃতি উপলক্ষে কর আদায় অন্যতম ছিল ।[১] দুদু মিয়া এসব জুলুমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। "It was against the living of illegal ceases by land lord the Dhudhu Miyan made his most determined stand. That a Muhammandan rayat should be obliged to contribute the support of any of the idolatrous rites of the Hindu land lord were intolerable act of oppression. He advances a step further when he proclaimed that the earth's is God's and that no one has right to occupy it as an inheritance or levy taxes upon it. The peasantry was, therefore perswarded to settle on khas mahal lands, managed directly by the government and thus to escape the payment of any taxes but those raised by the state" ।[২]

তিনি এসব কর প্রদান নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন । জমিদারদের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গরু কুরবানী করতে উৎসাহ প্রদান করেন। তাই তিনি তাঁর পিতার মৃত্যুর (১৮৪০) পূর্বেই হিন্দুজমিদার ইংরেজ নীলকর ও ইংরেজ শাসকদের প্রতিপক্ষ হিসেবে প্রতিভাত হন ।[৩]

দুদু মিয়া একজন অনিতবিক্রম সংগঠক ছিলেন । তাঁর সাংগঠনিক ব্যবস্থার ফলে ফরায়েযী আন্দোলন ধর্মীয় আন্দোলন থেকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। তাঁর সফল নেতৃত্বের ফলে এ দেশের কৃষক শ্রমিকরা নিজেদের দাবী দাওয়া সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠে। ফরায়েযী আন্দোলনে ঢাকা, ফরিদপুর, যশোর, নোয়াখালী, ময়মনসিংহ, পাবনা, রংপুর, রাজশাহী ও সিলেট জিলার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে । ফলে, অত্যাচারী ও জুলুমবাজ হিন্দু জমিদার ও নীলকরেরা মুসলমান প্রজাদের উপর অত্যাচার করতে শুরু করে ।[৪] তাঁরা ফরায়েযীদের পরস্পারের দাঁড়ির সাথে দাঁড়ি বেঁধে লংকা মরিচের গুড়ো নাকে ঢুকিয়ে দেয়। "The beards recalcitration rayts were ties together and red chilli powder given as snuff".[৫] ফরিদপুরের জমিদার জয়নারায়ণ ঘোষ এবং একই জেলাধীন কানাইপুরের জমিদার পরিবার দুদুমিয়া ও তাঁর সমর্থকদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র করেই ক্ষান্ত হয়নি, তারা মুসলমানদের গরু কুরবানী বন্ধ করতে এবং কালীপূজা ও দুর্গাপূজার কর দিতে বাধ্য করে । তাছাড়া, প্রজারা যাতে ফরায়েযী আন্দোলনে যোগদান না করে তজ্জন্য জমিদার ও নীলকুঠির সাহেবরা কঠোর শক্তি প্রয়োগের নির্দেশ জারী করে। ডব্লিউ, ডব্লিউ, হান্টার তার বিখ্যাতগ্রন্থ The Indian Musalmans -এ বলেন, ''যাহাতে রায়তরা ফরায়েযী আন্দোলনে যোগ না দেয় তার জন্যে করা নির্দেশ জারী হয় । যে সমস্ত রায়তরা জমিদারদের নির্দেশ অমান্য করে ফরায়েযী আন্দোলনে যোগ দিত তাদের উপর এমন শারীরিক নির্যাতন চালান হত যে, শরীরে অসহ্য যন্ত্রনা

১। পীরজাদা মুহিবউদ্দীন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩।

২। Journal of Asiatic Society of Bengal, Vol-LXIII, Part-III, No.-1, 1894, P. 50 ।
হুমায়ুন আবদুল হাই, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৪ ।

৩। ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৩শ খন্ড, পৃঃ ৪৫৭ ।

৪। হুমায়ুন আবদুল হাই, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৩ ।

৫। Journal of Asiatic Society of Bengal, Vol-LXIII, Part-III, No.-1, 1894, p-50, Azizur Rahman Mallick, British policy in Muslim Bengal, P. 83.

Dhaka University Institutional Repository

হত কিন্তু শরীরে আঘাতের কোন চিহ্ন থাকত না। শরীরের উভয় দিকে এই যন্ত্রণা দেয়া হত যাতে কাহারো অভিযুক্ত করা না যায়। দু'জন রায়তের দাঁড়ি দৃঢ়ভাবে বন্ধন করে নাকে নস্যার ন্যায় লাল মরিচের পাউডার নাকের বাশীর ভিতর দেয়া হত। অবস্থাটা একবার কল্পনা করে দেখুন কি করুণ ও নিষ্ঠুর ব্যবস্থা''।[১] এ ছাড়াও প্রজাদেরকে আরও বহুবিধ শাস্তি দেয়া হত। যেমন, উলঙ্গ করে সমস্ত শরীরে পিপড়ে ছেড়ে দেয়া হত। হাত পা বেধে চিৎ করে ফেলে জামার ভিতর দিয়ে পেটের উপর এক প্রকার বিষাক্ত সাদা পিপড়া বা ঘাসের পোকা ছেড়ে দেয়া হত। বিশেষভাবে তৈরী আবর্জনা ভর্তি কুপের মধ্যে বুক পর্যন্ত পুতে রাখা হত। এ ছাড়া দাঁড়ির উপর জনপ্রতি আড়াই টাকা হারে খাজনা অনাদায়ে অকথ্য নির্যাতন করা হত ।[২] জমিদারদের এহেন অত্যাচার সত্ত্বেও প্রজারা ফরায়েযী আন্দোলনে যোগ দিতে পিছপা হত না । জমিদারদের এরূপ অত্যাচার তাদের উদ্দেশ্য হাসিলে ব্যর্থ হল ।

এ দিকে ঢাকা, ফরিদপুর, যশোর, নোয়াখালী, ময়মনসিংহ, পাবনা, কুষ্টিয়া, রংপুর, রাজশাহী ও সিলেট জিলার হাজার হাজার মুসলমান তাদের প্রিয় নেতার নির্দেশে যে কোন বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে জীবন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিল ।[৩] দুদু মিয়ার নির্দেশে ফরায়েযী সম্প্রদায়ের যে সব লোক গরু জবাই করত এবং কালীপূজা ও দুর্গাপূজার মত অবৈধ কর দিতে অস্বীকার করত, কানাইপুরের শিকদাররা এবং ফরিদপুরের জমিদাররা একত্রিত হয়ে তাদের উপর নির্যাতন চালাত । জমিদারদের নিয়োজিত পাইকও লাঠিয়ালদের ভীতি প্রদর্শন, শারীরিক নির্যাতন এবং মুসলমান নারীদের প্রতি অসদাচরণ প্রভৃতি তাদের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় ।[৪] এ সম্পর্কে জেমস ওয়াইজ বলেন, ''জমিদারদের এই দমননীতি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। মুসলমানদের পুনঃর্জাগরণ হিন্দু জমিদারগণ রোধ করতে চেয়েছিল । কিন্তু পীর সাহেব এ বিষয়ে সাফল্য লাভ করেছিলেন''।[৫]

জমিদার কর্তৃক প্রজাদের কাছ থেকে বেআইনী কর আদায়ের বিরুদ্ধে পীর দুদু মিয়া যে আপোষহীন প্রতিরোধ চালিয়েছিলেন সে সম্পর্কে জেমস ওয়াইজ বলেন, ''কোন দুর্গাপ্রতিমা সাজানো বা হিন্দু জমিদারের অন্যকোন দেব-দেবীর অনুষ্ঠানে অর্থ প্রদান করবে ইহা ছিল একটি অসহনীয় অত্যাচার । এই বিষয়ে পীর দুদু মিয়া যথার্থভাবেই ন্যায়পন্থী । কেননা, তাঁর সঙ্গে জনসাধারণের অনুভূতির প্রশ্ন রয়েছে''।[৬]

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ফরিদপুর জিলার শিবচরের পাঁচচর গ্রামের নীল কুঠিয়ালের মালিক এন্ডারসন ডানলপ নামক নীলকর সাহেবের অভিযোগক্রমে পীর দুদু মিয়াকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও লুটতরাজের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। কিন্তু যথার্থ সাক্ষী প্রমাণের অভাবে তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হন এবং সসম্মানে মুক্তি লাভ করেন ।[৭]

১। James wise, Eastern Bengal, P-.24...; পীরজাদা মুহিবউদ্দীন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬ ।
২। Dr. Mainuddin Ahmad Khan. History of Faraidi Movement, P-175
৩। M.A.Khan, opcit, p.178
৪। Azizur Rahman Mallik, ibid, P-72-73
৫। পীরজাদা মুহিবউদ্দীন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭।
৬। পীরজাদা মুহিবউদ্দীন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪।
৭। পীরজাদা মুহিবউদ্দীন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭।

Dhaka University Institutional Repository

১৮৪১ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে ডানলপের চক্রান্তে পীর সাহেব ও তাঁর কয়েকজন শিষ্য 'চুচমী' নামে এক ব্যক্তিকে খুনের দায়ে অভিযুক্ত হন। কিন্তু ঢাকার অতিরিক্ত দায়রা জজ পীর সাহেবকে নির্দোষ বলে বিচারে মুক্তি দেন ।[১] আর বাকী ২২জন অনুসারীদের অমানুষিক নির্যাতন বন্ধের লক্ষ্যে দুদু মিয়া কৃষকদের সংঘবদ্ধ করে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে কানাইপুরের জমিদার শিকদার-এর বাড়ীতে হামলা করেন । শিকদার ভবিষ্যতে প্রজাদের উপর অত্যাচার না করে ভাল ব্যবহার করার অঙ্গীকার করে রেহাই পায় এবং পীর সাহেবের সঙ্গে কানাইপুরের জমিদারদের মধ্যে এ মর্মে চুক্তি হয় যে ফরায়েযী প্রজাদের উপর কোনরূপ দৈহিক নির্যাতন,অত্যাচার,অবিচার, উৎপীড়ন করা হবে না । তাদের কাছ থেকে কোনরূপ অবৈধ কর যথা- কালী বৃত্তি, দূর্গাবৃত্তি আদায় করা অবিলম্বে বন্ধ করে দেয়া হবে । দাঁড়ির উপর থেকে খাজনা তুলে নেয়া হবে। পূজার সময় বা অন্য কোন সময় প্রজাদের বেকার খাটানো অবিলম্বে বন্ধ করা হবে ।[২]

অতঃপর ১৮৪২ সালে পীর সাহেব সদল বলে ফরিদপুরের আরেক জমিদার জয়নারায়ণ ঘোষের বাড়ীতে হামলা করে বাড়ীর সমস্ত জিনিষ পত্র ধ্বংস করে দেন। জয়নারায়ণ পলায়ন করে জীবন রক্ষা করে কিন্তু তার ভ্রাতা মদন নারায়ণ ঘোষকে তারা হত্যা করে পদ্মানদীতে ভাসিয়ে দিয়ে কৃষক প্রজাদের উপর অন্যায় অত্যাচারের প্রতিশোধ নেয় ।[৩] উক্ত ঘটনার মামলায় পুলিশ নিম্নোক্ত রিপোর্ট প্রদান করে, ''প্রায় ৮০০ ফরায়েযী প্রজা একদিন রাত্রে একত্রিত হয়ে জয়নারায়ণ ঘোষের বাড়ী আক্রমণ করে এবং তার ভাই মদন ঘোষকে ধরে নিয়ে যায় । পুলিশ রিপোর্টে আরো বলা হয় যে, ফরায়েযীদের মধ্যে একতা খুব দৃঢ় ছিল । তারা বিভিন্ন স্থান থেকে হঠাৎ জমায়েত হত এবং তারা কার্য্য সমাধা করে বিভিন্ন স্থানে চলে যেত''।[৩]

বাংলাদেশের তৎকালীন পুলিশ প্রধান তার রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন, ''এ আক্রমণের উদ্দেশ্য লুটপাট করা ছিলনা বরং জমিদারদের অত্যাচারের প্রতিশোধমূলক আক্রমণ ছিল। তাদের উপর জমিদারদের শারীরিক নির্যাতন ও অবৈধ খাজনা আদায়ের প্রতিশোধ । তারা লিখিতভাবে আমাকে যা জানিয়েছে তার দশভাগের এক ভাগও যদি সত্য হয় তবে আমি বিস্মিত হয়েছি যে, তার চেয়েও ভয়ানক গন্ডগোল সংগঠিত হয়নি । এতে আমার কোন সন্দেহ নেই যে তারা লিখিতভাবে আমাকে যে বিবৃতি দিয়েছে তা সত্য এবং এই জমিদাররা এই সমস্ত রায়তদের ধর্ম, পরিবারবর্গকে অপদস্ত এবং হেয় করেছে। পুলিশ প্রধান ফরিদপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটকে এই নির্দেশ দিয়ে গেলেন যে, তিনি যেন শুধু প্রজাদের উপর সতর্ক দৃষ্টি না রাখেন বরং জমিদারদের কার্যকলাপের উপরও সতর্ক দৃষ্টি রাখেন । বিশেষ করে কালীবৃত্তি, দুর্গাবৃত্তি প্রভৃতি অবৈধ খাজনা না দিলে প্রজাদের উপর যেন হিন্দু জমিদাররা কোন প্রকার অন্যায় অত্যাচার না করতে পারে''। এই মামলায় পুলিশ পীর সাহেবসহ ১২৭ জনকে গ্রেফতার করে । দায়রা জজের আদালতে ১০৬ জনের বিচার হয় । ২২ জনকে ৭ বছর কারাদন্ড দেয়া হয় । বাকী সব বেকসুর খালাস পেয়ে যায় ।[৪]

১। পীরজাদা মুহিবউদ্দীন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭।

২। পীরজাদা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮।

৩। M. A. Khan, ibid, P-27-29; পীরজাদা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮

৪। Calcutta Review, vol (1844) Eulsact from Dam press Report 1842 in art, Rural population of Bengal.

Dhaka University Institutional Repository

পীর দুদু মিয়া এর প্রাথমিক বিজয়ে জনসাধারণ অত্যন্ত আনন্দিত হয়। জনগণের মাঝেও তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। অত্যাচারিত, অবহেলিত, নির্যাতিত কৃষক প্রজারা তাঁকে তাদের মুক্তি দূত ও ত্রানকর্তারূপে মনে করতে থাকে । ঐতিহাসিক জেম্‌স ওয়াইজ বলেন, ''পীর সাহেবের এই বিজয়ের ফলে তাঁর নাম ফরিদপুর, পাবনা, বরিশাল, ঢাকা, নোয়াখালী প্রভৃতি জিলার প্রতি ঘরে ঘরে শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হতে লাগল । এতদিন পর্যন্ত যে সব প্রজারা জমিদারদের ভয়ে ফরায়েযী আন্দোলনে যোগ দিতে ইতস্তত করেছিল তারা এবার বাধভাঙ্গা জোয়ারের ন্যায় ফরায়েযী আন্দোলনে যোগ দিতে লাগল''। ১৮৪৩ সালে পুলিশ রিপোর্ট অনুযায়ী পীর দুদু মিয়া ৮০ হাজার শিষ্যের একমাত্র নেতা ছিলেন ।[১] এ আশি হাজার মানুষের প্রত্যেকে পরস্পরের প্রতি আবেদনশীল ছিল । সবাই সমান স্বার্থ ও অবস্থার অধিকারী ছিল ।[২]

অবশেষে দুদু মিয়া ডানলপ এর কীর্তিকলাপের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান এবং ১৮৪৬ সালে দুদু মিয়ার অনুচরেরা কাদিরবক্স নামক জনৈক ব্যক্তির নেতৃত্বে ফরিদপুর জিলার পাঁচচরে অবস্থিত ডানলপের নীলকুঠি আক্রমণ করে আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দেয় । ডানলপ পূর্বাহ্নেই সংবাদ পেয়ে পালিয়ে আত্মরক্ষা করে, কিন্তু নীলকুঠি রক্ষক কালী প্রসাদ কাঞ্জীলাল নামক জনৈক ব্রাহ্মন মারা যায়। এবারও তাঁকে বলপূর্বক নারী অপহরণ প্রভৃতি অপরাধে অভিযুক্ত করা হয় । কিন্তু যথোপযুক্ত সাক্ষী প্রমাণের অভাবে দায়রা জজ তাঁকে নির্দোষ ঘোষণা করে মুক্তি দেয় ।[৩] মামলা মোকদ্দমা করে যখন পীর দুদু মিয়াকে দমন করা গেল না তখন কুঠিয়াল ডানলপ ও জমিদাররা তাঁর বাড়ী লুন্ঠন করার ষড়যন্ত্র করে । তদনুযায়ী ১২৫৩ বঙ্গাব্দের (১৮৪৮ খৃঃ) ৩০শে ভাদ্র সকাল ৮/৯ ঘটিকায় ডানলপের গোমস্তা কালী প্রসাদ, কালী চক্রবর্তী, গঙ্গা প্রসাদ চৌধুরীসহ বিভিন্ন জিলার প্রায় ৭০০/৮০০ সমগ্র লোক কামান বন্দুক সহ পীর সাহেবের বাহাদুরপুরের বাড়ী আক্রমণ করে । তারা সদর দরজা ভেঙ্গে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করে চারজন প্রহরীকে হত্যা করে এবং অনেককে আহত করে। আক্রমণ করে তারা দেড়লক্ষ টাকাসহ বারলক্ষ টাকা মূল্যের সম্পদ লুট করে নিয়ে যায় ।[৪] তারা পীর দুদু মিয়ার বাড়ীর মসজিদে প্রবেশ করে বই পুস্তক কুর'আন শরীফ আসবাবপত্রসহ সংগৃহীত সমস্ত কিতাব পুড়িয়ে মসজিদকে অপবিত্র করে ।[৫] নিহতদের লাশসহ নিয়ে চলে যায় ও আহতদের পুলিশের হাতে সোপর্দ করে। পুলিশ আহতদের ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে হাজির করে। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট এ মোকাদ্দমার কোন প্রকার আগ্রহ প্রকাশ করেনি ।[৬] আহত আমিরুল হক হাসপাতালে মারা যায়। হিন্দু বাবুরা পীর দুদু মিয়াকে অপহরণ করে পাঁচচরে নিয়ে যায় এবং সেখানে দুই দিন একরাত্রি আটকে রাখে যাতে তিনি বাড়ী আক্রমণের কোন অভিযোগ যথাসময়ে পেশ করতে না পারেন । পীর সাহেব পাঁচচর হতে ছাড়া পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ফরিদপুর গিয়ে তাঁর বাড়ী লুন্ঠণের ব্যাপারে দরখাস্ত পেশ করেন। ডানলপের

১। পীরজাদা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০ ।

২। W. W. Hunter, The Indian Musalmans, P-১০০ ·

৩। পীরজাদা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১-২২।

৪। At one time an Indigo planter with 700 to 800 armed men attacked Dhudhu Miyan's house and plundered and looked his property valued at 12 lacs of rupees. The planter bribed the police and later on the Magistrate (non-muslim) diued with the planter, and without enquiry arrested Dhudhu Miyan and committed him to trail (part papx iv, 1861, minutes of evidence replies to question 3917 and 3918, quoted by Dr. Mallik, 85) ।

৫। M. A. Khan, ibid, পৃঃ-১০৪-১১২ ।

৬। পীরজাদা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩।

Dhaka University Institutional Repository

অনুগত ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁর দরখাস্ত সরাসরি নাকচ করে দিয়ে পাঁচচরে নীলকুঠিয়াল ডানলপের সঙ্গে আপোষ করার পরামর্শ দেন । এ ব্যাপারে একটি নথী তৈরী করে আপোষ নামায় দরখাস্ত প্রদানের জন্য পীর সাহেবকে আদেশ করলে পীর সাহেব দরখাস্ত দিতে অস্বীকার করে, বাড়ী ঘর লুট-তরাজকারী, তাঁর লোকজনকে হতাহত কারীদের ব্যাপারে তদন্ত করার জন্য বারবার অনুরোধ জানানো সত্ত্বেও ম্যাজিষ্ট্রেট এ ব্যাপারে কিছুই করেননি, বরং তিনি পীর সাহেবের উপর অসন্তুষ্ট হন ।[১]

ডানলপ ও তার নীলকুঠি রক্ষকরা যে মুসলমানদের উপর কিরূপ নির্যাতন করত তার নমুনা পাওয়া যায় উজির আলীর মুসলিম রত্নহার কাব্যের একটি পংক্তিতে ঃ-

> ''ফরিদপুর জিলাধীন পাঁচচর পর,
> বাঙ্গলার নীলকুঠি ছিল তথাপর।
> কালা কাঞ্জীলাল ছিল কর্মচারী বড়,
> উৎপীড়ন করত বড় মুসলমান পর ।[২]

যা হোক, কালীপ্রসাদ কাঞ্জীলালের বিরুদ্ধে সার্থক অভিযানের ফলে পীর সাহেবের সম্মুখে আর কোন বাধা রইল না। ফলে ১৮৪৭ সাল থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত এ ১০ বছর পীর সাহেব নিরুপদ্রব অবস্থায় কাটান ।

দুদু মিয়া একজন সুদক্ষ সংগঠক ছিলেন । তিনি জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচার-নিপীড়ন থেকে জনগণকে সংঘবদ্ধ করেন। তাদেরকে ইংরেজদের আদালতে যেতে বারন করেন। গ্রামে গ্রামে গ্রামীণ আদালত প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইসলাম ধর্মজ্ঞানী ব্যক্তিদের আদালতের বিচারক নিযুক্ত করেন। কোন ব্যক্তি ইংরেজদের আদালতে গেলে তাকে সমাজচ্যুত করা হত । তিনি জমিদারকে খাজনা না দেয়ার জন্য কৃষকদের নির্দেশ প্রদান করেন । কারণ, জমিদারগণ অযৌক্তিকভাবে অধিক হারে কর আদায় করত। তিনি আরও ঘোষণা করেন যে, এই পৃথিবী আল্লাহর । উত্তরাধিকার বলে এখানে কর ধার্য করার কারো অধিকার নেই । লাঙ্গল যার জমি তার তার এসব কথায় জনগণ খুব অনুপ্রাণিত হয়, সরকারী খাস জমিতে অনেকে বসবাস করতে শুরু করে এবং দলে দলে লোক তাঁর আন্দোলনে শরীক হতে থাকে। এ সম্পর্কে অতুল রায় বলেন, ''দুদু মিয়ার নেতৃত্বে গ্রাম বাংলায় স্থানীয় সরকার গঠন, স্থানীয় আদালত স্থাপন, কৃষক স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে স্বাধীন সরকারের সেনাবাহিনী গঠন এবং বিস্তৃত অঞ্চলে জনগণের নিকট হতে কর আদায় প্রভৃতি কার্য ফরায়েযী আন্দোলনকে জনগণের প্রকৃত স্বাধীনতা সংগ্রামের বৈপ্লবিক রূপদান করেছিল''।[৩] তাঁরই সাংগঠনিক নেতৃত্বের ফলে অতি অল্পকালের মধ্যে বাংলাদেশের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও নির্যাতিত মুসলমান মুক্তির পথ খুঁজে পায়। পূর্ব বাংলার আনাচে-কানাচে ফরায়েযী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। কলিকাতার 'অমৃতবাজার পত্রিকা' এ সম্পর্কে একবার লেখে যে, দুদু মিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ৫০ হাজার লোক জমায়েত করতে সক্ষম ছিলেন ।[৪] সে সময় দুদু মিয়ার এতই প্রাধান্য ছিল যে সমগ্র বাংলাদেশেই তাঁর অনুসারী ছিল।

১। পীরজাদা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩-২৪ ।
২। উজির আলী, মুসলিম রত্নহার, পৃঃ-৮, হুমায়ুন আবদুল হাই, প্রাগুক্ত, পৃঃ-৬৫
৩ অতুল চন্দ্র রায়, ভারতের ইতিহাস , পৃঃ-২৫৬।
৪। হুমায়ুন আবদুল হাই, প্রাগুক্ত, পৃঃ-৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক নিখিলসুর বলেন, ''নোয়াখালী জিলায় জনসংখ্যার পঁচাশি শতাংশ ছিল ফরায়েযী আন্দোলনের সমর্থক। মাদারীপুর অঞ্চলেও তাদের প্রভাব ছিল ।[১] তিনি হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকলের উদ্দেশ্যে আদেশ জারী করতেন এবং তা সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়ত। এ সব আদেশ পত্রে তিনি ছদ্মনাম 'আহমদ নাম না মালুম' নামে দস্তখত করতেন। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক নিখিলসুর বলেন যে, ''আন্দোলনকারীরা দরিদ্র নিরীহ হিন্দুদের বিরুদ্ধে কখনও সংঘর্ষে লিপ্ত হয় নাই''।[২] দুদু মিয়ার প্রভাব প্রতিপত্তি দেখে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী রীতিমত ভয় পেয়ে যায়। তৎকালীণ বাংলাদেশে দুদু মিয়ার ৮০,০০০ গোঁড়া শিষ্য ছিল ।তাঁর কার্যকলাপ সম্পর্কে সরকারের সন্দেহের কারণ ব্যক্ত করেছেন জেম্পীয়ার এর ভাষায়, "That the real object of the Faraizees was the expulsion of the then rules in the land and the restoration of the Mohammadan power"[৩]

জেমস টেলর এর মতে, ১৮৩৯ সালে ঢাকা, ফরিদপুর, বাকেরগঞ্জ, ও ময়মনসিংহে দ্রুত এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে ।

১৮৪৩ সালের এক পুলিশী প্রতিবেদনে জানা যায় যে, তৎকালে দুদু মিয়ার ৮০,০০০ একনিষ্ঠ শিষ্য ছিল। ১৮৪৭ সালে Calcutta Review- এর সম্পাদক লক্ষ্য করেন যে-ঢাকা, ফরিদপুর ও বাকেরগঞ্জ অঞ্চলে ফরায়েযীদের শক্তি বলয় সৃষ্টি হয়। ১৮৬২ সালেও তাদের প্রভাব দিন দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। এ ছাড়া চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কুমিল্লা, সিলেট, গোয়ালপাড়া, কামরূপ অঞ্চলেও ফরায়েযীদের প্রভাব ছিল ।[৪] দুদু মিয়ার জনপ্রিয়তা সম্পর্কে উজির আলী মুসলিম রত্নহার এ লিখেনঃ-

''মাওলানা দুদু মিয়া পৃথিবী তাজিল
এতকাল মুসলমান একমতে ছিল।
বারশ পাঁচচল্লিশ সালে হিন্দুয়ানী
মাওলানা ক্রামত আলী আসে বঙ্গে শুনি।
তিনি আসি জুমা ঈদ আদেশিয়া দিল,
ভবিষ্যতে দু একজন সেদিকে ঝুঁকিল।
এইমাত্র ক্রামত আলীর রায় হইল নাম,
পূর্বেতে দুদু মিয়ার রায় আছিল তামাম
অধম উজির বলে বঙ্গের এই নীতি
মোসলেম বিচে দলাদলির এই মাত্র ভিত্তি ।[৫]

দুদু মিয়া একজন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন আলিম ও সূফী-সাধক ছিলেন । তিনি ছিলেন স্নেহ বৎসল, ন্যায়পরায়ণ ও সর্বোপরি উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার তিনি সহ্য করতেন না । তার কাছে ধনী-দরিদ্র সকলেই সমান ছিল । তিনি অত্যান্ত অতিথি পরায়ণ ছিলেন।

১। ইসলামী বিশ্বকোষ, ত্রয়োদশ খন্ড, পৃ-৪৫৮
২। নিখিল সুর, ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পটভূমি , পৃঃ-৭১
৩। হুমায়ুন আব্দুল হাই, প্রাগুক্ত, পৃঃ-৬৫
৪। ডঃ খান, প্রাগুক্ত, পৃঃ- ২৮৮-২৯২
৫। উজির আলী, প্রাগুক্ত, পৃঃ- ১৬; হুমায়ুন আব্দুল হাই, প্রাগুক্ত, পৃঃ-৬৯

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে আগত প্রত্যেক মুসলমানকে তিনি সহৃদ্যতার সাথে আপ্যায়ন করতেন ।[১]

পীর দুদু মিয়া ফরায়েযী সম্প্রদায়ের নেতা নির্বাচিত হয়ে সমগ্র বাংলা দেশের ফরায়েযীদের একত্রিত করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। এ সম্পর্কে গোলাম আহমদ মোর্তজা 'তাঁর চেপে রাখা ইতিহাস' গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে,''পিতার মৃত্যুর পরই তিনি সংগ্রামের ধারা একটু বদল করলেন । হিন্দু-মুসলমান দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের কানে প্রথমে তিনিই সাম্যবাদ প্রচার করেন। আরও বলেন, জমিদার ও ইউরোপীয় শাসকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রস্তুত থাকতে হবে । যদি হিন্দুর উপরও অত্যাচার করা হয় তাহলেও ইসলাম অনুযায়ী আমাদেরকে তাদের পাশে সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে যাওয়া ধর্মের বিধান । যদি না যাওয়া হয়, তাহলে অধর্মের কাজ হবে । তিনি শাসনতন্ত্র কায়েম করলেন। তাঁর বাহিনী তলোয়ার, সড়কি, তীর, ধনুক প্রভৃতি অস্ত্রে সজ্জিত হয় । সর্বপ্রথম তিনি বিপ্লবী খেলাফত ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করেন পুরোপুরিভাবে। এ পদে সর্বোচ্চ স্থানে যিনি থাকতেন তাকে বলা হয় 'উস্তাদজী'। তাদের পরামর্শদাতারা দু'জন ছিলেন 'খলিফা' । এমনিভাবে সুপারিনটেনডেন্ট খলিফা, ওয়ার্ড খলিফা, গাঁও খলিফা প্রভৃতি নানা নামে নানা পদের ব্যবস্থা ছিল। সুপাঃ খলিফার একজন পিয়ন ও একজন পেয়াদা থাকত। তাদের দ্বারা নীচ হতে উপর মহলে যোগাযোগ ও নির্দেশ পাঠাবার ব্যবস্থা ছিল ।[২] দুদু মিয়া ফরায়েযী আন্দোলনকে নিম্নরূপে সাজিয়েছিলেন ঃ-

ক) ফরায়েযীনীতি অবলম্বনকারী তিনশ থেকে পাঁচশ পরিবার নিয়ে একেকটি ক্ষুদ্র দল গঠন করা হয়। অনুরূপ দশ বা ততোধিক দল নিয়ে একটি উপ-অঞ্চল গঠন করা হয়। বাংলা ও আসামের এরূপ অনেকগুলো উপ-অঞ্চল দল নিয়ে বৃহত্তর ফরায়েযী আন্দোলনের কেন্দ্রীয় দল গঠিত হয়। দলের কেন্দ্রীয় নেতা ছিলেন মুহসিন উদ্দীন ওরফে দুদু মিয়া। দলের সদর দফতর ছিল ফরিদপুর জেলার শামাইল গ্রামে ।

খ) ফরায়েযীদের মধ্যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ছিল । প্রাত্যহিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে ধর্মীয় নীতিমালার প্রতিফলন ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত বিশেষ ভূমিকা পালন করত। পঞ্চায়েত, ক্ষুদে দল,উপ-দলের লোকেরা কোন ব্যাপারে মীমাংসা করতে না পারলে দুদু মিয়া স্বয়ং তার মীমাংসা করতেন ।

গ) ইসলামী শিক্ষার সার্বিক বিস্তারের লক্ষ্যে ফরায়েযী ক্ষুদে দলসমূহের বিশেষ দায়িত্ব পালন করার সাংগঠনিক নির্দেশ ছিল। প্রতিটি মুসলমানকে কুরআন ও নামায শিক্ষার এবং ফরায়েযী নীতিসমূহ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশ দেয়া হয়।

ঘ) ফরায়েযী নীতি অবলম্বনকারীদের ইসলামী শিক্ষার আলোকে নিজস্ব ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার পাশাপাশি সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ অনুসরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়। ফলে একটি অভিন্ন ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার আওতায় ফরায়েযীগণ সংগঠিত হয় ।[৩]

১। হুমায়ুন আব্দুল হাই, প্রাগুক্ত, পৃঃ-৬৬

২। Dr. Mainuddin Ahmad Khan, Ibid, P-104-112

৩। মোঃ আবদুস সাত্তার, ফরিদপুরে ইসলাম , পৃঃ ১৫০; ডঃ মঈন উদ্দীন আহমদ খান, ফরায়েযী আন্দোলন , পৃঃ ৩৬-৪০।

Dhaka University Institutional Repository

সকল অঞ্চলের বিচার ফরায়েযীরাই করতে থাকেন । মুসলমানদের যাকাত, উশর ইত্যাদি সংগ্রহ করা, সংগঠনের চাঁদা ফসল হতে তোলা, ঠিকমত তা আদায় করা, সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করা, মাদ্রাসা-মক্তব মসজিদ তৈরী করা প্রভৃতি কাজ খুব দ্রুত গতিতে চলতে থাকে। ফরায়েযীরা বলতেন, ''পৃথিবীতে জায়গা-জমি যা আছে সব আল্লাহর । সেখানে জমিদার বা সরকারের কর নেয়া জুলুম। মানুষ সব সমান, আমাদের কারো উপর তাদের কর্তৃত্ব করার অধিকার নেই''।

এই সুবাদে অমুসলমানরাও অনেকে তাদের কাছে অভিযোগ পেশ করত, বিচারও হত সুষ্ঠুভাবে। বিচারের রায় না মানলে তা মানিয়ে নেবার ক্ষমতা পীর দুদু মিয়ার সৈন্য বিভাগের ছিল। অবশেষে অবস্থা অনুকূলে দেখে তিনি তাঁর এলাকায় ঘোষণা করলেন যে, ''সমস্ত বিচার আমাদের স্বদেশী আদালতে হবে; যদি কেহ ইংরেজদের আদালতে বিচার প্রার্থী হয় তাহলে তাকে শাস্তি পেতে হবে''।[১] এ প্রসঙ্গে সুপ্রকাশ রায় বলেন যে, ''ইতিমধ্যে দুদু মিয়ার স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার কার্য বহুদূর অগ্রসর হয়। দুদু মিয়া বাহাদুরপুর নামক গ্রামে বাস করতেন। এ গ্রামকে কেন্দ্র করে তাঁর শাসন ব্যবস্থা বহুদূর অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। তিনি সর্বত্র নির্দেশ পাঠিয়ে জমিদার ও নীল করদের খাজনা দেয়া বন্ধ করেছেন। মহাজনদের ঋনশোধ করাও নিষিদ্ধ করা হয়। জনসাধারণ সরকারী আদালত বর্জন করে দুদু মিয়া দ্বারা প্রতিষ্ঠিত গ্রামের আদালতে আপন আপন অভিযোগ পেশ করত। আদালতের বৃদ্ধ বিচারকগণ যে রায়দান করতেন তা সকলে মেনে নিত''।[২]

পীর দুদু মিয়া ফরায়েযী আন্দোলনের বুনিয়াদ সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের উপর প্রতিষ্ঠা করেন। জেমস ওয়াইজ এ সম্পর্কে বলেন, ''তিনি (পীর দুদু মিয়া) সমস্ত মানুষের প্রবক্তা ছিলেন এবং তার শিক্ষা সবার চেয়ে দরিদ্র নীচু শ্রেণী মানুষের প্রবক্তা ছিলেন এবং তার শিক্ষা ছিল সবার চেয়ে দরিদ্র নীচু শ্রেনী মানুষেরও উঁচু ও সম্মানিত শ্রেণীর মানুষের ন্যায় কল্যাণের অধিকারী ।তার নিকট সমস্ত মানুষ ভাই ভাই ছিল''।[৩] জেমস ওয়াইজ আরও বলেন, ''ফরায়েযী আন্দোলনের অন্যতম আদর্শ এই যে যখন এক ভাই বিপদাপন্ন হয়ে পড়ে তখন তার প্রতিবেশীর কর্তব্য হচ্ছে তাকে সর্বপ্রকার সাহায্য করা দুদু মিয়া ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য একটি সাধারণ তহবিল ও গঠন করেছিলেন''।[৪]

পীর দুদু মিয়া পবিত্র কুর'আনের ভাষ্য ''দ্যুলোকে ও ভূলোকে যা কিছু রয়েছে তার সবকিছুর মালিক আল্লাহ''- এর মর্মানুসারে ঘোষণা করেন যে, ভূমি আল্লাহর দান এবং এই ভূমি থেকে উপকৃত হওয়ার পূর্ণ অধিকার সকল মানুষের রয়েছে । কাজেই ভূমি কৃষকের; জমিদারের কৃষকের উপর এমন কোন কর আরোপ করার অধিকার নেই যা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত নয়। যেহেতু জমিদাররা কৃষকের উপর অত্যাচার চালানো থেকে বিরত হত না, সেহেতু তিনি কৃষকদের নির্দেশ দেন যে, তারা যেন প্রত্যক্ষ সরকার নিয়ন্ত্রিত ভূমির আবাদ করে ।[৫]

ফরায়েযী আন্দোলনের ধর্মীয় সংস্কার সমূহের ফলশ্রুতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক

১। Proceeding of the Judicial Department, O.C.no. 25, May, 1843-462.

২। সুপ্রকাশ রায়, ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম , পৃঃ.২৯৬।

৩। পীরজাদা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৭।

৪। পীরজাদা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫।

৫। পীরজাদা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

কর্মসূচীগুলো মূলতই নতুন জমিদার শ্রেণীর অত্যাচারকে প্রতিহত করার ব্যাপারে জনসাধারণের এক সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা ছিল। ইংরেজ সরকার বিভিন্ন সময়ে দুদু মিয়াকে ১৪ বছর কারাগারে আটক করে রাখে । কেবল কারাগারে আটক রেখেই ইংরেজরা ক্ষান্ত হয়নি তারা তাঁর তালুকদারীও কেড়ে নেয় ।[১]

তিনি অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ লোক ছিলেন। বাহাদুরপুরে তাঁর গ্রামের বাড়ীতে তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় কাটান । গ্রামের ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অধিবাসীদের সুযোগ সুবিধা নিজে তদারক করতেন। তাদের মাঝে ঝগড়া বিবাদ হলে তিনি নিজে চেষ্টা করে তা মিটিয়ে দিতেন এবং তাকে না জানিয়ে যে কোন হিন্দু-মুসলিম বা ফিরিঙ্গি ঋণ আদায়ের জন্য মুন্সেফের আদালতে নালিশ জানাত, সে সব ঋনদাতাকে তিনি সাজা দিতেন ।[২]

পীর দুদু মিয়া -এর শরীরের গঠন খুব সুন্দর ও সুসম লম্বা ছিল। তাঁর মুখমন্ডল ভর্তি সুন্দর কাল দাঁড়ি ছিল। তিনি মাথায় বড় পাগড়ী ব্যবহার করতেন। হযরত ইউসুফ (আঃ) খুব সুন্দর ছিলেন সে জন্য পীর দুদু মিয়াকে 'হাজী ইউসুফ' বলা হত। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ আরম্ভ হলে নীল কর সাহেব এবং হিন্দু জমিদারদের ষড়যন্ত্রের ফলে বৃটিশ সরকার পীর দুদু মিয়াকে কলিকাতা আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে আটক করে রাখে। তাঁর অপরাধ ছিল তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন যে কেবলমাত্র আঙ্গুল হেলানের মাধ্যমে তিনি ৮০,০০০ লোক সমবেত করতে পারেন এবং যা করতে বলবেন তারা তা-ই করবে। তাঁর আটকের কারণ সম্পর্কে জেমস ওয়াইজ বলেন, "পীর দুদু মিয়াকে গ্রেফতার করা হতনা, যদি না সে গর্ব করে কোর্টের সামনে বলতেন আমি আহবান করার সঙ্গে সঙ্গে ৮০,০০০ হাজার লোক এসে হাজির হবে, যা করতে বলবে তারা তাই করবে''।[৩]
১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের অজুহাতে ইংরেজ সরকার দুদু মিয়াকে বন্দী করে এবং বিনা বিচারে ১৮৬২ সাল পর্যন্ত হাজতে আবদ্ধ করে রাখে । অনবরত সংগ্রাম ও কারাবাসের কারণে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। অবশেষে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ২৪ ডিসেম্বর ৪১ বৎসর বয়সে পীর দুদু মিয়া ইনতিকাল করেন ।[৪] ঢাকা শহরের ১৩৭, বংশাল রোডে তাঁর পত্নীর পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয় ।

১। জুলফিকার আহমদ কিসমতী, বাংলাদেশের পীর- মাশায়েখগন , পৃঃ৯১;পীরজাদা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৯।

২। পীরজাদা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৯।

৩। পীরজাদা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০-৩১ ও ৪০।

৪। তাঁর ইনতিকালের স্থান ও সন তারিখ সম্পর্কে বিভিন্ন মত দেখা যায়। ডঃ আনিসুজ্জামান একটি হিন্দুস্থে উল্লেখ করে লিখেছেন যে,তিনি ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে বন্দী দশায় ইনতিকাল করেন। (মুসলিম মানস, পৃঃ ৫২-৫৯)। সুপ্রকাশ রায়ের মতে, দুদু মিয়া বাহাদুরপুর গ্রামে১৮৬০ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর মৃত্যুবরণ করেন এবং তথায় তাঁকে সমাহিত করা হয়। (ভারতের কৃষক বিদ্রোহ, পৃঃ ২৯৮) প্রখ্যাত গবেষক স্বপন বসু লিখেছেন যে, ১৮৬০ সনে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে দুদু মিয়া ঢাকাতে চলে যান এবং ১৮৬১ সনে সেখানে ইনতিকাল করেন। কিন্তু 'মুক্তির সংগ্রামে ভারত' গ্রন্থের উল্লেখ করা হয় যে, ১৮৬০ সনের ২৪শে সেপ্টেম্বর দুদু মিয়ার মৃত্যু হয়। তাঁর জন্মস্থান বাহাদুরপুর গ্রামে অথচ ভারতের ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করা হয় যে ১৮৫৯-এ মুক্ত হয়ে তিনি আবার গ্রেফতার হন এবং ১৮৬০ সালে ফরিদপুর জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ঢাকায় চলে যান এবং ১৮৬২ সালে ঢাকায় তাঁর মৃত্যু হয়। 'মুক্তি সংগ্রামে ভারত গ্রন্থে' বলা হয়েছে যে, জেলের মধ্যেই ১৮৬২ সালে দুদু মিয়া মারা যান (পৃঃ ৩)। ডঃ মঈন উদ্দীন খানের মতে,১২৬৮ বাংলা সনে তিনি ইনতিকাল করেন (উজির আলী মুসলিম রত্নহার, পৃঃ-৯) । ঐতিহাসিক উইলিয়াম হান্টারের মতে, তাঁর মৃত্যু সাল ১৮৬২ খৃঃ। সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ও মুনতাসির মামুন, 'বাংলাদেশে সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে ১৮৫৭ সনে তথাকথিত সিপাহী বিদ্রোহের অজুহাতে ইংরেজ সরকার দুদু মিয়াকে বন্দী করে এবং বিনা বিচারে ১৮৬২ সাল পর্যন্ত হাজতে আবদ্ধ রেখে ফরায়েযী আন্দোলনের অগ্রগতি ব্যাহত করে। এর দ্বারা প্রমানিত হয় যে দুদু মিয়া ১৮৬২ সন পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, দুদু মিয়ার মৃত্যুসন ১৮৬২ বলে উল্লেখ করেছেন। (some muslim stalwarts, p-27), সুতরাং দুদু মিয়ার মৃত্যুবরণ বাংলা ১২৬৮ মুতাবিক ১৮৬২ খৃষ্টাব্দেই অধিকার গ্রহণ যোগ্য।

Dhaka University Institutional Repository

শাহ্ সূফী ফতেহ আলী (রঃ)
(১৮২৫ - ১৮৮৬)

ঊনিশ শতকের প্রথম ভাগে যে মহান ব্যক্তিত্ব ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে আল্লাহ ও রাসূলের পবিত্র বাণী প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন এবং বালাকোটের যুদ্ধে শিখ বাহিনীর হাতে শাহাদাত বরণ করেন তিনি হলেন হযরত শাহ্ সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (রঃ)। তাঁর খলীফা রূপে মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী, মাওলানা শাহ্ সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে এবং বাংলায় ইসলামের বাণী প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরীর অন্যতম প্রধান খলীফা এবং পাক ভারত বাংলা ও আসামের অন্যতম সূফী সাধক শাহ্ সূফী আবূ বকর সিদ্দীকীর পীর ছিলেন শাহ্ সূফী ফতেহ আলী। তিনি চট্টগ্রাম জিলার নিজামপুর পরগণার মীরসরাই থানাধীন মালিয়াশ গ্রামে ১৮২৫ [১] সালে জন্মগ্রহণ করেন।

বাল্যকাল থেকেই তিনি খুবই মেধাবী ছিলেন। অল্প বয়সেই মাদ্রাসায় পবিত্র কুর'আন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পুস্তকাদির অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। অতঃপর তাফসীর-ই-ফুরকানী, হাদীস-ই-নববী, ফিক্হ, উসূল-ই-ফিক্হ, আকায়িদ, মানাতিক, দর্শন ও বালাগাতসহ আরবী ও ফারসী সাহিত্যে বুৎপত্তি অর্জন করেন।[২] অতঃপর দাহসা[৩] -এ অবস্থিত মাদ্রাসায় পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাগ্রহণ করেন। তবে চট্টগ্রাম থেকে শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে দাহসায় কখন ও কত বৎসর বয়সে গমন করেন এ সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি। ফারসী ভাষাভাষী না হওয়া সত্ত্বেও তিনি ফারসী ভাষায় গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি ৩১ বৎসর বয়সে অযোধ্যার তৎকালীন পদচ্যুত নওয়াব ওয়াজিদ আলী শাহ্-এর প্রাইভেট সেক্রেটারী পদে যোগদান করেন এবং পরে তাঁর পলিটিকাল পেনশন অফিসের সুপারিনটেনডেন্ট পদে নিযুক্ত হন। এ দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য তখন তিনি কলিকাতায় অবস্থান করতেন।[৪]

ফতেহ আলী নিজামপুরী পরিণত বয়সে মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত পুনাসী গ্রামের অধিবাসীনী বিবি ফাতেমা নাম্নী এক মহিলাকে বিয়ে করে সপরিবারে কলিকাতাতেই বসবাস করতে থাকেন। কর্মজীবনে তিনি খুব কঠোর ও দৃঢ়চেতা ছিলেন। তিনি তাঁর পীর সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরীর বিধি-নিষেধ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন এবং তাঁর নির্দেশ মুতাবিক লোকদের মুরীদ করতেন।[৫]

সূফী ফতেহ আলী চাকুরী জীবনেই ধীরে ধীরে আধ্যাত্মিকতার দিকে ঝুকে পড়েন এবং চাকুরী ছেড়ে দিয়ে তা প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

১। মতীউর রহমান , আয়না-ই-উয়াইসী, ভূমিকা, পৃঃ ক।

২। মতীউর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৭।

৩। দাহসা ভারতের হাওড়া জেলার অন্তর্গত মালিয়া থানাধীন মুনশীর হাটের কাছে এক ঐতিহাসিক স্থান। ঊনিশ শতকের দিকে দাহসাতে একটি মাদ্রাসা ছিল। তথায় হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী গোলাম কাদির নামে একজন প্রখ্যাত 'আলিম ও বুযর্গ লোক ছিলেন। তিনি সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী- এর পীর ভাই ছিলেন। দাহসায় তাঁর মাযার অবস্থিত। বর্তমানে উক্ত মাদ্রাসাটির কোন অস্তিত্ব নেই। মতীউর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৭।

৪। মতীউর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬১; আবু ফাতেমা মুহাম্মদ ইসহাক, ফুরফুরার পীর হযরত আবুবকর সিদ্দীকী, পৃঃ ১৮।

৫। হুমায়ুন আবদুল হাই, মুসলিম সংস্কারক ও সাধক, পৃঃ ১০০-১০১, মোবারক করীম জওহর, ভারতের সূফী, পৃঃ ১৬১।

Dhaka University Institutional Repository

সূফী সায়্যিদ ফতেহ্ আলী (রঃ) নক্শবন্দিয়া, কাদ্‌রিয়া ও চিশ্‌তিয়া তরীকাহ্‌র খিলাফত লাভ করেছিলেন বটে তবে তাঁর মধ্যে নক্‌শবন্দিয়া তরীকাহ্‌র ফায়েয-এর প্রাধান্য ছিল। নক্‌শবন্দিয়া তরীকাহ্‌র সূত্র পরম্পরার ৩য় স্তরে হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী, সপ্তম স্তরে মুজাদ্দিদ-ই-আল্‌ফ-ই-সানী হযরত শায়খ আহমদ ফারুকী সিরহিন্দী, পঞ্চম স্তরে হযরত খাজা বাহাউদ্দিন নক্‌শবন্দি, একবিংশ স্তরে হযরত খাজা আবদুল খালেক গুজদাওয়ানী, পচিশতম স্তরে সুলতানুল 'আরেফীন হযরত খাজা বায়েজিদ বস্তামি এবং উনত্রিশতম স্তরে আমীরুল মুমিনীন হযরত আবূ বকর (রাঃ) পর্যন্ত পৌঁছে।

চিশ্‌তিয়া তরিকাহ্‌র সূত্র পরম্পরা সপ্তম স্তরে শায়খ কাযী খান ইউসুফ নাসিহী জাফরাবাদী, একাদশ স্তরে হযরত শায়খ নূরুল হক কুরতাবুল আলম (পাভুয়া শরীফ, মালদহ), চতুর্দশ স্তরে হযরত খাজা নিজামউদ্দীন আওলিয়া, সপ্তদশ স্তরে হযরত খাজা মাঈন উদ্দীন চিশতী, চতুর্বিংশ স্তরে হযরত খাজা শরফুদ্দীন আবূ ইসহাক শামী, উন-ত্রিশতম স্তরে হযরত খাজা ফুয়াউল বিন আব্বাস এবং ত্রিশতম স্তরে হযরত 'আলী (রাঃ) পর্যন্ত পৌঁছে।[১]

প্রকৃতপক্ষে সূফী ফতেহ আলী ছিলেন মুজাদ্দীদ-ই-আল্‌ফ-ই-সানী শায়খ আহমদ ফারুকী সিরহিন্দী (১৫৬৪-১৬২৪)-এর একজন খলীফা। মুজাদ্দিদ-ই-আল্‌ফ-ই-সানী থেকে সূফী ফতেহ আলী পর্যন্ত খলীফাগনের শাজারা নাম হলঃ-

মুজাদ্দিদ-ই-আল্‌ফ-ই-সানী শায়খ আহমদ ফারুকী সিরহিন্দী

↕

আদম বান্নুরী

↕

সায়্যিদ আবদুল্লাহ আকবরাবাদী

↕

মাওলানা শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ

↕

মাওলানা শাহ্ আবদুল আযীয

↕

সায়্যিদ আহমদ শহীদ

১। মতীউর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৯-৫০।

Dhaka University Institutional Repository

সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী

↕

সূফী ফতেহ আলী নিজামপুরী

হযরত সূফী সায়্যিদ ফতেহ আলী (রঃ) চট্টগ্রাম থেকে কলিকাতা গিয়ে মাটিয়া বুরুজে নওয়াব ওয়াজিদ আলী শাহ[১]- এর প্রাইভেট সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। অবশেষে ভারত সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পলিটিক্যাল পেনশন অফিস-এর সুপারিনটেনডেন্ট নিযুক্ত হন।

সূফী ফতেহ আলী নিজামপুরী কেবল যে একজন পীর ও ধর্ম সংস্কারক ছিলেন তাই নয়, তিনি একজন পন্ডিত ব্যক্তিও ছিলেন। ফারসী ভাষা ও সাহিত্য তাঁর প্রভূত জ্ঞান ছিল। সাধকের সাথে সাথে তিনি ফারসী ভাষা ও সাহিত্যের একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। তাঁর কবি নাম ছিল 'ওয়াইসী'। 'দীওয়ানে ওয়াইসী' নামে তিনি ফারসী ভাষায় একখানা কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন।[২] একজন কামিল বুযর্গ পীরের বায়'আত লাভের উদ্দেশ্যেই ফুরফুরার মাওলানা আবূ বকর সিদ্দীকী তাঁর কাছেই কাদ্‌রিয়া, চিশ্‌তিয়া, নক্‌শবন্দিয়া, মুজাদ্দিদিয়া ও মুহাম্মদিয়া তরীকাহ্ গুলোর শিক্ষা গ্রহন করেন ও তাঁর খিলাফত লাভ করেন।

সূফী ফতেহ আলী একজন আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন আলিম ও একজন উঁচু স্তরের কামিল ওলী ছিলেন। তাঁকে লোকে 'মানিক তলার সূফী সাহেব' বলে অভিহিত করত। হযরত খাজা খিযির (আঃ) তাঁকে সাক্ষাত দান করে বলেছিলেন "তুমি স্পর্শ মনি চর্চা করছ কেন? তোমার সত্তাই সৌভাগ্যের স্পর্শ মনি"।

১। নওয়াব ওয়াজিদ আলী শাহ্ অযোধ্যা রাজ্যের সর্বশেষ শাসনকর্তা ছিলেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী সিংহাসনে আরোহন করেন । লর্ড ডালহৌসির শাসনামলে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারী তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন এবং ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী জেনারেল উট্রাম রেসিডেন্ট অযোধ্যায় চীফ কমিশনার হিসেবে রাজ্য অধিকার করেন। নওয়াব ওয়াজিদ আলী শাহ্ ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ৩রা মার্চ লক্ষ্ণৌর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মে কলিকাতায় মাটিয়া বুরুজে পৌছেন। বিশ্বাসঘাতকতাকালীন সমকের তাঁকে অযোধ্যার ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে কয়েদ করে রাখা হয়। ২৬ মাস পর ১৮৫৯ সালের ৯ই জানুয়ারী বন্দী দশা থেকে মুক্তি দেয়া হয়। ১৮৮৭ সালের ২১শে ডিসেম্বর ইন্তিকাল করেন এবং ১৫১, মাটিয়া বুরুজের ইমাম বাড়ীতে সমাহিত করা হয়। (মতিউর রহমান , প্রাগুক্ত, পৃঃ- ১৫১।)

২। কাব্য গ্রন্থটি তাঁর দৌহিত্র মৌলিবী সায়্যিদ মীর হাসান কর্তৃক ১৯৩৫ সালের কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। মুহাম্মদ আব্দুল কাইউম এর প্রকাশক ছিলেন। গ্রন্থটিতে ১৭৯টি গযল ও ২৩টি কাসীদা রয়েছে। ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর "ইসলাম প্রসঙ্গ" গ্রন্থে উক্ত দীওয়ানের একটি গযলের একটি বঙ্গানুবাদ করেছেন এভাবে ঃ-

"মোর যদি সে রূপের রাজা পারাবে মোর আঁখির পরে,
বিলিয়ে দেব দীন দুনিয়া তার চরনের ধুলির তরে।
তার পীড়িতি জ্বালায় নিতি পরান এমন বুকের মাঝে
আগুন পাক মোর হাহাকার দেয় গলায়ে পাষানেরে।
হায় কি হলো রূপের রাজার ? আমার দশায় নাই দশা তার
মোর তরে কি রোদন দশার নাই খবর সেই রূপ রাজেরে।
এসো ওগো আহমদ নবী! এসো ওগো দয়ার ছবি!
নেক নজর দাও আমার দশায় পা রাখ মোর আঁখির পরে।"

Dhaka University Institutional Repository

সূফী ফতেহ আলী তরীকত ও মা'রিফাতের জগতে আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি তাঁর মুরীদগণকে মূহুর্তের মধ্যে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর যিয়ারত (দর্শন) লাভ করিয়ে দিতে পারতেন।

সূফী ফতেহ আলীর রোগ-ব্যধি নিয়ন্ত্রণ করার প্রবল ক্ষমতা ছিল। এ সম্পর্কে একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। ঘটনাটি হল একবার তাঁর শ্বাশুড়ী পায়ের ব্যথায় অস্থির হয়ে পড়েন। পরিমিত চিকিৎসার পরও ব্যথা উপশম হচ্ছে না দেখে সূফী ফতেহ আলী পায়ের ব্যথার স্থান ধরে বললেন, 'কই বেদনা তো নেই'। এই কথা বলার সাথে সাথে ব্যথা-বেদনা দূরীভূত হয়ে যায় এবং তাঁর শ্বাশুড়ী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেন।[১]

হযরত সূফী ফতেহ আলী ছিলেন 'কুতবুল ইরশাদ'। মাওলানা রুহুল আমীন সাহেব লিখেন যে, হযরত সূফী সাহেব নবী করীম(সঃ)-এর রূহ থেকে নিসবত হাসিল করেছিলেন। তাছাড়া চার তরীকাহ্র নিসবত তরীকাহ্ সমূহের মূল চার হযরতের রূহ থেকেই হাসিল করেছিলেন। তাঁকে 'ওয়াইসিয়া তরীকার পীর' বলেও আখ্যায়িত করা হয়। তিনি চার তরীকাহ্র ফায়েয তাঁর পীর হযরত শাহ্ সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী কর্তৃক শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। ফুরফুরার হযরত পীর সাহেবের পীর ভাই হযরত মাওলানা ইশরামুল হক মুর্শিদাবাদী বলেন, "একদিন হযরত সূফী ফতেহ আলী সাহেব ফুরফুরার হযরত পীর সাহেবকে ডেকে বলেন ,বাবা ইকরামুল হক, তুমি মুহিউস সুন্নাহ ও আমীরুশ শারী'আত হবে। আর আমাকে ডেকে বলেন বাবা ইকরামুল হক, তুমি কচ্ছপের ন্যায় ধীর গতিতে পাহাড়-পর্বত হেদায়েত করবে"। মাওলানা রুহুল আমীন লিখেছেন যে, হযরত সূফী ফতেহ আলী সাহেবের ভবিষ্যত বাণী অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হয়।[২]

সূফী ফতেহ আলীর খলীফা ও মুরীদানের মধ্যে যারা অন্যতম ছিলেন তাঁরা হলেন ঃ-

১। মাওলানা আবদুল হক, নিজগ্রাম, মুর্শিদাবাদ ,ভারত।
২। মৌলবী ইয়ায উদ্দীন - আলীপুর, কলিকাতা, ভারত।
৩। সূফী নিয়ায আহমদ, কাটরা পোতা, বর্ধমান, ভারত।
৪। সূফী ইকরামুল হক, পুনাসী, মুর্শিদাবাদ, ভারত।
৫। মৌলবী মতীউর রহমান, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।
৬। হাফিয মুহাম্মদ ইবরাহীম, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।
৭। মৌলবী আবদুল আযীয, চান্দুরা, জাহানাবাদ, হুগলী, ভারত।
৮। মৌলবী আকবর আলী, সিলেট, বাংলাদেশ।
৯। মৌলবী আমযাদ আলী, সিলেট, বাংলাদেশ।
১০। মৌলবী আহমদ আলী, ফরিদপুর, বাংলাদেশ।
১১। শাহ্ দীদার বখশ, পদ্মপুকুর, হাওড়া, ভারত।
১২। শাহ্ বাকা উল্লাহ, কানপুর, হুগলী, ভারত।

১। মোবারক করীম জওহর, ভারতের সূফী সাধক, পৃঃ ১৬২।
২। আবু ফাতেমা মুহাম্মদ ইসহাক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০।

Dhaka University Institutional Repository

১৩। মৌলবী শাহ্ সূফী আবু বক্র সিদ্দীকী, ফুরফুরা , হুগলী, ভারত।

১৪। মৌলবী শাহ্ সূফী গোলাম সালমানী, ফুরফুরা, হুগলী, ভারত।

১৫। মৌলবী গানীমত উল্লাহ, ফুরফুরা, হুগলী, ভারত।

১৬। মুন্শী সাদাকাত উল্লাহ, ফুরফুরা, হুগলী, ভারত।

১৭। মুন্শী সাদাকাত উল্লাহ, ফুরফুরা, হুগলী, ভারত।

১৮। শায়খ কুরবান বীন তালাব, কলিকাতা, ভারত।

১৯। শামসুল উলামা মৌলবী মিরযা আশরাফ, কলিকাতা, ভারত।

২০। সায়্যিদ ওয়াজেদ আলী, মেহেদীবাগ, কলিকাতা, ভারত।

২১। মৌলবী গুল হুসাইন, খুরাসান, কলিকাতা, ভারত।

২২। মৌলবী আতাউর রহমান, চব্বিশ পরগণা, ভারত।

২৩। মৌলবী মুবীন উল্লাহ্, রামপাড়া, হুগলী, ভারত।

২৪। মৌলবী সায়্যিদ জুলফিকার আলী, টাটিয়াগড়, চব্বিশ পরগনা, ভারত।

২৫। মৌলবী আতা ইলাহী, মঙ্গলকোট, বর্ধমান, ভারত।

২৬। মুন্শী সুলাইমান, বারাসাত, চব্বিশ পরগনা, ভারত।

২৭। মৌলবী নাসীরুদ্দীন, নদীয়া, ভারত।

২৮। মৌলবী আবদুল কাদির, ফরিদপুর, বাংলাদেশ।

২৯। মৌলবী কাজী খুদা নাওয়ায, দাহসা, হুগলী, ভারত।

৩০। মৌলবী আবদুল কাদির, বাইন্দিয়াবাটি, হুগলী, ভারত।

৩১। কাজী ফাসাহাত উল্লাহ, চব্বিশ পরগণা, ভারত।

৩২। শায়খ লাল মুহাম্মদ, চুচীরা, হুগলী, ভারত।

৩৩। মৌলবী সায়্যিদ আজম হুসাইন, মদীনা মুনাওয়ারা, সৌদি আরব।

৩৪। মৌলবী সায়্যিদ ওরাইদুল্লাহ্, শান্তিপুর, নদীয়া, ভারত।

৩৫। হাফেয মুহাম্মদ ইবরাহীম, হুগলী, ভারত।

দশ/ বার বৎসর চাকুরী করার পর সূফী ফতেহ আলী সরকারী চাকুরী ছেড়ে দিয়ে মুর্শিদাবাদের পুনাসী গ্রামে বসবাস করতে থাকেন। সেখানে তাঁর এক পুত্র মৌলবী মোস্তফা আলী ইন্তিকাল করেন। মোস্তফা আলী আরবী ও ফারসীর বিখ্যাত 'আলিম ছিলেন। উর্দূ ও ইংরেজীতে তিনি পারদর্শী ছিলেন। তৎকালীন কলিকাতা থেকে প্রকাশিত ইংরেজী 'মুসলিম ক্রনিকল' পত্রিকায় বিভিন্ন বিষয়ে লিখতেন এবং নওয়াব ওয়াজেদ আলী শাহ্ এর পলিটিক্যাল পেনশন অফিসে কাজ করতেন।[১] তাঁর মেয়ে যোহরা খাতুন মুর্শিদাবাদ জিলার শাহপুর গ্রামের অধিবাসিনী ছিলেন। যোহরা খাতুন একজন বড় ওলী ছিলেন। সূফী সাহেব তাকে বাংলার "রাবি'আ বসরী" বলে অভিহিত করেছিলেন। যোহরা খাতুনও সূফী সাহেবের অন্যতম খলীফা ছিলেন। [২] এই মহান তাপস ১৮/১৯ বৎসর ইসলামের প্রচার

১। মতীউর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮৬।

২। মোবারক করীম জওহর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৩; আবু ফাতেমা মুহাম্মদ ইসহাক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১-২২; মতীউর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রসার ও মুসলমানদের হিদায়াতের কাজ আনজাম দিয়ে ৬১ বৎসর বয়সে ৮ই রবিউল আউয়াল, ১৩০৪ হিঃ/ ২০ শে অগ্রহায়ণ, ১২৯৩ বাং/ ৬ই ডিসেম্বর, ১৮৮৬ খৃঃ রবিবার বিকাল ৪টায় কলিকাতায় ইন্তিকাল করেন। কলিকাতায় মানিকলতায় ২৪/১, মুনশীপাড়া লেন, দিল্লীওয়ালা কবরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়। প্রতি বছর ২৬শে রমযান রাতে সেখানে ঈসালে ছওয়াবের মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।[১]

শাহ্ সূফী আবূ বকর সিদ্দীকীর খলীফা মাওলানা শাহ্ সূফী আহমদ আলী দিল্লী ওয়ালা মসজিদে সূফী ফতেহ আলীর স্মরণে 'দারুল ফুনুন' নামে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে কুর'আন ও হাদীসের শিক্ষা দেওয়া হত। উক্ত মাদ্রাসা থেকে পাশ করে ছাত্র প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজে নিজেদেরকে আত্মনিয়োগ করত। বর্তমানে মাদ্রাসাটির কোন অস্তিত্ব নেই।[২]

মৌলবী আবদুল মজীদ

মৌলবী আবদুল মজীদ চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত কদুরখিল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম-মৃত্যুকাল সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। তিনি চট্টগ্রাম সদরস্থ মুহ্সিনিয়া মাদ্রাসায় অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। হযরত শাহ্ সূফী ফতেহ আলী (১৮২৫-১৮৮৬ খৃঃ) এর নিকট থেকে খিলাফত লাভ করেন। মাওলানা শাহ্ নজীর আহমদ প্রথমে তাঁরই নিকট বায়'আত থেকে খিলাফত প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কদুরখিল গ্রামে তাঁর মাযার অবস্থিত।[৩]

হযরত মাওলানা শাহ্ আহমদ উল্লাহ (রঃ)

(১২৪৩/৪৪ - ১৩২৫ হিঃ)/(১৮২৬ - ১৯০৬ ইং)

হযরত মাওলানা শাহ্ আহমদ উল্লাহ ১২৪৩ হিঃ/১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ১২৩৩ বঙ্গাব্দের ১লা মাঘ, বুধবার চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত ফটিক ছড়ি থানাধীন নাজিরহাট রেল ষ্টেশনের মাইজভান্ডার গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত ও ধার্মিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[৪] তাঁর পূর্ব পুরুষ সায়্যিদ হামিদ উদ্দিন গৌড়ী নামক জনৈক লোক ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে হিদায়াতের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রামে আগমন করেন। তিনি পটিয়া থানার অন্তর্গত কাঞ্চন নগরে বসতি স্থাপন করেন। হিদায়াত ও ইমামতির কাজে রত থাকেন। সেখানে তাঁর নামানুসারে হামিদগাঁও নামে একটি গ্রাম আছে। তাঁর এক পুত্র সায়্যিদ আবদুল কাদির ফটিক ছড়ি থানার অন্তর্গত আজিম নগরে গ্রামে ইমামতি উপলক্ষে আগমন করে তথায় বসতি স্থাপন করেন। তাঁর পুত্র সায়্যিদ আতাউল্লাহ এবং তাঁর পুত্র সায়্যিদ তৈয়্যব উল্লাহ উক্ত আজিমপুর নগরেই বসতি স্থাপন করে ইমামতি করতে থাকেন। তাঁর তিন পুত্রের মধ্যে মেঝো পুত্র মৌলভী সায়্যিদ মতিউল্লাহ মাইজভান্ডার গ্রামে বসবাস করতে থাকেন। এই মৌলভী সায়্যিদ মতীউল্লাহ-ই ছিলেন মাওলানা শাহ্ আহমদ উল্লাহ (রঃ)-এর পিতা। তাঁর (আহমদ উল্লাহ) মাতার নাম ছিল সায়্যিদা খায়রুন্নিছা বিবি।[৫]

১। মতীউর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৬।

২। মতীউর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮১।

৩। মাওলানা এম, ওবাইদুল হক, বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ, পৃঃ ৬১।

৪। বি,এ, আজাদ ইসলামাবাদী, চট্টগ্রাম স্মরণী, পৃঃ ৭; মাওলানা নূরুর রহমান, তাযকেরাতুল আউলিয়া, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৬৩।

৫। মাওলানা মুহাম্মদ ফয়েজ উল্লাহ ভূঁইয়া, হযরত গাউছুল আজম শাহ্ ছুফী মাওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (রঃ) মাইজভান্ডারীর জীবনী ও কেরামত, পৃঃ ২০-২১।

Dhaka University Institutional Repository

স্বীয় জন্মভূমি মাইজভান্ডার গ্রামের মক্তবেই তিনি বাংলাও আরবীসহ প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি ধর্মপরায়ণ, নির্জনতা প্রিয়, অধ্যবসায়ী ও প্রতিভাশালী ছিলেন।[২]

সাত বৎসর বয়সের সময় তিনি নামায শিক্ষা করেন এবং তাঁর পিতার সাথে রীতিমত জামা'আতে নামায আদায় করতেন। নামাযের সময় হলে তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়তেন। নামায আদায় না করা পর্যন্ত শান্ত হতেন না।[১] শৈশব থেকেই তিনি অত্যন্ত মেধাবী, সৎ ও নম্র স্বভাবের ছিলেন। প্রকৃতিগতভাবে বাল্যকাল থেকেই তিনি সূফী সাধনা ভাবাপন্ন ছিলেন। তাই তিনি সহপাঠিদের আনন্দ উল্লাসে কখনও যোগদান করতেন না। বরং নিজের পড়াশুনা, যিক্র আযকার ও ধ্যানে সর্বদা রত থাকতেন।[৩] প্রত্যেক শ্রেণীতেই তিনি শীর্ষস্থান অধিকার করতেন। নিজের তীক্ষ্ণ মেধা ও আদর্শ চরিত্র বলে তিনি উস্তাদগণের নিকট অতিশয় প্রিয় ছিলেন। স্থানীয় মক্তবে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত একটি আলীয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। সেখান থেকে কৃতিত্বের সাথে আলিম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। চট্টগ্রামে তৎকালে উচ্চ শিক্ষার সুব্যবস্থা ছিলনা। তাই তিনি হিজরী ১২৬০ সনে কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং মাদ্রাসার পদ গ্রহণ করেন।[৪] পরের বছরেই (১২৭০ হিজরী) তিনি কাজীরপদ ত্যাগ করে কলিকাতায় মুন্শী বু'আলী মাদ্রাসায় প্রধান মুদাররিস হিসেবে শিক্ষাকতার কাজ শুরু করেন। তিনি অত্যন্ত বিদ্যানুরাগী ছিলেন। তাফসীর, হাদীছ, মানতিক, ফিক্হ, আরবী সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে তিনি যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। মাদ্রাসায় চাকুরী গ্রহণের পর তিনি আধ্যাত্মিক শিক্ষা গ্রহণের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। ইতিমধ্যে তিনি গাউসুল আজম হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রঃ) ও বংশধর ও কাদ্রিয়া তরীকায় খিলাফত প্রাপ্ত শায়খ সায়্যিদ আবূ শাহামা মুহাম্মদ সালিহ আল কাদরী লাহোরী এবং তাঁর অগ্রজ চিরকুমার শাহ্ সায়্যিদ দেলওয়ার আরী পাকরাজ-এর সাহচর্যে এসে ফায়েজ ও কামালিয়াত অর্জন করেন[৫] ও খিলাফত লাভ করেন।[৬] অতঃপর মাদ্রাসা আলীয়ার চাকুরী প্রদান করে পীরের নির্দেশে গ্রামে ফিরে এসে একাগ্রমণে আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত ও যিক্র আযকারে আত্মনিয়োগ করেন। প্রত্যহ ফজরের নামাযের পর নির্দিষ্ট ওজীফা ও নফল নামায আদায় করার পর অনেক বেলা পর্যন্ত তিনি কুর'আন শরীফ তিলাওয়াত করতেন। যোহরের নামায ও আসরের নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে ওয়াজ নসীহত করতেন। তাঁর ওয়াজ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও ক্রিয়াশীল ছিল।[৭] ইতিমধ্যে তাঁর জ্ঞান গরিমার সংবাদ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং জতিধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল স্তরের লোক তাঁর কাছে আসতে থাকে। এমনি সময়ে হিজরী ১২৭৫ সনের ২৯শে আষাঢ়, সোমবার তাঁর পিতা মৌলভী সায়্যিদ মতীউল্লাহ ইন্তিকাল করেন।[৮]

১। মাওলানা মুহাম্মদ ফয়েজ উল্লাহ ভূঁইয়া, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭।

২। মাওলানা মুহাম্মদ ফয়েজ উল্লাহ ভূঁইয়া, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭।

৩। মাওলানা নূরুল রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৩

৪। তাযকেরাতুল আউলিয়া ও বাংলাদেশেরে পীর-আউলিয়াগণ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় শেষ পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শনের ফলে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে উক্ত মাদ্রাসার শিক্ষক পদে নিয়োগ করা হয়।

৫। বি. এ. আজাদ ইসলামাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ-৭; মাওলানা মুহাম্মদ ফয়েজ উল্লাহ ভূঁইয়া, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩-৩৫।

৬। মাওলানা মুহাম্মদ ফয়েজ উল্লাহ ভূঁইয়া, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪০-২৪২।

৭। মাওলানা নূরুল রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৩-৬৪।

৮। মাওলানা শাহ্ সূফী সৈয়দ দেলওয়ার হোসাইন, পৃঃ ৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

শাহ্ আহমদ উল্লাহ সংসারের প্রতি উদাসীন ছিলেন। তাঁর এ উদাসীনতায় তাঁর মাতা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তাই তিনি (শাহ্ আহমদ উল্লাহ) ৩২ বছর বয়সের সময় হিজরী ১২৭৬ সনে মায়ের উদ্বিগ্ন দূরীকরনার্থে আজীমনগর নিবাসী মুনশী সায়্যিদ আফাজউদ্দীন আহমদ-এর কন্যা মুসাম্মাৎ সায়্যিদা আলফুন্নিছা বিবির সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শনের ফলে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে উক্ত মাদ্রাসার শিক্ষক পদে নিয়োগ করা হয়।

তাঁর তরীকতের সাজারা নিম্নরূপঃ-

হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ)

↕

হযরত আলী (রাঃ)

↕

হযরত ইমাম হুসাইন (রাঃ)

↕

হযরত জয়নুল আবেদীন (রঃ)

↕

হযরত ইমাম মুহাম্মদ বাকের (রঃ)

↕

হযরত ইমাম যাফর সাদিক (রঃ)

↕

হযরত ইমাম মূসা কাজিম (রঃ)

↕

হযরত ইমাম আলী ইব্ন মূসা রিজা (রঃ)

↕

হযরত মা'রুফ কারখী (রঃ)

↕

হযরত সেরে সক্তী (রঃ)

↕

হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রঃ)

↕

হযরত আবূ বকর শিবলী (রঃ)

↕

হযরত শায়খ আবদুল আযীয তামীমী (রঃ)

↕

হযরত মাওলানা আবদুল ফারাহ ইউছুফ তরতুসী (রঃ)

Dhaka University Institutional Repository

হযরত মাওলানা আবদুল হাসন কুরায়শী (রঃ)

↕

হযরত আবূ সাঈদ মাখযুমী (রঃ)

↕

হযরত সায়্যিদ মহীউদ্দীন আবদুল কাদির জীলানী (রঃ)

↕

হযরত নিজামুদ্দীন গযনবী (রঃ)

|

হযরত সায়্যিদ মুবারক গযনবী (রঃ)

↕

হযরত সূফী নাজমুদ্দীন গযনবী (রঃ)

|

হযরত সূফী কুতুবুদ্দীন রওশন জমীর (রঃ)

↕

হযরত সূফী ফয়জুল্লাহ (রঃ)

↕

হযরত সায়্যিদ মাহ্মুদ (রঃ)

↕

হযরত নাসিরুদ্দীন (রঃ)

|

হযরত সূফী তাকীউদ্দীন (রঃ)

↕

হযরত সূফী নিজামুদ্দীন (রঃ)

↕

হযরত সায়্যিদ আবদুল্লাহ (রঃ)

↕

হযরত সায়্যিদ যাফর হুসাইন (রঃ)

↕

হযরত সূফী খলীলুদ্দীন (রঃ)

↕

হযরত মওলানা মুহাম্মদ মুন'য়িম (রঃ)

↕

হযরত সূফী মুহাম্মদ দায়িম (রঃ)

Dhaka University Institutional Repository

হযরত সূফী আহমদ উল্লাহ (রঃ)

↕

হযরত সূফী লকিয়ত উল্লাহ (রঃ)

↕

হযরত সূফী সায়্যিদ মুহাম্মদ সালিহ লাহোরী (রঃ)

↕

হযরত মাওলানা সায়্যিদ আহমদ উল্লাহ (রঃ)।

কিন্তু বিয়ের ছয় মাস পরেই তাঁর স্ত্রী মৃত্যু বরণ করেন। তাই তিনি সে বৎসরই পুনরায় উক্ত আজীমনগর নিবাসী সায়্যিদ আফাজ উল্লাহ-এর অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, রূপলাবণ্যময়ী ও স্নেহের কন্যা সায়্যিদ লুৎফুন্নিছা বিবিকে বিয়ে করেন।[১] দ্বিতীয় বিয়ের দুই বৎসর পর তাঁর এক কন্যা সন্তান জন্ম লাভ করে। তাঁর নাম রাখা হয় সায়্যিদা বদীউন্নিছা বিবি। তিনি চার বৎসর বয়সে ইন্তিকাল করেন। এরপর তাঁর এক পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে অল্পদিন পরেই মারা যায়। অত ঃপর হিজরী ১২৮২ সনে তাঁর আর এক পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। তাঁর নাম রাখার হয় সায়্যিদ ফয়জুল হক। এর আট বছর পর হিজরী ১২৮৯ সনে তাঁর এক কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে, যার রাখা হয় সায়্যিদা আনোয়ারুন্নিছা। শাহ্ সাহেবের একমাত্র পুত্র মৌলভী ফয়জুল হক দুই পুত্র সন্তান রেখে অল্প বয়সেই ইন্তিকাল করেন।[২]

কলিকাতা থেকে দেশে ফেরার পর শাহ্ আহমদ উল্লাহ চট্টগ্রামের তৎকালীন অন্যতম কামিল পীর হযরত মাওলানা নূর মুহাম্মদ নিজামপুরীর মুরীদ হন, তাঁর কাছে চিশ্তিয়া তরীকাহ্র দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং তাঁর থেকে খিলাফত লাভ করেন।[৩]

শাহ্ আহমদ উল্লাহ অত্যন্ত দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর দরবারে যেসব হাদিয়া তুহ্ফা যেমন-ফলমূল, দুগ্ধ, কলা, চাল, মোরগ, মাছ, কোরমা, পোলাও ইত্যাদি আসত তা থেকে যৎসামান্য অংশ রেখে বাকী সবটুকুই তিনি তাঁর বাড়ী, প্রতিবেশী ও অন্যান্য আগতজনদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। তাই তাঁর দরবারে গরীব দুঃখী ও উপঢৌকন প্রার্থীদের ভীড় সব সময় লেগেই থাকত। তাঁর নিকট যে যা চাইত তিনি তা দিয়ে দিতেন।[৪]

তিনি অত্যন্ত কামিল লোক ছিলেন। কোন লোক তাঁর কাছে গেলে সে যে উদ্দেশ্যে গিয়েছে তা তিনি তৎক্ষণাৎ বলে দিতে পারতেন। তিনি বলতেন, মুসলমান কেবল আল্লাহকেই সিজ্দাহ করবে, অন্য কাউকে নয়। অন্য কাউকে সিজ্দাহ করতে তিনি কঠোর ভাষায় নিষেধ করে গেছেন।[৫] মুক্ত বেলায়েত যুগের গাউছুল আজম বলে তিনি অভিহিত। মানবতা এবং বিচার সাম্যকে সর্বোচ্চ স্থান দেওয়াই তাঁর দর্শন।

১। মৌলভী শাহ্ সূফী সৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৯।
২। মৌলভী শাহ্ সূফী সৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০।
৩। গোলাম সাকলায়েন, বাংলাদেশের সূফীসাধক, পৃঃ ১০২।
৪। মৌলভী শাহ্ সূফী সৈয়দ দেলোয়ার হুসাইন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৭।
৫। গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০২।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর থেকে বহু কারামত প্রকাশিত হয়েছে বলে জানা যায়। তাঁর কারামত ও আধ্যাত্মিক প্রভাবে বহু অমুসলমান ইসলাম গ্রহণ করে। এই মহান সাধক ৭৯ বৎসর বয়সে ১৯০৬ খৃঃ/২৭ জিলকদ, ১৩২৩ হিঃ/১৩ই মাঘ, ১৩১৩ বঙ্গাব্দ, সোমবার রাত ১টায় ইনতিকাল করেন।[১] পরদিন মঙ্গলবার বাদ আসর তাঁর পীর ভাই ও ভক্ত শ্রেষ্ঠ মাওলানা শাহ্ সূফী সায়্যিদ মসীউল্লাহ মির্জাপুরীর ইমামতিতে জানাযার নামায সম্পন্ন হয় এবং মাগরিবের নামাযের পূর্বে তাঁকে দাফন করা হয়।[২] প্রতি বৎসর ১০ই মাঘ মাইজভান্ডারে তণার আদর্শকে উজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে বার্ষিক উরস উদযাপিত হয়। উক্ত উরস-এ বিপুল সংখ্যক ভক্ত সমবেত হয়। জন সমাগমে ইহা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সম্মেলন সমূহের মধ্যে পঞ্চম।[৩]

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী সায়্যিদা লুৎফুন্নিছা, কন্যা সায়্যিদা আনোয়ারুন্নিছা, একমাত্র পুত্র মাওলানা মকদুম শাহ্ সূফী সায়্যিদ ফয়জুল হক-এর পুত্রদ্বয় শাহ সূফী সায়্যিদ মীর হাসান ও মাওলানা শাহ্ সূফী সায়্যিদ দেলওয়ার হোসাইন ও পৌত্রী সায়্যিদা সবরুন্নিছাকে উত্তরাধিকারী হিসেবে রেখে যান।[৪]

শাহ্ সায়্যিদ আমীরুদ্দীন ওরফে পাগলা মিঞা
(জন্ম- ১২৩০/১২৩৮ বাং মোতাবেক ১৮৩১/১৮২৩ ইং)

সাবেক নোয়াখালী বর্তমান ফেনী জিলার আশেপাশে যে সূফী সাধক ইসলাম প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা রেখে যান তাঁর নাম শাহ্ সায়্যিদ আমীরুদ্দীন ওরফে পাগলা মিঞা। তিনি ফেনী জিলার অন্তর্গত ফাজিলপুরের নিকটবর্তী সনুয়া গ্রামে ১২৩৮ বাং/ ১৮৩১ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন।[৫] কিন্তু মৌলভী সায়্যিদ সাহাব উদ্দিন আহমদ কাদেরী কর্তৃক রচিত 'পাগলা মিঞা' [৬] (রঃ) নামক গ্রন্থে তাঁর জন্ম তারিখ ১২৩০ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১৮২৩ ইং সালের উল্লেখ করেছেন। শাহ্ সায়্যিদ আমীরুদ্দীন ওরফে পাগলা মিঞার পিতার নাম ছিল সায়্যিদ রফিউদ্দিন ও মাতার নাম মায়মুনা খাতুন। পাগলা মিঞার পূর্ব পুরুষ ছিলেন হযরত শাহ্ জালাল (রঃ) এর সঙ্গী বাগদাদের মহাতাপস শাহ্ সায়্যিদ কুতুব। সিলেট বিজয়ের পর হযরত শাহ্ জালাল (রঃ) তাঁর প্রিয় সহচর শাহ্ কুতুবকে সঙ্গে নিয়ে অত্র জেলার অন্তর্গত ন্যায়রবক্ষ নামক স্থানে উপস্থিত হয়ে তথায় শাহ্ কুতুবের বাসস্থান নির্দেশ করে দেন। শাহ্ কুতুব পীরের নির্দেশ মুতাবেক তথায় সুখ স্বাচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্বাহ করতে থাকেন। কিছুদিন পর তথাকার অধিবাসী সায়্যিদ বংশীয় জনৈকা রমণীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তাঁর গর্ভে হয় পুত্র শাহ্ সায়্যিদ জালাল উদ্দিন, শাহ্ সায়্যিদ জামাল উদ্দিন, শাহ্ সায়্যিদ রিযা, শাহ্ সায়্যিদ আলী, শাহ্ সায়্যিদ কাসিম ও শাহ্ সায়্যিদ চান্দ জন্মগ্রহণ করেন।[৭] তাঁর সকল পুত্রই ইসলাম প্রচারে নিজেদেরকে আত্মনিয়োগ করেন। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র ইসলাম প্রচারের

১। মৌলভী শাহ্ সূফী সৈয়দ দেলোয়ার হুসাইন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১৭।
২। মৌলভী শাহ্ সূফী সৈয়দ দেলোয়ার হুসাইন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১৯।
৩। মৌলভী শাহ্ সূফী সৈয়দ দেলোয়ার হুসাইন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৮।
৪। মাওলানা শাহ্ সূফী সায়্যিদ দেলওয়ার হোসাইন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১৯।
৫। ডঃ আবদুল কাদের, নোয়াখালীতে ইসলাম , পৃঃ ৮৯।
৬। সায়্যিদ সাহাব উদ্দীন আহমদ কাদেরী, পাগলা মিঞা, (রঃ), পৃঃ ২১
৭। মৌলভী সাহাব উদ্দীন আহমদ কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭-১৮

Dhaka University Institutional Repository

উদ্দেশ্যে আসাম ও পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করেন। পঞ্চম ও ষষ্ঠ পুত্র ক্রমান্বয়ে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গে ও শ্রীহট্টে (বর্তমান সিলেট) বসবাস করেন। চতুর্থ পুত্র শাহ্ সায়্যিদ আলী মহুরী ও ফেনী নদীর সঙ্গমস্থলের অনতিদূরে বসবাস করেন। এই শাহ্ সায়্যিদ আলীর ঔরসে সায়্যিদ আবূ নামে একপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। শাহ্ সায়্যিদ আবূ বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে হিন্দুস্তান গমন করে তথায় হাদীস ও তাফসীর শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং ফাজিল উপাধী লাভ করে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর ইসলাম প্রচারে মনোনিবেশ করেন এবং সায়্যিদ বংশীয় জনৈকা রমণীকে বিয়ে করেন। সায়্যিদ আবূ-এর পুত্র যথাক্রমে সায়্যিদ জয়নুদ্দীন, সায়্যিদ হোসেন ও সায়্যিদ বাহার উদ্দীনও ইসলাম প্রচারে ব্রতী হন। কিন্তু কালক্রমে শাহ্ সায়্যিদ আবূ-এর বাড়ী নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। অতঃপর তাঁর পুত্রগণ এর অতিদূরে বসতি স্থপনপূর্বক জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে থাকেন।[১] শাহ্ সায়্যিদ আবূ-এর প্রথম পুত্র সায়্যিদ জয়নুদ্দীন এর ঔরসে সায়্যিদ ইন'আম উদ্দীন ও সায়্যিদ কায়িম উদ্দীন নামে দুই পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করেন। দ্বিতীয় পুত্র সায়্যিদ আবুল হোসেন সাহেবের ঔরসে সায়্যিদ নাসির উদ্দীন নামক এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। সায়্যিদ ইন'আম উদ্দীন সাহেবের ঔরসে আমান উদ্দীন ও সায়্যিদ আছহাব উদ্দীন নামে দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। সায়্যিদ কায়িম উদ্দীন তদানীন্তন ফেনী সাবডিভিশনের অন্তর্গত খইয়ারা নামক গ্রামে গমন করে তথায় বাড়ী নির্মাণপূর্বক বসবাস করতে থাকেন। সায়্যিদ ইমাম উদ্দীন ও তদীয় পুত্র সায়্যিদ নাজমুদ্দীন চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত মিরেরসরাই এলাকায় হিঙ্গুল নামক গ্রামে বসতি বিস্তার করতে লাগলেন। তথায় সায়্যিদ নাজমুদ্দীন এর ঔরসে সায়্যিদ তাজুদ্দীন ও সায়্যিদ নিজাম উদ্দীন নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।[২] অপরদিকে সায়্যিদ জয়নুদ্দীন এর দ্বিতীয় পুত্র সায়্যিদ কায়িম উদ্দীন সাহেবের ঔরসে দুই পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের নাম যথাক্রমে সায়্যিদ আজা উদ্দীন, সায়্যিদ রাজি উদ্দীন এবং সায়্যিদ মায়মুনা বেগম। সায়্যিদ রাজি উদ্দীন এর দুই পুত্র যথাক্রমে সায়্যিদ সালীম উদ্দীন ও সায়্যিদ আকরাম উদ্দীন।

সায়্যিদ নাসির উদ্দীন সাহেবের ঔরসে সায়্যিদ বশীর নামক এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। এই সায়্যিদ বশীর সাহেবই মরহুম পাগলা মিঞা সাহেবের পিতা। তিনি ফেনী জেলার এলাহাবাদ নামক স্থানে গমনপূর্বক এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের জনৈকা রমনীর পাণি গ্রহণ করে স্বীয় শ্বশুরালয়ে বসবাস করতে থাকেন। দূর্ভাগ্যক্রমে, এখানে নিঃসন্তান অবস্থায় তাঁর পত্নী মারা যান। অতঃপর তিনি তাঁর পূর্ব পুরুষের বাড়ীতে খইয়ারা (ফাজিলপুর) নামক স্থানে গমনপূর্বক স্বীয় খুল্লতাত ভগ্নী সায়্যিদা মায়মুনা খাতুন বেগমের পাণি গ্রহণ করেন। উক্ত সায়্যিদ বশীর এর ঔরসে সায়্যিদা মায়মুনা খাতুন বেগমের গর্ভেই সায়্যিদ আমীর উদ্দীন ওরফে পাগলা মিঞার জন্ম হয়।[৩]

১। মৌলভী সায়্যিদ সাহাব উদ্দীন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮।
২। মৌলভী সায়্যিদ সাহাব উদ্দীন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯।
৩। মৌলভী সায়্যিদ সাহাব উদ্দীন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০।

Dhaka University Institutional Repository

শাহ্ সায়্যিদ আমীরুদ্দীন ওরফে পাগলা মিঞার বংশ তালিকাঃ-

শাহ্ সৈয়দ কুতুবুল আলম বোগদাদী ওরফে শাহ্ সৈয়দ কুতুব সাহেব

শাহ্ সৈয়দ জালাল উদ্দীন - শাহ্ সৈয়দ জামাল উদ্দীন - শাহ্ সৈয়দ রেজা - শাহ্ সৈয়দ অলি - শাহ্ সৈয়দ কাসেম - শাহ্ সৈয়দ চাঁন্দ

শাহ্ সৈয়দ আবু

সৈয়দ জয়ন উদ্দীন - সৈয়দ আবুল হুসাইন সৈয়দ বাহার উদ্দীন

সৈয়দ ইমাম উদ্দীন (হিঙ্গুলী বাড়ী প্রতিষ্ঠাতা), সৈয়দ কায়েম উদ্দীন (খাইয়ারা বাড়ী প্রতিষ্ঠাতা) সৈয়দ ইমাম উদ্দীন

সৈয়দ নজুমউদ্দীন সৈয়দ আমান উদ্দীন সৈয়দ আছহাব উদ্দীন

সৈয়দ নাছের উদ্দীন

সৈয়দ তায়জুদ্দীন সৈয়দ নেজামউদ্দীন

সৈয়দ বসির

সৈয়দ হোসাইন সৈয়দ রেয়াজ উদ্দীন

সৈয়দ আমির উদ্দীন (পাগলা মিঞা)

সৈয়দ আজাউদ্দীন সৈয়দ রাজি উদ্দীন সৈয়দা মায়মুনা খাতুন (পাগলা মিঞার মাতা- বিবি মায়মুনা)

সৈয়দ ছলিম উদ্দীন সৈয়দ আকরাম উদ্দীন (পাগলা মিঞার প্রথম খাদেম)

১) সৈয়দ আফসার উদ্দীন ২) সায়্যিদ ওমেদ রাজা ৩) সৈয়দ দানা মিঞা ৪) সৈয়দ সুলতান আহমদ ৫) সৈয়দ আলী আহমদ ৬) সৈয়দ সোলায়মান ৭) সৈয়দ সাহাব উদ্দীন আহমদ কাদেরী (লেখক) ৮) সৈয়দ শামসুদ্দীন আহমদ।[১]

যখন তাঁর বয়স চার বৎসর এগার মাস তখন তাঁকে বিদ্যা শিক্ষার জন্য জনৈক উস্তাদের হাতে সমর্পণ করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে কিছু জ্ঞান অর্জন করার পর তাঁর পিতা তাঁকে তের বৎসর বয়সে চট্টগ্রাম জেলার সদর ইসলামিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি করিয়ে দেন। তাঁর আদর্শ চরিত্র ও নির্মল ব্যবহারে মাদ্রাসার শিক্ষক মন্ডলী তাঁর প্রতি অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে পড়েন। তিনিও লেখা-পড়ায় অত্যন্ত মনোযোগী ছিলেন। বিশেষ করে ফারসী ভাষায় তিনি সর্বাপেক্ষা অধিক পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন। শৈশবকাল হতেই নির্জনে বাস করা তাঁর স্বভাবগত অভ্যাস ছিল।

১। মৌলভী সায়্যিদ সাহাব উদ্দীন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬২।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি নামায রোযা ইত্যাদি কার্যে লিপ্ত থাকতে শান্তি অনুভব করতেন। সাদা জামা কাপড় ও সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করতে ভালবাসতেন। পিতামাতার একান্ত অনুগত ছিলেন, কোন সময়েই তাঁদের আদেশ অমান্য করতেন না।[১] তাঁর চরিত্র ছিল নির্মল। বাল্যকাল থেকেই তাঁর থেকে অনেক অলৌকিক ঘটনাবলী সংগঠিত হয় বিধায় জনসাধারণ্যে তিনি একজন কামিল সাধক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি সংসারের নানা শ্রেণীর লোকের মধ্যে উপদেশ ও হিতজ্ঞানবাণী প্রচার করতেন।[২]

নিম্নে তাঁর কয়েকটি হিতোদেশের উদাহরণ দেওয়া গেল ঃ

ক) আইনে থাকিস, আইনে থাকলে ভাল।
গাইনে গেলে গন্ডগোল ॥

খ) রাব্বের হুকুম যে বুঝে, সে বুঝে।
সকলে বুঝে না ॥

গ) লাগি থাকিস, লাগি থাকলে ভাগী হয়।

ঘ) ওয়া পড়িস, ওয়া পড়লে দোয়া পায়।

ঙ) ফকিরী করা আগুন খাওয়া, অঙ্গার হজম করা, ছোট শক্তি নয় হুসেনের রণ (অর্থাৎ কারবালার যুদ্ধ)
যে বুঝে, সে বুঝে।
সকলে বুঝে না ॥

চ) হাটু সমান মধু- ভাত, গলা সমান কাঁটা।
তারপর ফকিরী ঘাটা ॥

ছ) থানাদার বাধ্য থাকলে কোন্ বেটায় কি করতে পারে।[৩]

একটু চিন্তা করলেই পাগলা মিঞার তত্ত্বপূর্ণ কথার মানে বুঝতে পারা যায়।

শাহ্ সায়্যিদ আমীর উদ্দীনের কথাবার্তা ছিল হেঁয়ালীপূর্ণ। জনসাধারণ সময় সময় তাঁর কথার তাৎপর্য বুঝতে পারত না। স্বভাবও ছিল তাঁর পাগলাটে ধরনের। তজ্জন্য লোকে তাঁকে 'পাগলা মিঞা' বলে ডাকত। তিনি একজন কামেল লোক ছিলেন, তাই দেশ-বিদেশের মামলাবাজ, চাকুরীজীবী, রোগী ও শোকাতুর মানুষ এবং জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ খৃষ্টান তাঁর দর্শন কামনায় বহু অর্থ ও টাকা-কড়ি নিয়ে তাঁর দরবারে হাজির হত। এগুলো তিনি অন্য লোককে বিলিয়ে দিতেন। কারও উপহার পছন্দ না হলে ফেরৎ দিতেন ও তাঁকে তাড়া করতেন[৪]

১। সায়্যিদ সাহাব উদ্দিন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১।
২। গোলাম সাকলায়েন, বাংলাদেশের সূফী সাধক, পৃঃ ১৩১।
৩। গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩১-৩২।
৪। ডঃ আবদুল কাদের, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯০।

Dhaka University Institutional Repository

ইউসুফ নামক জনৈক চাকর তাঁর হিতোপদেশে চৌর্য-বৃত্তি ত্যাগ করে এবং তাঁর দোয়ায় সাংসারিক স্বচ্ছলতা ফিরে পায়। তিনি চিশ্‌তিয়া তরীকাহ্‌র অনুসারী ছিলেন। বাদ্যযন্ত্র পছন্দ করতেন এবং অনেক সময় বাদ্যযন্ত্র সহযোগে লোকজনের গানের সাথে তিনি নিজেও অংশ গ্রহণ করতেন।

১৩ই শ্রাবণ ১২৮৩ বাং/১৮৭৬ইং বুধবার তাঁর ওফাত হয়। ফেনী বাজারেরর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে তাকিয়া বাড়ীতে তাঁর মাযার অবস্থিত। মৃত্যু দিবসে সেখানে উরস হয় এবং এ উপলক্ষ্যে বিপুল জনসমাগম হয়। কয়েকজন হিন্দু তাঁর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন বলে প্রকাশ।[১] দেশ বিদেশের দূর-দূরান্ত থেকে হাজী, গাজী, দরবেশ ও শত শত ভক্ত এই বিখ্যাত সাধকের মাযার যিয়ারতে আসেন।[২]

মাওলানা হাফিজ আহমদ
(১৮৩৪-১৮৯৯)

মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরীর (১৮০০-১৮৭৩) কলিকাতায় অবস্থানকালে সেখানে ১২৫০হিঃ/১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে তাঁর পুত্র হাফিজ আহমদের জন্ম হয়।[৩] তিনি শৈশবকাল হতেই অতিশয় শান্ত প্রকৃতির, সৎস্বভাব, স্বল্পভাষী ও লাজুক ছিলেন। হাসি-ঠাট্টা বেফাহেশ কথাবার্তা এবং শিশু সুলভ খেলাধূলাকে তিনি বাল্যকাল থেকেই অপছন্দ করতেন এবং লেখাপড়ার প্রতি অত্যধিক অনুরাগী ছিলেন।

বদান্যতা, পরার্থপরতা ও সদাশয়তা প্রভৃতি সদ গুণাবলী শৈশব হতেই তাঁর মধ্যে পুর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। শৈশব থেকেই তিনি পরদুঃখকাতর ছিলেন।[৪] চার বৎসর বয়ঃকালে তাঁর পিতা মাওলানা কারামত আলী তাকে পবিত্র কুর'আনের প্রথম ছবক দেন। আল্লাহ প্রদত্ত অসাধারণ মেধাশক্তির বলে শৈশবেই কুর'আন হিফজ করে ধর্মীয় আরবী কিতাবসমূহ পড়তে আরম্ভ করেন। অল্পকালের মধ্যেই তিনি নাহু, সরফ, মানতিক হিকমত, বালাগাত, হাদীস তাফসীর ইত্যাদি বিষয়ে প্রভূত জ্ঞানের অধিকারি হন।[৫] ভারতের তৎকালীন খ্যাতনামা আলিম মুফতী মুহাম্মদ ইউসূফ লক্ষ্ণৌবীর নিকট অধিকাংশ ধর্মীয় গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। এছাড়া তিনি ফিরিংগী মহলের মাওলানা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌবীর (১৮৪৮-১৮৬৬) পিতা মাওলানা আবদুল হালীম লক্ষ্ণৌবীর (১৮২৩-১৮৬৮) নিকটও মাওলানা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌবীর (১৮৪৮-১৮৬৬) পাঠ্য পুস্তকসমূহ অধ্যয়ন করেন। সে সময় মাওলানা হালীম জৌনপুরের হানাফিয়া মাদ্রাসায় প্রধান শিক্ষকরূপে নিয়োজিত ছিলেন। অতঃপর মাওলানা হাফিজ আহমদ পবিত্র মক্কার প্রখ্যাত আলিম ও মুহাদ্দিস শায়খ আহমদ দাহ্‌লানের নিকট হাদীস অধ্যয়ন করে হাদীস বর্ণনায় সনদ লাভ করেন।[৬] দ্বীনী শিক্ষা অধ্যয়ন সমাপ্তির নিদর্শনস্বরূপ

১। ডঃ আবদুল কাদের, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯১।
২। সায়্যিদ সাহাব উদ্দীন আহমদ কাদেরী, পাগলা মিঞার জীবন কাহিনী, পৃঃ ৯৪৯।
৩। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, মাওলানা আবদুল আউয়াল জৌনপুরী (রঃ), পৃঃ ১৩।
৪। মাওলানা নুরুর রহমান, তাযকেরাতুল আওলিয়া, খন্ড-৬, পৃঃ ১৯।
৫। খন্দকার বশীর উদ্দিন, তাযকেরাতুল আওলিয়া, পৃঃ ৪০১।
৬। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশেষে মুফতী মুহাম্মাদ ইউসুফ তাঁকে পাগড়ী পরিয়ে দেন । বিদ্যা অর্জনের পর কিছুকাল তিনি শিক্ষকতা করেন। তিনি একজন ভাল শিক্ষকও ছিলেন। স্বীয় পিতা মাওলানা কারামত আলীর বাংলা-আসাম সফরের সময় তাঁর বোটে (নৌকা) প্রতিষ্ঠিত ভ্রাম্যমাণ মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত ছাত্রদের ধর্মীয় শিক্ষা দিতেন। তাঁর ছোট ভাই মাওলানা মাহমুদ, মাওলানা আবদুল আউয়াল ও ভ্রাতুষ্পুত্র মাওলানা আবদুর রবও তাঁর নিকট শিক্ষা লাভ করেন ।[১]

মাওলানা হাফিজ আহমদের ইসলাম প্রচারের প্রধান কেন্দ্র ছিল পূর্ব বাংলা। মাওলানা কারামত আলীর মৃত্যুর (১৮৭৩) তিন বছর পূর্বেই তিনি চল্লিশ বছর বয়সে (১৮৭০) পূর্ব বঙ্গ সফর শুরু করেন এবং পিতার মৃত্যুর পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে ১২৯১/১৮৭৪ সাল থেকে যথারীতি ধর্মপ্রচার শুরু করেন ও একটানা ৭/৮ বছর পূর্ব বাংলায় ইসলাম প্রচার অব্যাহত রাখেন । এরপর স্বদেশের মায়ায় বা হজ্জ করার উদ্দেশ্যে জৌনপুর যাত্রা করেন। পথিমধ্যে কয়েকদিন কলিকাতায় অবস্থান করেন। সেখানে নওয়াব আবদুল লতীফের (১৮২৮-১৮৯৩) ব্যবস্থাপনায় এবং পুলিশ কমিশনারের অনুমতিক্রমে ১৮৮১ সালের ৩রা নভেম্বর তিনি গড়ের মাঠে ঈদুল আযহার নামাযের ইমামতি করেন। 'দারুস-সালতানাত' পত্রিকায় এই সংবাদ পরিবেশিত হয়। অতঃপর কলিকাতা থেকে তিনি জৌনপুরে পৌঁছেন এবং বছর খানেক বাড়ীতে অবস্থান করে হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ রওয়ানা হন ।[২]

১২৯৯/১৮৮২ সালের ৩রা নভেম্বর মাওলানা হাফিজ আহমদ হজ্জ সমাপন করেন। এ সময় তিনি ওহুদ ও বদরের ময়দানও ভ্রমণ করেন। হজ্জ থেকে ফিরে এসে কিছুদিন জৌনপুর অবস্থান করে বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। হজ্জ থেকে ফিরে এসে তিনি মোটামুটি ১৬ বছর জীবিত ছিলেন ।[৩] হজ্জের পর তিনি কতকাল জৌনপুরে অবস্থান করেন তা জানা যায়নি। তবে মাওলানা আবদুল বাতেনের ভাষ্যানুসারে হজ্জের পর তিনি জৌনপুরে কিছুদিন অবস্থান করে শেষবারের মত পূর্ব বাংলায় আগমন করেন ।

তিনি সুদীর্ঘ ২৫ বছর যাবত বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার করেন । ভোলার দৌলতখানে তিনি মাদ্রাসা ও ঈদগাহ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত মাওলানা আবদুর রব (১৮৭৪-১৯৩৫) একাধারে ৩৭ বছর ঐ ঈদগাহে ইমামতী করেন ।[৪] মাওলানা হাফিজ আহমদের কাছে দেশ-বিদেশ থেকে বহু হাদিয়া তুহফা আসত, কিন্তু তিনি প্রয়োজনীয় পরিমাণ রেখে বাকী সবকিছুই অভাবী লোকদের মাঝে বিতরণ করে দিতেন। তাঁর দানশীলতা ও বদান্যতা এমন ছিল যে, কোন প্রার্থী বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যেতনা। এরূপ দানশীলতার কারণে অনেক সময়ে তিনি ঋণী হয়ে পড়তেন ।[৫] পরহেযগারী ও সাবধানতা তাঁর মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। সন্দেহজনক কোন মাল তিনি কখনও গ্রহণ করতেন না । সন্দেহজনক লোকের দাওয়াতও গ্রহণ করতেন না। তবে স্থান বিশেষে দাওয়াতে যেতেন, উপদেশ ও নসীহত করতেন, গুনাহের কাজ হতে তওবা করাতেন, কিন্তু তারে দেয়া কিছুই গ্রহণ করতেন না। তাঁর ওয়াজ শুনে কোন সুদখোর তওবা করলে তিনি তাকে বলতেন,

---

১। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত,পৃঃ ১৩।
২। মাওলানা আবদুল বাতেন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৩,' ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত,পৃঃ ১৪।
৩। মাওলানা আবদুল বাতেন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৭।
৪। মাওলানা আবদুল বাতেন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫০,' ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪।
৫। মাওলানা নুরুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪।

Dhaka University Institutional Repository

''ভাই তুমি সুদ হতে তওবা করলে এখন যাদের নিকট থেকে সুদ নিয়েছ তাদের সুদের টাকাগুলি দিয়ে দাও''।[১]

মাওলানা হাফিজ আহমদ শুধু একজন ওলীই ছিলেন না, তিনি একজন হক্কানী আলিমও ছিলেন । তাঁর ওয়াজ জাহিরী ও বাতিনী শিক্ষায় পরিপুর্ণ ছিল। তাঁর ওয়াজ এতই ক্রিয়াশীল ছিল যে, অতি অল্প সময়ে শ্রোতাবৃন্দের অন্তরে ক্রিয়া করে তাদের আমল ও আখলাককে সংশোধন করে দিত ।[২]

তিনি ধর্ম-গোত্র বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোকের কাছেই সম্মানিত ছিলেন । মাওলানা হাফিজ আহমদের অনেক কারামতের বর্ণনা পাওয়া যায়। সকল ধর্মের লোক ফুঁক দেয়ার জন্য তাঁর কাছে পানি, কাল জিরা ও কাল সুতা নিয়ে আসত। কথিত আছে, তাঁর ফুঁক ও দোয়ার বরকতে লোকেরা কঠিন রোগ থেকেও আরোগ্য লাভ করত। পূর্ব বাংলার প্রত্যেকটি জেলায় তাঁর অসংখ্য খলীফা ইসলাম প্রচার রত ছিলেন এবং এখনও অনেক স্থানে এদেশীয় সেই অনেক 'আলিম জৌনপুরীর সিলসিলার প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তাঁর তদানীন্তন খলীফাদের মধ্যে মাওলানা হাকীম আবদুর রব ও মাওলানা শাহ্ মুহাম্মদ ইয়াকুব বদরপুরী-এর নাম সবিশেষ উলেখযোগ্য ।[৩] মাওলানা হাফিজ আহমদ নিঃসন্তান ছিলেন। ভ্রাতষ্পুত্রগণকে তিনি আপন সন্তানের ন্যায় আদরযত্ন করতেন ।[৪]

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারকালে স্বীয় বজরায় নদীপথে ভ্রমণের এক পর্যায়ে কুমিল্লা জেলার মতলব (বর্তমান চাঁদপুর) থানাধীন কদমতলী নামকস্থানে পৌছে তিনি ১৩০৫ বঙ্গাব্দের ২০শে পৌষ পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন এবং চিকিৎসকের পরামর্শে তাঁকে ঢাকায় আনার পথে ৬ই মাঘ, ১৩০৫ বঙ্গাব্দ, ৫ই রমজান, ১৩১৬ হিঃ, ২৬শে জানুয়ারী, ১৮৯৯ইং, ঢাকার সদরঘাটে অবস্থিত বোটে ইনতিকাল করেন ।[৫] সেখানে তাঁকে গোছল করানো হয়। তাঁর জানাযায় শহরের বহু লোক শরীক হয়। এমন কি হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরাও তাঁর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে শব মিছিলে যোগদান করে। ঢাকা শহরের চকবাজার শাহী মসজিদের দক্ষিণ পার্শ্বে তাঁকে দাফন করা হয় ।[৬] দাফন শেষে শব দেহের চাদরখানা ছিড়ে টুকরো টুকরো করে তাবীজ বানিয়ে বহু লোককে দেয়া হয়। মৃত্যুর একবছর পর তাঁর কবরটি পাকা করে দেয়া হয় ।

তাঁর ইনতিকালের বর্ণনা দিতে গিয়ে হাকীম হাবীবুর রহমান বলেন, মাওলানা হাফিজ আহমদ সারা জীবন বাংলায় অতিবাহিত করেন । তাঁর কাছে জনগণের খুবই আনাগোনা ছিল। তিনি অত্যন্ত ওয়াকিফহাল, বিণয়ী, আলিম, এবং স্বনামধন্য বক্তা ছিলেন। তিনি পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন। চিকিৎসার উদ্দেশ্যে তিনি ঢাকায় আসছিলেন। পথিমধ্যে তিনি বোটে ইনতিকাল করেন। লাশ ঢাকার সদরঘাটে আনা হয়। সেখানেই গোসল দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। শায়খ ফয়েয বখশ কানপুরীর প্রস্তাবানুসারে লাশ চকবাজার আনা হয়। সদরঘাট থেকে চকবাজার পর্যন্ত লোকে লোকারণ্য ছিল। লোকেরা মাওলানার খাটটিতে কাঁধ পেতে দেয়ার জন্যে পতঙ্গের মত অধীর চিত্তে খাটটির দিকে

১। মাওলানা নূরুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫ ।
২। মাওলানা নূরুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১ ।
৩। মাওলানা আবদুল বাতেন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩১; ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫ ।
৪। মাওলানা নূরুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬ ।
৫। ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪ ।
৬। মাওলানা আবদুল বাতেন, পৃঃ ১২৮; নাজির হোসেন, কিংবদন্তীর ঢাকা, পৃঃ ৯১ ।

Dhaka University Institutional Repository

অধীর চিত্তে খাটটির দিকে ধাবমান ছিল। আমি লক্ষ্য করেছিলাম, হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় তাঁর দাফন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিল এবং সবাই তাঁর জন্য কাঁদছিল। সর্ব সাধারণের এত গভীর শোক ও আহাজারী ইতিমধ্যে আমি আর কখনও দেখিনি । চকবাজার মসজিদের দক্ষিণ দিকে ছোট একখন্ড জমি শূন্য ছিল। তাতে কবর প্রস্তুত করা হয় এবং সেখানে তাঁকে দাফন করা হয়। বছর খানেক পর তাঁর কবরের উপর দালান তৈরী করা হয় ।[১]

হযরত শাহ্ সূফী সদরুদ্দীন
(১৮৪৪-১৯৪১)

হযরত শাহ্ সূফী সদরুদ্দীন ১২৬০হিঃ/ ১৮৪৪ইং সনে যশোর জেলার অন্তর্গত গঙ্গারামপুর গ্রামে এক উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন ।[২] তাঁর পিতা একজন সুদক্ষ আমীন ছিলেন। তিনি আঠার বৎসর বয়সে ম্যাট্রিক পাশ করেন এবং বিশ বৎসর বয়সে ছোট দারোগার পদে নিযুক্ত হন। তিন বৎসর পর পদোন্নতি পেয়ে বড় দারোগা হন । ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে খুব ভাল বাসতেন। ইংরেজী ভাষায় খুবই দক্ষতা অর্জন করেছিলেন । ইংরেজদের ন্যায় ইংরেজীতে অনর্গলভাবে কথা বার্তা বলতে পারতেন। একবার তিনি জনৈক উচ্চ পদস্থ ইংরেজ অফিসারের সাথে ইংরেজী ভাষায় এক ঘন্টা আলাপ করেন। তাঁর আলাপচারিতায় সন্তুষ্ট হয়ে ইংরেজ অফিসার তাঁকে এক হাজার টাকা পুরস্কারস্বরূপ প্রদান করেন। ইংরেজী পড়ে পুলিশের চাকুরী করলেও বাল্যকাল থেকেই তিনি নিস্কলুষ চরিত্রের অধিকারী, খোদাভীরু, পীর-ফকিরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও আত্মশীল ছিলেন। কথিত আছে যে, চাকুরী কালীন সময়ে তিনি জনৈক শাহ্ সাহেবের কিছু কাপড় নিজ হাতে ধুয়ে দেন। তখন শাহ্ সাহেব খুশী হয়ে তাঁর জন্য দোয়া করলেন যে, তুমি আমার কাপড় যেরূপ পরিস্কার করেছ আল্লাহ পাক যেন তোমার অন্তরকে তদ্রূপ পরিস্কার করে দেন। সে দিন দিবাগত রাতে তিনি নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্নে দেখেন যে আসমান থেকে অতি মসৃন ও ফিন্‌ফিন্ একখানা পাতলা কাপড় তাঁর মুখে এসে পড়ে। এই কাপড়ের বরকতে তিনি ইলম ও মা'রিফাত অর্জন করেন। এরপর থেকে তাঁর মনে পরিবর্তন আসে। কদিন পর তিনি চাকুরী ছেড়ে ইলম-ই-দ্বীন শিক্ষার উদ্দেশ্যে কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। মাদ্রাসার শিক্ষকমন্ডলী তাঁর মনের অবস্থা উপলব্ধি করতে পেরে তাঁকে ফুরফুরার পীর হযরত শাহ্ সূফী মাওলানা আবূ বকর সিদ্দীকী এর নিকট পাঠিয়ে দেন। ফুরফুরা গমনপূর্বক তিনি মাওলানার হাতে বায়'আত হন ।

সূফী সদরুদ্দীন-এর অসাধারণ আধ্যাত্মিক যোগ্যতা লক্ষ্য করে পীর সাহেব অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁকে মা'রিফাতের উচ্চতর স্তরে পৌঁছিয়ে দিয়ে খিলাফত প্রদান করেন । অতঃপর তিনি বাড়ী এসে একাধারে সুদীর্ঘ ছ'বছর যাবত ইলম-ই-শরী'আতের কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করতে থাকেন। এ সময় তিনি সংসার ত্যাগী হয়ে পড়েন । আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আঃ)- এর রূহানী ফয়েযের

১। হাকিম হাবিবুর রহমান, আসুদেগান-এ-ঢাকা , পৃঃ ১৩১; ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫ ।

২। কিন্তু মাওলানা এম, ওবাইদুল হক তাঁর রচিত বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ গ্রন্থে তাঁর জন্ম ১৮৪০ ইং লিখেছেন (পৃঃ ২৬০) ।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বারা তাঁকে ইলম-ই-মা'রিফাত দান করেন । পুনরায় তিনি ফুরফুরার পীর সাহেবের কাছে গিয়ে ইলম-ই-তাসাউফ শিক্ষা করেন । কিছুদিন সেখানে অবস্থান করার পর একদিন তিনি দেখলেন যে, পীর সাহেবের এক চাকর কুড়াল দিয়ে লাকড়ী চিরছে । তখন তিনি চাকর থেকে কুড়াল নিয়ে লাকড়ী চিরা আরম্ভ করেন। পীর সাহেব এ অবস্থা দেখে তাঁকে বললেন আল্লাহ পাক তোমাকে লাকড়ী চিরার জন্য সৃষ্টি করেননি, বরং লোকদেরকে হিদা'আতের পথে আনার জন্য সৃষ্টি করেছেন । অতঃপর তাঁকে খিলাফত দিয়ে দেশে পাঠিয়ে দিলেন । দেশে এসে তিনি লোকদেরকে হিদা'আতের পথে আনতে আরম্ভ করলেন। কিছুদিন পর মক্কা শরীফ গমন করে হজ্জব্রত পালন করেন। তৎপর তিনি যশোর, পাবনা, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, খুলনা, নদীয়া, বরিশাল, নোয়াখালী ও কুমিল্লা জেলায় হিদা'আতের কাজ করেন ।

১৩২৭বাং/১৯২০ইং পীরকে সিজদা করা, কবর সিজদা করা এবং গান-বাদ্য জায়েয না-জায়েয নিয়ে জনৈক মাওলানা শাহ্ বদিউল আলম-এর সাথে তাঁর মুনাজারা হয়। মুনাজারায় তিনি জয়ী হন এবং নাজায়েয ও অনৈসলামিক বলে ফতোয়া দেন ।

মহাত্মা গান্ধীর স্বদেশ আন্দোলনে হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানরাও বন্দে মাতরম বলতে থাকে। ১৩৩০ বাং/১৯২৩ইং সন্দীপের বিখ্যাত মাওলানা অজিউল্লাহ-এর সাথে 'বন্দে মাতরম' জায়েয কি না জায়েয? এ নিয়ে তার সাথে এক বিরাট মুনাজারা হয়। তিনি 'বন্দে মাতরম' বলাকে কুফরী বলে ফতোয়া দেন। উক্ত মুনাজারায় মাওলানা অজিউল্লাহ পরাজিত হন এবং তাঁর ফতোয়া সমর্থন করেন।

একবার ফেনী আলিয়া মাদ্রাসার বার্ষিক সভায় 'ফখর-ই-বাঙ্গালা' মাওলানা আবদুল হামিদ ওয়াজ করার সময় ইখলাস সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, নিয়ত ঠিক থাকলে হিন্দুদের সঙ্গে সুর মিলায়ে সমস্বরে আবৃত্তি করতে কোন দোষ নেই । হযরত সূফী সাহেব এর ঘোর প্রতিবাদ করে বললেন যে, এটা পরিষ্কার শিরক । শেষ পর্যন্ত ফখর-ই-বাঙ্গাল তাঁর কথা মেনে নিলেন এবং মন্তব্য করলেন যে, তিনি শরী'আতের এত অনুসারী ছিলেন যে, তাঁর পীর-এর মাযারের উপর ঘর উঠান হয়েছে বলে প্রায় যেতেন না। ফেনীর মাওলানা করীম বখশ, শাহ্ আবদুল খালেক, বগুড়ার সূফী জয়নুল আবেদীন প্রমুখ তাঁর প্রসিদ্ধ মুরীদ ও খলীফা ছিলেন । তিনি তাসাউফ সম্পর্কে অনেক কিতাব রচনা করেছেন ।[১] শাহ্ সূফী সদরুদ্দীন হচ্ছেন খাপ বিহীন তরবারী যেদিকে আঘাত করেন কেটে ফেলেন ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফেনীতে জাপানী বিমানের বোমায় তাঁর ডান পায়ের হাঁটুর নীচে সামান্য আঘাত লাগে। এই আঘাতের বিষ ছড়িয়ে পড়লে ১৩৬০হিঃ/১৯৪১ সনে তিনি ইন্তিকাল করেন ।[২]

ফেনীর দক্ষিন-পশ্চিম দিকে গজারিয়া গ্রামে মৌলবী হাবীবুল্লাহ-এর বাড়ীর সামনে তাঁর মাযার অবস্থিত। প্রত্যহ বহু লোক তাঁর মাযার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে আগমন করে ।

১। মাওলানা এম, ওবাইদুল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬০-৬৪; মাওলানা নুরুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৮-৪১ ।

২। কিন্তু বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে তিনি ১৩৪০ বঙ্গাব্দের ২৬শে চৈত্র রোজ শুক্রবার রাত ৮টায় জাপানী বিমানের বোমার আঘাতের বিষের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ইন্তিকাল করেন । ১৩৪০ বঙ্গাব্দ ছিল ইংরেজী ১৯৩৩ সাল। অথচ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয় ১৯৩৯ইং ।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী আবূ বকর সিদ্দীকী (রঃ)
(১৮৪১ - ১৯৩৯)

ধর্মের সঙ্গে কর্মের সমন্বয় সাধন করে যে সকল মহান সাধক সাধারণ মানুষকে আধ্যাত্মিক এবং ব্যবহারিক জীবনে নানা সৎকর্মে উজ্জীবিত করেছেন হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী আবূ বকর সিদ্দীকী (রঃ) তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

মাওলানা শাহ্ সূফী আবূ বকর সিদ্দীকী (রঃ) ভারতের পশ্চিম বঙ্গের হুগলী জেলার ফুরফুরায়[১] জন্মগ্রহণ করেন ।[২] তিনি প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রঃ)-এর ৩০তম বংশধর। প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) থেকে শাহ্ সূফী আবু বকর সিদ্দীকী (রঃ) পর্যন্ত শাজারা বা বংশ তালিকা নিম্নরূপ ঃ-

আমীরুল মু'মিনীন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ)

↕

মুহাম্মদ

↕

মুহাম্মদ কাসিম

↕

খাজা হযরত আবদুর রহমান

১। হযরত মাওলানা আবু বকর সিদ্দীকী, (রঃ)-এর পূর্ব পুরুষ মাওলানা মানসুর বাগদাদী (রঃ) তদীয় সেনাপতি হযরত শাহ্ হোসেন বুখারী (রঃ)কে সঙ্গে নিয়ে বাংলাদেশে আগমনকালে বর্তমানের ফুরফুরা ও পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির পূর্ব নাম ছিল 'বালিয়াবাসন্তী' । এ অঞ্চলটি তখন একজন হিন্দু বাগদী রাজার অধীন ছিল। 'বালিয়াবাসন্তী' বর্তমান হুগলী জেলার অন্তর্গত একটি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ গ্রাম । বালিয়াবাসন্তীর মালিক এই হিন্দু বাগদী রাজা যে স্থানে বসবাস করতেন, সে স্থানটি 'বাগদী রাজার গড়' বলে সুপরিচিত ছিল । বর্তমানে তা 'চার শহীদের গড়' বলে প্রসিদ্ধ । যে চারজন শহীদের নামানুসারে 'চার শহীদের গড়' হয়েছে তাঁরা হলেন- ১) হযরত শাহ্ সায়্যিদ খায়রুর রহমান, ২) হযরত শাহ্ সায়্যিদ তাবীবুর রহমান, ৩) হযরত শাহ্ সায়্যিদ 'আবীদুর রহমান, ও ৪) হযরত শাহ্ সায়্যিদ ফয়জুর রহমান ও মতান্তরে ১) সায়্যিদ মুহাম্মদ শাহ, ২) সায়্যিদ মুহাম্মদ শরীফ, ৩) সায়্যিদ মুহাম্মদ ফরীদ ও ৪) শায়খ খারওয়া । শামসুল উলামা গোলাম সালমানির মতে,'বালিয়াবাসন্তী' এলাকা দখল করে মুসলমানগণ পরিপূর্ণ আনন্দ লাভ করেছিলেন বলে এর নাম দেয়া হয় 'ফায়রে ফারাহ' অর্থাৎ পরিপূর্ণ জাঁকজমকময় আনন্দ । আবার কারো কারো মতে মুসলমানগণ এই এলাকা অতি দ্রুত অধিকার করে নিতে পেরেছিলেন বলে এর নামকরণ করা হয় ফরফরাহ। এই ফরফরাহ শব্দই পরবর্তীকালে ফুরফুরায় রূপান্তরিত হয়েছে। ফুরফুরায় বহু শরীফ, আবিদ, সুফী, ওলী, গাউস, কুতুব, আবদাল, মাওলানা, মৌলবীর মাযার রয়েছে বলে বর্তমানে একে 'ফুরফুরা শরীফ' বলা হয় (আবু ফাতেমা, পৃঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪-১৫) ।

২। তাঁর জন্ম সন সম্পর্কে মতভেদ আছে- ১৮৪১ খৃষ্টাব্দ, জুলফিকার আহমদ কিসমতী, বাংলাদেশের সংগ্রামী ওলামা পীর মাশায়েখ, পৃঃ ৬২; ১২৫৩ বঙ্গাব্দ, সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান, প্রধান সম্পাদক, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ১৯৭৬ খৃঃ, পৃঃ৪৩; ১২৬৫ বঙ্গাব্দ, মাওলানা এম, ওবাইদুল হক, বাংলাদেশের পীর আওলিয়াগণ, ফেনী, ১৯৮১, পৃঃ ৪০; ১২৬৩ হিজরী, মুহাম্মদ মতীউর রহমান, আয়না-ই-ওয়াইসী, পাটনা, ১৯৭৬, পৃঃ ২৪২; দেওয়ান মুহাম্মদ ইব্রাহীম তর্কবাগীশ, হাকীকতে ইনসানিয়াত, রাজশাহী, ১৩৯০ হিঃ,পৃঃ ৩; ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খন্ড, পৃঃ ১১৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

খাজা আবদুর রহীম

↕

শায়খ আহমদ মুহাদ্দিছ

↕

শায়খ মুহাম্মদ আমজাদ

↕

মুহাম্মদ শাহ্ আমজাদ

↕

মুহাম্মদ শাহ্ আসগর

↕

মুহাম্মদ শাহ্ আরিফ বিল্লাহ

↕

মুহাম্মদ শাহ্ যাহিদ

↕

খাজা মুহাম্মদ দীন

↕

মুহাম্মদ শাহ্ জাহান

↕

মুহাম্মদ খাজা নাসির উদ্দীন

↕

নূর মুহাম্মদ

↕

মুহাম্মদ রুস্তম খুরসানী

↕

মুহাম্মদ যিয়া উদ্দীন যাহিদ

↕

মুহাম্মদ মানসুর বাগদাদী

↕

মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দীন বাগদাদী

↕

মুহাম্মদ আশরাফ

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ শাহ্ কালু মিঞা

↕

মুহাম্মদ ইসমাইল বাগদাদী

↕

মুহাম্মদ দাউদ

↕

মুহাম্মদ খেযের

↕

মুস্তাফা মাদানী

↕

কুতবুল আফতাব

↕

অজিহ উদ্দীন মুজতবা

↕

মাখদুম মুহাম্মদ মুনাব্বা

↕

মাখদুম মাওলানা গোলাম সামদানী

↕

মাখদুম মু'তাসিম বিল্লাহ

↕

মাখদুম আবদুল মাক্তাদির

↕

আবু বকর সিদ্দীকী।

তাঁর ১৪তম পূর্ব পুরুষ মানসূর বাগদাদী ৭৪১ হিঃ/১৩৪০ খৃষ্টাব্দে তদীয় সেনাপতি হযরত শাহ্ হোসেন বুখারী (রঃ) কে সঙ্গে নিয়ে ভারত সম্রাট আলাউদ্দীন খিলজীর রাজত্বকালে বাগদাদ থেকে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে (তৎকালীন বঙ্গদেশ) এসে হুগলী জেলার অন্তর্গত মোল্লাপাড়া নামক গ্রামে বসবাস শুরু করেন ।[১] তাঁর উর্ধ্বতন ৮ম পুরুষ মুস্তফা মাদানী ছিলেন শায়খ আহমাদ সিরহিন্দী (রঃ) (মৃঃ-১০৩৪/১৬৩৪)-এর তৃতীয় পুত্র মা'সূম রব্বানীর মুরীদ । কথিত আছে যে, সম্রাট

১। ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, ইসলাম প্রসঙ্গ, ঢাকা, ১৯৬৩ খৃঃ, পৃঃ ১১৭-২৬; মাওলানা এম, ওবাইদুল হক, বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ, পৃঃ ৪১ ।

Dhaka University Institutional Repository

আওরঙ্গযেব (মৃঃ-১১১৮/১৭০৭) মা'সুম রব্বানীর অন্যতম মুরীদ ছিলেন । তিনি মুস্তাফা মাদানীকে মেদিনীপুর শহরে মসজিদ সংলগ্ন একটি মহল ও বহু লাখাজ (নিষ্কর) সম্পত্তি দান করেন ।

আবূ বকর সিদ্দিকীর পিতার নাম ছিল হাজী মৌলবী মাখদুম আবদুল মুকতাদির। তিনি আত্মিক প্রজ্ঞার অধিকারী সম্পন্ন একজন ওলী ছিলেন । আবূ বকরের জন্মের নয় মাস পরেই (১২৬৬ বঙ্গাব্দ/১৮৫৯ খৃষ্টাব্দ) তিনি ইনতিকাল করেন । সুতরাং তাঁর স্নেহময়ী মাতা মুহাব্বাতুন্নিছা তাঁকে লালন পালনের ভার গ্রহণ করেন। মাতার আগ্রহে ও যত্নে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তখন দেশে রাজভাষা ইংরেজীর মর্যাদা সবচেয়ে বেশী ছিল । আবূ বকর সিদ্দীকী ছিলেন তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী। তাই, সকলে তাঁকে ইংরেজী শিখতে উৎসাহিত করে। তদনুযায়ী আবূ বকর সিদ্দীকী (রঃ) ইংরেজী শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন । এ সময় একদিন তিনি স্বপ্ন দেখলেন যে, তাঁর উর্ধতন অষ্টম পুরুষ মাওলানা হাজী মুস্তাফা মাদানী স্বপ্নের মধ্যেই আত্মপরিচয় দিয়ে তাঁকে (আবূ বকর) আরবী-ফারসী প্রভৃতি ভাষায় ধর্মীয় শিক্ষা লাভের জন্য অনুপ্রাণিত করে ।[১] তাই তিনি প্রথমে সীতাপুর ও পরে হুগলী মুহসিনিয়া মাদ্রাসায় আরবী ভাষা অধ্যয়ন করেন এবং হুগলী মুহসিনিয়া মাদ্রাসা হতে কৃতিত্বের সাথে জামা'আত উলা (ফাযিল) পাশ করেন ।[২] হুগলী মুহসিনিয়া মাদ্রাসা বোর্ডিং-এ অবস্থানকালে তিনি মাঝে মধ্যে রাত্রিকালে বের হয়ে যিকর করতে করতে অলিগলি ঘুরে বেড়াতেন। তিনি বলেছেন যে, সে সময় একটি নুর তাঁর মাথা হতে পা পর্যন্ত ঘিরে রাখত। তখন তিনি যিকর-এ মত্ত হয়ে যেতেন ।[৩] জামা'আত উলা পাশ করে তিনি কলিকাতা সিন্দুরিয়া পট্টির মসজিদে হাফিজ জামাল উদ্দীন-এর নিকট তাফসীর, হাদীস ও ফিকহ অধ্যয়ন করেন । হাফিজ সাহেব শহীদ সায়্যিদ আহমাদ বেরেলভী (রঃ) (মৃঃ-১২৪৬/১৮৩১)-এর খলীফা ছিলেন । অতঃপর কলিকাতা নাখোদা মসজিদে মাওলানা বেলায়েতের কাছে মানতিক ও হিকমত (গ্রীক বিজ্ঞান) ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন। এভাবে তিনি ২৩/২৪ বৎসর বয়সে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন । এ সময়ে তাঁর বিদ্যাবত্তার খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এরপর তিনি মদীনা মুনাওয়ারা গমন করেন, তথায় হাদীস অধ্যয়ন করেন এবং নবী করীম (সঃ)- এর রওযা মুবারক-এর খাদিম বিখ্যাত আলিম আদ-দালাইল আমীন রিদওয়ান-এর নিকট থেকে চল্লিশটি হাদীস গ্রন্থের[৪] সনদ লাভ

১। মোবারক করীম জওহর, ভারতের সূফী, পৃঃ ১১৬।

২। ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খন্ড, পৃঃ ১১৮; মোবারক করীম জওহর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৬, মাওলানা এম, ওবাইদুল হক, বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ, পৃঃ ৪১ ।

৩। মাওলানা এম, ওবাইদুল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪১ ।

৪। ১) সুনানে তিরমিযী, ২) সহীহ মুসলিম, ৩) সুনানে আবু দাউদ, ৪) সুনানে তিরমিযী, ৫) সুনানে নাসায়ী, ৬) সুনানে ইবনি মাজাহ, ৭) মুয়াত্তায়ে ইমাম মালেক, ৮) মুসনাদে ইমাম আবূ হানাফী, ৯) মুসনাদে ইমাম শাফেয়ী, ১০) মুসনাদে ইমাম আহমদ, ১১) মুসনাদে দারিমী, ১২) মুসনাদে তায়লসী, ১৩) মুসনাদে আবদ ইবনি হোমায়দ, ১৪) মুসনাদে হারিস ইবনে উসামা, ১৫) মুসনাদে রাজ্জাক, ১৬) মুসনাদে আবু ইয়ালী মুসেলী, ১৭) সহীহ ইবনি হাব্বান, ১৮) সহীহ ইবনি খুজায়মা, ১৯) মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক, ২০) মিশকাতুল আনওয়ার লিল শায়খিল আকবার, ২১) মুসনাদে আবু মুসলিমীন কাশি, ২২) মুসনাদে সাঈদ ইবনে মানসুর, ২৩) মুসান্নাফে ইবনি আবী শায়বা, ২৪) সুনানে বায়হাকিয়ে কুবরা, ২৫) তারীখে ইবনু আসাকির, ২৬)তারিখে ইয়াহইয়া ইবন মাঈন, ২৭) শিফায়ে কাযী ইয়াজ, ২৮) শারহিস সুন্নাহ লিল বাগাবী,২৯) আয-যাহদু আদ- দাকায়িক লি ইবনি মুবারক, ৩০) নাওয়াদিরুল ওসুল লিল হাকিমিত তিরমিযী, ৩১) কিতাবুল দুআ লিত তিবরানী, ৩২) আকসুল ইলমি ওয়াল আমালি লিল খাতীব, ৩৩) মুসতাখরিজে ইসমাঈল আলা সাহীহিল বুখারী, ৩৪) মুসাদরিক লিল হাকিম, ৩৫) ফারাজু বাদাশ লিল্লাহ লি ইবনি আবিদ দুনিয়া, ৩৬) মুস্তাখরিজে আবিওয়ানা আল সাহীহিল মুসলিম, ৩৭) হুলইয়া লি আবী নাঈম, ৩৮) যিয়াদুল মুসালসা মালাতি লিজালালুদ্দীন সিউতী, ৩৯) আজজুররিয়াতুত তাহিরা ও ৪০) আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাতি লি আবিস সুনানি।

Dhaka University Institutional Repository

করেন । অতঃপর দেশে প্রত্যাবর্তন করে বহু দুর্লভ গ্রন্থ সংগ্রহ করে একাধিক্রমে ১৮ বৎসর অধ্যয়ন ও গবেষণা করেন ।[১] পাঠ্যাবস্থা থেকেই ইবাদাত-বন্দেগীর প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল । রাত জেগে যিকর করতেন, শরী'আতের হুকুম-আহকাম সাধ্যমত পালন করতে আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। এভাবে যখন তিনি নিরলস সাধনায় রত ছিলেন, তখন কলিকাতায় বিখ্যাত সাধক শাহ সূফী ফতেহ আলী (রঃ) (মৃঃ-১৩০৪/১৮৮৬)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাত হয় । আবূ বকর সিদ্দীকী (রঃ) তাঁর নিকট বায়'আত গ্রহণ করে নিষ্ঠার সাথে ইলম-ই-মা'রিফাত শিক্ষা করেন এবং কাদরিয়া চিশ্তিয়া, নকশবন্দিয়া, মোজাদ্দিদীয়া ও মুহাম্মদিয়া তরীকাহয় তাঁর থেকে খিলাফত লাভ করেন ।[২]
হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী আবূ বকর সিদ্দীকী (রঃ) -এর তরীকতের শাজারা নিম্নরূপ ঃ

হযরত মাওলানা শাহ্ আব্দুল আযীয দেহলবী (রঃ)
↕
হযরত শাহ সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী (রঃ)
↕
হযরত মাওলানা শাহ সূফী ফতেহ আলী (রঃ)
↕
হযরত মাওলানা শাহ্ সুফী আবূ বকর সিদ্দীকী (রঃ) ।

হযরত মাওলানা শাহ্ আবদুল আযীয দেহলবী (রঃ) এর পর নকশবন্দিয়া তরীকাহর শাজারা একদিকে, কাদরিয়া তরীকাহর শাজারা আর একদিকে, চিশ্তিয়া তরীকাহর শাজারা অন্য আর একদিকে পৌছে । সকল শাজারা শেষ হযরত নবী করীম (সঃ) পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে । ফিকহ শাস্ত্রেও তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল । বিভিন্ন ফিক্হ সম্পর্কীয় মাস'আলার সঠিক উত্তর জিজ্ঞাসা করা মাত্রই তিনি কিতাব না দেখে বলে দিতে পারতেন । কথিত আছে যে, স্বপ্নে তিনি হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর নিকট কিছু দ্বীনী মাস'আলা শিক্ষা করেছিলেন ।[৩] তিনি দু'বার (১৩১০ ও ১৩৩০ বাং) হজ্জব্রত পালন করেন। প্রথম বার হজ্জের সময় তিনি স্বপ্নে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর দর্শন লাভ করেন । তাঁর দর্শনে তিনি আত্মহারা হয়ে বলেন যে, হযরত আমার নাম 'আবদুর রাসূল' রাখুন। তখন হযরত (সঃ) ঈষৎ হেসে বলেন না, আমি তোমার নাম 'আবদুল্লাহ' রাখলাম। এরপর থেকে তিনি নিজের নামের পূর্বে অনেক সময় 'আবদুল্লাহ' লিখতেন । দ্বিতীয় বার (১৩৩০ বাং) হজ্জের সময় তাঁর সঙ্গে প্রায় ১৩০০ জন মুরীদ ছিলেন। হজ্জ সম্পাদন করে তিনি মদীনা শরীফে কয়েক মাস অবস্থাণ করে বিভিন্ন মুহাদ্দিসের নিকট হাদীস শরীফ অধ্যয়ন করে সনদ লাভ করেন। এ সময় তিনি কলিকাতার বেলিয়া ঘাটার জমিদার তাঁর আত্মীয়া বিবি সওলাতুন্নিছা প্রতিষ্ঠিত মক্তাস্থিত 'সওলাতিয়া মাদ্রাসা' পরিদর্শন করে এক হাজার টাকা দান করেন ।[৪] তৎকালে বঙ্গ দেশের হজ্জ যাত্রীদিগকে বোম্বাই গিয়ে জাহাযে আরোহণ করতে হত ।

১। আবূ ফাতেমা মুহম্মদ ইসহাক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১ ।
২। ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খন্ড, পৃঃ ১১৮, মোবারক করীম জওহর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৭ ।
৩। মাওলানা এম, ওবাইদুল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪২; ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খন্ড, পৃঃ ১১৮ ।
৪। মাওলানা এম, ওবাইদুল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

ফলে, তাঁরা অনেক দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হতেন। বাঙ্গালী হাজীদের এসব অসুবিধা ও নির্যাতন দেখে দ্বিতীয়বার হজ্জে থাকাকালে (১৩৩০) এ সম্পর্কে তিনি সংবাদপত্রে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখে পাঠান। হজ্জ থেকে ফিরে এসে তিনি এ নিয়ে তুমুল আন্দোলন শুরু করেন। বাংলার গভর্নরের কাছে বার বার টেলিফোন করে এই পরিস্থিতির কথা জানান এবং 'জমইয়্যাতে-ই-উলামা'-এর পক্ষ থেকে এ দুরাবস্থার অবসানের জন্য প্রস্তাব পাস করিয়ে গভর্নরের কাছে পাঠানো হয় ।[১] অবশেষে তাঁরই প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ বাঙ্গালী হাজীদের জন্য কলিকাতা হতে হজ্জে যাতায়াতের জন্য জাহাযের ব্যবস্থা করা হয়[২] এবং তাদের অসুবিধা দূর করার জন্য হজ্জ কমিটি গঠন করা হয় ।

তিনি সূফী দরবেশদের কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে গমন করেন। একাধিকবার তিনি পাক-ভারতের বিশিষ্ট গাউস কুতুব ওলী-দরবেশদের মাযার যিয়ারত করেন। প্রথমে তিনি পাঞ্জাবের 'সরহিন্দ' শরীফের সূফী মুজাদ্দিদ আলফ-ই-সানী, সূফী মাসুমে রাব্বানী সুলতানুল হিন্দ খাজা মঈনউদ্দীন চিশ্‌তী, খাজা বাকী বিল্লাহ, কুতুব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী, খাজা নিজাম উদ্দীন আওলিয়া, আমীর খসরু, সূফী নাসির উদ্দীন চেরাগ ও আজমীর শরীফের তাবাগড় পাহাড়ের শহীদদের মাযার যিয়ারত করেন। তাঁর ধারণা ছিল যে, জীবিত পীরদের দ্বারা যেরূপ আত্মিক শক্তি লাভ হয়, মৃত পীরদের দ্বারা তার চেয়ে বেশী আত্মিক শক্তি লাভ হয়ে থাকে। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে তিনি পানিপথের খাজা তুর্ক সাহেবের মাযার, শাহ্ বু-আলী কলন্দরের মাযার, মাওলানা কাযী সানাউল্লাহ পানিপথের মাযার যিয়ারত করে পুন্য লাভে ধন্য হন । তারপর তিনি বাংলা আসামের প্রতি জেলাতেই ইলম-ই শরী'আত ও ইলমে-ই তরীকতের প্রচার কার্যে আত্মনিয়োগ করেন । বাংলা আসামের হাজার হাজার মানুষ তাঁর সান্নিধ্যে এসে শরী'আত ও তরীকতের তা'লীম গ্রহণ করেন। প্রত্যেক ফজর ও মাগরিবের নামাযের পর শত শত মানুষকে তিনি আল্লাহ! আল্লাহ! যিক্র এবং মুরাকাবা শিক্ষা দিতেন। তাঁদেরকে তিনি জরুরী বিধান, লেবাস-পোশাক, চাল-চলন ও বিতর্কিত বিষয়গুলো সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করতেন। ভন্ড পীরদের অনুষ্ঠানে যে সব অনৈসলামিক কর্মকান্ড হত যেমন৭ অতি উচ্চস্বরে বা নর্তন-কুর্দন করে যিক্র করা, হাততালি দিয়ে নানারূপ ভাবভঙ্গি করা, মাথা ঝাঁকিয়ে রাগ-রাগিনীসহ গযল গাওয়া, পীরের পায়ে বা কবরে গিয়ে সিজদা করা ইত্যাদি তিনি পছন্দ করতেন না । লক্ষ লক্ষ লোক তাঁর কাছে মুরীদ হয়ে ইসলামের সুমহান শিক্ষা, আদব ও আদর্শ প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। বহুশত ব্যক্তি তাঁর খিলাফত লাভ করে মানুষকে শরী'আত ও তরীকত সম্পর্কে অবহিত করতে থাকেন ।[৩]

তিনি একজন কামিল পীর ছিলেন। বঙ্গদেশের প্রতিটি এলাকায় এবং এর বাইরেও তাঁর অনেক মুরীদ রয়েছে। তাঁর মতে শরী'আত ব্যতীত মারি'ফাত হয় না । ইবাদাত বন্দেগীতে, কাজ-কর্মে, চাল-চলনে, আচার অনুষ্ঠানে, রীতি-নীতিতে, মোট কথা সকল ব্যাপারে যিনি শরী'আতের অনুবর্তী হন, তিনিই পীর হতে পারেন । তিনি বলতেন, কেবল পীরের বংশেই যে পীরের জন্ম হবে এমন কথা কিতাবে নেই । যে বংশেরই হোক না কেন, যিনি শরী'আত ও মারি'ফাত ইত্যাদিতে কামিল হবেন তিনিই পীর হতে পারবেন ।

১। মোবারক করীম জওহর, প্রাগক্ত, পৃঃ ১২৪ ।

২। আবু ফাতেমা মোহাম্মাদ ইসহাক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৬-৩৭ ।

৩। মোবারক করীম জওহর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৮ ।

৪। মাওলানা রুহুল আমীন, হযরত পীর সাহেব কেবলার বিস্তারিত জীবনী, পৃঃ ২৪৬-৪৭; দেওয়ান মুহাম্মদ ইব্রাহিম তর্কবাগীশ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৮-৯৯; ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খন্ড, পৃঃ ১১৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি ছিলেন একজন সুবক্তা । বাংলা ও আসামের শহরে, গ্রামে-গঞ্জে প্রায় পঞ্চাশ ষাট বছর যাবত বহু ধর্মীয়সভায় ওয়াজ-নসীহত-এর মাধ্যমেই ইসলামের প্রচার ও মুসলিম সমাজের মধ্যে শৃংখলা আনয়নের কাজ করেছেন। বিদ'আতপন্থী ও শরী'আত পরিপন্থী পীরদের বিরুদ্ধে তিনি মৌখিক প্রচার ও লেখনীর মাধ্যমে বিরামহীন সংগ্রাম করেছেন। তৎকালে আলিমগণ সাধারনত বাংলা শিখতেন না এবং বাংলা ভাষায় কিছু লিখতে আগ্রহী ছিলেন না। সহজ সরল বাংলা ভাষায় সাধারণের বোধগম্য করে শরী'আতের বিধি বিধান তথা ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর বই পুস্তক রচনা করতে তিনি আলিম ও ইংরেজী শিক্ষিত তাঁর মুরীদগণকে উৎসাহিত করেন । ফলে, মাওলানা রুহুল আমীন (১৯৪৫), মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী মাওলানা আবদুল হাকীম (বিখ্যাত তাফসীরকার), ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখসহ আরও অনেকে একাজে আত্মনিয়োগ করেন । তাঁর নির্দেশ ও অনুমোদনক্রমে লিখিত এ ধরনের বই পুস্তকের সংখ্যা হাজারেরও অধিক । মাওলানা রুহুল আমীন একাই প্রায় ১৩৫ খানা পুস্তক রচনা করেন । তাঁর নির্দেশে লিখিত বা অনুমোদন প্রাপ্ত বই-পুস্তকের মধ্যে কয়েকখানার নাম উল্লেখ করা যায় । যেমন- আকায়েদে ইসলাম, ইলমে তাসাউফ, সিরাজুস সালেহীন, পীর-মুরীদ তত্ত্ব, বাতিল দলের মতামত, নসীহতে সিদ্দীকীয়া, ফতওয়ায়ে সিদ্দীকীয়া, তা'লীমে তরীকত, এরশাদে সিদ্দীকীয়া ইত্যাদি । তরীকত দর্শন বা তাসাউফ তত্ত্ব বইটি আবূ বকর সিদ্দীকীর মুখ নিঃসৃত বাণী সংগ্রহ ।[১] আবুবকর সিদ্দীকী (রঃ) নিজেও একজন সুলেখক ছিলেন। তাঁর রচিত তারিখুল ইসলাম (বাংলা), ফজলুল হক (উর্দু) এবং ওসিয়তনামা (বাংলা) প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু ' আদিল্লাতুল মুহাম্মাদিয়া ' নামে আরবী ভাষায় লিখিত কিতাবটি প্রকাশিত হয় নাই।[২] পত্র পত্রিকায় তাঁর বহু বিবৃতি, প্রবন্ধ ও লিখিত ভাষন প্রকাশিত হয়েছে ।[৩]

মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য তিনি আপ্রান প্রচেষ্টা চালান। মাদ্রাসার পাঠ্য তালিকা সংস্কারের জন্য তিনি দাবী জানান। যুগোপযোগী শিক্ষা গ্রহণ করতে তিনি মুসলমানদেরকে উপদেশ দেন, বিশেষত ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ।[৪] তিনি অনেক ধর্ম সভায় বলেছেন যে, ইংরেজী বিদ্যা একটি হুনুর। তা শিখতে কোনও দোষ নেই। কিন্তু খবরদার! তোমরা দ্বীনী ইলম ছেড়ে তা শিখবে না । তিনি আরও বলেছেন যে, হযরত (সঃ) স্বীয় সাহাবী হযরত যায়িদ ইবনে সাবিত (রাঃ) কে প্রয়োজনের তাকীদে হিব্রু ভাষা শিক্ষা করতে আদেশ দিয়েছিলেন। তাই তিনি অল্পদিনের মধ্যে হিব্রু ভাষা শিখে রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর পক্ষ থেকে ইহুদীদেরকে হিব্রু ভাষায় পত্রাদি লিখতেন ।[৫] বালক-বালিকাদেরকে প্রাথমিক শিক্ষা (ইব্‌তিদায়ী তা'লীম) ইসলামী পদ্ধতি অনুযায়ী ও ইসলামী পরিবেশ প্রদানের জন্য শিখতে তিনি জোর তাকীদ দেন । তাঁর মতে নারী শিক্ষাও জরুরী, তবে পর্দার সাথে হতে হবে। তাদের উচ্চ শিক্ষার জন্য পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়তে তিনি উপদেশ দেন[৬] বাংলা ও আসামের লক্ষ লক্ষ মুসলমান দীর্ঘদিনের সঞ্চিত

১। দেওয়ান মুহাম্মদ ইব্রাহিম তর্কবাগীশ, পৃঃ ৯৬-৯৭; ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খন্ড, পৃঃ ১১৮-১১৯ ।

২। রমযান আলী, ফুরফুরা শরীফের হযরত সাহেবের (রঃ) এর মত ও পথ, পাবনা, পৃঃ ৬ ।

৩। তৎকালীন শরীয়তে ইসলাম, আল-ইসলাম ও সুন্নত আল জমাত পত্রিকাগুলো দেখা যেতে পারে ।

৪। দেওয়ান মুহাম্মদ ইব্রাহিম তর্কবাগীশ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৬-৭৪, ১৪০; শরী'আতে ইসলাম পত্রিকা, ৩য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা ।

৫। মাওলানা এম, ওবাইদুল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৫ ।

৬। দেওয়ান মুহাম্মদ ইব্রাহিম তর্কবাগীশ, পৃঃ ৬৬-৭৪, ১৪০; শরী'আতে ইসলাম পত্রিকা, ৩য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা ।

Dhaka University Institutional Repository

কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল নানারূপ পাপাচারে লিপ্ত, দিগ-ভ্রান্ত ও অশিক্ষিত এসব মুসলমানকে ধর্মীয় শিক্ষার আলোকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য তিনি তাঁর 'আলিম মুরীদদেরকে দেশের সর্বত্র ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের নির্দেশ দেন । এ নির্দেশ অনুযায়ী তাঁরা নিজ নিজ এলাকায় বহু বিদ্যালয় ও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নিজেও বহু মক্তব, মাদ্রাসা, মুসাফিরখানা, এতিমখানা ও লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সময়কার বাংলা ও আসামের প্রায় সবকটি ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্রের ভিত্তি প্রস্তর তিনি স্থাপন করেন ।[১] তাই, দেখা যায় তাঁর প্রচেষ্টায় বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রায় ৮০০ মাদ্রাসা ও ১১০০ মসজিদ স্থাপিত হয়। তাঁর নিজ গ্রামে তিনি একটি ওল্ডস্কীম ও একটি নিউস্কীম মাদ্রাসা এবং একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন ।[২] ১৯২৮ সালে গঠিত কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসার প্রথম গভর্নিং বডির তিনি সদস্য ছিলেন ।[৩] তিনি ' জমইয়্যাত-ই-উলামা-ই-হিন্দ ' (প্রতিষ্ঠিত ১৯১৯ সালে) এর একটি শাখা ' জমইয়্যাত-ই-বাঙ্গালা ও আসাম ' এর সভাপতি ছিলেন এবং আযাদী আন্দোলনে (১৯৪৭) অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ইহার (জমইয়্যাত) এক অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে তিনি বলেছিলেন, ''শরী'আত, তরীকত, হাকীকত ও মা'রিফাত-এ পূর্ণরূপে আমল করিয়া দেশ ও কাওমের খিদমতের জন্য 'আলিমদের রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতিতে যোগ দেওয়া আবশ্যক''। তিনি আরও বলেছেন, ''রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে আলিমদিগকে সরিয়া পড়িবার জন্য আজ মুসলিম সমাজে নানাবিধ অন্যায় ও বেশরা কাজ হইতেছে''। তিনি রাজনীতিবিদ ছিলেন না, কিন্তু প্রয়োজনে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে যোগ দিতেন। ১৯০৬ সালে শাহবাগে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের এক সভায় তিনি যোগদান করেন ।[৪]

১৯২৬ সালে কলিকাতায় জমইয়্যাত-ই-উলামা-ই-হিন্দ এর বার্ষিক সভায় অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০) এর সমর্থনে প্রস্তাব গৃহীত হলে তিনি উহার বিরোধিতা করে বলেছিলেন যে, আইন অমান্য আন্দোলনের ফলে শান্তি-শৃংখলা বিনষ্ট ও মহাক্ষতি সাধিত হবে। স্বরাজ স্বাধীনতা সকলের কাম্য উহা লাভ করার জন্য পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করা অবশ্য প্রয়োজন নতুবা তার ফল হবে ভয়ংকর বিপ্লব । ভারতের মুসলমানগণ এ বিষয়ে বহু পশ্চাতে পড়ে আছে। তারা সামাজিক সংগঠন ও শিক্ষা ক্ষেত্রে নিতান্ত পশ্চাদপদ। সুতরাং তাদেরকে শিক্ষা, সংগঠন প্রভৃতি বিষয়ে উন্নত করতে হবে, নতুবা মহাসর্বনাশ অনিবার্য। আইন অমান্য আন্দোলন হতে সম্পূর্ণ পৃথক থাকা বিশেষ প্রয়োজন ।[৬] মিঃ সিঃ আর. দাস, গান্ধীজী, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমূখ ব্যক্তিবর্গ তাঁকে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের আহবান জানালে তিনি এর বিরোধিতা করে বলেন যে, ''আমাদের মনে রাখা উচিত আমরা প্রথমে মুসলমান, তারপর ভারতবাসী'' ।[৭] ১৯৩৬ সালে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে তিনি তাঁর মুরীদান, মুত্তাকি, দ্বীনী ও সাধারন মুসলমানগণকে মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ড কর্তৃক মনোনীত প্রার্থীদের পক্ষে ভোট দিতে অনুরোধ করেছিলেন ।[৮]

১। মোবারক করীম জওহর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২১-২২ ।
২। মোবারক করীম জওহর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৫-৬৬ ।
৩। আবদুস সাত্তার, তারীখ-ই-মাদ্রাসা-ই-আলীয়া, ঢাকা, ১৯৫৯, পৃ ৮৪-৮৫ ।
৪। শরী'আতে ইসলাম, ১০ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩৪২ ।
৫। মাওলানা এম, ওবাইদুল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৫ ।
৬। শরী'আতে ইসলাম, ৫ম বর্ষ, আষাঢ় সংখ্যা, পৃঃ ১৪২ ।
৭। মাওলানা এম, ওবাইদুল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৫ ।
৮। সুন্নত আল-জামাত পত্রিকা, ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ৫৬; দেওয়ান মুহাম্মদ ইব্রাহিম তর্কবাগীশ, পৃঃ ২৪৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

জমইয়াতের সভাপতি হিসেবে তিনি সা'উদী আরবের সুলতান আবদুল আযীয ইবন সাউদকে শরী'আত বিরোধী কার্য্যাদি রোধ সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করে ১৩৫১ হিঃ পত্র দেন। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং আরও চেষ্টা করা হবে বলে বাদশাহ তাঁর পত্রের জবাব দিয়েছেন।[১] তিনি বলকান যুদ্ধকালে তুরস্কের দুঃস্থদের সাহায্যার্থে প্রায় ৬০ হাজার টাকা চাঁদা সংগ্রহ করে যথাস্থানে পৌঁছে দেন। বাংলা ১৩২৬ সালের ঝড়ে বাংলাদেশের বিপন্নদের সাহায্যের জন্য প্রায় ৫০ হাজার টাকা চাঁদা সংগ্রহ করে এদেশে পাঠান।[২]

বাংলা ও আসামের আলিমগণকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সংঘবদ্ধ করার জন্য তিনি 'জমইয়াত-ই-উলামা-ই-বাঙ্গালা' নামে সংস্থা গঠন করে আলিম সমাজের মধ্যে একতা স্থাপন, দ্বন্দ্ব কলহ বিদূরন, দেশ ও সমাজের খিদমত করনের কাজে এক বিরাট ভূমিকা পালন করেন। কয়েকবার জমইয়াত-ই-উলামার অধিবেশনে ত্রিপুরা (বর্তমান কুমিল্লা), চাঁদপুর, নোয়াখালী, চৌমুহনী, হাজীগঞ্জ ও ফুরফুরা শরীফে অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রতিবারই লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়। হাজীগঞ্জের অধিবেশনে দিল্লীর মাওলানা আহমদ সাঈদ এবং চৌমুহনীর অধিবেশনে মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী সাহেবও যোগদান করেন।[৩]

তৎকালীন সমাজে সংবাদপত্রের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম এ কথাটি ভালভাবে উপলব্ধি করে তিনি বেশ কিছু পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। আর্থিক সংকটে নিপতিত পত্রিকাগুলোকে নিজ তহবিল থেকে অথবা চাঁদা সংগ্রহ করে সাহায্য করেন।[৪] তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় যে সব পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলোর মধ্যে -(১) 'মিহির' ও 'সুধাকর' (সাপ্তাহিক), সম্পাদক- শেখ আবদুর রহিম, ১ম প্রকাশ, ১৮৯৫; (২) নবনূর (মাসিক), সম্পাদক-সৈয়দ এমদাদ আলী, ১ম প্রকাশ, ১৯০৩; (৩) মোহাম্মদী (সাপ্তাহিক), সম্পাদক- মুহাম্মদ আকরাম খাঁ, ১ম প্রকাশ, ১৯০৮; (৪) সোলতান (সাপ্তাহিক) পরবর্তীকালে দৈনিক, সম্পাদক-প্রথমে রেয়াজুদ্দীন আহমদ ও পরে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, ১ম প্রকাশ, ১৯০২; (৫) মুসলিম হিতৈষী (সাপ্তহিক), সম্পাদক- শেখ আবদুর রহিম, ১ম প্রকাশ ১৯১১; (৬) ইসলাম দর্শন (মাসিক) আঞ্জুমানে ওয়ায়েজীন মুখপাত্র, সম্পাদক- মোহাম্মদ আবদুল হাকীম ও নূর আহমদ, ১ম প্রকাশ, ১৯২০; (৭) হানাফী (সাপ্তহিক), সম্পাদক- মোহাম্মদ রুহুল আমীন, ১ম প্রকাশ, ১৯২৬; (৮) শরি'আতে ইসলাম (মাসিক), সম্পাদক- আহমদ আলী এনায়েতপুরী, ১ম প্রকাশ, ১৯২৬ উল্লেখযোগ্য।[৫]

মাওলানা আবূ বকর সিদ্দীকী (রঃ) বঙ্গ, আসাম, এমনকি সুদূর আরব ও অনারবের বহু নর-নারীকে বাতিনী ইল্‌ম (আধ্যাত্মিক জ্ঞান) শিক্ষা দেন। তিনি তরীকতের তা'লীম দিতেন ৪ প্রকারে। যারা শিক্ষিত এবং বেশী সময় দিতে পারতেন তাঁদেরকে নক্‌শবন্দিয়া মুজাদ্দিদিয়া তরীকাহ্‌তে দীক্ষা দিতেন

১। দেওয়ান মুহাম্মদ ইব্রাহিম তর্কবাগীশ, পৃঃ ১১৫-১৭।
২। মাওলানা এম, ওবাইদুল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৫।
৩। মোবারক করীম জওহর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৩।
৪। দেওয়ান মুহাম্মদ ইব্রাহিম তর্কবাগীশ, পৃঃ ১১৫-১৭।
৫। ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খন্ড, পৃঃ ১২০।

Dhaka University Institutional Repository

এবং যারা বেশী সময় দিতে পারতেন না তাঁদেরকে চিশ্‌তিয়া ও কাদ্‌রিয়া তরীকাহতে তা'লীম দিতেন। মুরীদদের তিনি উক্ত চার প্রকার তরীকাহতেই শিক্ষা দিতেন ।[১]

পীর সাহেব তাঁর মুরীদদেরকে সুদ-ঘুষ প্রভৃতি হারাম উপার্জন থেকে দূরে থাকার জন্য জোর তাকীদ দিতেন। তিনি বলতেন, ''দেহের প্রত্যেকটি মাংসের টুকরো আল্লাহ তায়ালার যিক্‌র করতে থাকে। পক্ষান্তরে হারাম খাদ্য উদরস্থ হলে এর দ্বারা যে রক্ত মাংস তৈরী হয়-সেই রক্ত মাংস দেহের যিকরকারী রক্ত মাংসের সঙ্গে মিশ্রিত হওয়া মাত্রই যিক্‌র বন্ধ হয়ে যায়''। তাঁর মুরীদরাও তার উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতেন। তাঁর খলীফাগণের অনেকেই কামেল বুযুর্গ ছিলেন। তাঁরা হালাল হারাম তমীয করে চলতেন। কখনও হারাম খোরদের যিয়াফত কবুল করতেন না ।[২]

আবূ বকর সিদ্দীকী (রঃ) ছিলেন একজন সমাজ সংস্কারক। তিনি মুসলিম সমাজ থেকে শিরক বিদ'আত ও অনৈসলামিক কর্মকান্ড দূর করতে সাধ্যমত চেষ্টা করেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি অবিভক্ত পূর্ব বাংলা-আসামের মুসলিম সমাজকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করার জন্য আঞ্জুমানে ওয়ায়েজীন নামক একটি সংগঠন (১৩১৭/১৯১১) প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলিম সমাজের সর্বস্তরে খাঁটি ইসলামের রীতি-নীতি ও শরী'আতের সুশিক্ষা প্রদানের জন্য তিনি বহু আলিমকে এ কাজে নিয়োজিত করেন। কিছু আলিমকে তিনি বেতন-ভোগী প্রচারকরূপে নিয়োগ করেন। তাঁদের বেতনের জন্য বহু টাকার প্রয়োজন হওয়ায় তিনি চাঁদা সংগ্রহের ব্যবস্থা করেন। বাংলার পল্লী গ্রামে গিয়ে এসব আলিম মুসলমানদের মধ্যে যে সব কুসংস্কার স্তুপীকৃত হয়েছিল তা দূর করার জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালান, খৃষ্টান মিশনারীদের কার্যকলাপের প্রতিবিধান করেন এবং অমুসলিমদের মধ্যে ইসলাম প্রচার করেন। ফলে বেশ কিছু অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করে। আমৃত্যু তিনি এই আঞ্জুমানের সভাপতি ছিলেন। এমনিভাবে ব্যাপক প্রচার ও সংস্কারের মাধ্যমে আলিমগণ অনৈসলামিক ও খৃষ্টান মিশনারীদের অপপ্রচার থেকে তখনকার মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে রক্ষা করতে অনেকটা সফলকাম হয় ।[৩] ফুরফুরার পীর সাহেব বাংলা আসামের প্রায় সর্বত্র সভা সমিতি করে পথহারা দিগভ্রান্ত মুসলমানদের সত্য-সঠিক পথের সন্ধান দেন। সভার সময় যে দিকে যার মুখের দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়ত তিনিই আবেগে আপ্লুত হয়ে কেঁদে উঠতেন এবং চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে দিতেন। সভা সমিতিতে যখন তিনি কালেমা পাঠ করতেন তখন সভাস্থ কোন মানুষই চোখের পানি চেপে রাখতে পারত না ।

পীর সাহেব অত্যন্ত মানবতাবাদী ছিলেন । একটি ছোট্ট ঘটনার উল্লেখ থেকে এর সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে। ঘটনাটি হলো এই- সাতক্ষীরার একটি মেথরের মেয়ে মুসলমান হয়ে পবিত্র কুর'আন-এর দশ পারা মুখস্ত করে। তসীরউদ্দীন নামে এক নামকরা সরদার এই হাফিজা মেথর মেয়েটিকে বিয়ে করেন। এর ফলে সাতক্ষীরার মুসলমান সমাজ সরদারকে এক ঘরে করে। তার সঙ্গে সামাজিক লেন-দেন ও ক্রিয়াকর্ম বন্ধ করে দেয়। তখন মাওলানা সানাউল্লাহ নামে এক ব্যক্তি সেখানে গিয়ে তথাকার সমাজপতিদের এ সম্পর্কে বুঝানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। এই সামাজিক বয়কটের ফলে তসীরউদ্দীন

১। গোলাম সাকলায়েন, বাংলাদেশের সূফী-সাধক পৃঃ ২১৮ ।
২। মোবারক করীম জওহর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১৮ ।
৩। মোবারক করীম জওহর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৩-২৪, ইসলাম দর্শন, ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা শ্রাবণ, ১৩২৭, মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র, পৃঃ ৩২৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

খুবই অভাবগ্রস্থ হয়ে পড়েন। অবশেষে নিরুপায় হয়ে তিনি তাঁর হাফিজা মেথর স্ত্রীকে নিয়ে ফুরফুরা শরীফ হাজির হন এবং পীর সাহেবের কাছে তার সমস্ত দুঃখের কথা নিবেদন করেন। পীর সাহেব এই নিদারুণ দুঃখের কাহিনী শুনে মর্মাহত হন। কিছুক্ষণ পর তিনি সরদার তসীরউদ্দীনের হাফিজা মেথর স্ত্রীকে অন্দর মহলে পাঠিয়ে দেন এবং নিজে অন্দর মহলে গিয়ে তাঁর বড় স্ত্রীকে দুটি থালায় ভাত তরকারী সাজিয়ে একটি মেথর মেয়েটিকে খেতে দিতে এবং অপরটি বাহির বাড়িতে তসীরউদ্দীন সরদারকে পাঠিয়ে দিতে নির্দেশ দেন। তারপর তাঁকে (স্ত্রীকে) লক্ষ্য করে বললেন, আপনি যদি আপনার হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর শাফা'আত চান তবে এই মেয়েটির ঝুটা ভাত-তরকারী খান। আল্লাহ যদি এই আবু বকরের কোন বন্দেগী কবুল না করেন, তবে আশা করি অন্ততঃ এ কাজের জন্য বেহেশতে প্রবেশ করতে পারব এবং রাসুল (সঃ) এর শাফা'আত লাভে সক্ষম হব। তাঁর হুকুম তাঁর বড় স্ত্রী সানন্দে পালন করলেন। সাতক্ষীরার লোকেরা এই ঘটনার কথা শুনে বিশেষভাবে লজ্জিত হলে এবং তসীর উদ্দীন সরদারকে বয়কট করা থেকে বিরত হল ।[১] এ ভাবে তিনি বহু পতিত মানুষকে সামাজিক মর্যাদা পেতে সাহায্য করেন ।

তিনি একজন নিষ্ঠাবান আদর্শ পরহেজগার পীর ছিলেন । তাঁর দরবার ছিল পাক-ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী গুণীদের দরবার। এই দরবার যাঁরা অলংকৃত করতেন তারা ছিলেন বিশেষ পান্ডিত্যের অধিকারী। তাঁর বিখ্যাত কয়েকজন মুরীদ শিষ্যদের মধ্যে শাহ্ সূফী সদরউদ্দীন, মাওলানা শাহ্ সূফী নেসার উদ্দীন, মাওলানা রুহুল আমীন, মাওলানা শাহ্ সূফী আবদুল খালেক এম, এ, রংপুরের মাওলানা শাহ্ সূফী নফিজুদ্দীন, কলিকাতার মাওলানা শাহ্ সূফী অলী হামিদ জালালী, নদীয়ার মাওলানা শাহ্ সূফী তাজাম্মুল হোসেন সিদ্দীকী, মাওলানা শাহ্ সূফী হাতেম আহমদ শ্রীহট্টী, মেদিনীপুরের মাওলানা শাহ্ সূফী আবদুল মাবুদ, মাওলানা শাহ্ সূফী শফি উদ্দীন প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য ।[২]

ফুরফুরার পীর সাহেবের জীবনে কোনরূপ আড়ম্বর ছিল না। খাওয়া-দাওয়া পোশাক-পরিচ্ছদে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাদা সিদে। তিনি সচরাচর পায়জামা, লুঙ্গি, লম্বা জামা, টুপি ও পাগড়ী ব্যবহার করতেন। মাওলানা রুহুল আমিন লিখেছেন, ''তিনি (পীর সাহেব) সূতি কিংবা পশমী লম্বা পিরহান ব্যবহার করতেন, আচকান ব্যবহার করতে তাঁকে দেখিনি । পিরহানে মুক্তি ব্যবহার করতেন। লম্বা পিরহানের নীচে নিম আস্তিন কোর্তা ব্যবহার করতেন । কখনও পায়জামা, কখনও তহবন্দ ব্যবহার করতেন। তাঁর প্রস্রাব পায়খানার তহবন্দ আর নামাযের তহবন্দ পৃথক ছিল । মাথায় আরবী টুপি, পায়ে সলিমশাহী জুতো ব্যবহার করতেন। একখানা রুমাল ব্যবহার করতেন। পাগড়ী ব্যবহার করতেন নামাজের সময়, অন্য সময় কদাচিৎ। অনেক সময় কেবল টুপি ব্যবহার করতেন । আবার চোগা কাপড় ব্যবহার করতেন না । পীর সাহেব বলতেন,বাবা! ও সব ব্যবহারে মনের গরিমা বৃদ্ধি পায় তাই ও সব ব্যবহার ত্যাগ করেছি।[৩] পীর সাহেবের আহার্য বস্তু সম্পর্কেও মাওলানা রুহুল আমীন লিখেছেন, ''পীর সাহেব অধিকাংশ সময় সরুচালের ভাত খেতেন। হালুয়া, গোশত, মাছ ও ঘি ব্যবহার করতেন। যখন যা সুযোগ হত তাই খেতেন। যদি কোন তরকারি ঝালের জন্য খাওয়ার অযোগ্য হত তবে তার দুর্নাম না করে খাওয়া ত্যাগ করতেন। খাদ্য সামগ্রীর অবশিষ্টাংশ মালিকের

১। মোবারক করীম জওহর, প্রাগুক্ত, পৃঃ১২৪-২৫ ।

২। মোবারক করীম জওহর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

অনুমতি নিয়ে সঙ্গীদের মধ্যে বিতরণ করতেন''। তিনি মিছরিসহ গরম দুধ পান করতেন। অধিকাংশ সময়ে মুরগী ও ছাগলের মাংস পছন্দ করতেন। শক্তি উৎপাদনকারী খাদ্য না খেলে সাধারণ মানুষের পক্ষে স্বাস্থ্য ঠিক রাখা সম্ভব নয়। তাই তিনি শক্তি উৎপাদনকারী খাদ্য গ্রহণের বিরোধী ছিলেন না। তিনি বলতেন, অত্যধিক সংসার বৈরাগ্য, সুস্বাদু ও উপাদেয় খাদ্য বর্জন অন্তর ও মস্তিষ্কে দুর্বলতার সৃষ্টি করে। তাই তিনি তার মুরীদানদের সর্বদা উপাদেয় খাদ্য গ্রহণে উৎসাহ দিতেন ।[১]

জমি বন্দকধারী লোকের দাওয়াত তিনি কবুল করতেন না । যৌতুকের বিয়েতে যোগদান করতেন না। যারা সেভিংস ব্যাংক বা সুদ প্রাপ্তির নিয়্যতে কোন অফিসে টাকা জমা রাখত তিনি তাদের দাওয়াতও কবুল করতেন না ।

ভন্ড, বেনামাযির দাওয়াত গ্রহণ করতেন না । চাঁদার মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থে কেনা কিছুই খেতেন না, হাদিয়া কিংবা তুহফারূপেও গ্রহণ করতেন না । কেহ হাদিয়া তুহফা নিয়ে আসলে তা খতিয়ে দেখতেন। সন্দেহ হলে তা গ্রহণ করতেন না, ফেরত দিয়ে দিতেন। আবূ বকর সিদ্দীকী (রঃ) উচ্চ মার্গের সূফী এবং কাশ্ফ শক্তির অধিকারী একজন বড় কামিল ওলী ছিলেন । তাঁর বহু কারামতের উল্লেখ বিভিন্ন পুস্তকাদিতে পাওয়া যায় ।

ফুরফুরার পীর সাহেব তাঁর যুগের মুজাদ্দিদ ছিলেন। ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহও পীর সাহেবের মুজাদ্দিদ হওয়া সম্পর্কে নিঃসন্দেহ ছিলেন। তিনি অতি উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন । অত্যন্ত মিষ্টি ভাষী ও মিতভাষী ছিলেন। জীবনে কাউকে কখনও কটু কথা বলেননি। এত সুন্দর ও মিষ্টি ভাষায় ওয়াজ-নসীহত করতেন যে, তা শ্রোতাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়ে যেত। কেহ কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি নরম মেজাজে, মিষ্টি ভাষায়, যুক্তি দিয়ে তাকে বুঝিয়ে দিতেন । পীর সাহেব কারও উপর কোন দিন রাগান্বিত হলে তার কাছে এমনভাবে রাগ প্রকাশ করতেন যে সে লজ্জিত হয়ে পড়ত এবং নিজেকে সংশোধন করে নিত ।[২]

তিনি অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন। কখনও গর্বভরে কোন কথা বলতেন না । মাওলানা রুহুল আমীন লিখেছেন, ''কখনও গরিমামুলক কোন কথা তাঁর মুখে শ্রবণ করিনি । কখনও তিনি কোন মজলিসে ব্যক্তি বিশেষের নিন্দাবাদ করতেন না । জৌনপুরের মাওলানা খান্দানের কোন আলিমের উপর দোষারোপ করেননি । তিনি নিজেকে একজন সাধারণ লোকের তুল্য বলে মনে করতেন । নিজের নামের আগে লিখতেন, বান্দাগনের মধ্যে নিকৃষ্টতম। যদি তাঁর কোন মুরীদ তাঁর উচ্চ দরজা সম্পর্কে কাশ্ফ বা স্বপ্নযোগে জানতে পেরে তাঁর কাছে প্রকাশ করত তবে তিনি বলতেন, "এটা তোমাদের ভাল ধারনা। নইলে আমি যা তা আমি জানি''।
কোন সায়্যিদজাদা কিংবা বুযুর্গযাদা তাঁর নিকট শিক্ষা করতে এলে তিনি সম্মানের সংগে তাঁকে তরীকতে দাখিল করে অতি সত্বর খাস তাওয়াজ্জুহ প্রদান করে শেষ দরজা পর্যন্ত পৌঁছেদিতেন। তাঁদের পূর্ব পুরুষদের সম্মানের জন্য তাঁদের দ্বারা খিদমত নিতে কুণ্ঠাবোধ করতেন ।[৩]

১। মোবারক করীম জওহর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৩-৪৪ ।
২। মোবারক করীম জওহর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪০ ।
৩। মোবারক করীম জওহর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪০-৪১ ।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি আলিমদের সম্মান করতেন। ফুরফুরা শরীফে আলিমদের জন্য পৃথক সামিয়ানা স্থাপন করতেন। কোন আলিম তাঁর দরবারে উপস্থিত হলে তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন এবং তিনি বলতেন, ইলম-এর সম্মান করা দরকার। তিনি কখনও উচ্চ-নীচ, ইতর-ভদ্র, ছোট-বড় তারতম্য করতেন না। কোন শ্রেণীর লোকের হৃদয়ে আঘাত লাগে এমন কোন উপাধি ব্যবহার করতেন না। পীর সাহেবের অসীম সহ্য ও ধৈর্য্যগুণ ছিল। ছোট-বড় যে কেউ ধর্ম ও শরী'আতের নিয়ম-কানুন সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি নিঃসংকোচে তার জবাব ও ব্যাখ্যা প্রদান করতেন। সহজে যদি কেউ কোন কিছু বুঝতে না পারত তবে তিনি দীর্ঘ সময় নিয়ে বার বার তাকে বুঝাতেন। তাতে সামান্যতমও বিরক্ত বোধ করতেন না। একই বিষয় নিয়ে যদি কেউ তাকে একাধিকবার প্রশ্ন করত, তবু তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে তার প্রশ্নের উত্তর দিতেন। অপর কোন লোক যদি এ ব্যাপারে বিরক্ত হয়ে প্রশ্নকারীকে তিরস্কার করত তবে তিনি কিছুটা অসন্তুষ্টির ভাব দেখিয়ে সে ব্যক্তিকে বলতেন, ঐ লোক তো আপনার কাছে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করছে না, তবে আপনি কেন তাকে তিরস্কার করছেন। তার তৃপ্তি না হওয়া পর্যন্ত আমি তাকে বুঝাবার চেষ্টা করব।[১]

তিনি ছিলেন ক্ষমার আঁধার। তাঁর আত্মীয়-স্বজন কিংবা প্রতিবেশীদের কেউ তাঁর ক্ষতি করলে তিনি কখনও প্রতিশোধ নিতেন না। তাদের তিনি ক্ষমা করে দিতেন। তাঁর কোন মুরীদ কোন বড় অপরাধ করলেও তিনি ক্ষমা করে দিতেন।

পীর সাহেব একজন বড় দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। কত লোককে কতভাবে যে তিনি দান-খয়রাত করেছেন তার কোন হিসাব-নিকাশ নেই। তিনি অতি সঙ্গোপনে দান করতেন। বহু দরিদ্র প্রতিবেশী, বিধবা, এতিম তাঁর কাছ থেকে দান-খয়রাত নিয়ে ধন্য হয়েছে। তিনি অনেক দরিদ্র বিধবাদের তত্ত্বাবধান করেছেন, এতিম বালক-বালিকাদের প্রতিপালন করেছেন, ঈসালে সাওয়াবের মাহফিলের সময় বহু দরিদ্র মানুষকে সাহায্য করেছেন। তাঁর নিজের বাড়িতেই তিনি সতের আঠার জন ছাত্রকে রীতিমত জায়গীর রাখতেন। মাদ্রাসার ঘাটতি নিজ তহবিল থেকে পূর্ণ করে দিতেন। বহু কপর্দকহীন ব্যক্তিকে তিনি নিজের পকেট থেকে পাথেয় দিয়েছেন।

তাঁর জমিদারীতে যাতে প্রজাদের উপর কোন রকম অত্যাচার না হয় সেদিকে তিনি তীক্ষ্ণ নজর রাখতেন। সকল প্রজাকেই তিনি সন্তানতুল্য মনে করতেন। কোন প্রজার পাঁচ বছরের খাজনা বাকী পড়লে তিনি দু-এক বছরের খাজনা নিয়ে বাকী খাজনা মাফ করে দিতেন। কোন লোক বিপদে পড়ে পীর সাহেবের দ্বারস্থ হলে তিনি তাকে বিপদ থেকে মুক্ত করার জন্য চেষ্টা করতেন। নানাভাবে তাকে সাহায্য করতেন। কেউ কোন চাকরি, জায়গীর, মসজিদ ও মাদ্রাসার সাহায্যের জন্য তাঁর সুপারিশপত্র নিতে এলে তিনি কোনরূপ ওজর আপত্তি না করে তাতে দস্তখত দিয়ে দিতেন। অন্যায়ভাবে কোন লোক আদালতে অভিযুক্ত হলে তিনি তারপক্ষে তদ্বির ও দোয়া করে তাকে পরিতৃপ্ত করতেন।

তিনি কোথাও গেলে সেখানে বুযুর্গ বা পীর-আওলিয়ার মাযারের কথা জানতে বা শুনতে পেলে সেই মাযার যিয়ারত না করে ফিরতেন না। কোন গোরস্থানের পাশ দিয়ে গেলে সমস্ত গোরবাসীদের জন্য

১। মোবারক করীম জওহর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪১।

Dhaka University Institutional Repository

দোয়া করতেন। মাযার বা গোরস্থানের খাদিমরা কোন শরী'আত বিরোধী কাজ করলে তাদেরকে তা থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করতেন।

ফুরফুরা শরীফের পীর সাহেবের দরবারে কোন দারোয়ান ছিল না। যে কোন লোক অবাধে দরবারে প্রবেশ করতে এবং তাঁর (পীর সাহেব) সঙ্গে সাক্ষাত করতে পারতেন। ছোট বড় সকলেই অকপটে তাঁর কাছে মনের কথা প্রকাশ করতে পারত। কোন বিধি-নিষেধ ছিল না। পীর সাহেবের সঙ্গে কেউ মুসাফাহ্ করতে চাইলে তিনি আনন্দ সহকারে তাঁর সঙ্গে মোসাফাহ্ করতেন। সমাগত আলিমদের মান-সম্ভ্রমের প্রতি তাঁর যেরূপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল, সাধারণ মানুষের প্রতিও ছিল তদ্রূপ। আমীর, মহাজন, জমিদার, তালুকদার শ্রেণীর লোকদের মর্যাদা ও সম্মানের প্রতি যেমন নজর রাখতেন, গরীব মিসকিনদের প্রতিও তাঁর সেরূপ নজর ও অনুগ্রহ বজায় থাকত।[১]

শাহ্ সূফী আবু বকর সিদ্দীকী (রঃ)-এর পাঁচ সন্তান ছাড়া অন্যান্য খলীফাদের সংখ্যা অনেক। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ঃ-

১। জনাব শাহ্ সুফী তাজাম্মুল হুসাইন সিদ্দীকী (রঃ), নদীয়া, (পশ্চিম বঙ্গ)।
২। জনাব শাহ্ সূফী সদরুদ্দীন, গঙ্গারামপুর, যশোর (বাংলাদেশ)।
৩। জনাব মাওলানা শাহ্ সূফী নিসারুদ্দীন, সারসীনা, বরিশাল (বাংলাদেশ)।
৪। জনাব মাওলানা শাহ্ সূফী রুহুল আমীন, বশীরহাট, চব্বিশ পরগণা (পশ্চিম বঙ্গ)।
৫। জনাব খান বাহাদুর আলহাজ্জ মাওলানা আহমদ আলী, এনায়েতপুর, যশোর, (বাংলাদেশ)।
৬। জনাব প্রফেসর মাওলানা আবদুল খালেক- সতুরা, কুমিল্লা, (বাংলাদেশ)।
৭। জনাব মাওলানা আহমদ আলী জালালী, মাটিয়াবুরুজ, কলিকাতা (পশ্চিমবঙ্গ)।
৮। জনাব মৌলবী তমীজ উদ্দীন খান, খানানপুর, ফরিদপুর, (বাংলাদেশ)।
৯। জনাব মাওলানা সায়্যিদ হাতিম আলী হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর (বাংলাদেশ)।
১০। জনাব মাওলানা তোফায়েল আহমদ, ঢাকা (বাংলাদেশ)।
১১। জনাব আলহাজ্জ মাওলানা হাফিজ সায়্যিদ আবুল বাশার মুহাম্মদ বশীরুদ্দীন, ঢাকা, (বাংলাদেশ)।
১২। সূফী মুহাম্মদ শফী, কলিকাতা (পশ্চিম বঙ্গ)।
১৩। জনাব সূফী আবদুস সাত্তার, ঢাকা (বাংলাদেশ)।
১৪। জনাব মাওলানা আদুল গনী, মালীআইশ, মীরসরাই, চট্টগ্রাম (বাংলাদেশ)।
১৫। ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, ঢাকা (বাংলাদেশ)।

তাঁর মুরীদানের সংখ্যা অসংখ্য। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করা হলঃ-

১। জনাব খান বাহাদুর আবদুল হাকীম চৌধুরী, অবসরপ্রাপ্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, নোয়াখালী (বাংলাদেশ)।
২। জনাব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, অবসরপ্রাপ্ত সুপারিনটেনডেন্ট, বাংলাদেশ।
৩। জনাব মাওলানা আবদুল আযীয, অবসরপ্রাপ্ত আয়কর কমিশনার।

১। মোবারক করীম জওহর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪২-৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

৪। জনাব মাওলানা আবূ ঈসা মুহাম্মদ মসীহ; অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ডাইরেক্টর, শিল্প (পূর্ব পাকিস্তান)।

৫। জনাব আলহাজ্জ্ব মাওলানা ফজলুল করীম অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত জেলা জজ।

৬। জনাব আলহাজ্জ্ব সায়্যিদ আবু নসর মুহাম্মদ নাছির উদ্দীন, এডভোকেট, সুপ্রিম কোর্ট, ঢাকা

৭। সায়্যিদ আবু জাফর মুহাম্মদ জহিরুদ্দীন, অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ সুপাঃ, ঢাকা।

৮। জনাব মাওলানা আবদুস সাত্তার, অবসরপ্রাপ্ত ইনকাম ট্যাক্স কমিশনার।

৯। জনাব প্রফেসর এ, কে, এম, জালালুদ্দীন, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ।

১০। জনাব মাওলানা আবূ মুজতবা মুহাম্মদ মুসা, এডভোকেট, সরকারী উকিল, কুমিল্লা।

১১। জনাব খান বাহাদুর আবদুর রহমান, বশীরহাট, প্রাক্তন মন্ত্রী, অবিভক্ত বাংলা।

১৩। জনাব খান সাহেব আবদুল কাদির, ডেপুটি সুপাঃ জেলা, ভাগলপুর।[১]

হযরত পীর সাহেব মৃত্যুর পূর্বে তাঁর মুরীদান ও মুসলমানদের উদ্দেশ্যে এক অমূল্য ওসিয়তনামা রেখে গেছেন যা সকল মানুষের জন্য পথ নির্দেশনা হিসেবে কাজ করবে। তাঁর ওসিয়তনামাটি এখানে হুবহু বর্ণনা করা হলঃ-

আসসালামু আলাইকুম-
বাদ আমার অনুরোধ ও উপদেশ এই যে আমার খলিফা মুরীদান ও কুলঈমানদার মুসলমান ভাইদিগের নিকট নিম্নলিখিত মনোভাব প্রকাশ করিলাম। সকলে যথাশক্তি আমল করিবেন। হায়াত কাহারও কায়েম নহে। কুল্লু নাফছিন যা ইক্বাতুল মাউত।

আমি বৃদ্ধ অবস্থায় পরিণত হইয়াছি, কোন সময় ইহ জগত ছাড়িয়া যাইতে হয় তাহার নিশ্চয়তা নাই। আমার ভয় হয় আমার খলিফা, মুরীদগণ ও মোতাকেদগণ শরী'আত অনুযায়ী আমার মতের কোন বিরুদ্ধমত আমল করিয়া গোমরাহ হইয়া যায়। স্থানে স্থানে দেখা যায় শরীআত অনুযায়ী আমলকারী পীরের খলিফা ও মুরীদ পীরের মতের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া এক একজন এক একদল তৈয়ার করিয়া সাধারণ মুসলমান ভাইদিগকে গোমরাহ করিতেছে। যাহা হউক আমার ওসিয়তনামাখানি আমল করিলে আমি বিশেষ খুশী হইব। যেহেতু হাদীস শরীফে আছে 'আদ্দায়াল্লু আলাল খায়রি কাফায়িলিহি' যিনি নেক কাজের পথ দেখাইয়া দেন, তিনি ঐ নেককারের সমান সওয়াব লাভ করিবেন। তাই অনুরোধ, আমি যেনো মৃত্যুর পরও কিছু নেকি পাইতে পারি।

ওসিয়ত

১) বর্তমান সময়ে ঈমান বাঁচাইয়া রাখা খুব সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিতেছে। আশরাফুল মাখলুকাত খাতিমুন নাবিয়ীন হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম শেষ নবী, তাঁহার পর আর নবী হইবে না। ইহার উপর ঈমান কায়েম রাখিবেন। কালেমা তাইয়্যেবা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ' আল্লাহ ব্যতীত কেহই মাবুদ নাই, হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) আল্লাহর বান্দা ও রাসুল। ইহার বিপরীতে কোন কিছুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিবেন না। যদি কেহ উক্ত কালেমাসমূহ পরিবর্তন করে, সে বেঈমান ও কাফের হইয়া যাইবে।

১। মতীউর রহমান, আইনা-ই-উয়াইসী, পৃঃ ২৪৭-২৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

২) জীবিত কি মৃত পীরের সুরাত হাজের নাজের জানিয়া ধ্যান করা হারাম, যাহারা করে তাহারা বেঈমান ।

৩) পুত্রকন্যাদিগকে দ্বীনি ইলম শিক্ষা দিবেন তৎসঙ্গে দুনিয়ার যাবতীয় বৈধ হুনর (কৌশল, গুণ) হিকমত (শিল্প) ও ভাষা-ইংরেজী বাংলা ইত্যাদি শিক্ষা দিবেন ও যাহাতে সর্বসাধারণে শিক্ষিত হইতে পারে তজ্জন্য ইসলামিক কলেজ, ইসলামিয়া মাদ্রাসা, জুনিয়ার সিনিয়ার মাদ্রাসা, মক্তব ইত্যাদি ও মধ্যে মধ্যে দুই একটি হাদীস তফসীরের দাওরা খুলিয়া হাদীস তফসীর পড়ার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিবেন এবং পাক কুরআন শরীফ তাজবিদ অনুযায়ী যাহাতে পড়িতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন ।

৪) স্ত্রী, কন্যা, মা ভগ্নীদিগকে পর্দায় রাখিবেন । কন্যাদিগকে শিক্ষা দানকালেও পর্দায় রাখিয়া স্ত্রী শিক্ষয়িত্রী বা মুহরিম ব্যক্তি দ্বারা শিক্ষা দিবেন । যাহারা স্ত্রী, কণ্যা, মা ও ভগ্নীকে বেপর্দায় রাখিবে, তাহারা দাইয়ুছ হইয়া জাহান্নামে যাইবে । পর্দা করা ফরজে আদন । ইহার প্রতি যাহারা ঘৃণা করিবে, তাহারা বে-ঈমান। উহাদের মতের উপর ধিক্কার দিবেন ।

৫) আমার মতে যাবতীয় চাকুরীর উপযুক্ত বিদ্যাশিক্ষা করায় বাধা নাই। যে চাকুরী শরী'আত অনুযায়ী জায়েয, তাহা করিবেন । কিন্তু হালাল উপার্জন ও সুন্নত মুতাবেক পোশাক ইত্যাদি ও রোযা নামায ঈমান ঠিক রাখিয়া করিবেন ।

৬) সুদ খাওয়া হারাম, কম হউক কি বেশী হউক, বিশেষ ওজর ব্যতীত সুদ দেওয়াও হারাম। সুদ দেওয়া ও সুদ খাওয়া একই প্রকার গোনাহ । সুদের টাকা আনিয়া কারবারও করিতে নাই। সুদখোরের দাওয়াত খাওয়া, তাহার দান খয়রাত গ্রহণ করা হারাম । যে সুদের মাল খাইবে, তাহার কলব অন্ধকার হইয়া যাইবে। সে যিকিরের স্বাদ পাইবে না । সুদখোর তওবা করিলেও তাহার বাড়ীতে বৎসরকাল মধ্যে খাইতে নাই। যদি কোন সুদখোর তওবা করিয়া সুদের সমস্ত মাল ফেরত দেয়, তবে তাহার বাড়ীতে তৎক্ষণাত খাইতে পারো। আর তওবা করিয়া সুদ ফেরত না দিলে, তাহাকে বৎসরকাল পর্যন্ত দেখিতে হইবে, সে সুদ হইতে পরহেয করে কি না। যদি সুদ আর না খায় ও তাহার মাল অর্ধেকের বেশী হালাল থাকে, এক্ষেত্রে যদি দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, হালাল মাল- দ্বারা খাওয়াইবে, তবে তাহার দাওয়াত খাওয়া জায়েয হইবে । সুদখোরের পৌণে ষোল আনা হালাল মাল থাকিলেও তওবা করিয়া ইস্তেকামাত (সোজা দাড়ান) না করা পর্যন্ত তাহার বাড়ীতে দাওয়াত খাওয়া জায়েজ নহে, যেহেতু সেও ফাঁসেকে মোলেন (প্রকাশ্য ফাসি) । সুদখোরকে তওবা করান মাত্রই তাহার বাড়ীতে খাইলে ও খয়রাত লইলে, হিদায়েত হওয়া সুয়ের কথা বরং যে সুদখোরের দাওয়াত খায় ও খয়রাত লয়, সে যেন আমার মুরিদ বা খলিফা বলিয়া পরিচয় না দেয়। তাহার নিকট কেহ মুরীদ হইবেন না ।

৭) মেয়ের সাচকের (পনের) টাকা খাইবেন না । যে ব্যক্তি খাইবে ও তদ্বারা জেয়াফত করিবে তাহা হারাম । এই জেয়াফত যাহারা খাইবে, তাহাদের হারাম খাওয়ার গোনাহ হইবে। আমার খলিফাদের মধ্যে যদি কেহ সুদখোরের বাড়ী কিংবা মেয়ের পণের টাকা দ্বারা জেয়াফতকারী ও গ্রহণকারীর বাড়ীতে খায়, তাহার নিকট কেহ মুরিদ হইবেন না । এইরূপ ব্যক্তি আমার খলিফা হউক অথবা অন্য পীরের খলিফা হউক, তাহাদের নিকট মুরীদ হইবেন না ।

৮) ভাই ভগ্নী ও অংশীদারগণের অংশ ফারায়েয অনুযায়ী ভাগ করিয়া দিবেন। যদি তাহাদিগকে দেওয়া অসম্ভব হয়, তবে উহার মূল্য দিয়া হউক, বা যে কোন প্রকারে হউক সন্তুষ্ট করিয়া দাবী ছাড়াইয়া লইবেন নচেৎ খোদার নিকট দায়ী থাকিবেন। টাকার হউক, কথার হউক, দাবীদারের নিকট মাফ লইবে। যদি দাবীদার মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, তবে টাকা পয়সা তাহার ওয়ারিশগণকে দিবে ।

Dhaka University Institutional Repository

কথা ইত্যাদি মাফের জন্য নামায পড়িয়া সেই মৃতের রূহের উপর ছওয়াব রেছানি করিবে। আর খোদার নিকট ক্ষমা চাহিবে। প্রথম বিবাহ ও দ্বিতীয় বিবাহের পুত্র-কন্যাদের অংশের মধ্যে ফারায়েয অপেক্ষা কম বেশী করিয়া দিলে, খোদার নিকট দায়ী থাকিবে ।

৯) আমি যে কাদরীয়া, চিশতীয়া, নকশবন্দীয়া ও মুজাদ্দিদিয়া তরিকাহ্ সম্মন্ধে সবক ও তা'লিম দিয়া থাকি ও দিয়াছি, সেই মোতাবেক সকলে কায়েম থাকিবেন। উহা হযরত পীরানে পীর শাহ আবদুল কাদির জিলানী (রঃ) সাহেবের ও মাওলানা শাহ্ অলিউল্লাহ মুহাদ্দেছে দেহলবী (রঃ) এর কিতাব অনুযায়ী করিয়াছি । এতদ্ব্যতীত মাওলানা শাহ্ কারামত আলী মরহুম মগফুর সাহেবের মা'রিফাতের কিতাবগুলি সকলে সর্বদা দেখিতে থাকিবেন। তিনি আমার দাদা পীর হযরত মাওলানা শাহ্ নুর মুহাম্মদ মরহুম মগফুর সাহেবের পীর ভাই ছিলেন। অতএব আমরা এক তরিকাহ্ভুক্ত ।

১০) আমার খলীফা ও মুরীদদের মধ্যে যদি কেহ কুরআন হাদীস ও ফিকাহসমূহের বিপরীত অর্থাৎ শরী'আতের বিপরীত কোন মত প্রকাশ করে, তবে তাহা কেহ মানিবেন না । যদি কেহ আমার খলিফা ও মুরিদ দাবী করিয়া আমার ওছিয়তের বিপরীতে চলে, তবে কেহ তাহাকে আমার মুরীদ বা খলিফা মনে করিবেন না ও তাহার নিকট মুরীদ হইবেন না ।

১১) হিন্দুর পূজা পার্বণে, মেলা, বিহারে ও গান বাজনার স্থানে সাহায্য করিবেন না ও উহাতে যাইবেন না । পূজায় পাঁঠা, কলা, ইক্ষু, দুধ ইত্যাদি বিক্রয় করিবেন না । ভেট দিবেন না। দিলে গোনাহ কবীরা হইবে ।

১২) কেহ প্রকাশ্যে ফাসেকের দাওয়াত কবুল করিবেন না এবং তাহাকে দাওয়াত করিয়া খাওয়াইবেন না; যথা- বেনামাযী, কেননা প্রত্যহ বেতেরের নামাযে পড়া হয় 'ওয়ানাত রুকু মাই ইয়াফ জুরুকা' আমরা ফাছেক ফাজেরের সহিত চলিব না ।

১৩) কেহ দাড়িমুন্ডন করিবেন না, এক মুষ্টির কম হয় এমন খাট করিবেন না, লম্বা মোচ রাখিবেন না। ফ্রান্সকাট, টেরি বা ঢাকাইয়া ছাঁট ছাটিবেন না। কাছা দিয়া কাপড় পরিবেন না। কোট পেন্ট নেকটাই ইত্যাদি বিজাতীয় পোষাক ব্যবহার করিবেন না। সুন্নত মোতাবেক পোশাক লইবেন ও খালি মাথায় চলিবেন না । টুপি, পাগড়ী লুঙ্গী পায়জামা ও লম্বা কোরতা ব্যবহার করিবেন । আচকান, চোগা ইত্যাদি মোবাহ পোশাক ব্যবহার করাও জায়েয । বড়ই পরিতাপের বিষয়; নাছারা, হিন্দু ও অন্যান্য গায়ের কওম তাহাদের জাতীয় পোশাক পরিচ্ছদ ত্যাগ করে না। আর আমাদের কওমের কতক লোক বর্তমানে যাত্রার সঙ সাজিতে লজ্জা বোধ করে না । কখনও দাঁড়ি মুন্ডন করিয়া, হ্যাট পরিয়া, খালি মাথায় কাছা দিয়া রাস্তায় বেড়ায়, কখন টুপী মাথায় দিয়া লুঙ্গী পরিয়া থাকে । আমি দোওয়া করি, আল্লাহ, আমার মুসলমান ভাইদের ঈমান কায়েম ও শরী'আতের খেলাফ পোশাক হইতে রক্ষা করেন ।

১৪) তাস, পাশা খেলবেন না । ঘোড়-দৌড়, মহিষ ও গরুর লড়াই বা কোন প্রাণীর লড়াই খেলার নিয়তে দিবেন না ও করিবেন না যদি কোথাও ঐরূপ লড়াই হয়, তথায় যাইবেন না, উহা হারাম। আত্মরক্ষার জন্য ঘোড়-দৌড়, লাঠি-খেলা শিক্ষা, তলোয়ারবাজী, তীরন্দাজ শিক্ষা মাসের মধ্যে দুই তিন দিন তা'লিমের জন্য করা জায়েয হইবে, কিন্তু হাঁটুর নীচে পর্যন্ত পায়জামা পরিবে, নামাযের ওয়াক্তে নামায পড়িবে, ঐ শিক্ষাকালে বাজী ও বাজনা না রাখিয়া শিক্ষা করা জায়েয আছে । কিন্তু ঈদ, বকরাঈদ, শবে বরাত, মহরম ইত্যাদিতে যেন না করে, করিলে ইবাদতের ক্ষতি হইবে ।

১৫) বিবাহে বারুদ পোড়ান, লাঠি খেলা, কলের গান, সুর দিয়া পুঁথি পড়া ইত্যাদি কার্য করিবেন না। ফজুলভাবে অর্থ ব্যয় করিবেন না, উহা হারাম ।

Dhaka University Institutional Repository

১৬) যথা শক্তি ব্যবসায় বাণিজ্য, কৃষি শিল্প কার্য ইত্যাদি অবলম্বন করিয়া হালাল উপার্জন করিবে, খয়রাত গ্রহণ করার উপর নির্ভর করিবে না । শক্তি থাকা সত্ত্বেও অন্যের নিকট খয়রাত চাহিয়া লওয়া হারাম। আলিমের ইলম, পীরের পীরত্ব যেন খয়রাত পাওয়ার উদ্দেশ্যে না হয়। আলেম ও পীরগণ আল্লাহর ওয়াস্তে ওয়াজ নাছিহত করিবেন । কাহার নিকট ইশারা বা ইঙ্গিত দ্বারা অথবা অন্যের সাহায্যে খয়রাত আদায় করিবেন না, উহাও হারাম । যদি কেহ ইচ্ছা করিয়া দেন, তবে লওয়া জায়েয আছে ।

১৭) আলিম সাহেবদের নিকট আমার বিনীত আরজ এই যে, আপনাদের মধ্যে যদি কোন মছলা লইয়া ইখতিলাফ বা মতভেদ হয়, তবে একত্রে বসিয়া কিতাবসমূহ লইয়া মতভেদ মীমাংসা করিয়া সর্বসাধারণের নিকট ছহি মত প্রকাশ করিবেন । যাবৎ এই 'আলিম সাহেবদের একতা না হইবে, তাবৎ আলিম সমাজে দলাদলি থাকিলে অচিরে সমাজ বিনষ্ট হইবার আশংকা আছে ।

১৮) যদি কোন আলিমের মত কোনরুপ কিতাবের খেলাফ বিজ্ঞাপন বা বাজে লোকের মুখে দেখিতে ও শুনিতে পান তবে যতক্ষণ নিজে তাহায় মত বলিয়া কিংবা তাহার মৌখিক কথা বলিয়া নিশ্চিতরুপে জানিতে না পারেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার উপর কোন প্রকার ইশতেহার ও ফতওয়া প্রকাশ করিবেন না । অনেক স্থানে অনেক বাজে লোকের কথা বিশ্বাস করিয়া ভাল লোকের উপর ফতওয়া ও ইশতেহার প্রকাশ করিয়া বহু সংখ্যক ঈমানদার মুসলমানের ঈমান বিনষ্ট করিয়া মহা গোনাহগার হইয়াছে ও হইতেছে । আলিম ও পীর সাহেবগণ সাবধান থাকিবেন। শয়তান জীবিত আছে। সে পীরে পীরে ও আলেমে আলেমে বিবাদ ও দলাদলি লাগাইয়া ইসলামকে বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করে। আল্লাহ পানা দিন ।

১৯) কেহ গান বাজনা করিবেন না ও শুনিবেন না । আল্লাহ ও রসুলের তা'রিফ কবিতা গজল পড়িতে পারে, কিন্তু ইলমে আরুজির ওজনে পড়িবে, ইলমে মুছিকির ওজনে অর্থাৎ রাগ-রাগিনী সহকারে পড়া হারাম। ইলমে আরুজির সহিত পড়িতে হইলে পাঁচটি শর্ত পালন করিতে হইবে যথা - মেয়ে লোক মজলিসে যেন না থাকে ।

২০) বর্তমানে যে বাজে লোক মসনবী শরীফ ইলমে মুছিকির ওজনে অর্থাৎ রাগ-রাগিনী সহকারে পড়িয়া থাকেন, ইহা জায়েয নাই[১] তথায় যাইবেন না । যদি কেহ তথায় যাইয়া থাকেন, তবে তথা হইতে উঠিয়া যাইবেন। মসনবী শরীফ ইলমে আরুজির সহিত অর্থাৎ বিনা রাগরাগিনীতে মিষ্টস্বরে পড়িতে বাধা নাই ।

২১) মাথায় এইরুপ লম্বা চুল রাখিবেন না যে তাহা মেয়ে লোকের ন্যায় হয় । বাবরী, সুন্নত মোতাবেক রাখিতে পারেন । বাজে নাদান ফকিরেরা লম্বা চুল রাখে- উহা হারাম। বাবরী রাখিতে হইলে স্কন্ধ পর্যন্ত চুল কাটিয়া খাট রাখিবেন, মহাড়ার নীচে যেন না পড়ে। মহড়ার নীচে চুল লম্বা হইলে স্ত্রীলোকের ন্যায় হয়। উহা হারাম। উহার প্রতি খোদা তাআলার লানত পতিত হইবে ।

২২) ছওয়াব রেছানি করিয়া, কেহ সওয়াল করিয়া কিছু লইবেন না, উহা হারাম। যদি কেহ আল্লাহর ওয়াস্তে মৃতের খতম পড়ে, আর পড়ানেওয়ালা লিল্লাহ কিছু দেয়, এ ক্ষেত্রে লওয়া-দেওয়া জায়েয আছে। বর্তমান জামানায় কুর'আন শরীফ ও হাদীস শরীফ শিক্ষা দিয়া, আজান দিয়া, ইমামতি করিয়া, খতমে তারাবী পড়িয়া ও ঝাড়ফুঁক দিয়া মজুরী লওয়া জায়েয আছে ।

২৩) ওয়াজ নসিহত আল্লাহর ওয়াস্তে করিবেন। কিছু লিল্লাহ দিলে লওয়া জায়েয আছে । বাজে স্থানের লোকেরা ভালমন্দ, সুদখোর, ঘুষখোর ইত্যাদির চাঁদা জমা করিয়া ওয়াজকারীদিগকে দেয় উহা না জায়েয। হালাল মাল দিয়া দিলে লইতে দোষ নাই ।

১। মাওলানা এম, ওবাইদুল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

২৪) যে যে স্থানে থাকেন, জময়াতে নামায পড়িবেন । জুমা ও ঈদের নামায পড়িবেন। মক্কাশরীফ ও মদীনা শরীফ ব্যতীত সকল স্থানে আখেরী যোহরের নামায পড়িবেন। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় তিন জুমা তরক করিবে, সে ব্যক্তি মালাউন ।

২৫) অনেক স্থানে দেখা যায়, পীরের ছেলে কিছু জানুক বা না জানুক পীর সাজিয়া বসে ও মুরীদ করিতে থাকে। অন্য কোন ভাল পীরের নিকট সাধারণকে যাইতে নিষেধ করে । আমার ভয় হয়, আমার মৃত্যুর পর আমার পুত্রদের মধ্যে ঐরূপ হইয়া পড়ে নাকি। অতএব, আমার পুত্রদের মধ্যে যাহারা শরী'আত মোতাবেক আমল করিবে ও চলিবে এবং তা'লিম ও শিক্ষা দিবে, তাহাদের অনুসরণ করিবেন।

২৬) আমার বাড়ীতে বৎসরের ২১/২২/২৩ শে ফাল্গুন তারিখ নির্ধারণ করিয়া একটি ওয়াজের মজলিস করি । ঐ তারিখে আমার পীর কিংবা দাদা পীরের মৃত্যু হয় নাই। আমি জানি আল্লাহ বলিয়াছেন ঃ . يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم و اهليكم نارا

''হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজদিগকে ও নিজেদের পরিজনকে অগ্নি হইতে রক্ষা কর''। এই আয়াতের মর্ম অবলম্বনে আমার বাড়ীতে দেশী বিদেশী সকলকে আম দাওয়াত দিয়ে বহু 'আলিম, ওলামা, হাফেজ, ক্বারী কর্তৃক ওয়াজ নছিহত করাইয়া ও নিজে করিয়া শরী'আতের হুকুম আহকাম জানাইয়া দেই। যদি কোন দেশে কোন মছলা লইয়া মতভেদ থাকে, তবে এই মাহফিলে থাকিয়া ইহার মীমাংসা করিয়া লন।

এই মাহফিলে প্রায় প্রত্যহ ২৪/৩০ হাজার লোক হাজির থাকে। ঐ তিন দিনের একদিন ৬০/৭০ খতম কুরআন শরীফ, সূরা ইখলাছ ও সূরা ফাতেহা, কালেমা ইত্যাদি পড়ান হয় । এই সমস্তের সওয়াব হযরত নবী করীম (সঃ) এর ও যাবতীয় অলি-আওলিয়া, গাওছ-কুতুব ও যাবতীয় মুসলমানের রূহের উপর (সওয়াব) রেছানি করা হয়। এই জন্য এই মাহফিলের এক নাম ইসালে সওয়াব। যদি কেহ এই মাহফিলকে প্রচলিত ওরোছ বা অন্য কিছু বলে, তবে তাহা কেহ শুনিবেন না। এই মাহফিল যাহাতে আল্লাহ কায়েম রাখেন তাহার চেষ্টা আমার পুত্রগণ ও মুরিদগণ করিবেন । খলিফাগণের মধ্যে যদি কাহার বাড়ীতে এইরূপ মাহফিল করিবার কাহারও শক্তি হয়, তবে তিনি তাহা করিবেন। সাবধান, কেহ যেন অর্থের লোভে বা অন্য কোন রূপ মান-মর্যাদার জন্য না করেন। বিশুদ্ধ হিদায়াতের নিয়তে করিলে বহু নেকী পাইবেন। আরও সাবধান থাকিবেন যে, যেন এই মাহফিলে কোন প্রকার বিদ'আত ও হারাম কার্য বা নামাযের জামা'আত তরক না হয়। বাজে তামাসা ইত্যাদি না হয়। যদি কেহ উহা করে, তবে আমি তাহার প্রতি দাবী রাখিব।

(২৭) বাজে পীরের দরবারের অমাবস্যা পূর্ণিমা পীরের মৃত্যুর তারিখ নির্দিষ্ট করিয়া 'ওরছ' ইত্যাদি; হইয়া থাকে। এমন কি জামায়াতে নামায পড়া হয় না, ওখানে মেয়েলোক যায়, তাহারা হালকা করে ও বেপর্দা চলে উহা হারাম । ঐরূপ মজলিসে কেহ যাইবেন না, যে রূপ সুরেশ্বর, মাইজভান্ডার ইত্যাদি স্থানে আছে। ঐভাবের 'ওরছ' বিদ'আত ও হারাম ।

২৮) এমন জলি যিকির করিবেন না যাহাতে নিদ্রিত ব্যক্তির নিদ্রা ভংগ হয়, কুরআন শরীফ ও নামায পড়ায় বিঘ্ন ঘটে।

২৯) 'যোয়াল্লিন' ও 'দোয়াল্লিন' সম্বন্ধে যে স্থানে মতভেদ আছে, তৎসম্বন্ধে আমার মত এই যে, মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফের মোহাক্কেক আলেমগণ যেরূপ 'দোয়াল্লিন' পড়ে, আমিও তদ্রূপ পড়ি, দাল, জাল দ্বায়া পড়িলে নামাযে ফতুরি আসিবে, কিন্তু যে ব্যক্তির চেষ্টা করা সত্ত্বেও মাখরাজ আদায় না হয়, তাহার জন্য মাফ।

৩০) কেহ জমি কট রাখিবেন না, জায়সুদী ইত্যাদি দ্বারা কেহ সুদ খাইবেন না ও জুলুম করিবেন না।

Dhaka University Institutional Repository

৩১) নিজের হাতে নাড়ি কাটা শরী'আতে কোন বাধা নাই। ইহা হযরত আদম (আঃ)-এর সুন্নাত। এই নাড়ি কাটাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিলে হযরত আদম (আঃ) কে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা হয়। ইহাতে ঈমান যাওয়ার আশংকা আছে।

৩২) কেহ কেহ আপনাকে মারফতি ফকির মনে করিয়া গরুর গোশত, মৎস্য ও কোন হালাল প্রাণী জবেহ করা ও খাওয়া নিষেধ করে। ইহা কুরআন শরীফ ও হাদীস শরীফের খেলাফ। যাহারা হালাল প্রানী জবেহ করিতে খাইতে ঘৃণা করে, তাহারা কুরআন শরীফের বিপরীত কার্যকারী কাজেই তাহারা বেঈমান।

৩৩) হানাফী, মালেকী, হাম্বলী ও শাফিয়ী - এই চারি মজহারের কোন মজহাবকে এহানত করিবেন না। আমি হানাফী, আমার মুরিদগণও হানাফী। শিয়া, রাফেজী, খারেজী ইত্যাদিদের আকিদা বাতিল ও হারাম।

চার মজহাব নহে, চারের মজহাব, চারের মজহাবই হাদীস, কুরআন ও ফিক্‌হ শরীফ হইতেছে। ফিক্‌হ শরীফ কুরআন শরীফ ও হাদীস শরীফের অনুবাদ মাত্র। যাহা কুরআন শরীফ ও হাদীস শরীফে স্পষ্টভাবে তাই তাহারই খোলাছা (মূল মর্ম) ফিক্‌হ হইতেছে।

অতএব এই চারের মজহাবকে যে এহানত (অবজ্ঞা) করিবে, সে কাফের হইবে। কেননা, ইহাতে কুরআন শরীফ ও হাদীস শরীফকে অবজ্ঞা করা হয়।

নবী (সাঃ) এর জামানা হইতে আজ পর্যন্ত সকলেই হাদীস ওয়াল কুরআন হইতেছে। যে আহলে হাদীস ওয়াল কুরআন হইবে, তাহার আমল চারের কোন এক মজহাবের সহিত মিলিবে।

৩৪) মিলাদ শরীফে কেয়াম করা মোস্তাহসান। যদি মৌলুদ শরীফ পাঠকালে কেয়াম করে তবে কেহ তাহাকে জবরদস্তি করিয়া বসাইবেন না। যদি কেহ বসিয়া তাওল্লাদ শরীফ পড়ে তবে তাহাকেও কেহ জোর করিয়া উঠাইবেন না। সামান্য মোস্তাহসান বিষয় লইয়া কেহ দলাদলি করিয়া বিভক্ত হইবেন না। কিয়াম করা আমি ভালই মনে করি। কিয়ামের সময় কেহবা বসিয়া থাকে, কেহবা দাঁড়ায় - ইহা ভাল নহে। তৎপ্রতি খেয়াল রাখিবেন। কিন্তু কিয়াম মোস্তাহসান সুন্নতে উম্মত। সুন্নত তিন প্রকার ক) সুন্নতে উম্মত, খ) সুন্নতে সাহাবা, গ) সুন্নতে নববী।

৩৫) ইলমে গায়েব আল্লাহ তায়ালা হযরত নবী (সঃ) কে যতদূর জানাইয়া দিয়াছেন, ততদূর জানেন। গায়েবের মালিক আল্লাহ তায়ালা, এইরূপ আকিদা রাখিবেন। হযরত (সঃ) যে গায়েব জানে, সেই গায়েবকে ইলমে হুছুলি বলে।

৩৬) দাড়ি রাখা, লম্বা কোরতা পরা ইত্যাদি সুন্নতী লেবাসকে যাহারা অবজ্ঞা করিবে, তাহারা বেঈমান হইবে। হযরত (সঃ) এর সুন্নতকে অবজ্ঞা করায় হযরত (সঃ) কে অবজ্ঞা করা হয়। হযরত (সঃ) কে যে অবজ্ঞা করে, সে কাফের হইবে।

৩৭) কামেল পীরের নিকট মুরীদ হইলে, পীর যদি মরিয়া যান, বেশরা হন বা দূর দেশবাসী হন, আর তাঁহার নিকট যাইতে অক্ষম হন, তবে কামেল পীর দেখিয়া মুরিদ হইয়া তা'লিম পাইতে পারিবেন। কিন্তু ভাল পীর থাকা সত্ত্বেও পীরকে অগ্রাহ্য ও অবজ্ঞা করিয়া অন্য পীর ধরিলে ঈমান যাইবার আশংকা আছে।

৩৮) আমার মুরিদ মোতাকেদদিগকে এবং সকল মুসলমানকে বলিতেছি, যদি কোন ব্যক্তি শীরয়ত মোতাবেক 'আলিম কিংবা কামিল হন, তবে তাহার ওয়াজ শুনিবেন, খাতেরদারী করিবেন। তাহাতে আমার কোন নিষেধ নাই।

যদি কোন 'আলিম বা ওয়ায়েজ বা ওয়াজের মধ্যে আল্লাহ ও রাসূলের প্রশংসা উপলক্ষ্যে মসনবীয়ে রুমী ইত্যাদি ইলমে মুছিকি ওজনে অর্থাৎ রাগ-রাগিনীসহ পড়ে, তবে তাহার মহফিলে যাইবেন না।

Dhaka University Institutional Repository

গেলে গোনাহ্‌গার হইবেন। যদি কেহ গিয়া থাকেন, তবে তাহার কর্তব্য এই যে, তথা হইতে উঠিয়া আসেন ।

৩৯) আমি আলিম ও শিক্ষিত লোকদিগকে মহব্বত ও তাজিম করিয়া থাকি। আপনারাও তাজিম ও মহব্বত করিবেন। যে আলিম ও সাধারণ লোক শরী'আত মোতাবেক চলেন, তাহাদিগকে কেহ তুচ্ছ জানিবেন না । তুচ্ছ জানিলে আল্লাহ তায়ালা ও হযরত নবী (সঃ) নারাজ হইবেন, যেহেতু 'আলিমগণ নবীগনের ওয়ারিছ ।

৪০) সকলে কুলুখ ব্যবহার করিবেন, স্ত্রী, কন্যা ও পরিজনদিগকে কুলুখ ইত্যাদি আমল করাইতে চেষ্টা করিবেন; যেহেতু কুলুখ ব্যবহার করা সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ ।

৪১) মাদ্রাসার তালবে-ইলমদিগকে যথাসাধ্য জায়গীর রাখিবেন ও সাহায্য করিবেন, কিন্তু দাড়ি মুন্ডনকারী, এলবার্ট রাখা ও হুক্কা বিড়ি-খোর তালেবে-ইলম রাখিবেন না। পরহেজগার নামাযী তালেবে-ইলম রাখিবেন। শিক্ষকদিগেরও পরহেজগারী অবলম্বন করিতে হইবে। মাদ্রাসা, স্কুল ও মক্তবে বদকার শিক্ষক রাখিতে নাই ।

৪২) আমার খলিফা ও মুরীদগণের মধ্যে হাজার হাজার 'আলিম, হাফেজ ও ক্বারী আছেন। তাহারা আমার আদেশে বহু কিতাব ছাপাইয়াছেন ও ছাপিতেছেন। আমি সকলের কিতাব সম্পুর্ণ দেখিতে পারি নাই । কাজেই যদি কাহারও কিতাবে শরী'আতের কোন খেলাফ মত লিখিয়া থাকেন, তবে তাহা কেহ আমল করিবেন না । বরং তাহার সংশোধনের জন্য তাহাকে জানাইয়া সংশোধন করিবেন।

৪৩) ইলম দুই প্রকার-ইলমে জাহের ও ইলমে বাতেন । ইলমে জাহের শরী'আত কুরআন শরীফ, হাদীস শরীফ ও ফিকহ শরীফ ইত্যাদি। শরী'আত মোতাবেক আমল করাই তরিকত। তরিকত ব্যতীত মারিফাত হাকিকত হইতে পারে না। উহা মিথ্যা বৈ কিছুই নহে। শরী'আত ছাড়িয়া যাহারা মারিফাত আমল করে, তাহারা ফাছেক। শরী'আত অনুযায়ী তরীকত, মা'রিফত এবং হাকিকত শিক্ষা করা ফরয। যাহারা তরিকত আমল না করে, তাহারা ফাছেক । যাহারা সত্য তরিকত মা'রিফাত ও হাকিকত অবজ্ঞা করে তাহারা কাফের ।

৪৪) কদমবুছি জায়েয আছে, পীরের পায়ে হাত দিয়া সেই হাতে তাজিমের জন্য চুম্বন করা বিদায়াতে জায়েয । মুখ দিয়া কদমবুছি করা সুন্নত। যদি পীর উপরে থাকেন, আর তখন কদমবুছি করে, তবে জায়েয হইবে ।

৪৫) আল্লাহ ব্যতীত কাহাকেও ইবাদতের সেজদা করা কুফর। তাহিয়তের সেজদা করা হারাম। এই হারামকে যাহারা মোবাহ জানে, তাহারা কাফের । নবী (সঃ) এর জামানার পূর্বে রুকুর নাম সেজদা ছিল, তজ্জন্যই নবী (সঃ) বলিয়াছেন, ''যেন কেহ সালাম দিবার কালেও পূর্ব জামানার সেজদার ন্যায় মাথা নত না করে''। যাহারা বর্তমানে তাহিয়াতের (তাজিমের) সেজদা হালাল জানিয়া করে ও লয়, তাহারা কাফের হইবে ।

৪৬) মোরগ বাঁধিয়া খাওয়া সুন্নত। হযরত নবী করিম (সঃ) উহা বাঁধিয়া রাখিয়া খাইয়াছেন; আমিও আমার মোতাকেদ এবং সবসাধারণ ভাইদিগকে আদেশ করি। 'জাল্লালা' মোরগ না বাঁধিয়া খাওয়া মকরুহ তাহরিমী ।

৪৭) হযরত মুহাম্মদ (সঃ) শেষ নবী । তাঁহার পরে কোন নবী হইবে না । যদি কেহ কোন সময় পয়গম্বরী দাবী করে, তবে সে মিথ্যাবাদী ।

Dhaka University Institutional Repository

৪৮) বর্তমান একদল ফকির বাহির হইয়াছে, তাহারা বোগদাদী সেজদা করে, তাহারা উত্তর দিকে সেজদা করিয়া পীর সাহেব পীর সাহেব বলিয়া থাকে, উহা হারাম। উহা জায়েয জানিলে বেদ্বীন হইতে হয়।

৪৯) পীর খান্দানেই যে কেবল পীর হইবে, এমন কথা কোন কিতাবে নাই। যদি শরী'আত ও মারিফাত ইত্যাদিতে কামেল হইবেন, তিনিই পীর হইতে পারিবেন, যে বংশেরই হউন না কেন।

৫০) আমার মুরীদ মোতাকেদগণ আমার আদিষ্ট দরুদ ও অজিফাসমূহ এবং মোরাকাবা ইত্যাদি যথারীতি করিবেন। হারাইয়া গেলে গণকের বাড়ী গনাইতে যাইবেন না। ধান চাউলকে মা লক্ষী বলিবেন না। দোয়া করি, আল্লাহ তা'য়ালা মুসলমান ভাই-ভগ্নিদিগের ঈমান কায়েম রাখুন।

৫২) বাজারের ভেজাল ঘৃত, দধি, মিষ্টান্ন সাদা চিনি হইতে পরহেজ করিবেন। আমি ঐ সকলের মর্ম যতদূর অবগত হইয়াছি, তাহাতে আমার উচিত হয় যে, সর্বসাধারণের পরহেজগারী অবলম্বন করার জন্য ঐ সকল ব্যবহার করিতে নিষেধ করি।

অমুসলমানদের তৈয়ারী মিষ্টান্ন ইত্যাদি না খাওয়া ভাল। কেননা তাহারা যাহা হালাল জানে, তাহা আমাদের জন্য হারাম, যেমন গোবর, চেনা ইত্যাদি।

৫৩) কেহ জামাতা হইতে মেয়ে আটক রাখিবেন না। জামাতার সহিত কোন বিষয়ে বিবাদ হইলে, মেয়ে আটক করা হারাম। কেহ কন্যা ও ভগ্নী ইত্যাদি আটক করিবেন না। যদি কোন বিবাদ উপস্থিত হয়, তবে তাহা মীমাংসা করিয়া শীঘ্র মেয়ে পাঠাইয়া দিবেন।

৫৪) নিজ স্ত্রীকে কেহ বাপের বাড়ী বা অন্যত্র ফেলিয়া রাখিয়া কষ্ট দিবেন না। তাহাদিগকে পর্দাতে রাখিয়া তাহাদের হক যথারীতি আদায় করিবেন, নচেৎ গোনাহগার হইবেন।

৫৫) কেহ হুক্কা, বিড়ি-সিগারেট ব্যবহার করিবেন না। উহা মকরুহ তাহরিমী। মদ, গাজা, ভাং ও নেশার দ্রব্য হারাম।

৫৬) গোরস্থানের হেফাজত করিবেন, গোরের উপর দিয়া পথ দিবেন না। গোরস্থানের নিকট পায়খানা প্রস্রাবের স্থান করিবেন না, করিলে গোনাহগার হইবেন ও বদদোয়া প্রাপ্ত হইবেন। যথাসাধ্য গোরের হেফাজত করিবেন।

৫৭) বৃদ্ধ পিতা-মাতার খেদমত করিবেন, তাহাদের সন্তুষ্টির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা ও যত্ন করিবেন।[১]

ভারতের এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মগুরু, ধর্মবীর বাংলার শ্রেষ্ঠতম আধ্যাত্মিক মহাপুরুষ আমীর শরী'আত-ই-বাংলা হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী হাজী মুহাম্মদ আবূ বকর বাংলা ১৩৪৫ সনের ৪ঠা চৈত্র/ইংরেজী ১৯৩৯ সনের ১১ই মার্চ শুক্রবার ভোর ৫-৪৫ মিনিটে প্রায় একশ বছর বয়সে ফুরফুরাস্থ স্বীয় বাসভবনে ইন্তিকাল করেন। পরদিন শনিবার বিকাল ৫টায় তাঁর জানাযার নামায সম্পন্ন হয়। তাঁর ওসিয়ত মুতাবিক ফুরফুরার সুবিখ্যাত দায়রা শরীফের সম্মুখে প্রাচীন কবরস্থানের মধ্যে তাঁর পূর্ব পুরুষের দু'জন ওলীর মাযারের পার্শ্বে তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর জানাযার নামাযে প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক সমবেত হয়।[২]

মৃত্যুকালে তিনি পাঁচ ছেলে ও পাঁচ মেয়ে রেখে যান।

প্রথম ছেলেঃ হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী আবুনসর মুহাম্মদ আবদুল হাই সিদ্দীকী বিশিষ্ট ওলীয়ে কামেল ছিলেন। পিতার ইন্তিকালের পর তিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

১। আবু ফাতেমা মোহাম্মদ ইসহাক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮০-৯২।
২। মোবারক করীম জওহর, প্রাগুক্ত, পৃঃ১৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় ছেলেঃ হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী হাজী আবু জাফর মুহাম্মদ ওয়াজিহ্ উদ্দীন। তিনিও একজন কামেল ওলী ছিলেন।

তৃতীয় ছেলেঃ মাওলানা আবদুল কাদির। তিনি একজন বড় কাশ্ফে শক্তি সমপন্ন ওলী ছিলেন।

চতুর্থ ছেলেঃ হযরত মাওলানা নজমুস সা'আদাত । তিনি আজন্ম ওলী ছিলেন ।

পঞ্চম ছেলেঃ মাওলানা জুলফিকার আলী ।

ছেলেদের সকলেই হযরত পীর সাহেবের যোগ্য উত্তরাধিকারী ও খলীফা ছিলেন । তাঁরা সকলেই লোকদেরকে শরী'আত ও তরীকতের শিক্ষাদান করেছেন ।

প্রথমা মেয়েঃ ফুরফুরায় সায়্যিদ মাওলানা কানা'আত হোসেনের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন ।

দ্বিতীয় মেয়েঃ আকনির মৌলবী আবদুল মান্নান সিদ্দীকীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন ।

তৃতীয় মেয়েঃ বাধপুরের মৌলবী শামস উদ্দীন-এর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন ।

চতুর্থ মেয়েঃ সীতাপুরের মৌলবী আবদুল ওয়াহিদ-এর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন ।[১]

তাঁর ইনতিকালে তৎকালীন একটি দৈনিক পত্রিকায় বলা হয় ঃ- The death occured yesterday morning at Furfura (Hoogly). At the age of ninety of his holiness, Hazrat Moulana Shah Sufi Hazi Mohammad Abu Bakar Siddiqui, a great Muslim divine and the spiritual guide of large number of Muslims in this country. The Moulana's name coas a household word in Bengal. He was the founder of many schools, Madrashas, Mosques, dispensaries and other Charitable institutions. By his pity and benevolence he endeared himself to large number of people of this province irrespective of class or community. (The statesman, Saturday, March 13, 1939).

এই মহান সাধকের জ্যেষ্ঠ পুত্র মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল হাই তাঁর পিতার কবরের উপর ইটের তৈরী সুন্দর খিলান গম্বুজ-মিনার ও জালির কাজযুক্ত একটি সমাধি তৈরী করেন ।[২]

১। মোবারক করীম জওহর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৪ ।
২। গোলাম সাকলায়েন, বাংলাদেশের সূফী-সাধক, পৃঃ ২২০ ।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত সূফী আবদুল মুন'য়িম
(১৮৪৪-১৯১০)

হযরত সূফী আবদুল মুন'য়িম ঢাকা জেলার অন্তর্গত সাভার থানাধীন সৈয়দাবাদ গ্রামে ১২৬০ হিঃ/ ১২৫২ বাং/ ১৮৪৪ইং জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মাওলানা সায়্যিদ শাহ্ সূফী আলী আবদুল্লাহ । তিনি তাঁর পরিবারেই প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন । অতঃপর পিতার নিকট উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন এবং পিতার হাতে বায়আত গ্রহণ করেন । চব্বিশ বছর বয়ঃকালে তাঁর পিতা ইন্তিকাল করেন । ত্রিশ বৎসর কঠোর রিয়াযাত ও মুজাহাদা করেন ।

তিনি বড় কামেল ওলী ছিলেন। সর্বদা আল্লাহ তাআলার যিক্র ও কুরআন তিলাওয়াত-এ রত থাকতেন। তাঁর বহু কারামতের কথা শুনা যায়। যেমন- তিনি জমিনের কথা শুনতেন। কোন স্থানে বা কোন গ্রামে মানুষের জান কবয করার জন্য আজরাইল ফিরিশতার আগমন ঘটলে সেখানে যমীন এক আশ্চর্যজনক শব্দের দ্বারা চীৎকার করত, তিনি উহা শুনতেন এবং সেই শব্দের দরুন তাঁর মুখের রং বিবর্ণ হয়ে যেত ।

২১শে জিলকদ/ ১৩২৮হিঃ ৭ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার ১৩১৭বাংলা, ১৯১০ইং তিনি ইন্তিকাল করেন। ঢাকার মিয়া সাহেব ময়দানে হযরত আবদুর রহীম শহীদ-এর মাযারের পার্শ্বে তাঁর মাযার অবস্থিত ।[১]

১। মাওলানা এম. ওবাইদুল হক, বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ, পৃঃ ১৬৫-৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংক্ষেপ নির্দেশনা

আ	-	আরবী
আঃ	-	আলায়হিস্ সালাম
ইং	-	ইংরেজী
বাং	-	বাংলা
হিঃ	-	হিজরী
ঐ	-	Ibid
খৃঃ	-	খৃষ্টাব্দ, খৃষ্টাব্দে
খৃ.পূ.	-	খৃষ্টপূর্ব
জ.	-	জন্ম
ড.ডঃ	-	ডক্টর (পিএইচ,ডি)
ডা.ডাঃ	-	ডাক্তার (চিকিৎসক)
মৃ.	-	মৃত, মৃত্যু
রঃ	-	রহমতুল্লাহি আলায়হি
রাঃ	-	রাদিয়াল্লাহু আনহু
সঃ	-	সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম
ক	-	a
খ	-	b
১খ,৪০	-	প্রথম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা (গ্রন্থের ক্ষেত্রে)
৩ঃ৭	-	সুরা ৩-এর আয়াত ৭ (কুরআন মজীদের ক্ষেত্রে)
?	-	জন্ম বা মৃত্যু সনে অজ্ঞাত বা অনিশ্চিত ক্ষেত্রে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণায়ন

أ	a	আ	ط	t	ত
إ	i	ই	ظ	z	জ
أُ	u	উ	ع		'
ب	b	ব	غ	gh	গ
پ	p	প	ف	f	ফ
ت	t	ত	ق	k,q	ক
ث	th	ছ	ك	k	ক
ج	di,j	জ	گ	g	গ
چ	c	চ	ل	l	ল
ح	h	হ	م	m	ম
خ	kh	খ	ن	n	ন
د	d	দ	ه	h	হ
ڈ	d'	ড	و	w	ও
ذ	dh	য	ی	y	য়
ر	r	র	ے	ay	ে
ڑ	r'	ড়	ء		'
ز	z	য	ـَ		আ
ژ	zh	ঝ	ـِ		ই/ি
س	s	স	ـُ		উ
ش	sh	শ	ـَ + ا		আ
ص	s	স	ـِ + ی		ঈ
ض	d	দ/য	ـُ + و		ঊ

Dhaka University Institutional Repository

অনুলিখনের ক্ষেত্রে অনুসৃত রীতি

(ক) কোন ব্যক্তি নিজ নাম বাংলায় যে বানানে লিখেছেন বা লিখিয়েছেন তাঁর নামের সে বানানই হবে।

(খ) যে সব আরবী, ফারসী ও উর্দু শব্দ বহু ব্যবহারের দরুন বাংলায় একটা প্রচলিত বানান-রূপ পরিগ্রহ করেছে, সেগুলোকে সাধারণতঃ প্রচলিত আকারেই রাখা হয়েছে। যথা- আইন, আখিরাত, আদম, আদালত, আরবী, ইমাম, ইন্তিকাল, ইরান, ইরশাদ, ইসলাম, ঈমান, ওযু, কদর, কবর, কলম, কানুন, কাফির, কার্যা, কিতাব, কিয়ামত, কুরবানী, খলীফা, খান, গযব, জনাব, জিহাদ, তওবা, তওরাত, তরজমা, তশরীফ, তসবীহ, তারিখ, তা'রীফ, দওলত (দৌলত), দফতর, দরুদ, দলীল, নফল, নবী, ফকীর, ফজর, ফরয, মওলানা, মক্কা, মদীনা, মনজিল, মসনদ, মসজিদ, মাফ, মিম্বর, মুকাবিলা, মুতাবিক, মুনাফিক, মৌলবী, যাকাত, রওযা, রমযান, রহমত, শহীদ, সালাত, সুন্নাত, মুসাফির, হক, হজ্জ, হযরত, হরফ, হুকুম ইত্যাদি।

বাংলা ও হিজরী 'অব্দ' গুলোর সমপরিমাণ খৃষ্টাব্দ নির্ণয় পদ্ধতি নিম্নরূপঃ

(১) বঙ্গাব্দের সমপরিমাণ খৃষ্টাব্দ পেতে হলে প্রাপ্ত বঙ্গাব্দের সাথে ৫৯৩ যোগ করতে হবে, যেমন, ১৩৮৬ বাং + ৫৯৩= ১৯৭৯ খৃঃ

(২) হিজরী অব্দের সমপরিমাণ খৃষ্টাব্দ পেতে হলে নিম্নোক্ত সূত্রে ফেলে অংক কষে বের করতে হবে, যেমন,

$$A.H - \frac{3\times A.H.}{100} + 621 = A.D$$

$$\text{হিঃ } ১০৮৪ - \frac{৩\times১০৮৪}{১০০} + ৬২১ \text{ খৃঃ} = ১৬৭২/১৬৭৩ \text{ খৃষ্টাব্দ।}$$

(তথ্যসূত্রঃ ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হক, মনীষা-মঞ্জুষা, ৩য় খন্ড, মুক্তধারা, ১৯৮৪ইং, পৃঃ ৫০-৫১ ও ৫৩।)

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়	ঃ	গৌড় লেখমালা॥ কলিকাতা ঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩১৯ বাংলা।
অতুল চন্দ্র রায়	ঃ	ভারতের ইতিহাস॥ কলিকাতা, ১৯৮০।
আব্দুল মজিদ রুশদী (এ,একে,এম)	ঃ	হযরত কেবলা, আওয়ালাদে রুশদী॥ ৩য় সংস্করণ ঢাকাঃ ২৬, শাহ সাহেব লেন, ১৯৮৪ ইং।
আব্দুল কাদের (ডঃ)	ঃ	নোয়াখালীতে ইসলাম॥ ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯১ ইং।
আজীরুদ্দীন	ঃ	রিয়াজুন নুর॥ কানপুরঃ নিজামী প্রেস, ১৮৭৫ ইং।
আহমদ উল্লাহ (সায়্যিদ)	ঃ	ঢাকা ঃ আজিমপুর দায়রা শরীফ॥ ১৯৯০ ইং।
আহমদুল্লাহ (শাহ)	ঃ	আইনুল জারিয়াহ॥ ঢাকা ঃ সেন্ট্রাল অপসেট প্রেস, বাংলা বাজার, ১৯৪৬ ইং।
আব্দুল করিম (ডঃ)	ঃ	মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য॥ ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪ ইং।
	ঃ	বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল॥ ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭ ইং।
	ঃ	চট্টগ্রামে ইসলাম॥ চট্টগ্রাম ঃ ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮০ ইং।
	ঃ	হযরত শাহ সূফী আমানত খান॥ চট্টগ্রাম ঃ খানকা শরীফ, হযরত শাহ আমানত সড়ক, ১৩৯২ বাং।
আবু তালিব (মুহাম্মদ)	ঃ	ছোটদের মাওলানা কারামত আলী॥ ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩ইং।
আব্দুল কাদির	ঃ	ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হক স্মারকমালা॥ ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪ ইং।
আব্দুল গফুর সিদ্দিকী (মোঃ)	ঃ	তিতুমীর॥ ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী।

Dhaka University Institutional Repository

আব্দুল বারী (এ,বি,এম) ঃ তীতুমীর মুক্তি সংগ্রামের প্রথম শহীদ ॥
ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬ ইং

আব্দুল মান্নান তালিব ঃ বাংলাদেশে ইসলাম॥
ঢাকা ঃ আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮০ ইং।

আব্দুর রাহীম হাযারীঃ সূফীতত্ত্বের আত্মকথা॥
ঢাকা ঃ নবরাগ প্রকাশনী, ১৯৮৮ ইং।

আব্দুর রশীদ(ফকির) ঃ সূফী দর্শন॥
ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৪ ইং।

আব্দুস সাত্তার (মোঃ) ঃ ফরিদপুরে ইসলাম॥
ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩ ইং।

আতহার উদ্দীন মোল্লা ঃ গাজী মাওলানা ইমামুদ্দীন (রঃ)॥

আহমদাবাদী(এ,এস,এম,মাওলানা) ঢাকা ঃ নোয়াখালী সমিতি, ১৯৮০ ইং।

আকরাম খাঁ (মোহাম্মদ) ঃ মোসলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস॥
ঢাকা ঃ গ্রন্থকার প্রকাশিত, ঢাকেশ্বরী রোড, ১৯৬৫ ইং

আল ইদ্রিসী ঃ নুযহাতুল মুশতাক॥

আব্দুল মোমিন চৌধুরী (ডঃ)ঃ বাংলাদেশের ইতিহাস॥
ঢাকা ঃ নওরোজ কিতাবিস্তান, বাংলা বাজার, ১৯৮৭ ইং।

আবুল ফজল ঃ আইন-ই-আকবরী॥ (২য় খন্ড)
কলিকাতা ঃ ১৯৯৪ ইং।

আহ্‌সানুল্লাহ (খাজা,নওয়াব)ঃ তাওয়ারীখ- এ-খান্দান- এ-কাশ্মীরিয়াহ্‌॥
অপ্রকাশিত পান্ডুলিপি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত।

আব্দুল মওদুদ ঃ মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ-সমাজের রূপান্তর॥
ঢাকা ঃ নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৯ ইং।

আব্দুল আউয়াল (জৌনপুরী)ঃ মুফীদুল মুফ্‌তী॥
লখনৌ ঃ অসি প্রেস, ১৯০৮ ইং।

আবদুল হাই (লখনৌবী) ঃ নুযহাতুল খাওয়াতীর॥ (৮ম খন্ড)
লখনৌ ঃ মজলিস-এ-দায়িরাতুল মা'আরিফ প্রেস, ১৯৭০ ইং।

Dhaka University Institutional Repository

আবদুস সাত্তার (মাওলানা) ঃ তারীখ-ই-মাদরাসা-ই-আলিয়া॥
ঢাকা ঃ মাদ্রাসা ই-আলিয়া পাবলিকেশন্স,
১৯৫৯ ইং।

আব্দুল বাতেন (মাওলানা) ঃ সীরাত-ই-কারামত আলী জৌনপুরী॥
এলাহাবাদ ঃ আসরার-এ-করীমী প্রেস,
১৯৪৭ ইং।

আব্দুর রহিম (মুহাম্মদ) ঃ বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস॥
ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮২ ইং।

আব্দুল্লাহ (মুহাম্মদ,ডঃ) ঃ মাওলানা আব্দুল আউয়াল জৌনপুরী(রঃ)॥
ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,
১৯৯৫ ইং।

ঃ ঢাকার কয়েকজন মুসলিম সুধী॥
ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,
১৯৯১ ইং।

ঃ বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ॥
ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,
১৯৮৬ ইং ।

ইবনে বতুতা ঃ আজায়েবুল আসফার ॥
(খানবাহাদুর মুহাম্মদ হুসায়ন কর্তৃক
উর্দুভাষায় অনূদিত)
দিল্লীঃ ১৯১৩ ইং।

ইসহাক (আবু ফাতেমা,
মুহাম্মদ) ঃ ফুরফুরার পীর হযরত মাওলানা আবু বকর
সিদ্দিকী॥
ঢাকাঃ ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৮০ইং।

উজীর আলী ঃ মুসলিম রত্নহার॥

এনামুল হক (ডঃ,মুহাম্মদ) ঃ মনীষা মঞ্জুষা॥(৩য় খন্ড)
ঢাকাঃ মুক্তধারা,১৯৮৪ইং।

ঃ পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম॥
ঢাকাঃ আদিল ব্রাদার্স,১৯৮৪ ইং।

ঃ আরাকান রাজ সভায় বাংলা সাহিত্য॥
কলিকাতাঃ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এ্যান্ড সন্স,
১৯০৫ ইং।

Dhaka University Institutional Repository

ওয়াকিল আহমদ (ডঃ) ঃ উনিশ শতকে বাঙ্গালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা ॥
ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী,১৯৮৩ ইং।

ওবাইদুল হক (এম,মাওলানা)ঃ বাংলাদেশের পীর আওলিয়াগণ॥
ফেনীঃ হামিদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৮১ ইং।

কারামত আলী (মাওলানা) ঃ মুরাদুল মুরীদীন॥
ঢাকাঃ ফাহিম প্রকাশনী,১৯৭৮ ইং।

ঃ নুরুন আলা নুর॥

ঃ যাদুত তাকওয়া॥
কানপুরঃ মাতবা-ই-মজীদী প্রেস, ১৩৪০ বাং।

ঃ মুকামিউল মুবতাদিঈন॥
কানপুরঃ মাতবা-ই-মজীদী প্রেস, ১৩৪৮ বাং।

ঃ নাসীমুল হারামাইন॥
জৌনপুরঃ আহমদী প্রেস, ১৮৬০ ইং।

কে,আলী (অধ্যাপক) ঃ বাংলাদেশের ইতিহাস॥
ঢাকাঃ আলী পাবলিকেশান্স, পাটুয়াটুলী, ১৯৮৬ইং।

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ ইসলামী কবিতা॥
ঢাকাঃ ইলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮১ইং।

গোলাম সাকলায়েন ঃ বাংলাদেশের সূফী সাধক॥
ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭ইং।

গোলাম হুমায়ন সেলিম ঃ রিয়াজুস সালাতিন, আকবর উদ্দীন অনূদিত-১৯৭৪ ইং।

গোপাল হালদার ঃ সংস্কৃতির রূপান্তর॥
ঢাকাঃ মুক্তধারা।

গুলাম রাসুল মিহর ঃ জামা'আত-ই-মুজাহিদীন॥ (২য় খন্ড),
লাহোরঃ ১৯৫৫ ইং।

চিয়ান পোয়ান ঃ চীনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস॥
পেইচীং,১৯৮৫ ইং।

জুলফিকার আহমদ (কিসমতী)ঃ বাংলাদেশের সংগ্রামী ওলামা পীর মাশায়েখ॥
ঢাকাঃ প্রগতি প্রকাশনী,১৯৮৮ ইং।

জয়নুদ্দীন (শায়খ) ঃ তুহ্‌ফাতুল মুজাহেদীন॥

Dhaka University Institutional Repository

জিয়া উদ্দীন বারণী ঃ তারীখ-ই-ফিরূজশাহী॥
ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী,১৯৮২ ইং।

জাহিদুল গণি (চৌধুরী) ঃ নোয়াখালীর চরিতাভিধান॥
ঢাকাঃ সিকদার প্রেস এন্ড পাবলিকেশন,
৫, শ্রীশ দাস লেন, ১৯৯০ ইং

তোফায়েল আহমদ ঃ যুগে যুগে বাংলাদেশ॥
ঢাকাঃ নওরোজ কিতাবিস্তান,১৯৯২ ইং।

তারা চাঁদ (ডঃ) ঃ ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব॥
এস,মুজিব উল্লাহ অনূদিত,
ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,
১৯৯১ ইং।

নাজির হোসেন ঃ কিংবদন্তির ঢাকা॥
ঢাকাঃ আযাদ মুসলিম ফাউন্ডেশন,১৯৮১ ইং।

নিহার রঞ্জন রায় ঃ বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)॥
পশ্চিমবঙ্গঃ পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ
সমিতি, ১৯৮০ ইং।

নগেন্দ্র নারায়ণ (চৌধুরী, ডঃ)ঃ বঙ্গ ভাষা ও বঙ্গ সাহিত্যের ক্রমবিকাশ॥
কলিকাতাঃ ১৩৪৪ বাং।

নূরুর রহমান (মাওলানা) ঃ তাযকিরাতুল আওলিয়া॥
ঢাকাঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী,১৯৮২ ইং।

নিখিল সুর ঃ ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পটভূমি॥
কলিকাতাঃ ১৯৮৯ ইং।

নূর মোহাম্মদ ঃ হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস॥
(আজমী, মাওলানা) ঢাকাঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৮৬ ইং।

নূরুদ্দীন যায়দী ঃ তাজাল্লা-ই-নূর ॥ (২য় খন্ড)
জৌনপুরঃ ১৯০০ইং।

নূরুল আলম ঃ আযীমপুর দায়রা শরীফের আত্মকথা॥
ঢাকাঃ তারিখবিহীন।

ফজলুল হাসান ইউসুফ ঃ বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস॥
ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,
১৯৯২ ইং।

ফারুক মাহমুদ ঃ ইতিহাসের অন্তরালে॥
ঢাকাঃ ওয়েসিস বুকস, ১৯৮৯ ইং।

Dhaka University Institutional Repository

ফয়েজ উল্লাহ ভূইয়া (মুহাঃ, মৌলানা) ঃ হযরত গাউছুল আজম মাইজভান্ডারীর জীবনী ও কারামত॥ চট্টগ্রামঃ মাইজভান্ডার দরবার শরীফ, ১৯৮৫ ইং

বি.এ. আজাদ ইসলামাবাদী ঃ চট্টগ্রাম স্মরণী॥ চট্টগ্রামঃ সমাজ প্রেস,১৯৮৭ ইং।

বজলুর রশীদ (আ,ন,ম) ঃ আমাদের সূফী সাধক॥ ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৭৭ ইং।

সম্পাদনা পরিষদ (জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড) ঃ বাংলা সাহিত্য সংকলন"- একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী- জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড - ঢাকা- ১৯৯৩ ইং

সম্পাদনা পরিষদ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ) ঃ বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ ,ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩ ইং

মতিউর রহমান (ডঃ) ঃ আইনা-এ-ওয়াইসী॥ পাটনাঃ লেবুল লিথু প্রেস,১৯৭৬ ইং।

মাহমুদ আযাদ ঃ দিওয়ান-এ-আযাদ॥ আজীমাবাদঃ ১৯৮৯ ইং।

মাহমুদ বখত (চিশ্তী) ঃ বাংলাদেশের সূফীবাদের দিশারী যারা॥ ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭ ইং।

মাহবুবুর রহমান ঃ মুসলিম বাংলার অভ্যুদয়॥ ঢাকাঃ খানপ্রিন্টার্স,১৯৮৮ ইং।

মুহিবউদ্দীন আহমদ (পীরজাদা) ঃ আপোষহীন এক সংগ্রামী পীর দুদু মিয়া (রঃ)॥ ঢাকাঃ শরীআতিয়া লাইব্রেরী ও প্রকাশনী, ১৯৯২ ইং।

মানবেন্দ্র নাথ রায় ঃ ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান॥ (মুহাম্মদ আব্দুল হাই অনূদিত) ঢাকাঃ শতদল প্রকাশনী,১৯৯০ ইং।

মাজহারুল হক (সৈয়দ) ঃ বাংলাদেশের নদী॥ ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী,১৯৮৫ ইং।

Dhaka University Institutional Repository

মীনহাজ-ই-সিরাজ ঃ তবকাত-ই-নাসীর॥
(আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া অনূদিত)
ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী ১৯৮৩ ইং।

মনসুর মুসা (সম্পাদিত) ঃ বাঙালা দেশ॥
ঢাকাঃ নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৮৩ ইং।

মন্মথ মোহন বসু- ঃ বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ॥
কলিকাতাঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,১৯৫৯ ইং।

মুকাখখারুল ইসলাম ঃ প্রত্নময় উত্তর টাঙ্গাইল ইতিহাস॥
ঢাকাঃ ১৩৮৪ বাং।

মুসলিম চৌধুরী (মোহাম্মদ)ঃ উজ্জ্বল এক পায়রা ॥
ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮ ইং।

মাহমুদুল হাসান(সৈয়দ,ডঃ) ঃ ইসলামের ইতিহাস ॥
ঢাকাঃ গ্লোব লাইব্রেরী (প্রাঃ) লিঃ, ১৯৮৯ ইং।

মনসুর নোমানী (মাওলানা) ঃ তাসাউফ কাহাকে বলে॥
ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,
১৯৮৯ ইং।

মোবারক করীম জওহর ঃ ভারতের সূফী॥
কলিকাতাঃ ২/১ তিলজলা প্রেস,১৯৮৬ ইং।

মাহবুব-উল-আলম ঃ চট্টগ্রামের ইতিহাস॥

মুহাম্মদ সিদ্দিক (খান) ঃ পীর দুদু মিয়া॥

রাজীব হুমায়ুন ঃ সন্দ্বীপের ইতিহাস, সমাজ ও সংস্কৃতি॥
ঢাকাঃ সন্দ্বীপ শিক্ষাও সাংস্কৃতি পরিষদ,
১৯৮৭ ইং।

রহমান আলী ঃ তাযকিয়া-ই-উলামা হিন্দ॥
লখনৌঃ নেওয়াল কিশোর প্রেস,১৯১৪ ইং।

রশীদুল আলম ঃ মুসলিম দর্শনের ভূমিকা॥
বগুড়াঃ সাহিত্যকুটির, ১৯৮১ ইং

রহমান আলী (তায়েশ, মুন্সী)ঃ তাওয়ারীখে ঢাকা॥
ঢাকাঃ আরা পাবলিকেশন্স, ১৯১০ ইং।

রমেশ চন্দ্র মজুমদার ঃ বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীনযুগ)॥
কলিকাতাঃ কে,বি, প্রিন্টার্স, ১৯৭৪ ইং।

রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় ঃ বাঙ্গালার ইতিহাস (১ম খন্ড)॥
কলিকাতাঃ ১৯৭১ইং।

রুহুল আমীন (মাওলানা) ঃ হযরত পীর সাহেব কেবলার বিস্তারিত জীবনী,
কলিকাতাঃ মোঃ আব্দুল মাজেদ, ১৯৩৯ ইং

Dhaka University Institutional Repository

রমযান আলী ঃ ফুরফুরা শরীফের হযরত পীর সাহেবের (রঃ) মত ও পথ॥
পাবনাঃ

রশীদ আহমদ ঃ বাংলাদেশের সূফী সাধক॥
ঢাকাঃ মডার্ন লাইব্রেরী,
১১, প্যারিদাস রোড, ১৯৭৪ইং

লকীতুল্লাহ (শাহ) ঃ মুঝদা-ই-ফযলে হক॥
কলিকাতাঃ সিতারা-ই- হিন্দ-প্রেস,১৯৩৩ ইং।

শহীদুল্লাহ (ডঃ,মুহাম্মদ) ঃ ইসলাম প্রসঙ্গ॥
ঢাকাঃ রেনেসাস প্রিন্টার্স, ১৯৬৩ ইং।

শাহ নূরী ঃ কিবরীত-এ-আহ্মার॥ (পান্ডুলিপি)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ডাক নং- ৪৯।

সুপ্রকাশ রায় ঃ ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম॥
কলিকাতাঃ ডি,এন,বি,এ,ব্রাদার্স,১৯৭২ ইং।

সালাউদ্দীন লস্কর(এ,বি,এম)ঃ অনূদিত ঃ হযরত আলহাজ মাওলানা শাহ্ কারামত আলী জৌনপুরী (রঃ)॥
ঢাকাঃ ৪৩, নয়া পল্টন, ১৯৭৮ ইং।

দেওয়ান মুহাম্মদ ইব্রাহীম (তর্কবাগীশ) ঃ হাকীকতে ইনসানিয়াত॥
পাবনাঃ পাকশী খানকা শরীফ, ১৯৭৮ ইং।

সাইদুর রহমান ঃ মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি॥
(রূপান্তর ও সম্পাদনায় ডঃ আমিনুল ইসলাম)
ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪ ইং।

সাদেক শিবলী জামান ঃ বাংলাদেশের সূফী সাধক ও অলী আওলিয়া॥
ঢাকাঃ রহমানিয়া লাইব্রেরী,১৯৯৩ ইং।

সাহাব উদ্দিন আহমদ কাদেরী (সৈয়দ) ঃ পাগলা মিঞা (রঃ)॥
ফেনীঃ তাকিয়াবাড়ী, ১৯৯০ ইং।

সাইদুর রহমান ঃ ইসরাইল ও মুসলিম জাহান॥
ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,
১৯৮৯ ইং।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (ডঃ)ঃ জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য॥
কলিকাতাঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,১৯৬২ ইং।

সুলায়মান নদভী (সৈয়দ) ঃ আরব ওয়া হিন্দ কি তাওয়াল্লুকাত॥
ঃ আরবোকা জাহাজরানী॥

সুলায়মান আলী সরকার (মোঃ) ঃ ইবনুল আরাবী ও জালাল উদ্দীন রুমী॥
ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী,১৯৮৪ ইং।

Dhaka University Institutional Repository

হাবীবুর রহমান (হাকীম) ঃ আসুদেগান-এ-ঢাকা॥
ঢাকাঃ এমদাদীয়া লাইব্রেরী,১৯৪৬ ইং।

হামীদুল্লাহ (খানবাহাদুর) ঃ আহাদীসুল খাওয়ানীন॥
কলিকাতাঃ মাযহারুল আজায়েব প্রেস, ১৮৭১ ইং।

হাসান আলী চৌধুরী (মোঃ) ঃ রংপুরে ইসলাম॥
ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৪ ইং।

হাসান জামান (ডঃ) ঃ সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য॥
ঢাকাঃ ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৮০ ইং।

হাবিবুর রহমান (মুহাম্মদ) ঃ গঙ্গা ঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ॥
ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫ ইং।

হুমায়ুন আব্দুল হাই ঃ মুসলিম সংস্কারক ও সাধক॥
ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী,১৯৮৯ ইং।

Thomas Arnold (Dr)- : The Preaching of islam.
Lahore: 1956.

Amir Ali (Sayed) : The spirit of islam, London : 1946.

Abdul Majid B.A : Taswaf-E-Islam

A.L. Clay : Principal heads of the history and statistics of Dacca Division. London: 1868.

Abdul Hai (Sayed) : Muslim Philosophy.
Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh-1982.

Athar Abbas. (Rizvl, Saiyid): A History of Sufism in India. Vol-II. New delhi Munshiram Monoharlal. Pub. 1978.

Abdul Bari : The Reform movement in Bengal.

M. Abid Ali Khan (Khan Sahib). : Memoirs of Gour and Pandua, Calcutta, 1924.

Abdullah (Muhammad) : Some Muslim Stalwarts.
Dhaka: Islamic foundation Bangladesh,1980.

D.C. Sircer : Studies in the geography of ancient and. Medieval India.
Delhi,1971.

Elphinstone : History of India. 1911.

Dhaka University Institutional Repository

Fuzli Rubbe (Khandker)	:	The Origin of the Musalman of Bengal. Calcutta: Thacker pink, 1895.
Gibb & Kramers	:	Shorter Encyclopedia of Islam.
Hem Chandra Ray Chawdory	:	History of Bengal. Calcutta.
Brevesgely Henry (B.C.S)	:	The District of Bakergong. London: Trubners & Co.
Iqbal. (Dr)	:	The Reconstruction of Religious thought in
Islam.		Lahore: Ashraf Press, 7. Aibak Road, 1965.
	:	The Development of Metaphysies in persia, London: 1908
Jadhunath Serker (ed)	:	History of Bengal, Vol-II, Dacca University,1972.
Wise, James	:	Notes on the Race, Caste and Trades of
Eastern		Bengal. London: Herrison and sons, 1883.
Taylor, James	:	A Scketch of the Topography and staatistics of Dacca, Calcutta : 1840.
Muin-Ud-Din Ahmed Khan	:	History of the Faraidi Movement, Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 1984.
Muzaffar Uddin Nadvi (sayed,Dr.)	:	Muslim thought and its source.
Margon, K.W.	:	Islam, the straight Path.
Nicholson	:	Mystics of Islam.
R.C. Majumder	:	History of Bengal, Vol.- I, Dhaka,1963.
Richard Saymond	:	The making of Pakistan.
R.C. Basak	:	The History of North Eastern India. 1934.
Shila Sen	:	Muslim Politics in Bengal (1937-1947). New Delhi: 1976.
V.A. Smith	:	The Early History of India. Londonl: 1967.
Yusuf Ali	:	Encyclopedia of Islam, Vol-II.

Dhaka University Institutional Repository

পত্র পত্রিকা/ ম্যাগাজিন

অগ্রপথিক, ৯ম বর্ষ , ৩য় সংখ্যা, মার্চ, ১৯৯৪ ইং।

অগ্রপথিকঃ সীরাতুন্নবী সংখ্যা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮ ইং।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, এপ্রিল-জুন সংখ্যা, ১৯৮৭ ইং।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, অক্টোবর- ডিসেম্বর সংখ্যা, ১৯৮৭ ইং।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, এপ্রিল-জুন সংখ্যা, ১৯৮৮ ইং।

দৈনিক ইত্তেফাক, ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭ ইং।

দৈনিক বাংলা, ২০ শে এপ্রিল, ১৯৮৬ ইং।

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৮৯ ইং।

তরজমানুল হাদীস (মাসিক) ১ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, পাবনা,১৯৮৯ ইং।

মানব বিদ্যা বক্তৃতা ৮৭, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৭ইং।

মাসিক মদীনা, ঈদ সংখ্যা এপ্রিল, ১৯৯৩ ইং।

বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, একাদশ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, শ্রাবন-চৈত্র, ১৩৮৪ বাং।

বাংলা সাহিত্য পত্রিকা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,১৯৭৫ ইং।

শরীয়তে ইসলাম পত্রিকা, ৩য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা।

শরীয়তে ইসলাম পত্রিকা, ১০ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ১৩৪২বাং।

শরীয়তে ইসলাম পত্রিকা, ৫ম বর্ষ, আষাড় সংখ্যা।

ছুন্নত আল- জামাত পত্রিকা, ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা

ইসলাম দর্শন, ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩২৭ বাং।

সাহিত্য পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৯০ বাং।

আল হেরা, ঢাকা, বৈশাখ, ১৩৮৪ বাং।

দৈনিক সংগ্রাম, ২৪শে জৈষ্ঠ্য ১৩৯০ বাং।

মাসিক মোহাম্মদী, ঢাকা, শ্রাবণ, ১৩৭১ বাং।

দৈনিক ইনকিলাব, ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৯০ ইং।

বাংলাদেশ সৌদি আরব ভ্রাতৃ সমিতি, শাশ্বত ভ্রাতৃত্ব সংকলন '৯১।

ইসলামী বিশ্বকোষ, (২য় খন্ড), ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

ইসলামী বিশ্বকোষ, (১৪শ খন্ড), ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

বাংলা বিশ্বকোষ, কলিকাতাঃ

বাংলা বিশ্বকোষ, (৩য় খন্ড), ঢাকাঃ নওরোজ কিতাবিস্তান বাংলাবাজার, ১৯৭৩ ইং।

Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol-16, 1847 . p.76

Report on the Sensus of Bengal 1871.

Report on the Sensus of Bengal 1881.

Report on the Sensus of Bengal 1891.